অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

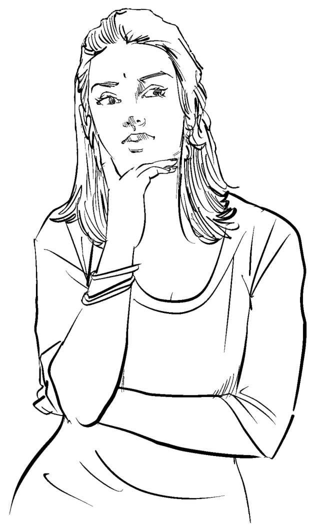


অনিলিখা রহস্য সমগ্র

অনিলিখা রহস্য সমগ্র ১

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অনিলিখা রহস্য সমগ্র ১



পত্রভারতী®

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ রঞ্জন দত্ত

ANILIKHA RAHASYA SAMAGRA 1

Anthology of Anilikha Series : Part 1

by Abhijnan Roychowdhury

Published by PATRA BHARATI®

শ্রদ্ধেয় লেখক কল্পবিজ্ঞানের লেজেন্ড

শ্রীঅনীশ দেব

যাঁর হাতে এই বইটা না তুলে দেওয়ার আপশোস
চিরকাল থেকে যাবে।

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত লেখকের

কিশোর সাহিত্য

অনিলিখা ও অনিলিখা

সব লজিকের বাইরে

ভৌতিক অলৌকিক

বিজ্ঞান। জানা অজানা

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

কিছু কথা

অনিলিখাকে বাঙালি পাঠকের কাছে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই।

অনিলিখার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে কিশোরভারতীর পাতায়। গল্পের নাম ছিল 'মিকুমুর গবেষণা'। এখনও এত বছর বাদে সে গল্প অনিলিখার অন্য সব গল্পের মতো বিভিন্ন আলোচনায় ঘুরে-ফিরে আসে। সে গল্প ছিল বিজ্ঞাননির্ভর রহস্যগল্প—এক বিশেষ জেনেটিক রোগ ও এক বিজ্ঞানীকে কেন্দ্র করে।

তার প্রায় এক বছর বাদে একই গল্প আনন্দমেলায় বের হয়। সে গল্পের নাম 'মিকুমু ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার'। অনিলিখা সেখানে 'অনুলেখা' হয়ে গেছে। এর পিছনেও একটা রহস্য আছে।

তখনকার সময়ে যোগাযোগের অভাবেই হয়তো এটা হয়েছিল। ওই গল্প আমি প্রথমে ১৯৯৫ সাল নাগাদ আনন্দমেলায় পাঠাই। সে লেখা নির্বাচিত হয়েছিল! কিন্তু ওঁদের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে 'অনিলিখা'—নামের কোনও অর্থ না থাকায় নাম পরিবর্তন করে 'অনুলেখা' করতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। আনন্দমেলাকে জানাই, যেন ওই গল্প কোনওভাবে না বেরোয়। লেখাটা ফেরত চাই। ওই লেখাটাই কিশোরভারতীতে পাঠাই।

কিন্তু কীভাবে জানি সে গল্প তখন না বেরোলেও তার প্রায় দু-বছর বাদে আনন্দমেলায় বেরিয়ে যায়। যাই হোক, এই খবর পেয়ে আমি তৎকালীন সম্পাদকের কাছে আমার অসন্তোষ জানাই ও বলি, 'অনিলিখা' নামে না বেরোলে ভবিষ্যতে অন্য কোনও 'অনিলিখা'র গল্প আনন্দমেলায় পাঠাব না। সেজন্য বেশ কয়েক বছর আনন্দমেলায় আর লিখিনি। পরের অনিলিখার গল্প আনন্দমেলায় ২০০০ সালে 'আধঘণ্টার অভিনয়' প্রকাশিত হয়, যেখানে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল অনিলিখা।

এটা এজন্যই বললাম যে 'অনিলিখা'-র গল্পের মান, প্লটের মৌলিকতা সম্বন্ধে শুরু থেকেই আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। তাই আমার অবস্থানও ছিল খুব পরিষ্কার, অনিলিখা ঠিক নিজের মতো করেই পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাবে, তার জন্য কোনও নামী পত্রিকার শর্ত মানার বা দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন হবে না।

এর প্রায় এক যুগ পরের কথা। ২০০৭ সালে আমি তখন আমেরিকা থেকে কিছুদিনের জন্য দেশে এসেছি। দুই প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনীশ দেব আমাকে ডাকলেন দপ্তরে। উপন্যাস লিখতে হবে আমাদের সবার প্রিয় শারদীয়া কিশোর

ভারতীতে। অনিলিখাকে নিয়ে উপন্যাস, তাও আবার সরাসরি অন্যতম জনপ্রিয় কিশোর পত্রিকার শারদীয়ায়।

সেই প্রথম অনিলিখা এল উপন্যাসে। সংকেত রহস্য। তিন মহাদেশ জুড়ে বহুমাত্রিক কল্পবিজ্ঞান-রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস, যার কেন্দ্রে পেরুর মনু রিসার্ভ ফরেস্ট। মনে আছে সে উপন্যাস প্রকাশের প্রায় ছয় মাস পরেও প্রতি সংখ্যায় ওই উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু চিঠি আসত। সেই সময়টা অন্যরকম ছিল। চিঠিতে পাঠকদের নির্ভেজাল ভালোবাসা মিশে থাকত।

তার পরে আরও এক যুগ কেটে গেছে। অনিলিখাকে নিয়ে অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস লেখা হয়ে গিয়েছে গত চব্বিশ বছরে। অনিলিখা পৌঁছে গেছে প্রায় সব বাঙালি পাঠকের ড্রয়িংরুমে। সেভাবে অনিলিখাকে নিয়ে কখনও মার্কেটিং-এরও প্রয়োজন হয়নি।

এই গল্প-উপন্যাসগুলো নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে আরও লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন অনেক পাঠকই আছে, যারা সারাবছর অনিলিখাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অপেক্ষায় থাকে। অনিলিখাকে ঘিরে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে অবাক করে, উৎসাহিত করে। সেই আকাশছোঁয়া প্রত্যাশাপূরণের জন্য প্রত্যেকবার এমন কিছু লেখার চেষ্টা করি যা বিশ্বসাহিত্যে এখনও লেখা হয়নি। এত শক্ত সে কাজ, এত রিসার্চ থাকে প্রত্যেকটা লেখার পিছনে যে সেজন্যই আমি খুব কম অনিলিখার গল্প বা উপন্যাস লিখি। কখনোই চাইনি অনিলিখার গল্পের মান নিয়ে প্রশ্ন আসুক। দিতে চেয়েছি এমন কিছু লেখা, যা ভবিষ্যতের পাঠক তৈরি করবে। সে অর্থে তাই অনিলিখা গবেষক নয়, গোয়েন্দাও নয়, প্রফেসারও নয়।

আমি নিজে গেছি প্রায় ষাটটা দেশে। অনিলিখার গল্পও তাই শুধু বাংলার মাটিতে আটকে থাকেনি। কিন্তু জোর করেও কোনও গল্পে বিদেশের উপস্থাপনা করা হয়নি। গল্প বা উপন্যাসের প্রয়োজনে গল্পের জায়গা নির্বাচন করতে হয়েছে। যেমন উপন্যাস 'সংকেত রহস্য'-তে মূলত চারটে কারণে পেরুর মনু রিসার্ভ ফরেস্ট নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। একইভাবে 'মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন' উপন্যাসেও সুমাত্রা ছাড়া অন্য কোনও জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল না।

অনিলিখার গল্পের পরতে পরতে রহস্য রোমাঞ্চের সঙ্গে মিশে থাকে কল্পবিজ্ঞান, স্পষ্ট যুক্তি অথবা কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক ঘটনা। তবে সবার উপরে আমি গল্পের কথাই মাথায় রাখি, যাতে পাঠক বিজ্ঞান সবটা না বুঝলেও গল্পের টানটান আকর্ষণ ও রহস্য উপভোগ করেন। একই সঙ্গে অনিলিখার গল্পের ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে বলে হয়তো অনেক গল্পে পাঠকের মানসভ্রমণও হয়ে যায়।

হ্যাঁ, একটা সংযোজনও ঘটেছে। ২০১০-এর পরে লেখা অনিলিখার কিছু উপন্যাসে ও গল্পে উপস্থিত আছেন আমার কল্পবিজ্ঞানের আরেক চরিত্র। বিজ্ঞানী মিস্টার পাই।

অনিলিখার গল্প ঠিক কাদের জন্য? যারা টানটান রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞাননির্ভর একদম নতুন কিছু পড়তে চান, তাদের জন্য অবশ্যই অনিলিখা। অনিলিখার গল্প বা উপন্যাসে একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও মিল নেই। এমনকী 'সংকেত রহস্য'-র সিকুয়েল 'রহস্য যখন সংকেতে'-র থিমও সম্পূর্ণ আলাদা।

আজকাল বাঙালি কল্পবিজ্ঞানের পাঠকরা অনেক বেশি খোঁজখবর রাখেন। তাঁরা এখনকার বিদেশের কল্পবিজ্ঞানের লেখাও পড়ছেন, আমার লেখাও পড়ছেন, তুলনামূলক বিচার করছেন। অনিলিখার গল্প মানে রসকষহীন বিজ্ঞানের কঠিন সম্ভাষণ নয়, তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে আজকের সমাজ, বিশ্ব রাজনীতি, মানবিক অনুভূতি, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিলিখার চরিত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে, হয়তো গল্পের চরিত্রেও। অনিলিখার গল্প শুধু কল্পবিজ্ঞান রহস্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভৌতিক অলৌকিক ঘটনাও এসেছে অনিলিখার গল্পে। অজস্র পাঠক বহু বছর ধরেই অনিলিখার বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসকে একসাথে পেতে চেয়েছে। সেই আগ্রহ থেকেই 'অনিলিখা রহস্য সমগ্র'।

এই বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে যিনি মূল ভুমিকা গ্রহণ করেছেন আমার সেই প্রিয় সাহিত্যিক পত্র ভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবদাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বৌদি চুমকি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অনীশ দেবকে যাঁরা আমার উপরে ভরসা না রাখলে আমি এই উপন্যাসগুলো কোনওদিন লিখতেই পারতাম না। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই বন্ধুদের। যাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা আমাকে প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখায়, বাংলা থেকে এত দূরে থাকলেও বাংলাসাহিত্যে নতুন সৃষ্টির তাগাদা নিরন্তর জোগায়।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড
নভেম্বর, ২০২১

সূচিপত্র



রহস্য যখন ডারউইন

রহস্যের দশ আঙুল

রহস্য যখন সংকেতে

সংকেত রহস্য



পোর্টেরিকো, আমেরিকা 16 এপ্রিল

ভোর পাঁচটা। অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের ওপরের একটা লোহার প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন জিল টার্টার। জিল 'সেটি' বা সার্চ ফর একস্ট্রাটেরেস্টিয়াল ইনস্টিটিউটের ফিনিক্স প্রজেক্টের ডিরেক্টার। জিল আর জিলের টিমের কাজ তারাদের কথা শোনা। অর্থাৎ বহির্বিশ্ব থেকে কোনও সংকেত আসছে কি না তা লক্ষ করা। পৃথিবীর বৃহত্তম এই টেলিস্কোপে খুব দুর্বল সিগন্যালও ধরা পড়ে। গত কুড়ি বছর ধরে জিলের এই কাজ। তবে এখনও অবধি বহির্বিশ্বের কোনও সংকেত ধরা পড়েনি এই বিশাল টেলিস্কোপে।

তবু জিলের এই কাজ খুব ভালো লাগে। প্রত্যেক মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি এল কোনও সংকেত। আর আশা করাটা কি খুব ভুল! মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই আছে 400 বিলিয়ন তারা। তার মধ্যে দশ শতাংশ সূর্যেরই মতো—আকারে-বয়সে। মহাবিশ্বে এরকম 100 বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। তাই প্রাণ নিশ্চয়ই আছে আরও কোথাও। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রোজ এই সময়টাতে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য বাইরে এসে দাঁড়ান জিল। বিশাল টেলিস্কোপের মাথার ওপরের এই প্ল্যাটফর্মটায়। টেলিস্কোপের চারদিক ঘিরে ঘন জঙ্গল। প্রকৃতির মাঝেই প্রযুক্তি। ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে পুবের দিকে সূর্যোদয়ের রক্তাভা দেখা যাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলেই জঙ্গলের সুর কেমন যেন বদলে যায়। দূরে গাছে কোকুই ব্যাঙের সমবেত ডাক শোনা যায়—'কোকুই, কোকুই'! অদ্ভুত এই ব্যাঙ। ডাক শোনা যায়। কিছু কখনও দেখা যায় না। টেলিস্কোপের উপরের স্টিলের তারে বসা পাখিদের ডানা ঝাপটানো শুরু হয়েছে। হঠাৎ তার সঙ্গে আজ এক বেসুরো আওয়াজ যোগ হল। সেলফোন বাজছে।

দিনের বেলায় সূর্যের বদান্যতায় রেডিয়ো সিগন্যাল বিকৃত হয়ে যায়। তাই টিম রাতের বেলা কাজ করে তারাদের ওপর নজরদারি করার। সন্ধে ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা হল কাজের সময়। তাই এসময় ফোন বাজাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ফোনের নাম্বারটা অস্বাভাবিক। ল্যাবের কম্পিউটার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা ফোন। এই ফোন জিল গত কুড়িবছরে মোটে ছ'বার পেয়েছে।

অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার মহাকাশের কোনও জায়গা থেকে ন্যারো ব্যান্ড সিগন্যাল পেলে তা সঙ্গে-সঙ্গে ইংল্যান্ডের আরেকটা টেলিস্কোপকে জানায়। ওই টেলিস্কোপ সঙ্গে-সঙ্গে দেখে আকাশের ওই দিক থেকে সত্যিই কোনও সংকেত আসছে কি না। দু-জায়গায় দুটো টেলিস্কোপ একসঙ্গে নিশ্চয়ই ভুল দেখবে না! দ্বিতীয় টেলিস্কোপও ওই

সিগন্যাল পেলে কম্পিউটার অ্যারেকিবো টেলিস্কোপকে অভিমুখ সামান্য পরিবর্তন করতে বলে। যদি অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য সিগন্যাল চলে যায়, আর আবার আগের পজিশনে মুখ ঘোরালে ফিরে আসে তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, আগে টেলিস্কোপ যে-তারার দিকে নির্দেশ করেছিল তার থেকে সংকেত পাচ্ছে। এর পরই কম্পিউটার 'সেটি' টিমের সবার কাছে ফোন করে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়।

এসবের পরেও গত কুড়িবছরে জিল যে ছ'বার ফোন পেয়েছে, প্রত্যেকবারই ভুল সংকেত ছিল। শেষবার একটা স্যাটেলাইট থেকে ভুল সংকেত পেয়েছিল। তবু এই সংকেতের জন্যই জিলের আজীবন প্রতীক্ষা। ছুটে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে অবজারভেশন সেন্টারে ঢুকতে জিলের সময় লাগল মোটে পাঁচমিনিট। অন্যরাও জড়ো হয়েছে কম্পিউটারের সামনে।

পাশ থেকে হেনরি বলে ওঠে,—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট ল্যাসেনের টেলিস্কোপেও এই সিগন্যাল এক্ষুনি ধরা পড়েছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য চার মিলিমিটার। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

জন বলে ওঠে,—নিশ্চিতভাবে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। সংকেতটা আসছে তারা HD214 825 0AB থেকে। এ-তারাটা আমাদের সূর্যেরই মতো। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই।

বলতে-না-বলতে কম্পিউটার মনিটরে একটা বৃত্ত ফুটে ওঠে। তারপরে আরেকটা। আস্তে-আস্তে পুরো নকশা ফুটে ওঠে। জিল অস্ফুটে বলে ওঠে,—ও মাই গড! এটা কী নকশা?

লিমা, পেরু 18 এপ্রিল

আপনার কি মাথার ঠিক আছে ডক্টর গেরার্ডো? এ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী কাস্টেলোর কাছে গেলে আমার-আপনার চাকরি থাকবে?

নানান ধরনের চার্ট, ছবি আঁকা রঙিন রিপোর্টটা ছুড়ে দিয়ে গার্সিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন। গার্সিয়া পেরুর মানবসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী।

—কিন্তু রিপোর্টটায় কোনও ভুল নেই। আমি না বললেও খবরটা ঠিক ছড়িয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন উপজাতি প্রধান আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই 'অ্যামাহুয়াকা'-দের কথাই ধরুন। দু-বছর আগেও দুশো ছিল সংখ্যায়। এখন তারা ভ্যানিশ। 'অ্যাশানিনকা'-দের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার, এখন সেটা আট হাজার। 'অ্যাশুয়ার' ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার। ডক্টর গেরার্ডো রিপোর্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

—তা কোনও উপজাতির সংখ্যা বাড়েনি?

—হ্যাঁ বেড়েছে। বোরা ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে।

গার্সিয়ার পাশেই বসে আছেন মানবসম্পদ দপ্তরের সেক্রেটারি অ্যারন। রিভলভিং চেয়ারটা টেবিলের দিকে একটু টেনে এনে বলে উঠলেন,—গেরার্ডো, আপনি তো এখানকার রাজনৈতিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এমনিতেই আমাজনের জঙ্গলে তেলের পাইপলাইন বসানো নিয়ে হইচই হচ্ছে। নানা দেশের আবহাওয়াবিদেরা সুর ধরেছেন এর জন্য নাকি আমাজন ধ্বংস হয়ে যাবে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়ে যাবে। পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য উপজাতিরা উধাও হয়ে যাবে। এসবের মধ্যে যদি আবার এ-খবর বেরোয় তাহলে আর দেখতে হবে না। আমাদের সরকার যে-ক'টা তেল আর গ্যাসের কন্ট্রাক্টে সই করেছে, সবক'টা বাতিল করতে হবে।

গার্সিয়া আবার শুরু করলেন,—তা কী কারণ হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? জঙ্গল কাটার জন্য এরা তো আর উবে যাবে না।

—সেটাই রহস্য। আর, এই যে বললাম উপজাতিদের সংখ্যা কমে যাওয়া—এটা কিন্তু সব উপজাতির মধ্যে নয়। মূলত আমাজন বেসিনের জঙ্গলে যেসব উপজাতিরা থাকে তাদেরই সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। আর এই কমে যাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ করে লক্ষ করা গেছে গত দু-বছরে।

—উপজাতি প্রধানদের তো তা জানা উচিত। তারা কী বলছে?

—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওদের ভাষা বোঝাটাই সমস্যা। অ্যাশনিনকা ইন্ডিয়ানদের চার-পাঁচজন প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। হঠাৎ-হঠাৎ করে এদের দলের লোকেরা ইদানীং উধাও হয়ে যাচ্ছে। হয়তো কেউ মাছ ধরতে গিয়েছিল, কেউ কাঠ কাটতে গিয়েছিল, ব্যস আর ফেরেনি।

গেরার্ডোকে থামিয়ে গার্সিয়া বলে ওঠেন,—তবেই বুঝুন? নির্ঘাত জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডার সংখ্যা বেড়ে গেছে। হবে না, শুধু জঙ্গল-জঙ্গল করলে! তাদের পেটেই যাচ্ছে এরা।

—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে অন্তত ডেডবডির চিহ্ন পড়ে থাকে। ওরা কিছুই খুঁজে পায়নি। যারা হারিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের নাকি ভূতে ধরেছে। ফেরার পর কাউকেই তারা আর চিনতে পারে না। চিকিৎসা করেও সারানো যায়নি।

—ওরা আবার কী চিকিৎসা করায়! নিয়ে তো যায় ওদের হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে। তা আপনি কি ওরকম ভূতে-ধরা কারও সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন?

—না, সে চান্স আমার হয়নি। তবে শুনেছি এরা নাকি বাড়ির লোকজন কাউকে চিনতে পারছে না। এমনকী, আগুন, জন্তু-জানোয়ার—এসবের ভয়ও এদের চলে গেছে।

—আপনার কাছেই এসব যখন রহস্য, তখন এগুলো রিপোর্টে না লেখাই ভালো। তার থেকে আপনি বরং একটা টাস্ক কমিটি তৈরি করুন। তাতে ভালো কয়েকজন বিজ্ঞানী রাখুন।

আর কয়েকজনকে রাখুন যারা ওই উপজাতিদের ভালো বোঝে। আমাজনের অন্ধিসন্ধি জানে। তারপরে সেই টাস্ক কমিটির মতামত অনুযায়ী না হয় যা কিছু দরকার, তা করা যাবে। অ্যারন বলে ওঠেন।

ডক্টর গেরার্ডো সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

গার্সিয়া বলে ওঠেন,—দেখবেন, কোনওভাবে আপনার এই সংখ্যাতত্ত্ব যেন মিডিয়ার কাছে লিক না করে। টাস্ক কমিটিকেও এভাবে ব্যাপারটা বলবেন না। বলুন উপজাতি আর পরিবেশ পরিবর্তনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতেই এই টাস্ক কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়েও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

ডক্টর গেরার্ডো আর খানিকক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিলেন। অ্যারন উঠতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে চোখের ইশারায় বসতে বলে গার্সিয়া বললেন,—অ্যারন, এই বুড়োর ওপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, কী বলতে কী বলবে! তুমি এর প্রথম দিকের মিটিং গুলোতে থেকো। এটা ঠিক যে, উপজাতিদের সংখ্যা খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। আমিও অন্য জায়গা থেকে এরকম খবর পেয়েছি। কিছু একটা অস্বাভাবিক হচ্ছে। তা না হলে হাজার-হাজার বছর ধরে যারা এসব জায়গাতে আছে, হঠাৎ করে আজ তারা অসুবিধেয় পড়বে কেন? এরা নিজে থেকে কোথাও চলে যাওয়ার লোকও নয়। এত বছরেও এদের অভ্যাসে একবিন্দু পরিবর্তন হয়নি। সামনে 24 জুন ইন্ডিয়ান ডে আসছে। এসময় মিডিয়া আবার এদের নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করে। আমি তার আগেই তোমার বিস্তারিত রিপোর্ট চাই।

সম্মতি জানিয়ে রিপোর্টটা হাতে তুলে নিয়ে অ্যারন বেরিয়ে এলেন মানবসম্পদ মন্ত্রী গার্সিয়ার চেম্বার থেকে।

গ্যালওয়ে, আয়ার্ল্যান্ড, 1 মে

কোরিব নদীর ধারে একটা পাব-এ বসে স্যান্ডুইচ খাচ্ছিলেন রবার্ট আর পল। রবার্ট ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর পল 'ডাবলিন নিউজ'-এর সাংবাদিক। জানালার কাচের ওপর দিয়ে অঝোরে নেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটার দিকে তাকিয়ে রবার্ট বলে উঠলেন,—ভাবলাম একটু গলফ খেলা যাবে। তা সকাল থেকে বৃষ্টি। ছাড়ার নাম নেই। আচ্ছা, গারদা পুলিশের যে লোকটা প্রথম ক্রপ সার্কেলটা দেখেছিল—কী যেন নাম তার?

—বিল। বিল অবশ্য প্রথম দেখেনি। ওর আগে এক স্থানীয় চাষি প্রথম দেখে। সে-ই বিলকে ডেকে জানায়। তা দেখে আপনার কী মনে হল? কারুর ইয়ার্কি? প্রচার পাওয়ার জন্য খেতে ওরকমভাবে নকশা করেছে?

—গত সাতবছরে এরকম চারবার দেখেছি। একবার ইংল্যান্ডে, একবার অস্ট্রেলিয়ায়, একবার ব্রাজিলে আর-একবার আমেরিকার টেক্সাসে। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে মানুষ হয়তো এরকম করতেও পারে। তিরিশ-চল্লিশজন লোক মিলে রাতারাতি কি না পারে! কিন্তু এরকম করা সত্যিই শক্ত। তা তুমি কি ক্রপ সার্কেল আগে দেখেছ?

—না, এর আগে দেখিনি। পড়েছি। বিজ্ঞানীরা নাকি প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাতাসে ধূলিকণাগুলো চার্জড হয়ে নাকি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আর তার জন্য যে তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা-ই এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। আর এই ঘূর্ণিঝড় মাটির খুব কাছে হয় বলে, বৃত্তের মাঝের শস্যগুলো ওরকমভাবে শুয়ে পড়ে। গোল-গোল ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়। বৃত্তের নানানরকমের নকশা।

রবার্ট উদাসীন ভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে ওঠেন,—এ-থিয়োরির প্রবক্তা কে জানো? ডক্টর গিল হার্ভে। 1960-তে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে এরকম ক্রপ সার্কেলের খবর আসতে থাকে। বলা নেই-কওয়া নেই, হঠাৎ করে এক রাতের মধ্যে ফসল ভরতি মাঠের মধ্যে এরকম গোল-গোল নকশা। মাঝের শস্যগুলো নুয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। এতই নিখুঁত সেসব নকশা যে প্রথমেই মনে হয় অন্য কোনও গ্রহের জীব এসে তৈরি করে দিয়ে যায়নি তো? ক্রপ সার্কেলের খবরে সারা পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যায়। এ-সময়ে আবার E.T. সিনেমাটাও বেরিয়েছিল। তাই লোকে প্রথমেই ভাবতে শুরু করল UFO ল্যান্ডিং-এর জন্যে এরকম হয়নি তো?

1990 সালের 7 জুলাই। আমি তখন ব্রিস্টলে। খবরের কাগজে দেখলাম ইংল্যান্ডের উইলটশায়ারে রাতারাতি 149টা বৃত্ত দিয়ে ভারি সুন্দর একটা নকশা তৈরি হয়েছে। সে নকশাটার মধ্যে একটা অঙ্কের সংকেতও ছিল। এসবের মাঝে গিল হার্ভে নিজেই হঠাৎ করে হারিয়ে গেলেন 1995 সালে। কোথায় গেলেন কে জানে!

পল কোকের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে উঠল,—তা আপনার কি এ-থিয়োরি নিয়ে প্রশ্ন আছে?

—এ-থিয়োরি প্রমাণিত কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, যখনই এরকম ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়, আশেপাশে চৌম্বকক্ষেত্র প্রবল হতে দেখা গেছে। তবে বাতাসে প্লাজমা তৈরি হয়েছে বলেই যে এরকম ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি। কেউ-ই ক্রপ সার্কেল তৈরি হতে দেখেনি।

—তা কালকেও এরকম কিছু খবর এসেছে। সকালেও তো দেখলেন, এখানে এখনও চৌম্বক ক্ষেত্র স্বাভাবিকের থেকে শক্তিশালী। তা আপনি যেন কিছু একটা ভাবছেন?

—কিছু না, শুধু এবারে যে নকশাটা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিক আছে। সেটাই ভাবার চেষ্টা করছি। আগে কি কখনও এই সংকেত দেখেছি? কে জানে! আর বড় রাস্তার একদম পাশে। লোকের চোখ এড়িয়ে তৈরি করা শক্ত। ভাবছি আরেকবার জায়গাটার এরিয়াল সার্ভে করে নিই। ওপর থেকে ভালো ছবি আসে। পুরো নকশাটা ভালো করে দেখা দরকার।

—চলুন, আমার তো বিবিসি-তে দেড়ঘণ্টা বাদে এর ওপর একটা প্রোগ্রাম আছে। তখন আকাশ থেকেই না হয় দেখানো যাবে। ওপর থেকে ভালো ছবি আসবে।

কলকাতা, ভারত, 3 মে

—লস্ট ওয়ার্ল্ড, জুরাসিক পার্ক যতবার দেখি ততবারই ভালো লাগে। এত ভালো সিনেমা, দেখতে শুরু করলে আর ওঠা যায় না। মিলন বলে ওঠে।

—কিন্তু পুরো প্লটটাই তো গাঁজাখুরি। কোনওদিন ওরকম সম্ভব? 65 মিলিয়ন বছর আগে যারা উধাও হয়ে গেছে, ফসিল থেকে সেই ডাইনোসরদের তৈরি করা সম্ভব! অবাস্তব কিছুই প্রতীকের পছন্দ নয়।

আজকে আমাদের শনিবারের আসরে প্রায় সবাই উপস্থিত। বিশ্বজিৎদা, অনিলিখাও হাজির। আসলে বাইরে যা গরম পড়েছে তাতে শনিবারেও আর কেউ বাড়ির বাইরে দূরে যাচ্ছে না। সন্ধে হতেই এক-এক করে প্রায় সবাই হাজির আমাদের শনিবারের আড্ডায়। টিভিতে লস্ট ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছিল, শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তা-ই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

—আচ্ছা অনিলিখাদি, তোমার কী মনে হয়? ডাইনোসর কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব? শিশির জিগ্যেস করে।

—কেন ডাইনোসর ফিরে এলে কি খুব খুশি হতিস? অবশ্য দু-একজনকে মেরে ফেললে তোরা যে খুব আনন্দিত হতিস তা নিয়ে আমারও কোনও সন্দেহ নেই। অনিলিখা মুচকি হেসে বিশ্বজিৎদার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার বলে,—কল্পনাটা কিন্তু একেবারে আজগুবি নয়। ডাইনোসর অবশ্য ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সাম্প্রতিককালে যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন তাসমানিয়ার বাঘ—তাদেরকে হয়তো ক্লোন করে ফিরে পাওয়া সম্ভব।

—কীভাবে?

—জুরাসিক পার্কে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে ডাইনোসরের ডিএনএ-এর পুরো অংশ এত লক্ষ বছর পরে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, ডিএনএ পাওয়া গেলেও ভ্রূণ থেকে বাচ্চা তৈরি করার জন্য ওই ধরনের কোনও

প্রাণীর গর্ভ ব্যবহার করতে হবে। তার মধ্যেই তো বড় হবে। হাতির বাচ্চা তো আর ছাগলের পেটে হবে না। কিন্তু ডাইনোসর শ্রেণির কোনও প্রাণীই তো আজ আর নেই।

—তা, তুমি বলছ ফসিল থেকে ডিএনএ বের করে ওইরকম বিলুপ্ত প্রাণী ফিরে পাওয়া সম্ভব? প্রতীকের মনে এখনও প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, সেরকম চেষ্টা তো অলরেডি চলছে। মেরু অঞ্চলের বরফের তলায় হাড়, দাঁত, নখ, চুলের কোষ হাজার-হাজার বছর ধরে বরফে জমাট অবস্থায় অবিকৃত থাকতে পারে। প্রথমেই ওসব কোষ থেকে ডিএনএ বের করে আনতে হবে। ডিএনএ-র মধ্যেই ওই বিলুপ্ত প্রাণীর সব কিছু ধরা থাকে। তবে পুরো ডিএনএ এত বছর পরে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়ার আশাটা একটু বাড়াবাড়ি। ধরা যাক, ম্যামথের একটা কোষ পাওয়া গেল। এবার, ম্যামথের কাছাকাছি প্রাণী কোনটা? হাতি। ম্যামথের ভাঙাচোরা ডিএনএ-র বাকি অংশ হাতির ডিএনএ দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

—মোদ্দাকথা হল বক আর কচ্ছপ মিলিয়ে বকচ্ছপ তৈরি করলে, তাই তো? সাগ্নিক অনিলিখার কথা সরল করার চেষ্টা করে।

—না, তা কিন্তু নয়। আমরা শুধু ম্যামথের ডিএনএ মেরামত করে নিলাম। হাতির থেকে সেটুকুই নিলাম যা ম্যামথের ডিএনএ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

—তা, ম্যামথের ডিএনএ না হয় পেলে, তারপরে?

—এবার যেভাবে ক্লোনিং করা হয় ঠিক সেভাবে হাতির ডিম্বাণু বের করে তার থেকে নিউক্লিয়াস বাদ দিয়ে ওই জায়গায় ম্যামথের মেরামত করা ডিএনএ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর ইলেকট্রিক শকের সাহায্যে কোষবিভাজন শুরু করতে হবে। এভাবে যে ভ্রূণ তৈরি হবে তা এবার হাতির গর্ভে রাখতে হবে। ব্যস, হাতির যে বাচ্চা হবে, তা আসলে হবে ম্যামথ।

বিশ্বজিৎদা না শোনার ভান করে দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর গুনগুন করছিল। থামিয়ে পাশ থেকে মন্তব্য করল,—হ্যাঁ, অনিলিখার বাড়িতে বসে বিজ্ঞানীরা গোপনে এসব রিসার্চ করছেন। আমাদের পাড়ার নেড়িকুকুর ভুলোর যে বাচ্চাটা হয়েছে, তার হাবভাব তাই ঠিক তাসমানিয়ার বিলুপ্ত বাঘের মতো। অনিলিখাকে দেখলেই তাড়া করে।

অনিলিখা বিদ্রূপ গায়ে না মাখিয়ে বলে উঠল,—বিজ্ঞানীরা সাইবেরিয়ায় এরকম এক প্লিটোসিন পার্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যেখানে প্লিটোসিন যুগের হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যাবে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটিতে ঠিক এভাবেই

তাসমানিয়ার বিলুপ্ত বাঘ ক্লোন করার চেষ্টা চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক হলে বছর পনেরোর মধ্যেই এই বিলুপ্ত বাঘকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

—কিন্তু অনিলিখাদি, এ তো আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি। যেসব প্রাণী জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার উপযুক্ত নয়, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনছি। আর—। বাপ্পার কথায় বাধা এল। অনিলিখার সেল ফোনটা বাজছে।

—হ্যালো, অনিলিখা স্পিকিং।

একটা কানে হাত রেখে অনিলিখার শোনার চেষ্টা দেখে মনে হল খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পুরো কথাবার্তাই ইংরেজিতে হল। মিনিটপাঁচেক ফোনে অনিলিখা যে কথা বলল তার বাংলা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়,—গ্যারি, বহুদিন পরে, তা কী খবর!...না আমি খবরটা দেখিনি। বিবিসি-তে! হ্যাঁ, এখানে ও চ্যানেলটা আসে। দেখে নেব।...ক্রপ সার্কেল!...তুমি ওই একই সংকেত...আশ্চর্য!...তা এটা কত পুরোনো?...পঞ্চাশ হাজার বছর!...দ্যাখো যতটা জটিল ভাবছ ততটা কিন্তু নয়। হতেই পারে কেউ ওই সংকেতটা দেখে এরকম তৈরি করেছে।...না, তাহলে সত্যিই ভাবার মতো।...হ্যাঁ তোমার নাম্বার তো ফোনেই থাকবে। আমি পরে ফোন করব।

ফোনটা ছেড়েই অনিলিখা বিল্টুকে বলল,—বিবিসি-টা চালা তো!

—কী ব্যাপার, কিছু অসুবিধে হয়েছে?

—আগে চালা, পরে বুঝিয়ে বলছি।

বিবিসি চালানো হল।

সাংবাদিক পল নিউম্যান। একটা ছোট হেলিকপ্টার থেকে নীচের জমি দেখানো হচ্ছে। মাইলখানেক জায়গা জুড়ে ভুট্টার জমিতে ছোট-বড় বৃত্তের রকমারি নকশা। মনে হয়, যেন নিপুণ হাতে মাসের-পর-মাস পরিশ্রম করে কেউ এই নকশা তৈরি করেছে। বৃত্তের মাঝের শস্যগুলো শুয়ে পড়েছে। যেন খুব ভারী কিছু দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। পল নিউম্যান বলে চলেছেন,—এত বড় ক্রপ সার্কেল এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। মাত্র এক রাতের মধ্যে এই নকশা তৈরি হয়েছে আয়াল্যান্ডের পশ্চিমে গ্যালওয়ে কাউন্টিতে। আমার সঙ্গে আছে বিখ্যাত জৈব পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওয়াইল্ড। রবার্ট আপনার কী মনে হয়?

রবার্ট বলতে শুরু করে,—ক্রপ সার্কেল তৈরি হয় যখন বাতাসের ধূলিকণা চার্জড হয়ে প্লাজমা সৃষ্টি করে। এই প্লাজমা যে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে তার জন্য...

অনুষ্ঠানটা মিনিটপনেরো হল। অনিলিখাকে দুবার 'আশ্চর্য' বলতে শুনলাম। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে অনিলিখা খুব সংক্ষেপে বলল,—আমার বন্ধু গ্যারির ফোন, আমেরিকার

কলোরাডো থেকে। ঠিক এই একই সংকেত ও এক সদ্য আবিষ্কৃত গুহায় দেখেছে। ব্যাপারটা সত্যিই ভাবার মতো। একটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি সংকেত আরেকটার সঙ্গে কখনও এক হতে পারে না।

ডেনভার, কলোরাডো, আমেরিকা ৪ মে

ডেনভার এয়ারপোর্টের 4নং টার্মিনালের লাগেজ নেওয়ার জায়গায় অপেক্ষা করছিল গ্যারি। প্রায় আট বছর বাদে দেখা, তাও দূর থেকেই চিনতে পেরেছিল অনিলিখা। একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। শৌখিন দাড়িটুকু বাদ দিলে আর অন্য কোনও পরিবর্তন নেই।

—কী, আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—নাহ, শুধু তো লন্ডনে একবার প্লেন চেঞ্জ।

—তুমি যে এ ক'দিনের মধ্যে আসতে পারবে, প্রথমে বিশ্বাস-ই হয়নি।

—আসলে আমার ভিসা তো ছিলই। সেদিন ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আর গ্যালওয়ের ওই ক্রপ সার্কেলের ছবিটা দেখার পর কৌতূহল আর সামলাতে পারিনি। তা, তুমি বলছ ওই একই নকশা দেখেছ ম্যানিটো স্প্রিং-এর গুহায়।

—হ্যাঁ, কাল নিজের চোখেই দেখবে। আমি আয়ার্ল্যান্ডের ক্রপ সার্কেলের নকশাটার একটা বড় ছবি তৈরি করে রেখেছি। মিলিয়ে দেখে নেবে। তবে খেয়াল রেখো আমি তোমাকে ছাড়া এখন পর্যন্ত কাউকে বলিনি।

—তা হঠাৎ করে আমার কথাই মনে পড়ল?

—দ্যাখো, সবাই না জানলেও আমি তোমার ন্যাচারাল এবিলিটির কথা জানি। আমার এখনও মনে আছে যে-কোনও সাংকেতিক ধাঁধা তুমি কীভাবে চটপট সলভ করে দিতে পারতে। এ সংকেতের অর্থ কেউ না বুঝলেও তুমি ঠিক বুঝবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ম্যানিটো স্প্রিং-এর হোটেলের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি নিল দুজন। সবে বসন্ত শুরু হয়েছে। গাছে নতুন ফুল ধরেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় দূরে রকি মাউন্টেন দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় এখনও সাদা বরফ। পাশে ঘাসের ওপর মাঝেমধ্যে রোদের চোখ এড়ানো বরফ।

—আমি আরও উত্তেজিত কারণ, সবার জন্য খোলা গুহা আমি দেখেছি, কিন্তু এভাবে সদ্য আবিষ্কৃত গুহা যা সাধারণের জন্য এখনও খোলেনি, তা আগে কখনও দেখিনি। তা গুহাটা দেখতে পেলে কীভাবে?

—ম্যানিটো স্প্রিং-এর কাছে ইন্টারস্টেট হাইওয়েতে কাজ হচ্ছিল। এই রাস্তাটার দু-ধারে রকি মাউন্টেন। রাস্তা করার জন্য কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়াররা পাহাড়ের একটা অংশে পরপর

কয়েকটা গর্ত করে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ করে একটা জায়গা এভাবে বোমা দিয়ে ওড়াতে গিয়ে দেখা গেল উড়ে যাওয়া পাথরের পরিমাণ নিতান্তই কম। কারণ খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল এই গুহা যা ওই রাস্তার অংশে এসে গিয়েছিল। তা এটা দেড়মাস আগের ঘটনা।

প্রথমেই ডাক পড়ল আমার। গুহার ম্যাপ তৈরি করতে। যে-কোনও গুহা আবিষ্কার করার পর প্রথমেই সে গুহার ম্যাপ তৈরি করতে হয়। তারপরে আসে জীবাশ্মবিদ, যারা দেখে ওই গুহাতে কী-কী প্রাণীর ফসিল আছে, গুহা কত পুরোনো। তারপর আসে হাইড্রোলোজিস্টরা। তারা দেখে গুহার মধ্যে জল কীভাবে ঢুকত, এখন জল কীরকমভাবে আসছে, কীভাবে ভবিষ্যতে জল ঢুকবে-বেরোবে। ভূতত্ত্ববিদরা দেখতে আসে কীভাবে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ওই গুহা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবার আগে গুহার ম্যাপ তৈরি করতে হয়। তা না হলে লোকে ঢুকবে, কিন্তু আর বেরোতে পারবে না।

—তা, তোমার কাজটা তো খুব ভয়ের! এমন একটা জায়গায় যেতে হয় যেখানে লক্ষ-লক্ষ বছর মানুষের পা পড়েনি। তাও আবার নিকষ কালো অন্ধকারে।

—এবার সেজন্যই তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি। গ্যারি মুচকি হেসে বলে।

—তা, তোমার এখনও গুহার ম্যাপ তৈরি করা হয়নি?

—না, আমরা তো সব মিলিয়ে বড়জোর সাত-আট ঘণ্টা কাটিয়েছি গুহায়। গুহার ম্যাপ তৈরি অন্তত তিন-চার মাসের কাজ। তার জন্য প্রস্তুতিও লাগে। আমরা গুহার মুখ বন্ধ করে চলে এসেছিলাম যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। কাল আবার কাজ শুরু হবে।

—ওই নকশাগুলো দেখলে কখন?

—আমি হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা ভেতর অবধি গিয়েছিলাম। তা প্রায় একমাইল হবে। আমার মাথার হেলমেটে জোরালো আলো ছিল। তাতেই দেখলাম ওই নকশাগুলো। দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা। ওইরকম নকশা শুধু এক জায়গায় নয়, অন্তত তিন-চারটে জায়গায় দেখেছি।

—তুমি নিশ্চিত, তা একইরকম? আর কেউ সঙ্গে ছিল?

—না, আর কেউ ছিল না। যারা আমার মতো ম্যাপ তৈরি করে, তাদের মেমারি খুব ভালো হতে হয়। গ্যালওয়ের ওই ক্রপ সার্কেল যে ওই নকশাগুলোরই বড় সংস্করণ তা আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, সামান্য এদিক-ওদিক হতেই পারে। আর তাই তো আমার এত অবাক লাগল। আমি ছাড়া গুহার ওই নকশার কথা কারুর জানার কথা নয়।

—গ্যারি, ভুলে যেও না আমরা অনেক সময় খুব সহজ কথা ভুলে যাই। তোমরা নিশ্চয়ই এমন জায়গা দিয়ে ঢুকেছ যা গুহার প্রবেশপথ নয়। না হওয়ারই কথা। তোমাদের কাছে গুহার আবিষ্কার তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, হয়তো ওর অন্য কোনও প্রবেশপথ আছে, যা দিয়ে কেউ এসে ওই নকশাটা দেখেছে। নকশা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো কিছুই শক্ত নয়। আরেকটা কারণও হতে পারে। এই নকশা হয়তো আরও কোথাও আছে, যা আমাদের জানা নেই। গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেল যে তৈরি করেছে সে হয়তো ওই নকশা দেখেই করেছে।

কথা বলতে-বলতে থেমে গেল অনিলিখা। উলটো দিকের লেনে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা বিশাল ট্রাক কাত হয়ে পড়ে আছে। কথা আর না বলাই ভালো। ড্রাইভার না অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

ম্যানিটো স্প্রিং, কলোরাডো, আমেরিকা 10 মে

—কী পারবে তো ঢুকতে? সামনে গুহাটা খুব সরু হয়ে গিয়েছে, তার দিকে নির্দেশ করেই বলে ওঠে গ্যারি।

—তা, তুমি তো বলছিলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। সামনে যা অবস্থা, তাতে তো মনে হচ্ছে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে-শুয়ে যেতে হবে।

—বেশি দূর নয়। একশো ফুট যাওয়ার পরে দেখবে আবার আস্তে-আস্তে চওড়া হয়ে গেছে।

—ওপথে কোনও সাপ-খোপ, জন্তু—নেই তো?

—বলা শক্ত, সামনে কি আছে। এরকম বন্ধগুহায় কোনও জন্তু থাকার চান্স কম। তবে, র‍্যাটল স্নেক বা র‍্যাকুন থাকাটা অস্বাভাবিকও নয়, যদি এর অন্য কোনও পথ থেকে থাকে।

—আচ্ছা, ওই যে গুহার ছাদ থেকে বড়-বড় স্তম্ভের মতো জিনিসগুলো ঝুলছে, কি যেন বলে ওগুলোকে?

—স্ট্যালাকটাইটস। এসব গুহা সাধারণত ক্যালসাইট দিয়ে তৈরি হয়। গুহার উপরের দেওয়াল থেকে জল ঢোকে আর সে জল গুহার ক্যালসাইট নিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়ে। পরে জল বাষ্প হয়ে যায়। ক্যালসাইট ওপরের সিলিং থেকে ঝুলে থাকে। বাড়তে-বাড়তে লক্ষ-লক্ষ বছরে এরকম তৈরি হয়। গুহার শোভা বাড়ায়। তা এখানে এত যখন রয়েছে, তার মানে কোনও জন্তুর আসা-যাওয়া নিশ্চয়ই নেই। তাহলে এগুলো ভেঙে যেত।

খানিকটা দ্বিধা নিয়ে অনিলিখা গুহার সরু মুখটার দিকে এগিয়ে যায়। গ্যারি আগে, পেছনে অনিলিখা। বুকে ভর দিয়ে শুয়ে হাত দিয়ে ঠেলে-ঠেলে এগোতে থাকে। হেলমেটের আলোয় চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রায় একশো ফুট হামাগুড়ি দেওয়ার পর ওরা একটা বড় গুহার গহ্বরে প্রবেশ করল। বেরোনোর পরেই যে চাতালটা তাতে অনেক ছোট-ছোট সরু হাড় পড়ে আছে। খুব সাবধানে গ্যারি একটা হাড় হাতে তুলে নিয়ে বলল,—এটা সাপের হাড়ের ফসিল। দশ-বারো হাজার বছর পুরোনো হবে। এই চাতালটায় বড় কোনও প্রাণী থাকত মনে হয়। আচ্ছা, ওপরে ওটা কী! মাটি থেকে চোদ্দো-পনেরো ফুট ওপরে একটা থাবার দাগ, কোন প্রাণী এত বড় হতে পারে?

—বড় ভালুক হবে। দশ-বারো হাজার বছর আগে এসব জায়গায় এক ধরনের ছোট মুখের বিশাল চেহারার ভালুক ছিল। যারা লম্বায় পনেরো-ষোলো ফুট হত। দাঁড়ালে ওরা ওই উচ্চতায় অনায়াসে নাগাল পাবে। প্রচণ্ড হিংস্র এসব ভালুকের প্রিয় জায়গা ছিল এরকম গুহা। তবে এরা প্রায় দশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

—তার মানে, এ গুহার বয়স অন্তত দশ হাজার বছর। চলো, আরেকটু এগোলেই ওই নকশাগুলোর জায়গায় পৌঁছে যাব।

গ্যারি গুহার মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। পায়ের তলা দিয়ে একটা মৃদু জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল,—ওই দ্যাখো।

হেলমেটের আলোয় আলোকিত দেওয়াল দেখে অনিলিখার মুখ থেকে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল,—আশ্চর্য!

পকেট থেকে গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেলের নকশাটার ছবি বের করে নিল গ্যারি। ডানদিকের দেওয়ালে হুবহু সে-ই নকশা। কেউ যেন খুব যত্ন করে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে বাহাত্তরটা বৃত্ত আছে। ওপরের দিক থেকে ওরা মেলাতে শুরু করল। বৃত্তগুলো ওপর থেকে নীচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে। তারপর আবার বড় হয়েছে। বৃত্তগুলোর পারস্পরিক বিন্যাস দুটো ছবিতেই হুবহু এক। কিছু-কিছু বৃত্তের মধ্যে গ্যাপ খুবই কম। কয়েকটা ক্ষেত্রে বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করেছে। জটিল নকশা। হঠাৎ করে এই দুটো নকশা কখনওই মিলতে পারে না।

একটা কার্ডের সাইজের ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে গ্যারি পরপর ছবি তুলতে লাগল। অনিলিখা খুঁটিয়ে দুটো নকশা মিলিয়ে দেখতে লাগল। বৃত্তগুলোর ব্যাসার্ধ, বিভিন্ন বৃত্তের কেন্দ্রের কৌণিক অবস্থান, কী হারে দুটো বৃত্তের মধ্যে দূরত্ব কমেছে—এসব মাপতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে অনিলিখা বলে উঠল,—গুহার বয়স কত তা আমাদের জানতে হবে।

—গুহায় পাওয়া ফসিল দেখলেই গুহার বয়স বোঝা যাবে।

—পঞ্চাশ হাজার বছর অবধি ফসিল থেকে বোঝা যাবে। তার বেশি পুরোনো হলে অন্য উপায়। তার থেকে পুরোনো কোনও ফসিলে আর রেডিয়ো কার্বন থাকবে না। রেডিয়ো কার্বন ডেটিংও কাজ দেবে না।

—তা সেক্ষেত্রে উপায়?

—এখানকার দেওয়ালে শেষ কবে সূর্যের আলো পড়েছিল তা টেস্ট করলেই বেরিয়ে পড়বে। একে বলে কসমোজেনিক ডেটিং। এতে পঞ্চাশ লক্ষ বছর অবধি ঠিকঠাক বোঝা যায়। আমাদের ঠিক সে উপায়ে দেখে নিতে হবে এ নকশা কত পুরোনো!

—হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে ভূ-তত্ত্ববিদ ক্রিস স্টিভেন্স আছেন। গুহায় ঢোকার সময় যাঁর সঙ্গে দেখা হল। উনি এ ব্যাপারে বলতে পারবেন। তবে কিছুদিন সময় লাগবে। তুমি কি এখনই এই নকশার কথা সবাইকে জানাতে চাও? ব্যাপারটা নিয়ে খুব হইচই পড়ে যাবে।

—হ্যাঁ, সে তো পড়বেই। কারণ এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করবে যে গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেল প্রাকৃতিক ভাবে প্লাজমা ভর্টেক্সের জন্য তৈরি হয়নি। তাহলে এরকম একটা নকশার সঙ্গে হুবহু মিলে যেত না। এটাও প্রমাণ করবে যে, এই ক্রপ সার্কেল মানুষের হাতে তৈরি নয়। কারণ এই নকশা গত দশ হাজার বছরে কেউ দেখেনি। এত জটিল দুটো নকশার মধ্যে এতটা মিলও অস্বাভাবিক।

অর্থাৎ পড়ে রইল 'অ্যালিয়েন' থিয়োরি। অন্য গ্রহ থেকে কোনও জীব এসেছিল এই গ্রহে। তারাই তাদের সংকেত রেখে গিয়েছিল এ-গুহায় বেশ কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বছর আগে। তারপর থেকে তারা হয়তো আরও কয়েকবার এসেছে। প্রত্যেকবার তারা কোনও কারণে এসব নকশা এঁকে রেখে গেছে। হয়তো, এর মধ্যে এমন কোনও সংকেত আছে যা উদ্ধার করতে পারলে আমরা এদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারব।

গ্যারি বলে ওঠে,—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে ও নিয়ে আলোচনা পরে হবে। আরও খানিকটা এগোলে এরকম নকশা আরও দেখতে পাবে। প্রায় একইরকম। চলো ওদিকে যাওয়া যাক। আমার মনে হয় এই নকশার কথাটা এখনই কাউকে না জানানোই ভালো।

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

পায়ের নীচ দিয়ে যে জলধারা বয়ে যাচ্ছে তার গভীরতা একটু বেড়েছে। অনিলিখা বলে ওঠে,—তা এ-গুহার কি অন্য কোনও মুখ আছে বলে মনে হয়, যা দিয়ে কেউ এখানে এসে থাকতে পারে?

—তুমি কি এই জলস্রোত দেখে ভাবছ? অনেক গুহাতেই এরকম জলধারা থাকে যা নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমার ধারণা এ-গুহায় এমন কোনও প্রবেশ পথ নেই, যা দিয়ে কোনও

প্রাণী প্রবেশ করতে পারে। না-হলে আমরা বাদুড়, সাপ, কেঁচো এসব দেখতে পেতাম। গুহার কোনও প্রবেশপথ থাকলে বাদুড়রা তো থাকবেই। অনেক গুহাতে হাজার-হাজার বাদুড় থাকে। বাদুড়ের মল, মরা বাদুড়ে মাটি নোংরা হয়ে থাকে। এই যে এতটা এলাম দেখলে সেরকম কিছু?

—সাদা কাঁকড়া, গ্যারি। ওই দেখো সামনে জলের মধ্যে। বলতে না বলতে প্রমাণ পেয়ে গেলে তো!

গ্যারি ঝুঁকে নীচু হয়ে দেখতে থাকে। একটা নয়, দুটো সাদা কাঁকড়া। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়ে বলে উঠে,—এরা চোখে দেখতে পায় না। গুহার সবচেয়ে অন্ধকার জায়গায় এরা থাকে। এরকম বেশিরভাগ জীবের চোখ থাকে না, থাকলেও দেখতে পায় না। এ এক অদ্ভুত জীবজগৎ। আমরা কিছুই জানি না এদের সম্বন্ধে। তবে এরা কিন্তু গুহার প্রবেশপথ আছে প্রমাণ করে না। এরা সারাজীবন গুহার গভীর অন্ধকারেই কাটায়। জন্মায় ও এখানে, মরেও এখানে। কিন্তু বাদুড়, সাপ, র‍্যাকুন, ওয়েলবার্ড এরা গুহার মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এদের কাউকে দেখলে বুঝতাম গুহার অন্য কোনও পথ আছে। তবে, এটাও হতে পারে যে গুহার অন্য অংশে ওরকম কোনও জীব আছে, এখানে নেই।

খানিকবাদে ওরা গুহার আরেকটা বড় চেম্বারে এসে পৌঁছল। স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাকসাইটে ভরা প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা, তিরিশ ফুট চওড়া বিশাল ঘর। দেওয়ালে ক্যালসাইট দিয়ে তৈরি ভারি সুন্দর জিপসাম ফ্লাওয়ার। তার পাশেই আগেরটার থেকে প্রায় দেড় গুণ বড় আরেকটা নকশা।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। এটা হুবহু আগেরটার মতো মনে হলেও ঠিক তা নয়। আগেরটাতে প্রতি পাঁচটা বৃত্ত পরপর ছোট হয়ে আসার পর আবার বড় হতে শুরু করছিল। এটাতে সেটা দুটো বৃত্তের পর। বৃত্তের কেন্দ্রগুলোর পারস্পরিক কৌণিক অবস্থানও আলাদা।

—কী বুঝছ, অনিলিখা?

—যে-ই করে থাকুক, সে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। এটা অত্যন্ত প্ল্যান করে তৈরি করা সংকেত। এটা আমাদের 'সেটি' ইনস্টিটিউটে জানানো দরকার। ওদের কাজই হল অন্য গ্রহের থেকে পাঠানো সংকেত উদ্ধার করা। যদি এটা গ্রহান্তরের কারওর কাজ হয়ে থাকে, তাহলে ওরা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তবে একইসঙ্গে আমাদের জানতে হবে কত হাজার বছর আগে শেষ এই গুহায় কোন প্রাণীর আনাগোনা...

আহ! গ্যারির আর্তনাদে অনিলিখার কথা মাঝখানেই বন্ধ হয়ে গেল। গ্যারি ডান হাত চেপে মাটিতে বসে পড়েছে।

অনিলিখা ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তে সামলে নেয়। গ্যারির কাছে ছুটে আসে। এটুকু সময়ের মধ্যেই গ্যারির ডান হাতটা নীলচে হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে গ্যারি বলে,—ওই, ওই পোকাটা।

আরশোলার মতো দেখতে পোকাটা দু-ইঞ্চির মতো লম্বা। অজস্র লোমশ পা। গুহার চাতাল ধরে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। অনিলিখা জুতো দিয়ে চেপে মারার জন্য তাড়া করেছিল। গ্যারি যন্ত্রণার মধ্যেও বারণ করল,—মেরো না অনিলিখা। এ কোনও অজানা জীব। পারলে আমার ক্যামেরাটা দিয়ে ছবি তুলে নাও। এরকম প্রাণী হয়তো সারা বিশ্বে আর কোথাও পাবে না।

অনিলিখা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে খানিক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। পোকাটা ওর দ্বিগুণ আকারের আরেকটা পোকার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার ওপর উঠে পিঠের মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল। ছবি তোলার আগেই বড় পোকাটা পাথরের মধ্যে হারিয়ে গেল। এ যেন এক অপার্থিব জীব। অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখার পর ছুটে গ্যারির পাশে এসে দাঁড়াল অনিলিখা।

—তোমার শরীর আরও খারাপ হওয়ার আগে আমাদের এই গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে গ্যারি। এ গুহাতে এরকম ডেঞ্জারাস পোকা আরও আছে।

—আমার ব্যাগে একটা ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশান আছে। আমার ডান হাতের ওপরদিকে ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিতে পারবে? অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনিলিখা তাড়াতাড়ি ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিল। এ ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা আছে। তারপর ওয়াকিটকিতে সাহায্য চেয়ে পাঠাল। অবিলম্বে যাতে ডাক্তার পাঠানো হয়। ওরা জানাল, ডাক্তার সুনীল নারাং ও তাঁর টিম আসছে। কিন্তু সাহায্য আসতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। গ্যারির হাত ধরে ফেরার পথে এগোতে থাকে অনিলিখা। মিনিট পনেরো বাদে গ্যারি একটা পাথরের উপর বসে পড়ল।

—আমি বোধহয় আর বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতে অস্বাভাবিক কষ্ট হচ্ছে। ওই পোকাগুলো ওই নকশার গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল। আমরা দেখে ফেলেছি। আমাদের ওরা বাঁচতে দেবে না। প্রলাপ বকতে থাকে গ্যারি।

—আবোলতাবোল কথা বোলো না গ্যারি। তোমার কিছু হবে না। ডাক্তার এলেই চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে।

গ্যারি আস্তে-আস্তে পাথরটার ওপর শুয়ে পড়ল। কথা আস্তে-আস্তে জড়িয়ে আসছে। গুহার আলো হঠাৎ বেড়ে গেল। ডাক্তার সুনীল নারাং আর দুজন লোক খুব দ্রুত এদিকে এগিয়ে আসছে।

ডাক্তারদের দলের সামনেই গ্যারি মারা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কী বিষ এত দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা কারও জানা নেই। গ্যারির ব্রেনকেও অ্যাটাক করেছে।

গ্যারির ডেডবডি দ্রুত গুহার বাইরে বের করে আনা হল। এত দ্রুত জলজ্যান্ত একটা লোক মারা গেল, তা মানতে পারছিল না অনিলিখা। গ্যারির জন্যই এখানে আসা। বহু বছর ধরে গ্যারির সঙ্গে আলাপ। শক কাটিয়ে উঠতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এতক্ষণে ফোনটার কথা খেয়াল হল। গুহার মধ্যে সেলফোন কাজ করে না। দুটো মিসড কল অ্যালার্ট, আর-একটা মেসেজ। পেরু থেকে রিকার্ডো ফোন করেছে। অবিলম্বে রিকার্ডোকে ফোন করতে বলেছে।

রিকার্ডো আর অনিলিখা হার্ভাডে সহপাঠী ছিল। কিন্তু এখন আর ফোন করার মানসিকতা নেই অনিলিখার। পরে ফোন করা যাবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়িও এসে গেছে। অনুমতি পেয়ে অনিলিখা হোটেলের উদ্দেশ্যে গাড়ি ধরল। নকশার ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই পুলিশের কাছে আর উল্লেখ করল না অনিলিখা। ঠিক সময়ে ঠিক লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত।

লিমা, পেরু 15 মে

'জর্জ শ্যাভেজ' ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল অনিলিখা। রিকার্ডোকে এয়ারপোর্টে আসতে বারণ করেছিল। শুধু-শুধু ঝামেলা বাড়ানো। লিমাতে ছোটখাটো চুরি-ছিনতাই হলেও এমনিতে শহরটা নিরাপদ।

ট্যাক্সি পেতে সময় লাগল না। ট্যাক্সিতে উঠে অনিলিখা হোটেলের ঠিকানাটা বলল।

'কানটি ক্লাব, লিমা হোটেল, লস উইক্যালিপটোস 590।' লিমার নামকরা হোটেল। এত সংক্ষিপ্ত ঠিকানা দেখে অনিলিখা প্রথমে অবাক হয়েছিল। পরে জেনেছে পেরুতে সব জায়গায় ঠিকানা এরকমই হয়। সংক্ষিপ্ত রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর। যেমন 'পিজ্যারো 135।' 135-এর 1 রাস্তার উপর কোন ব্লকে বাড়িটা তা বোঝায়।

ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে চারদিক দেখে বেশ হতাশ হতে হল অনিলিখাকে। কলকাতার মতোই ট্রাফিক জ্যাম। রাস্তার ধারে ডাঁই করা আবর্জনা। দামি গাড়িও যেমন আছে, তেমনি আছে রাস্তার ধারে গিটার বাজিয়ে গান করা ভিখারির দল।

1535 সালে ফ্রানসিসকো পিজ্যারো, লিমাতে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ কলোনির রাজধানী স্থাপন করেন। লিমা ছিল রাজধানী হওয়ার আদর্শ জায়গা। স্বাভাবিক বন্দর।

ইনকাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সোনাদানা লিমা-মারফত স্পেনে চালান হয়ে যেত। এভাবে তিনশো বছর ধরে লিমা ছিল স্পেনের দক্ষিণ আমেরিকা-সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড। 'লিমা'-র স্প্যানিশ পরিভাষা হল 'রাজাদের শহর'। 1821 সালে পেরু স্বাধীন হয়। লিমার চারধারে ছিল প্রাচীর। 1870 সালে ওই প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। লিমার জনসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। এখন পুরো পেরুর এক তৃতীয়াংশ লোকের বাস এই লিমা শহরে। এই বাড়তি লোকের চাপ সামলাতে গিয়ে কাহিল লিমা। অট্টালিকার পাশাপাশি বড়-বড় বস্তি।

ট্যাক্সিতে বসে এসব ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল অনিলিখা। আজ রাত ন'টায় হোটেলেই মিটিং। তাতেই খোলসা হবে আসার উদ্দেশ্য। রিকোর্ডো গোপনীয়তার কারণে কিছু বলতে চায়নি।

হোটেলে চেক-ইন করে তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিল অনিলিখা। রিকার্ডোর সঙ্গে একেবারে মিটিংয়েই দেখা হবে।

খেয়ে উঠে একবার হোটেলটা ঘুরে দেখে নিল অনিলিখা। 1927 সালের হোটেল। খুব সুন্দর স্প্যানিশ স্থাপত্যে তৈরি। সঙ্গে গলফ কোর্সও আছে।

মিটিং-এ যাওয়ার পথে রিকার্ডোর সঙ্গে দেখা। ও অনিলিখাকে খুঁজছিল। রিকার্ডো পেরুরই লোক। স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর সময় আমেরিকাতে অনিলিখার সঙ্গে আলাপ। প্রাণীতত্ত্ববিদ হিসেবে রিকার্ডো পেরুতে খুব নাম করেছে।

ওরা হোটেলের টিটিকাকা কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল। লেক টিটিকাকা, পেরু আর বলিভিয়ার সীমান্তে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ নাব্য লেক। সমুদ্রের মতো বিশাল। ইনকাদের মতে, পৃথিবীতে প্রথম মানবজীবন শুরু হয় এখানেই। এর জল থেকে প্রথম ইনকা ম্যানকো ক্যাপাক আর তার বোন ম্যামা ওকলো বেরিয়ে এসে ইনকা সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তারই নামে এই কনফারেন্স রুম। এই বিশাল ঘরের দেওয়াল জুড়ে টিটিকাকা লেকের ছবি।

বিশাল কাচের গোল টেবিল। কয়েকজন ইতিমধ্যেই বসে আছেন। রিকার্ডো এক-এক করে অনিলিখার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেয়। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই মিটিং শুরু হল। মাথায় চামড়ার টুপি পরা এক বছরষাটেকের বৃদ্ধ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করেন, —আমাকে আপনাদের অনেকে নিশ্চয়ই চেনেন। আমি ডক্টর গেরার্ড। দক্ষিণ আমেরিকার সবথেকে পুরোনো ইউনিভার্সিটি—স্যান মার্কোস ইউনির্ভাসিটির ভাইস চ্যান্সেলার। আর পেরুর মানবসম্পদ দপ্তরের বিশেষ উপদেষ্টা। আমার সঙ্গে আছেন মানবসম্পদ দপ্তরের সেক্রেটারি অ্যারন। অ্যারনকে আমি অনুরোধ করছি এ-মিশনের উদ্দেশ্যে বলতে।

অ্যারন, গেরার্ডের পাশেই বসে ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেশ সুদর্শন। পরনে নীল স্যুট-টাই। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্ভাষণ করে বলতে শুরু করলেন,

—আমার সৌভাগ্য আপনাদের মতো দেশ-বিদেশের এতজন জ্ঞানীগুণী লোককে একসঙ্গে দেখার ও কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। ডক্টর গেরার্ড আপনাদের বিস্তারিত বলার আগে আমি সংক্ষেপে আমাদের প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে বলার চেষ্টা করছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পেরুতে 42টা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। এদের বড় একটা অংশ থাকে আমাজনের বেসিনে। এদের বাদ দিয়ে পেরুকে ভাবা যায় না। স্প্যানিশ আমাদের জাতীয় ভাষা হলেও পনেরোটা আদিবাসী ভাষা সরকারিভাবে স্বীকৃত। অর্ধেকের মতো লোক আজও কেচুয়া ভাষায় কথা বলে, যা ছিল ইনকাদের ভাষা।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, পেরুর এই আদিবাসীদের আমরা আজও মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারিনি। আজও এদের বেশিরভাগ এমন জীবনযাপন করে যা গত দশ হাজার বছরেও পরিবর্তিত হয়নি। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ইদানীং এদের সংখ্যা কমে আসছে। অতীতে যখনই এরা বাইরের লোকের সংস্পর্শে এসেছে, নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মিসলস, স্মলপক্স—এরকম বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা এদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। আমরা জানতে চাই, কী কারণে এদের সংখ্যা এত দ্রুত কমে আসছে, কীভাবে আমরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কী-কী এদের প্রধান সমস্যা। আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

আপনাদের মনে হতে পারে যে, এজন্য বাইরে থেকে আপনাদের নিয়ে আসা হয়েছে কেন, এজন্য তো পেরুর বিজ্ঞানীরাই আছেন। আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। তাই টিমে এখানকার লোকও আছেন, যাঁরা আমাজনের সম্বন্ধে, এখানকার উপজাতিদের সম্বন্ধে, এখানকার জৈব বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য আজ অন্যভাবে ভাবার দরকার। বিদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে পেরুর আদিবাসী, এখানকার মেসটিজো আর স্প্যানিশ জনসাধারণের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। এই কমিটির রিপোর্টকে তাই কেউ পক্ষপাতদুষ্ট বলতে পারবে না।

একজন প্রশ্ন তুললেন,—অ্যারন, আমি শুনেছি অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে নাকি হঠাৎ করে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ-কেউ ফিরে আসে, কিন্তু আসার পর থেকে আর কাউকে চিনতে পারে না।

—ড. জন, আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে এরকম আজগুবি কথা মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। তার একটা বড় কারণ, এসব আদিবাসীরা ব্ল্যাক ম্যাজিক, ভূত, কাল্পনিক ঘটনা খুব সহজে বিশ্বাস করে। আমরাও এদের কথা ভালো বুঝি না। অনেক সাংবাদিক আছে, যারা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প লিখতে বসে যায়। আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি। কোনও

মতেই যেন এই টাস্ক কমিটির রিপোর্ট, কোনওরকম খবর বাইরে না যায়। এবার আমি ড. গেরার্ডকে বিস্তারিত ভাবে বলতে অনুরোধ করব।

লিমা, পেরু, 16 মে

কাল থেকেই কাজে বেরিয়ে পড়তে হবে। লিমা দেখার জন্য শুধু আজকের দিনটাই আছে। অনিলিখাকে লিমা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য রিকার্ডো খানিকটা সময় বের করে নিয়েছে। শহরের কেন্দ্রে প্লাজা ডে আর্মাস—বিশাল চৌকাকৃতি খোলা জায়গা। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, থিয়েটার, বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া নানান কাজে 1535 সাল থেকে এই জায়গা ব্যবহার করা হত। লিমা শহরের কেন্দ্র হল এই প্লাজা ডে আর্মাস। স্পেন সাম্রাজ্যের স্থাপত্যের বেশিরভাগ চিহ্নই এই কেন্দ্রে। ওই সময়কার চার্চ, অট্টালিকা সব প্লাজা ডে আর্মাস-কে কেন্দ্র করে। এর পাশেই একটা কফি শপে বসে কফি খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল অনিলিখা আর রিকার্ডোর।

—তাহলে কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি।

—হ্যাঁ, এখান থেকে কুজকো পর্যন্ত ফ্লাইটে। সেখান থেকে চাটার্ড বিমানে 45 মিনিটে বোকা মানু বিমানবন্দর। তারপরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নৌকাযাত্রা। মনু রিজার্ভ ফরেস্টে আমরা যেখানেই যাই না কেন ডিঙিনৌকা করে যেতে হবে। বায়ো-ডাইভার্সিটিতে মনু রিজার্ভ ফরেস্টের স্থান সারা পৃথিবীতে একনম্বর। এলাকাটা আয়তনে সুইজারল্যান্ডের অর্ধেক মতো হবে। পুরো এলাকাটাই রিজার্ভড এরিয়া। এর মধ্যে আমরা একটা এলাকায় যাব যেখানে বাইরের লোকেদের আসা নিষিদ্ধ। শুধু আদি উপজাতিরা থাকে। আমাদের জন্য বিশেষভাবে অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

—তা আমাদের টিমটা কেন ওদিক দিয়ে যাচ্ছে বলো তো? আমাজনে যাওয়ার জন্য তো সবাই ইকুইটোস হয়েই যায়।

—ইকুইটোস হয়ে পেরুর উত্তর আমাজন বেসিনে যাওয়া যায়। অন্য টিমটা ইকুইটোস হয়েই আমাজনে ঢুকবে। আমাদের পথ কিন্তু অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তা ছাড়া মনুর জঙ্গলে অনেক কম পর্যটক যায়। দক্ষিণ পেরুর এদিকে অনেক উপজাতি আছে, যাদের কথা পেরু সরকার জানেই না। মনুর জঙ্গলের উপকণ্ঠে যেসব উপজাতি আছে তাদের সংখ্যা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। আমার ধারণা এই এলাকাতেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি আগেই ড. গেরার্ডকে বলেছিলাম যে, আমি এ-এলাকাটা দেখতে বেশি আগ্রহী। তাই আমাকে এ-এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গতকালের কনফারেন্সে ড. গেরার্ড টিমটাকে পাঁচজন-পাঁচজন করে দুটো দলে ভেঙে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, যাতে বেশি উপজাতি এলাকা কম সময়ে ঘোরা যায়। রিকার্ডো একটা

দলের দায়িত্বে। রিকার্ডোর টিমে আছে অনিলিখা, উপজাতি বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল, শিকারি ও আমাজন বিশেষজ্ঞ ফার্নান্ডো আর ফিল্ড বায়োলজিস্ট রবার্তো। রিকোর্ডোর টিমের কাজ দক্ষিণ-পূর্ব পেরুর উপজাতিগুলোকে কন্ট্যাক্ট করা। অন্য টিমের প্রধান ড. আর্নেস্টো। ওই টিমের কাজ উত্তর-পূর্ব পেরুর উপজাতিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

—আমরা যেখানে যাব সেখানে কিন্তু ডায়েরিয়া বা ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখানকার ম্যালেরিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও ওষুধ নেই।

তাই সবসময় মশার মলম লাগাতে হবে যাতে মশারা ধারেকাছে না আসতে পারে।

—হ্যাঁ, সেসব দিক দিয়ে আমি প্রস্তুত। তা, আমরা ওই জঙ্গলে ঠিক কোথায়-কোথায় যাব —সেসব প্ল্যান করেছ?

—হ্যাঁ, আমার কাছে সেসব ইনফরমেশন আছে। আমি জানি ঠিক কোথায় কোন উপজাতিরা থাকে। তবে তা যথেষ্ট নয়। অর্ধেক উপজাতিদের কথা আমরা জানিই না। তুমি ড. মিগুয়েলের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবে। ওঁর সঙ্গে অনেক উপজাতি প্রধানের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা আমাদের মতো লোকেদের কাছে আসা পছন্দ করে না। অনেক ক্ষেত্রে বিষতির ছোঁড়ে। মিগুয়েলের সাহায্য ছাড়া এদের সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব। অনেক উপজাতি প্রধানই মিগুয়েলের খুব বন্ধু। ওইসব উপজাতি প্রধানেরা তাদের সব কথা আমাদেরকে জানাবে। উপজাতির অন্যান্য লোকেদের কাছে নিয়ে যাবে।

অনিলিখা আর রিকার্ডো কফিশপ থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। কিছু সুন্দর-সুন্দর ম্যানসন আছে মাঝেমধ্যে। তাদের ব্যালকনিগুলো রঙিন কাচ দিয়ে ঘেরা। ভেতর থেকে রাস্তার লোকেদের দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। উচ্চবিত্ত স্প্যানিশরা এসব বাড়িতে থাকত একসময়।

ঘুরতে-ঘুরতে ওরা গেল 'ইগলেশিয়া ডে স্যান ফ্রান্সিসকো' চার্চে। 1674 সালে তৈরি। চার্চের ভেতরের দেওয়ালে ভারি সুন্দর নকশা। এই আঁকার স্টাইলকে বলে মুজেদার। এ ধরনের পেন্টিং পেরুর বাইরে আর কোথাও দেখা যায় না। চার্চ থেকে বেরিয়ে খানিকটা হাঁটার পর অনিলিখার মনে হল, কেউ যেন ওদের ফলো করছে। টুপি মাথায় রঙচঙে ঢলঢলে জামা পড়া একজন স্থানীয় লোককে বেশ কয়েকবার অনিলিখা লক্ষ করেছে। কফিশপেও অন্য টেবিলে বসে ছিল। চার্চেও একঝলক দেখেছে।

ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানোর জন্য অনিলিখা একটা ব্যাংকে ঢুকল। লিমাতে বড় জায়গাগুলোতে ডলার নেয়। কিন্তু প্রত্যন্ত জায়গায় এখানকার স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হবে।

এখানকার মুদ্রা হল 'সলস'। অনিলিখা বেশ কিছু ডলার সলে ভাঙিয়ে নিল। তখনই দেখল ওই লোকটা এনকোয়ারি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে।

কুজকো, পেরু 17 মে, সকাল দশটা

'বিয়েনভেনিডোস এ্যা ল্যা সিউদাদ ইমপেরিয়াল ডেল কুজকো।' ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট ঘোষণা করল প্লেন কুজকো পৌঁছে গেছে। আক্ষরিক অনুবাদ—'রাজকীয় শহর কুজকোতে আপনাকে স্বাগত জানাই।'

অনিলিখারা ল্যানপেরুর ফ্লাইটে লিমা থেকে কুজকো পৌঁছোল। এখান থেকে পরবর্তী যাত্রা পরের দিন। চার্টার্ড বিমানে বোকা মানু। তাই একদিন কুজকোতে কাটাতে হবে। সমুদ্রতল থেকে 11,500 ফুট উঁচুতে কুজকো ন'শো বছরের পুরোনো শহর। পাঁচশো বছর ধরে ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই কুজকো। উত্তরে ইকুয়েডর থেকে পেরু, বলিভিয়া হয়ে দক্ষিণে চিলি অবধি পা রেখেছিল এই বিশাল সাম্রাজ্য। 1532 সালে স্পেনের ফ্রানসিসকো পিজ্যারো মাত্র কয়েকশো সেনার বাহিনী নিয়ে ইনকাদের পরাস্ত করে। বন্দি করে শেষ ইনকা সম্রাট অ্যাতাহুয়ালপাকে। তারপর থেকেই পেরুতে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সূচনা।

হোটেলে ঢোকামাত্রই ফোনটা পেল অনিলিখা। 'সেটি' থেকে ফোন। ম্যানিটো স্প্রিং-এর গুহার নকশাটার কথা অনিলিখা 'সেটি'-কে জানিয়েছিল। নকশার যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই মাঝেমধ্যে ফোন পায় অনিলিখা। কিন্তু আজকের ফোনটা অন্যরকম। ফোনে ডিরেক্টার জিল আর জিলের টিমের কয়েকজন বিজ্ঞানী। এ-কয়দিন নকশার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেনি।

আজ কিন্তু জিল অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য সুরে শুরু করল। 'অনিলিখা, আমরা নকশার রহস্য হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্ধার করতে পারব। তোমাকে আমরা আগে জানাইনি —ঠিক এরকমই একটা নকশা আমাদের কম্পিউটারে কয়েকদিন আগে আসে। আমাদের গ্যালাক্সিরই অন্য একটা গ্রহ থেকে। গ্যালওয়ে ও আরও কয়েকটা ক্রপ সার্কেল, তোমার দেখা গুহার নকশা—সবই যে একই গ্রহের প্রাণীদের পাঠানো বা করা তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। আমাদের ধারণা কয়েক লক্ষ বছর আগে যখন ওরা পৃথিবীতে প্রথম পা রাখে, তখন ওরা পৃথিবীতে কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ পায়নি। তাই ওরা ওদের উপস্থিতির কথা এমন কিছু জায়গায় রেখে যায় যা সহজে নষ্ট হবে না। গুহার সংকেত সেজন্যই করা। উদ্দেশ্য, কোনওদিন যদি এ-গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হয়, তাহলে তারা এ-সংকেত উদ্ধার করতে পারবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওদের চিন্তাভাবনা সঠিকই ছিল। যেখানে ওদের গ্রহ থেকে আমাদের গ্রহে আলোর আসতেই কয়েকবছর সময় লেগে যায়, সেখানে বারবার

যোগাযোগ করা খুব শক্ত। আর সংকেতটাই তার পরীক্ষা। এ পরীক্ষা পাশ করবে শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীরা।

অনিলিখা বলে ওঠে,—তাহলে ওরা এখন বারবার সংকেত পাঠাচ্ছে কী করে?

—আমার বিশ্বাস, ওদের সভ্যতা হয়তো এখন কয়েক লক্ষ বছর পুরোনো। স্বাভাবিকভাবেই তা কতটা উন্নত তা আমাদের ধারণারও বাইরে। আমরা মোটে ছয় হাজার বছরে যদি এতটা উন্নতি করে থাকতে পারি, তাহলে ওরা কয়েক লক্ষ বছর ধরে কতটা উন্নত হয়েছে ভাবতেই পারছ! এখন হয়তো ওরা ইচ্ছেমতো অন্য গ্রহদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আগে ওরা এটা পারত না।

—কিন্তু বারবার একই সংকেত পাঠিয়ে লাভ?

—এটা আমাদেরও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পরে আমরা লক্ষ করেছি, নকশাগুলো এক মনে হলেও আসলে প্রত্যেকটার মধ্যেই পার্থক্য আছে। নকশায় যে বৃত্তগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটার কেন্দ্র থেকে তার আগের বৃত্তের ওপর যে দুটো চাপ আঁকা যায়, তাদের মধ্যের কোণের আস্তে-আস্তে পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরির্বতনের হার প্রত্যেকটা নকশায় ভিন্ন। আমাদের ধারণা এর মধ্যেই আছে নকশার সমাধান সূত্র। যখন কেউ কাউকে চিঠি লেখে তাতে দুটো তথ্য অবশ্যই থাকে। কে লিখছে? আর কীজন্য লেখা হচ্ছে?

'কে লিখছে'—তা এই নকশার প্যাটার্নটা জানায়। আর কীজন্যে লেখা হচ্ছে—তা এই কোণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যে সমীকরণ তৈরি হয়, তার মধ্যে থাকে।

—অসাধারণ। তা আপনার কি মনে হয় ওরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে চাইছে?

—মনে তো হয় না। তাহলে ওদের কাছে অন্য অনেক উপায় ছিল। প্রশ্ন এখন এত ঘনঘন বার্তা পাঠিয়ে ওরা ঠিক কী জানাতে চাইছে? ওদের স্বার্থ কি? ওদের কেউ কি পৃথিবীতেই আছে?

আরও খানিকক্ষণ কথা হল। সংকেত পুরোপুরি উদ্ধার হলেই জিল অনিলিখাকে জানাবে। আপাতত এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা চলবে না। তাহলে মিডিয়া পাগল করে তুলবে।

কুজকো, পেরু 17 মে, বিকেল ছ'টা

বিকেলের দিকে অনিলিখা, রিকার্ডো ও ফিল্ড বায়োলজিস্ট রবার্তো একসঙ্গে বেরোল কুজকো ঘুরে দেখতে। প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ পর্যটক আসে কুজকো দেখতে। ছোট শহর। একদিনেই পুরো দেখা যায়। কুজকো হয়ে তারা যায় মাচুপিচু দেখতে। পনেরো শতকে মাচুপিচু ছিল ইনকাদের উচ্চবিত্তদের প্রিয় জায়গা। স্প্যানিশ আক্রমণের পরে মাচুপিচু অদ্ভুতভাবে হারিয়ে যায়। লোকেরা ভুলে যায় এ শহরের অস্তিত্ব। শহরের লোকেরাও কীভাবে যেন উধাও

হয়ে যায়। প্রায় চারশো বছর পরে 1911 সালে আমেরিকার হিরাম বিগহ্যাম এই হারিয়ে যাওয়া শহর ফের খুঁজে পান। ইনকাদের তৈরি পাথরের দেওয়াল, মন্দির স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন মাচুপিচুতে ছড়িয়ে আছে।

তবে কুজকোর স্থানমাহাত্ম্যও কিছু কম নয়। ইনকা আর স্প্যানিশ সভ্যতা হাত ধরাধরি করে আছে এখানে। ভূমিকম্পের জন্য অনেক স্প্যানিশ বিল্ডিং ভেঙে গেছে। কিন্তু ইনকাদের পাথরের দেওয়াল আজও অটুট আছে। কুজকো শহরের কেন্দ্রে প্লাজা ডে আর্মার্স। শহরের উপরের দিকে এই এলাকা। এখান থেকে সরু-সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। বেশিরভাগ রাস্তা এত সরু যে পায়ে হেঁটেই ঘোরা ভালো। পাথরের রাস্তা। চড়াই মাঝেমধ্যে এত বেশি যে একটু হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।

অনিলিখার অস্বস্তি হচ্ছে দেখে রবার্তো বলে উঠল,—চলো একটু কোনও জায়গায় বসা যাক। এখানকার উচ্চতার জন্য অনেকেরই আসার পরপর শরীর খারাপ লাগে। অক্সিজেনের অভাব। এরা বলে 'সোরোসে'। এখানে কোকা পাতা দিয়ে একধরনের চা তৈরি হয়। যেমন টেস্ট, তেমনই ম্যাজিকের মতো কাজ করে 'সোরোসে' কাটিয়ে দেয়। চল, কোকাটী খাওয়া যাক।

—না, আমি ঠিক আছি। হাতে তো সময় বেশি নেই। একটা অ্যালাপাকার শোয়েটার কেনার ইচ্ছে আছে। খুব নরম হয় শুনেছি।

—হ্যাঁ, খুব ভালো। তবে নকল কিনে ঠকো না। রিকার্ডোকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ এখানকার বিখ্যাত স্যান্টো ডোমিঙ্গো চার্চ থেকে ঘুরে আসি।

অনিলিখা আর রিকার্ডোর সোয়েটার কিনতে বেশি সময় লাগল না। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তা ধরে উপরের দিকে হাঁটতে লাগল।

প্লাজা ডে আর্মাস-এর ওপরের দিকে পুরোনো কুজকো শহর। নীচের দিকে নতুন কুজকো। সরু-সরু রাস্তার ওপরে কালো ফলকে রাস্তার নাম লেখা আছে।

রিকার্ডো বলে,—এখন সব রাস্তার নাম আবার 'কেচুয়া'-তে লেখা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে ইনকাদের ঐতিহ্য বজায় রাখার।

অনিলিখা বলে,—চারশো বছর স্প্যানিশ শাসনের পরেও এখানকার লোকেরা কিন্তু ইনকাদের কথা ভোলেনি। এখনও দেখছি চারদিকে লোকে কেচুয়া ভাষায় কথা বলে। ইন্ডিয়ানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারায়নি।

—ঠিকই বলেছ। ইন্ডিয়ানরা কখনওই স্প্যানিশদের বিশ্বাস করেনি। করবেই বা কী করে। যেভাবে এদের শেষ ইনকা সম্রাটকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল! 1527 সালে অন্তর্দ্বন্দ্বে ইনকা

সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাঁচ বছর যুদ্ধের পর অ্যাতাহুয়ালপা রাজা হয়। কিন্তু কুজকোতে অভিষেকের কয়েকদিন আগে 1532 সালে স্পেনের ফ্রানসিসকো পিজারো, কুজকো আক্রমণ করে অ্যাতাহুয়ালপাকে বন্দি করে। পরে মেরেও ফেলে।

—তবে অ্যাতাহুয়ালপা প্রথমে ভেবেছিল পিজারো স্পেন থেকে সৌজন্য সফরে এসেছে। তাই পিজারোর নিমন্ত্রণ রাখতে ছয় হাজার অস্ত্রহীন রক্ষী নিয়ে পিজারোর সঙ্গে দেখা করে। পিজারো তখন রক্ষীদের ওপর গুলি চালায়। হাজার-হাজার ইন্ডিয়ান মারা যায়। অ্যাতাহুয়ালপাকে বন্দি করা হয়। বলা হয়, একটা বাইশ ফুট বাই সতেরো ফুটের ঘর সোনায় আর আরেকটা তার দ্বিগুণ সাইজের ঘর রূপোয় ভরিয়ে দিলে ইনকা রাজাকে মুক্তি দেওয়া হবে। ইনকাদের কাছে সোনা ছিল সূর্যদেবতার ঘাম। অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। কিন্তু তার কোনও আর্থিক মূল্য ছিল না। অ্যাতাহুয়ালপা তার কথা রাখে। রাখেনি পিজারো। ঘর সোনাবোঝাই করার পরও ইনকা রাজাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। অ্যাতাহুয়ালপাকে তার প্রজাদের সামনে মেরে ফেলা হয়।

—তাই নাকি? আমার এত সব জানা ছিল না। রিকার্ডো বলে ওঠে।

—এখানেই সব শেষ নয়। পিজারোর জানা ছিল না যখন অ্যাতাহুয়ালপাকে মারা হয়, তখন ইন্ডিয়ানরা তাদের রাজার মুক্তির জন্য যাবতীয় সোনা নিয়ে পিজারোর কাছে আসছিল। তাতে ছিল 750 টন সোনা। ষাট হাজার লোক ওই সোনা নিয়ে ক্যাজামার্কায় তাদের রাজাকে ছাড়াতে আসছিল। সোনার দায়িত্বে ছিল ইনকারাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি রুমিনাহুই। মৃত্যুর খবর আসতেই রুমিনাহুই রাতারাতি সেই যে সোনা লুকিয়ে ফেলে আর তার খোঁজ মেলেনি।

রিকার্ডো কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর ফোনটা বেজে উঠল। ফোনে কারওর সঙ্গে স্প্যানিশে কথা বলল দু-মিনিট। ফোন শেষ হলে উত্তেজিতভাবে রিকার্ডো বলে ওঠেন,—রবার্তোকে কেউ গুলি করেছে। মারা যায়নি, তবে গুরুতর আহত। পুলিশ ওর ফোন থেকে আমার নাম্বার পেয়ে ফোন করেছে। এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে।

রিকার্ডো আর অনিলিখা রাস্তার পাশের দেড়ফুট চওড়া ফুটপাত ধরে ছুটতে শুরু করল। খাড়া রাস্তা। মাঝে-মাঝে ধাপ-ধাপ করা ফুটপাত। তারই মধ্যে ছোট-ছোট ভেড়ার মতো দেখতে অ্যালপাকা দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে ছুটতে গিয়ে মাঝেমধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা বড় পাথর অনিলিখার দিকে ছুটে এল। সামনে একটা লামা এসে পড়ায় অনিলিখা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তা না-হলে ওর মাথাটা থেঁতলে যেত। মুহূর্তে সামলে নিয়ে যেদিক থেকে পাথরটা এসেছে সেদিকে ঘুরে তাকাল অনিলিখা। পাশের বাড়ির টালির ছাদ থেকে কেউ হুড়মুড় করে রাস্তার অন্যদিকে নেমে যাচ্ছে। ধরার কোনও

উপায় নেই। লিমায় ফলো করা, রবার্তোকে গুলি, এখন আবার অ্যাটাক—কেউ কি এই মিশন পণ্ড করতে চাইছে! —অনিলিখা ভাবতে থাকে।

মনু রিজার্ভ ফরেস্ট, আমাজন, পেরু, 20 মে

—কী বুঝছ অনিলিখা? এর নামই আমাজন। রিকার্ডো বলে উঠল। অনিলিখাদের বোট আমাজনের এক শাখানদী ধরে এগিয়ে চলেছে।

গতকাল ওরা মনু রিজার্ভ ফরেস্টে এসে পৌঁছেছে। কুজকো থেকে বোকা মানু ওরা এসেছে চাটার্ড বিমানে। ছোট বিমান—সব মিলিয়ে সাতজন উঠতে পারে, পাইলট বাদে। বিমানে আসার সময়ই জায়গাটার দুর্গমতার খানিকটা পরিচয় পেয়েছে অনিলিখা। নীচে আন্দেজ পাহাড় —আর শুধু বন-বনানী। যত এগিয়েছে আস্তে-আস্তে গহন বনের কাছে যেন হার মেনেছে পাহাড়ও।

বোকা মানু ছোট-ছোট বিমান নামার জন্য তৈরি ছোট বিমান বন্দর। মনু জঙ্গলের ঠিক বাইরেই। ওখান থেকে মোটরাইজড স্পিড বোটে করে জঙ্গলে ঢুকতে হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে মনু লজে ওদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। বোটে করে মনু লজে পৌঁছতে লেগেছে দু-ঘণ্টা। গতকাল ওরা আর কোথাও বেরোয়নি। আজ ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে।

আপাতত ওরা কোশ্নিপাতা নদী ধরে এগিয়ে চলেছে। আমাজন বেসিনে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার একমাত্র উপায় এই বোট। কাদাটে ঘোলা জল। মাথা তুলে ওপরে তাকালে শুধু গাছ আর গাছ।

শেষ কয়েকমাসের বৃষ্টিতে জলতল অনেক উপরে উঠে এসেছে। অনেক গাছের মাঝামাঝি অবদি জল। গাছের ডাল ধরা যায় বোট থেকেই।

ওরা চলেছে কোকামা উপজাতি এলাকায়। কোকামা উপজাতি প্রধানকে মিগুয়েল খুব ভালো করে জানেন। ওদের সুবিধে-অসুবিধে সবকিছুর খবরই জানা যাবে উপজাতি প্রধানের কাছ থেকে। তবে এরা থাকে জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে। তাই পৌঁছতে দু-ঘণ্টা লেগে যাবে।

—আমাজন নামটা কীভাবে এসেছিল জানো তো? ফার্নান্ডো অনিলিখাকে জিগ্যেস করল।

অনিলিখা ঘাড় নেড়ে না বলতে ফার্নান্ডো বলে উঠল,—1541-42 সালে স্পেনের ফ্রান্সিসকো ডে ওরেল্যানা পেরুর ন্যাপো নদীর মুখ থেকে আমাজন যেখানে আতলান্তিক সাগরে গিয়ে পড়েছে, সে জায়গা পর্যন্ত নৌকোতে যান। প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার। পথে নাকি ওরেল্যানার দলের ওপর মেয়ে যোদ্ধারা তিরধনুক নিয়ে আক্রমণ করে। গ্রিক মিথোলজিতে নারী যোদ্ধাদের আমাজন বলা হত। সেই অনুসারে ওরেল্যানা ওই যোদ্ধাদের নাম দেন আমাজন। পরে ওটাই নদীর নাম হয়ে যায়।

—এ-নদীপথে এরকম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অভিযান কিন্তু মুখের কথা নয়। তা, এরকম কত শাখানদী আছে আমাজনের?

—হাজারেরও বেশি। তারমধ্যে 17টা 1000 মাইলেরও বেশি লম্বা। জানোই তো, আমাজন পৃথিবীর যে-কোনও নদীর থেকে বেশি জল বহন করে। মিসিসিপি, নীল ও ইয়াংজি নদী একত্রে যত জল বহন করে, একা আমাজন তার থেকে বেশি জল বহন করে। ভাবা যায়!

—আরে, এখানে ডলফিন! ওই যে জলে খেলা করছে। অনিলিখা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

তিনটে পিংক ডলফিন কুইক-কুইক আওয়াজ করে জলের মধ্যে খেলা করতে-করতে উলটো দিকে চলে গেল। সাতফুটের মতো লম্বা। মাঝে-মাঝে জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে।

—এরা নাকি অনেকসময় এখানকার জেলেদের বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। তাই এখানকার লোকেরা ডলফিনদের খুব পছন্দ করে। আমাজনই একমাত্র নদী যেখানে ডলফিন আছে। ফার্নান্ডো বোঝায়।

অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে দু-ধারের গাছ দেখতে থাকে। কতরকমের পাখি। সারা পৃথিবীর অর্ধেক প্রজাতির পাখি এই আমাজনে। মনুর জঙ্গলের কিছু অংশ প্রায় বারোহাজার ফুট উচ্চতায়। আবার কোনও-কোনও জায়গা মোটে হাজার ফুট উঁচু। এজন্যেই এখানে এত প্রজাতির পাখি, গাছ—এত ধরনের জীবজন্তু।

ফার্নান্ডো আমাজনের জঙ্গল চষে বেরিয়েছে। তবে পারমিট না থাকায় মনুর জঙ্গলে আসতে পারেনি। তাই এবার ও বেশ খুশি।

একটা ভোঁদর জলে সাঁতরাচ্ছে। এদের বেশি দেখা যায় না। একটা অদ্ভুত চেহারার পাখি জল থেকে উঠে কাঠবেড়ালির মতো গাছ বেয়ে উঠে গেল। নীল মুখ, লাল চোখ, লাল পালক।

'হোয়াটজিন'।—রিকার্ডো বলে উঠল—'যেমন অদ্ভুত দেখতে, তেমনই অদ্ভুত হাবভাব। জলে নেমে ডানা ভিজে গেছে। তাই নখ দিয়ে গাছ বেয়ে বাসায় ফিরে গেল।'

নদী বেয়ে নৌকো চলেছে। ফার্নান্ডো বলল,—কাছে পিঠে কোথাও একটা জাগুয়ার আছে। ওই যে গাছে আঁচড়ের দাগ দেখছ, ওটা জাগুয়ারের। ওরা এভাবে ওদের জায়গা নির্দিষ্ট করে। গাছে আঁচড় দিয়ে গায়ের গন্ধ রেখে দেয়, যাতে আরেকটা জাগুয়ার ওই এলাকায় না আসে।

—তুমি জাগুয়ার দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখব না! এ-এলাকায় অনেক জাগুয়ার আছে। কয়েক বছর আগে একটা জাগুয়ার সংরক্ষণ প্রকল্পে কাজ করছিলাম। আমার কাজ ছিল জাগুয়ারদের গলায় রেডিয়ো কলার পরানো, যাতে স্যাটেলাইট দিয়ে ওদের গতিবিধি দেখা যায়।

খানিক বাদে নদী অনেক চওড়া হয়ে গেল। নদী স্থলভাগের অনেকটা জায়গায় থাবা বসিয়েছে। মাঝে-মাঝে নদীর দু-ধারে বিস্তৃত বালুচর। মিগুয়েল জানাল,—কোকামা উপজাতি এলাকা এসে গেছে। বোট দাঁড় করাতে হবে।

বালুচরে দুটো বাচ্চা ছেলে বালি দিয়ে খেলা করছে। কাছে যেতে দেখা গেল, বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম বার করছে। অনিলিখা অন্যমনস্ক হয়ে আগে-আগে হাঁটছিল। হঠাৎ ফার্নান্ডো চেঁচিয়ে উঠল,—সাবধান! সামনে একটা কুমির শুয়ে আছে। আমি জানি তুমি লক্ষ করোনি। এরা খুব হিংস্র হয়।

—আসলে বাচ্চাদুটো এখানে খেলছে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি যে ওটা কুমির হতে পারে।

—জঙ্গলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এখানকার বাচ্চারাও এসবে অভ্যস্ত। এই কুড়ি ফুট কুমিরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। অ্যানাকোন্ডা। জঙ্গলে যে-কোনও জায়গায় দেখা মিলতে পারে। খেয়াল রেখো।

ফার্নান্ডোর কথায় ছেদ পড়ল। উপজাতি প্রধান এসে গেছে। তার সঙ্গে নারী-পুরুষ-বাচ্চা মিলিয়ে জনাতিরিশের একটা দল। কারও গায়ে কোনওরকম পোশাক নেই। মুখে নানা রং করা, কানে-গলায় হাড়ের কাঠের অলংকার। হাতে গাছের পাতা বাঁধা। মিগুয়েলকে সবাই বেশ পছন্দ করে বলে মনে হল। অনিলিখারা এদের জন্য কিছু খাবার এনেছিল। সেগুলো উপজাতি প্রধানের কাছে দেওয়া হল। পরস্পরকে সম্ভাষণ করার কায়দাটাও অদ্ভুত। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তারপর মিগুয়েল কারুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। অনিলিখা, ফার্নান্ডো, রিকার্ডো-ও তাই করতে লাগল।

সম্ভাষণ পর্ব সমাপ্ত হলে ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ ধরে এগোতে লাগল। জঙ্গলের নীচের দিকটা অদ্ভুতরকমের পরিষ্কার। সূর্যের আলোর অভাবে কোনও ছোট গাছ-গাছালি জন্মায়নি। শুধু পচা পাতা, গাছের ফল পড়ে আছে। ওপরের দিকে তাকালে গাছের মাথা খুঁজে পাওয়া যায় না। একেকটা গাছ দেড়শো ফুটের মতো লম্বা। গাছ বেয়ে অজস্র লতাপাতা ওপরের দিকে উঠে গেছে।

খানিক হেঁটে ওরা উপজাতিদের গ্রামে প্রবেশ করল। খড়ের চালের মাটির ঘর। কিন্তু ঘরগুলো অনেক বড়। একেক ঘরে পনেরো-কুড়ি জন থাকে। উপজাতি প্রধানের বাড়ি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে। সেখানেই গিয়ে উঠল ওরা। মিগুয়েল উপজাতি প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

উপজাতি প্রধানের ঘরে জাগুয়ারের ছাল। একটা বিশাল বড় পাত্রে শস্য রাখা আছে। ইন্ডিয়ানরা পরের দিনের কথা বেশি ভাবে না। তবু যা শস্য বাড়তি হয় তা প্রধানের বাড়িতে রেখে আসে, যাতে দরকারে তা আবার বন্টন করে দেওয়া যায়।

খানিকবাদে খাওয়ার ডাক পড়ল। কলাপাতায় করে পোড়ানো পাখির মাংস।

অনেক ইন্ডিয়ান উপজাতিরা একে অন্যের গ্রাম আক্রমণ করে মূলত অন্য গ্রাম থেকে বিয়ের পাত্রী জোগাড়ের জন্য। এরা তাই বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা বেশি পছন্দ করে না।

খাওয়ার পর মিগুয়েল অনিলিখাদের ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে প্রধানের বিস্তৃত কথা হয়েছে। প্রধান অনুরোধ করেছে রাতটা ওদের সঙ্গে কাটাতে। নাচ-গান হবে। প্রধান নাকি এ-ও জানিয়েছে যে গ্রামের অনেককে ভূতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দু-একজনকে ফেরতও পাঠাচ্ছে। কিন্তু ফেরার পর থেকে তাদের মাথার ঠিক নেই। তা ছাড়া ওদের গ্রামে অপদেবতারা নাকি নতুন-নতুন প্রাণী পাঠাচ্ছেন যাদের ওরা আগে কখনও দেখেনি। প্রধানই নাকি এরকম চারপেয়ে একটা প্রাণী দেখেছে। সবমিলিয়ে রহস্য কিন্তু একটা আছেই।

21 মে, ভোর পাঁচটা, মনু রিজার্ভ ফরেস্ট

হ্যামকে শুয়ে ছিল অনিলিখা। দুটো গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বিছানা। খোলা আকাশের নীচে। এ এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। জঙ্গল কখনও নিঃশব্দ হয় না। সারারাত ধরে নানান ধরনের ডাক। তারপরে গরম, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। কখনওই গভীর ঘুম হয়নি। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ দড়ির বিছানা ছেড়ে অনিলিখা উঠে পড়ল। সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় রক্তাভ হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ।

হাত-মুখ ধুয়ে একটু হাঁটতে বেরোল অনিলিখা। মিনিটদুয়েক হাঁটার পর রিকার্ডোর সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে একটা আদিবাসী লোক আর বছরতিনেকের একটা বাচ্চা ছেলে। ওরা শিকার করতে যাচ্ছে। অনিলিখাও ওদের সঙ্গী হয়ে গেল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। কাঠবেড়ালির মতো দেখতে কিন্তু আকারে তার থেকে বড় একটা প্রাণী ব্রাজিল নাটের বাইরের খোলসটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ভাঙার চেষ্টা করছে।

রিকার্ডো বলে ওঠে,—অ্যাগুটি! একমাত্র এরাই ব্রাজিল নাটের খোলা দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারে। এখানে চারদিকে ব্রাজিল নাটের গাছ। বাদাম পড়ার আওয়াজ পেলেই এরা এসে জড়ো হয়। তারপর খোলা ভেঙে বাদাম বার করে খায়।

ম্যাকারি বাঁদরের একটা দল উঁচু গাছের একডাল থেকে আরেক ডাল লাফ দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে। পিঠটা লাল। মুখ আর সামনের দিকটা কালো। অনিলিখার কৌতূহলী চাহনি দেখে

রিকার্ডো বলে উঠল,—এরা লাল কচ্ছপের ডিম বালি থেকে বার করে খেতে ভালোবাসে। খুব বুদ্ধি। সহজেই পোষ মানে। আমাজনের জঙ্গলের একদম ওপরের দিকের ক্যানোপি অংশের বাসিন্দাদের অনেককেই আমরা আজও জানি না। ওই স্তরে সবথেকে বেশি প্রাণীর বাস। কিন্তু একশো-দেড়শো ফুট ওপরে উঠে দেখা সম্ভব হয় না। যাদেরকে খানিকটা চিনি, তাদের মধ্যে এই ম্যাকারি বাঁদর।

আদিবাসী লোকটার হাতে একটা বাঁশের নল। ওর মধ্যে 'কুরারি' বিষ মাখানো তির আছে। ভালো শিকারের সন্ধান পেলে ফুঁ দিয়ে তির ছুড়বে। গাছের ওপর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছে। কখন শিকার মেলে!

কুচকুচে কালো রঙের একদল হাউলার বাঁদর গাছের উপরে বসে আছে। কাল সারারাত এদের চিৎকার শোনা গেছে। সারাক্ষণ গোলাপি চোয়াল ফুলিয়ে আওয়াজ করে নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে। 'আমি আছি—খবরদার এসো না' গোছের। খোলা বোতলের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয়, ওদের ডাকটা অনেকটা সেরকম।

ইতিমধ্যে ঝুপ করে একটা পাখি পড়ার আওয়াজ। আদিবাসী লোকটা একটা টাউকান পাখিকে লক্ষ্য করে বিষতির ছুঁড়ে মেরেছে। বেশ বড় চেহারার পাখি। তবু এক তিরেই ঘায়েল। গায়ের রং কালো। ঠোঁটটা তিনরঙা, সবুজ, হলুদ আর লাল। প্রায় সব উপজাতি বিষতির ব্যবহার করে। তবে প্রত্যেকের এই কুরারি বিষ তৈরির পদ্ধতি আলাদা। রিকার্ডো অনিলিখাকে সেটা বোঝাতে-বোঝাতে নদীর দিকে এগোতে থাকল।

জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে অবশ্য গায়ে জোরে ছাট লাগে না। শুধু অদ্ভুত মোহময়ী একটা টুপটাপ আওয়াজ আর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। আস্তে-আস্তে পায়ের কাছের জলটা বাড়ছে। আর কুড়ি-তিরিশফুট এগোলেই মনে হয় কোমর পর্যন্ত উঠে আসবে। কম জলের মধ্যে আদিবাসীটা কী যেন খুঁজছে। রিকার্ডো হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,—সাবধান, ওই দ্যাখো কোরাল সাপ! খুব বিষাক্ত। লাল, কালো ডোরাকাটা। জলের তলায় সামান্য দূরে শুয়ে আছে। ওরা সাবধানে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

খানিকটা এগোনোর পর আদিবাসীটা হঠাৎ জলের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা অদ্ভুত দেখতে ব্যাঙ তুলে আনল। সাত-আট ইঞ্চি হবে।

আদিবাসীর হাত থেকে ব্যাঙটা নিয়ে ডান হাতের চেটোর ওপর রেখে রিকার্ডো বলল,—কিছুদিন আগেই পঞ্চাশ-ষাটটা ব্যাঙাচি বেরিয়েছে এর গা থেকে। অনিলিখা, ব্যাঙটার পিঠটা লক্ষ করো। গর্ত, গর্ত—খোবলানো মতো পিঠটা। এই ব্যাঙের নাম পিপাটোড। এই ব্যাঙটা সায়েন্স ফিকশনকেও হার মানায়। এর পিঠের মধ্যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি হয়। একসঙ্গে একশোর

মতো ব্যাঙাচি এর পিঠ চিরে বেরিয়ে আসে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। পিঠের চামড়া ভেদ করে পটপট করে এক-একটা গর্ত দিয়ে এক-একটা ব্যাঙাচি বেরিয়ে আসছে। এরা জলের তলায় থাকে। খয়েরি রঙের জন্য মাটি থেকে আলাদা করা যায় না। খায়ও অদ্ভুতভাবে। ভ্যাকুম তৈরি করে জলের সঙ্গে ছোট-ছোট মাছ টেনে নেয়। আমার তো মনে হয় এটা অন্য গ্রহের জীব।

অনিলিখা বলে উঠল,—আমাদের মধ্যেই কি অ্যালিয়েনরা আছে? হয়তো অন্য গ্রহ থেকে এসে যুগযুগ ধরে পৃথিবীতেই আছে, কে জানে!

হঠাৎ হাউলার বাঁদরগুলো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। বেশ জোরে ডাকতে শুরু করল।

রিকার্ডো বলে উঠল,—অনেক সময় জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডা বা বড় কোনও জন্তু দেখলে এরা এরকম চিৎকার করে। আমাদের একটু সাবধান হতে হবে।

আদিবাসী লোকটা আর বাচ্চা ছেলেটা ভয় না পেয়ে জলের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে মাছ ধরতে লাগল। বিষতির ছোঁড়ার পাইপটা ছেলেটার হাতে দিয়ে লোকটা এখন ডান হাতে বর্শা নিয়েছে। বর্শা বিঁধিয়ে মাছ ধরে বাঁ-হাতে রাখা কাঠের বাক্সে ফেলছে। যা দক্ষতার সঙ্গে মাছ গাঁথছে, তা রীতিমতো দেখার।

অনিলিখা আর রিকার্ডো সাবধানে এগোতে থাকল। হাউলারগুলোর ডাক আরও বেড়ে গেছে। একটা শ্লথ খুব ধীরগতিতে পাম গাছের গুঁড়ি নখ দিয়ে আঁকড়ে ওপরের দিকে উঠছে। কোনও ব্যস্ততা নেই।

হঠাৎ চারদিকের এই থমকে থাকা পরিবেশটা বদলে গেল। পাশের কয়েকটা গাছ সরিয়ে যে জীবটা বেরিয়ে এল সেরকম কোনও আজব চেহারার জীব আগে কখনও দেখেনি ওরা। প্রায় আট ফুটের মতো উঁচু। লালচে খয়েরি রং। পেছনের পা দুটো ছোট। তুলনায় সামনের পা দুটো অনেক বড়। চারটে পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঘোড়ার মতো মুখ, জিরাফের মতো লম্বা গলা। গরিলার মতো পেশিবহুল চেহারা। পায়ের পাতায় তিনটে করে আঙুল।

দুজনের মুখেই খানিকক্ষণ কথা নেই। রিকার্ডোই নীরবতা ভেঙে বলে উঠল,—ক্যালিকোথিয়ারস। মিয়োসিন যুগের জীব। বহুদিন আগে উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্য! এখানে কী করে এল? নিরামিষাশী বলে ধারণা করা হয়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! 12000 বছর আগে শেষ তুষার যুগের সময় এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বলে ধারণা। জানতামই না যে এখনও এদের কোনও অস্তিত্ব আছে।

আদিবাসী লোকটা এতক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেয়েছে। ভয় পাওয়া দূরের কথা। বর্শা হাতে তেড়ে গেল জন্তুটার দিকে। জন্তুটাও বিকট আওয়াজ করে মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

রিকার্ডো অনিলিখার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে ওঠে,—প্রধান তাহলে ভুল বলেনি।

অ্যাশানিনকা উপজাতি এলাকা, মনু ফরেস্ট, পেরু,

10 জুন, রাত দশটা

অর্ধনিমগ্ন গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আমাজনের এই শাখা নদী। বর্ষার আমাজন এত চওড়া যে একদিক থেকে আরেকদিক দেখা যায় না। চাঁদের আলোয় মায়াবী পরিবেশ। কিছু-কিছু জায়গায় জলে ভালো স্রোতও আছে। একটা টটোরা নৌকোয় রিকার্ডো আর অনিলিখা। অন্য আরেকটা নৌকোয় অ্যাশানিনকা উপজাতির এক আদিবাসী। বাঁশের তৈরি ছোট এই নৌকো এরা একাই কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়।

অ্যাশানিনকারা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এদের প্রধান বাসভূমি অ্যান্দেজ পাহাড়ের পূর্বদিকে আমাজন বেসিনে—নদীর উৎসমুখে। ইনকারা, স্প্যানিশরা কেউ কোনওদিন এদেরকে অধীনে আনতে পারেনি।

গত কয়েকদিনে অনিলিখারা বেশ কিছু উপজাতি এলাকায় গেছে। বোরা, ইয়াগুয়া, ওরেজোন, আয়মারা, অ্যাগুয়ারুনা, অ্যামাহুয়াকা, অ্যান্ডোয়া, শিউয়ার, শিপিকো, সিকুয়ানি। প্রত্যেক উপজাতির রীতিনীতির মধ্যে অনেক মিল থাকলেও অনেকক্ষেত্রে এদের আচার ব্যবহার একেবারেই আলাদা। এই পৃথিবীর মধ্যেই যে এত বিচ্ছিন্ন এত অন্যধরনের মানবজাতি থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

অনিলিখারা এদের একাধিক প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকক্ষেত্রে উপজাতিদের সঙ্গে রাতও কাটিয়েছে। এই আঠারো দিনের অভিজ্ঞতা লিখতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে।

তবে যে-ক'টা সিদ্ধান্তে আসা গেছে তা হল,—এক, প্রত্যেক উপজাতিরই লোকসংখ্যা গত দু-বছরে দশ শতাংশ বা তার বেশি কমে গেছে। দুই, এদের মধ্যে অনেকেই কয়েক মাসের মতো হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এরা সবাই পুরুষ। ফিরে আসার পর এদের সবার মধ্যে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে। এদের সবার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে, নতুন কিছুও মনে রাখতে পারে না। কোনও কিছুতে ভয় একেবারে চলে গেছে। তিন, এ এলাকার জঙ্গলে নতুন-নতুন প্রাণী দেখা যাচ্ছে, যা আগে বহু বছর কখনও দেখা যায়নি।

ক্যালিকোথিয়ারস ছাড়াও আরেকটা অজানা প্রাণী অনিলিখা নিজের চোখে দেখেছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে বিলুপ্ত হয় কোয়াগ্যা। জেব্রার মতো অনেকটা দেখতে এই প্রাণী 1878

সালের পর আর দেখা যায়নি। মাংস আর চামড়ার লোভে কোয়াগ্যাদের মেরে ফেলা হত। এই বিলুপ্ত প্রাণীরই দেখা মিলল বোরা উপজাতির সঙ্গে দেখা করার সময়। ওরা একটা কোয়াগ্যাকে ধরে পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। একমাস আগে বন থেকে ধরে এনেছে।

বেশিরভাগ উপজাতির লোকই হারিয়ে যায় রাতের সময়—মাছ ধরতে গিয়ে। তাই অনিলিখারাও মাঝেমধ্যে রাতের শিকারের সঙ্গী হয়। যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে! আজ রাতে সেই উদ্দেশ্যেই ওরা বেরিয়েছে। সামনের বোটে অ্যাশানিনকা উপজাতির লোকটা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটা পোশাক পরে দাঁড় বাইছে। মাঝেমধ্যে ছোট জাল ফেলে মাছ ধরছে। খানিক আগে একটা তিন কেজি মতো ওজনের বড় ট্যাকুনারে মাছ ধরে খুব খুশি। ট্যাকুনারে ভারি সুস্বাদু মাছ। হালকা সবুজ রঙের। একটা ট্যাকুনারেতে রীতিমতো ভোজ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে সামনের বোটের জালে এক ঝাঁক পিরানহা ধরা পড়েছে। পিরানহার ঝাঁক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে-কোনও বড় প্রাণীর মাংস খেয়ে নিতে পারে। তবে এরা মূলত মরা প্রাণীরই মাংস খায়। মানুষকে সাধারণত আক্রমণ করে না। বরং মানুষই এদেরকে মেরে নানারকম সুস্বাদু আইটেম রান্না করে।

হঠাৎ খানিকটা দূরে খুব জোরে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুরু হল। রিকার্ডো অনিলিখা দাঁড় বেয়ে ওদিকে এগোতে থাকল। একটা গাছের তলায় অল্প জলে কুমির আর অ্যানাকোন্ডার মধ্যে সাংঘাতিক মারামারি হচ্ছে। আরেকটু এগিয়েই রিকার্ডো হাত তুলে অনিলিখাকে দাঁড় বাইতে বারণ করল। শুধু বলে উঠল,—অবিশ্বাস্য!

চাঁদের অকৃপণ আলোয় চারদিক দেখা যাচ্ছে। তাই হাতচল্লিশেক দূর থেকেও অনিলিখা বুঝতে পারল রিকার্ডোর বলার কারণ। কুমিরটা অস্বাভাবিক বড়। আর চোখটা যে-কোনওদিকে ঘোরাতে পারে। প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা বিশাল চেহারার অ্যানাকোন্ডাটা কুমিরের চোয়ালের কামড়ে ছটফট করছে। লেজ দিয়ে পাশের একটা গাছ জাপটে ধরে পালানোর চেষ্টা করছে। বিশাল গাছটা সাপের টানে ঝুঁকে পড়েছে। মারামারিটা দু-মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। দ্বিখণ্ডিত অ্যানাকোন্ডার একটা টুকরো নিয়ে কুমিরটা ফিরে আসছে।

রিকার্ডো অনিলিখা বোট নিয়ে জোরে দাঁড় বেয়ে দূরে যেতে থাকল। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে-বাইতে রিকার্ডো বলে উঠল,—আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা হল সারকোসুকআস কুমির। ক্রেটেসাস যুগে এ ধরনের কুমির ছিল। টিরেক্সও এদের ভয় পেত। সাংঘাতিক হিংস্র আর গায়ে খুব জোর। গত কয়েক হাজার বছরে এরকম কুমির দেখা যায়নি। কী হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা, ওই লোকটা কোথায় গেল! ওর বোটটা দেখছি না তো। অনিলিখা বলল।

—ওই-ওই তো ওর বোটটা। গাছের ধারে। কিন্তু লোকটা কোথায়? চলো তাড়াতাড়ি দেখা যাক। কুমিরটার পেটে গেল না তো!

হঠাৎ রিকার্ডো উহ করে উঠল। কী হল বোঝার আগেই অনিলিখার পিঠেও একটা তির এসে বিঁধল। মুহূর্তে চন্দ্রালোকিত নদীতীরে যেন আঁধার নেমে এল।

মনু জঙ্গল, আমাজন, পেরু, 11 জুন

ঘুম ভাঙার পর অনিলিখা খানিকক্ষণ কিছুই মনে করতে পারল না। তারপর আস্তে-আস্তে মনে পড়ল। বোট, অস্বাভাবিক বড় একটা কুমির আর অ্যানাকোন্ডার লড়াই। তারপরে পিঠে কী যেন একটা বিঁধল। পিঠে অসহ্য ব্যথা এখনও। উঠে বসতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিল। কাঠের ঘর। গোলাকৃতি। ঘরের মধ্যে একটাই খাট। যার ওপর অনিলিখা শুয়ে আছে। কোণের দিকে একটা মাটির পাত্র। খুব সম্ভবত জল রাখার। মাথার কাছে দেওয়ালে একটা আলো লাগানো। কোনও পাখার ব্যবস্থা নেই। জানলাও নেই। ভেতরটা তাই গুমোট মতো। কতক্ষণ এরকম শুয়ে আছে কে জানে! একটু খেয়াল করতেই চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে দুটো ক্যামেরা। কেউ নিশ্চয়ই লক্ষ রাখছে অনিলিখার ওপর। কুণ্ঠিত হয়ে শুয়ে-শুয়েই পোশাক ঠিক করে নিল। খানিকবাদে মনের সমস্ত জোর একত্র করে উঠে বসল। শুধু পিঠের ব্যথাই নয়, কীরকম যেন নেশার ঘোরে মাথাটা ঘুরছে। তিরে নিশ্চয়ই বিষ মেশান ছিল।

কুরারি বিষ বিভিন্ন ভাবে বানানো যায়। এখন বেশ কিছু ওষুধ কোম্পানি কুরারি বিষের কিছু উপাদান কাজে লাগিয়ে মাসল রিল্যাক্সেশনের ওষুধ তৈরি করছে।

মিনিটপাঁচেক পরে খাট থেকে উঠে দাঁড়াতে পারল অনিলিখা। দরজাটা শুধু ভেতর থেকে ভেজানো আছে। খুলে অবাক হল। বাইরেও কেউ পাহারায় নেই। পর মুহূর্তেই অবশ্য বুঝতে পারল কেন পাহারায় নেই! ঘরটা একটা বাঁশের মাচার ওপরে। সামনে ছোট খোলা বারান্দা। নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমাজন নদী। ঘরে ঢুকতে-বেরোতে গেলে নৌকো লাগবে। নৌকোতে নামা ওঠার জন্য একটা ভাঁজ-করা মই বারান্দার সঙ্গে লাগানো আছে। কিন্তু কোনও নৌকো নেই। অবশ্য ঝাঁপ দিয়ে নদীতে নামা যায়। খানিকটা সাঁতার কাটলেই কোনও-না-কোনও গাছে উঠে পড়া যাবে। কিন্তু মাঝের নদী নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়। খানিক দূরে জলের মধ্যে কুমির চোখে পড়ল। তবে সাধারণ কুমির। সেদিনের কুমিরটার মতো অস্বাভাবিক বড় নয়। কিন্তু অনিলিখাকে খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আর এটুকু পথ পেরোলেই তো হল না। চারদিকে গভীর জঙ্গল। এরকম জঙ্গল থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ বেশ জোরে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমাজনে এরকম হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি নামে। এমনিতেই সন্ধে হয়ে এসেছিল। বর্ষার কালো মেঘ অন্ধকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে-মাঝে জঙ্গলের ওপর চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে বিদ্যুতের আলো।

এরমধ্যেই দূর থেকে একটা বোট আসতে দেখল অনিলিখা। এদিকেই আসছে। মোটরবোট। ওপরটা চাদরে ঢাকা। অতিথিরা যে তাকেই দেখতে আসছে তা বুঝতে পেরে অনিলিখা দরজা বন্ধ করে খাটের ওপর এসে বসল।

খানিকবাদে দরজায় নক করে দুজন ঘরে এসে ঢুকল। একজন বৃদ্ধ—সুট-টাই পরা। দেখেই ব্রিটিশ বলে মনে হয়। অন্যজন আদিবাসী। হলুদ হাফপ্যান্ট পরা। গায়ে লাল-হলুদ-গোলাপি ডোরাকাটা চাদর। মাথায় রঙবেরঙের টুপি। দেখেই বোঝা যায় কানোয়ারা উপজাতির লোক। এরা একসঙ্গে এখানে কী করছে?

বৃদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রিটিশ ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন,—এভাবে এখানে ধরে নিয়ে আসতে হল, তার জন্য দুঃখিত। আগেই সাবধান করেছিলাম। দেখলে রবার্তো গুলি খেল। তুমি একটুর জন্য মরতে-মরতে বেঁচে গেলে। তোমরা কখন কোথায় যাচ্ছ সবই আমার জানা ছিল। ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে ফিরে যাবে। তা সত্ত্বেও এত আগ্রহ যখন রহস্য উৎঘাটনের, তখন একটু ফলভোগ তো করতেই হবে। বাইরে তাকিয়েই নিশ্চয় বুঝেছ এখান থেকে পালানো অসম্ভব। একসঙ্গে এত হিংস্র প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

—রিকার্ডো কোথায়?

ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন,—ঘণ্টাদুয়েক আগে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমাদের বারণ সত্ত্বেও। ফল যা হওয়ার হয়েছে, ওর দেহ আমরা দশ মিনিট আগে উদ্ধার করেছি। খুব সম্ভবত জাগুয়ারের আক্রমণে মারা গেছে। জাগুয়ার অবশ্য এখানকার নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পড়ে।

একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বললেন,—তোমার কাছে দুটো পথ খোলা আছে অনিলিখা। এক আমার হয়ে কাজ করা। তোমার মতো ট্যালেন্টেড বিজ্ঞানীদের আমার খুব দরকার। দুই, মৃত্যু। অন্য কোনও উপায় নেই। এ-এলাকা পাহাড়, ঘন জঙ্গল, ঘন মেঘের জন্য স্যাটেলাইটের কাছেও অধরা। এখান থেকে পালানো বড় শিকারির পক্ষেও অসম্ভব। তা তুমিই তোমার পথ ঠিক করে নাও। সময় নাও। ক্যাটুন্টা তোমার জন্য টার্কির পোড়া মাংস নিয়ে এসেছে। খেয়ে নাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

বলে বৃদ্ধ ঘরের দেওয়ালে একটা স্পিকারের দিকে নির্দেশ করলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাটুন্টাকে অজানা ভাষায় কী একটা বললেন। ক্যাটুন্টা ঘরের কোণে কলাপাতার ওপর খাবারটা রেখে

দিল। দুজনে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমনসময় অনিলিখা বলে উঠল,—ডক্টর গিল!

বৃদ্ধ চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি ডক্টর গিল। শুধু এটা বুঝতে পারছি না, আপনার মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সারা পৃথিবী থেকে লুকিয়ে এখানে কী করছেন! আপনিই বোধহয় প্রথম বুঝতে পারেন যে ক্রপ সার্কেল অন্য গ্রহের জীবেদের তৈরি। তারা বিশেষ কোনও বার্তা পৃথিবীর মানুষকে জানানোর জন্য রেখে গেছে। আপনি ওই সংকেত উদ্ধারও করেন। তারপরে টাকার লোভে, আরও ক্ষমতার লোভে আপনি চেষ্টা করেন কীভাবে ক্রপ সার্কেল অন্য বিজ্ঞানীদের নজর থেকে লুকিয়ে রাখা যায়। আপনি তাই প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরির কথা বলেন —এটা বোঝানোর জন্য যে, এগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরাও মেনে নেয় যে ক্রপ সার্কেলে অ্যালিয়েনদের কোনও হাত নেই। আপনার জবাব নেই, সারা পৃথিবীকে আপনি বোকা বানিয়েছেন! যাতে আপনি যা জানেন, অন্যরা তা না জানতে পারে।

—অসাধারণ অনিলিখা! আমি তোমার প্রতিভার কথা আগেই শুনেছি। বরফের মধ্যে আটকে থাকা বাতাসে অক্সিজেন আইসোটোপের মিশ্রণ দেখে কীভাবে অতীতের তাপমাত্রা বোঝা যেতে পারে—তোমার ওই রিসার্চ পেপারটা আমি পড়েছিলাম। তখন থেকেই তোমার সম্বন্ধে আমার খুব উঁচু ধারণা। তোমাকে আমার দলে পেলে আমি আমার কাজ আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

তবে তুমি একটা জায়গায় ভুল বলেছ। বেশ কিছু ক্রপ সার্কেলের মধ্যে যে অ্যালিয়েনদের তৈরি করা জটিল সংকেত লুকিয়ে আছে—আমি প্রথমে সেটাই বলতে চেয়েছিলাম। কেম্ব্রিজে এক কনফারেন্সে বলেওছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে এমন হাসাহাসি, আমার নামে এমন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল যে, তখনই বুঝলাম আমি আমার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে আছি। যা বলছি তা কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না। যা করার আমাকে একাই করতে হবে। সরকার থেকে আমার রিসার্চের জন্য কোনও ফান্ড তো পেলামই না, উলটে কেম্ব্রিজ আমাকে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দিল। আমি তখন প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরির মাধ্যমে সবাইকে ক্রপ সার্কেল তৈরির রহস্য বুঝিয়ে দিলাম। ওটা তো এখন অনেক ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোও হয়। কত তফাত! বিজ্ঞান সবসময় প্রমাণিত তথ্য চায়। অ্যালিয়েন প্রমাণিত নয়। তাই ওদের নিয়ে কথাও বলা বারণ।

—তবে আপনি বোধহয় তখনই সংকেত উদ্ধার করতে পারেননি। পারেন 1995 সালে। তার পরেই আপনি হারিয়ে যান। কিন্তু কী ছিল আপনার উদ্ধার করা এই সংকেতে, যার জন্য

আপনাকে সারা বিশ্বের থেকে লুকিয়ে কাজ করতে হবে! আসতে হবে আমাজনের দুর্গমতম এলাকায়?

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ কী খেয়াল হতে অনিলিখা ফের উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—ও মাই গড! এখন বুঝতে পারছি এ এলাকায় কেন অতীতের বিলুপ্ত প্রাণী পাওয়া যাচ্ছে। এটাই আপনার গবেষণা। জুরাসিক পার্কের মতো একটা পার্ক তৈরি করা, যাতে থাকবে অতীতের হারানো প্রাণী। ক্রপ সার্কেলের সংকেত উদ্ধার করেই আপনি এই পদ্ধতির কথা জানতে পারেন। চলে আসেন পৃথিবীর এমন এক প্রত্যন্ত জঙ্গল প্রান্তে যার হদিশ কেউ চট করে পাবে না। আপনার তৈরি প্রাণীরা তাদের বাঁচার মতো পরিবেশও পাবে।

ড. গিলের চোখ চকচক করে উঠল। এগিয়ে এসে অনিলিখার হাত ধরে করমর্দন করে বলে উঠলেন,—ওয়েলকাম টু মাই টিম। আমার টিমে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সেরা বত্রিশজন বিজ্ঞানী আছেন। তোমাকে পেলে তা আরও শক্তিশালী হবে। শুধু একটা জিনিস বলি। আমি কখনওই টাকা বা ক্ষমতার লোভে কিছু করিনি। পার্ক বানাবার কোনও উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন ইংল্যান্ডের সবথেকে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। আমার জন্য যা সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা থেকেই আমি গবেষণার পিছনে খরচ করেছি। কোনও লাভের আশায় নয়। শুধু আবিষ্কারের আনন্দের জন্য। যেসব প্রাণীকে মানুষ কখনও দেখেনি, শুধু ফসিল দেখে কল্পনা করেছে—তাদের আবার রক্তমাংসের চেহারা দেওয়ার জন্য। আমি এখানে তিরিশটা প্রজাতির প্রাণী তৈরি করেছি, যারা গত একশো থেকে দশ লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—আমি জানি না, আপনি কী আলাদা পদ্ধতির কথা জেনেছেন। আজকে এমনিতেও তো আমরা জিন রিসার্চে অনেক অগ্রগতি করেছি। গত একশো-দেড়শো বছরে যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের ক্লোন করে তৈরির চেষ্টা করছি। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে তাসমানিয়ার বাঘও ভূমিষ্ঠ হবে।

—তাতে কি ক্যালিকোথিয়ারসকে ফিরিয়ে আনা যাবে, যা বারো হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? না বানানো যাবে টারওহসোর-এর মতো উড়ন্ত সরীসৃপ যা কয়েক লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

অবাক হয়ে অনিলিখা বলে,—আপনি কি টারওহসোর-এর মতো হিংস্র উড়ন্ত সরীসৃপও ফিরিয়ে এনেছেন?

—হ্যাঁ, এখানে চারটে টারওহসোর আছে। ওর মতো হিংস্র আরও জুরাসিক আর ক্রেটেসিয়াস যুগের প্রাণীও আছে। তবে সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ঠিক তোমার মতো।

—মানে? আপনি কি ওদের নিয়ন্ত্রণ করেন নাকি?

—যে-কোনও জন্তু কখন কতটা আক্রমণাত্মক হবে বা কখন শান্ত থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের একটা অংশ। এখানে আমরা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছি, সবার ব্রেনের মধ্যে একটা ছোট রেডিয়ো কন্ট্রোলড ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দিয়েছি। ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ওই ইলেকট্রোড চালু বা বন্ধ করে আমরাই ঠিক করি ওই জন্তু কখন কাউকে আক্রমণ করবে। কখন ঘুমিয়ে থাকবে। 1960 সালে বিজ্ঞানী হোসে ডেলগ্যাডো এভাবে ষাঁড়কে কন্ট্রোল করে দেখিয়েছিলেন। আমাদের প্রযুক্তি অবশ্য আরও উন্নত মানের। আমরা এখানে কম্পিউটারের কি-বোর্ডে টাইপ করে কোন প্রাণী কতদূর যাবে তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই যে বোরা উপজাতির লোকেরা কোয়াগ্যা ধরেছে, তা আমরাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা দেখতে চাই কোয়াগ্যা গৃহপালিত পশু হিসেবে কীরকম থাকে।

—ডক্টর গিল আপনি যা করেছেন তা কতটা সাংঘাতিক তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য। এরকম সংকেত পাঠিয়ে অন্যগ্রহের জীবদের লাভটা কী?

—খুব ভালো প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরটা আমার জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কী একটা সংকেত উদ্ধার করেই যা পেয়েছি, তা দিয়ে সারা পৃথিবী বদলে দিতে পারি। আমি আরও দুটো ক্রপ সার্কেলের সংকেত উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। হাতে সময়ও ছিল না। এগুলো খুবই জটিল সংকেত। কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে সংকেত উদ্ধার করা যায় না। ওরাও বোধহয় সেটাই চায়। যাতে কোনও একজন মানুষ সব জেনে ক্ষমতার মিসইউজ না করে।

একটু থেমে ড. গিল বললেন,—সন্ধে হয়ে এসেছে, অনেক কাজ বাকি আছে। আমি চললাম। কাল সকালে আমার লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। দেখবে আমাদের কর্মকাণ্ড।

হঠাৎ ড. গিল থেমে গেলেন। ঘরটা যেন দুলে উঠল।

15 জুন, সকাল আটটা, মনু ফরেস্ট, পেরু

এরকম অদ্ভুত কর্মশালা অনিলিখা আগে কোনওদিন দেখেনি। ছোট-ছোট গোল কাঠের বাড়ি। প্রত্যেকটা মাচার ওপর। নীচ দিয়ে বয়ে গেছে আমাজন। আমাজন বর্ষায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে (দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়মমতো) ফুলে ফেঁপে ওঠে। নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে জলতল কিছু-কিছু জায়গায় প্রায় 45 ফুট উঠে আসে। তাই মাচার ওপর বাড়ি সারা বছরের নিরাপদ আশ্রয়।

অনিলিখাকে বোটে করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে প্রোজেক্টের কাজ দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানী ন্যান্সি স্যাবাতো। বিশাল জায়গা জুড়ে কর্মকাণ্ড। ন্যান্সি ব্রেন সার্জেন। এখানে ন্যান্সি কী করছেন তা

এখনও জানা হয়নি অনিলিখার।

—বাড়িগুলো একই ধরনের। এর ভেতরেই কি গবেষণা হয়? না কি এগুলো থাকার জায়গা?

—আসলে এটা আগে ছিল একটা পরিত্যক্ত উপজাতি এলাকা। হারিয়ে যাওয়া শহর এল ডোরাডোর নাম শুনেছ? গত চারশো বছর ধরে সবাই এল ডোরাডো খুঁজে বেরিয়েছে সোনার সন্ধানে। ধারণা করা হত, ওই শহরে ইনকারা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কেউ খুঁজে পায়নি। যারা খুঁজতে এসেছিল শহর সম্বন্ধে তাদের ধারণা ভুল ছিল। তাদের ধারণা ছিল শহর মানে বড়-বড় বাড়ি, বিশাল রাস্তাঘাট। কখনওই তারা এ ধরনের শহর কল্পনা করেনি। এ শহর স্যারই আবিষ্কার করেন। গোটা কুড়ি বাড়ি নিয়ে একটা ব্লক। মাইলখানেক দূরে আবার এরকম কিছু বাড়ি। প্রত্যেক ব্লককে যুক্ত করলে প্রায় কুড়ি মাইল ব্যাসের একটা বৃত্ত পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা বাড়ির ব্লক থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আগে ভালো রাস্তা ছিল—যা জল নেমে গেলে আজও দেখা যায়। বৃত্তের কেন্দ্রে বেশ বড় জায়গা। সেখানেই স্যারের বাড়ি আর আমাদের মূল রিসার্চ সেন্টার। সেখানে মাটি অনেক উঁচু, কখনও জল ওঠে না। এই বাড়িগুলো থাকার জন্যও যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনই কিছু-কিছু বাড়ি রিসার্চের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

—তা তোমরা সোনাও পেয়েছ নাকি?

—তা জানি না। তবে স্যার গবেষকদের যা মাইনে দেন তা যে-কোনও ইউনিভার্সিটির গবেষকদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। জানি না সে টাকা কোথা থেকে আসে।

মোটরবোটের পাশ দিয়ে একটা টেপির সাঁতার কেটে চলে গেল। এসময় সব প্রাণীকেই একটু সাঁতরাতে হয়। ন্যান্সি বলল,—এরকম রিসার্চের পরিবেশ সব গবেষকের কাছেই স্বপ্নের মতো। আমি গত তিনবছর কতরকম জন্তু দেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। এখন ভয়ও চলে গেছে। কয়েক মাস আগে একটা ইলেকট্রিক ইলের 500 ভোল্টের শক খেয়ে প্রায় প্রাণ যেতে বসেছিল।

খানিকবাদে চারপাশের জল একটু কমে গেল। আরও মিনিটপাঁচেক বাদে বোট একটা তীরে এসে দাঁড়াল। এখানে নামলে পায়ের পাতা ডুবে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার একটা পথ ওপরের দিকে চলে গেছে। বোঝা যায় অনেক লোকের যাতায়াত আছে এ পথে।

—এ এলাকা নিরাপদ। কোনও হিংস্র জন্তু নেই। তবে পায়ের দিকে খেয়াল রেখো। কোরাল সাপ বা স্ট্রিং-রে থাকতে পারে। স্ট্রিং-রে'র ল্যাজে মারাত্মক বিষ থাকে। পা পড়লেই বিষ ছোবল দেবে। ন্যান্সি সাবধান করে দিল।

পা টিপে-টিপে অনিলিখা ন্যান্সির পেছন-পেছন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তা ওপরের দিকে উঠেছে। পায়ের তলায় শুধু ভিজে পাতার মচমচ আওয়াজ। মিনিটতিনেক হাঁটার পরেই অনিলিখারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিশাল একটা খোলা মাঠের ধারে এসে পৌঁছল। মাঠের মাঝে কয়েকটা খড়ের চালের বেশ বড়-বড় মাটির বাড়ি।

—ওগুলোই আমাদের মূল রিসার্চ সেন্টার। চলো একটায় ঢোকা যাক। ন্যান্সি বলে উঠল।

মিনিটপাঁচেক হেঁটে অনিলিখারা একটা বাড়িতে ঢুকল। বাড়ি বললে ভুল হবে। ঢোকার পরেই সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। ওপরে শুধু গোল বারান্দায় দাঁড়ানোর জায়গা। মাটির নীচে ওপরের প্রায় দশগুণ বড় গোল এলাকা। তার এক প্রান্তে একটা অদ্ভুত জীব। ড্রাগনের মতো দেখতে। ইন্দোনেশিয়ার কমোডো ড্রাগনের থেকে লম্বায় দ্বিগুণ বড়। প্রায় বারো ফুট। কালচে রং। মাঝে-মাঝে লম্বা জিভ বার করছে। শক্ত খোলসের ওপর দিকে কাঁটা-কাঁটা। বিশাল লেজ আর নীচের দিকটা ইগুয়ানার মতো। তিনটে হাত। প্রত্যেকটা হাতে পাঁচটা আঙুল-তাতে ধারালো বড় বাঁকানো নখ। লালচে চোখ আর ড্রাগনের মতো মুখ দেখেই বোঝা যায় খুব হিংস্র হবে।

ন্যান্সি পাশ থেকে বলে উঠল,—100 মিলিয়ন বছর আগে এই ড্রাগন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আজকে যে ইগুয়ানা দেখা যায় বা ইন্দোনেশিয়ার কমোডো ড্রাগন দেখা যায়, তার পূর্বজ। আমরা আবার সৃষ্টি করেছি। এটা একটাই আছে। প্রচণ্ড হিংস্র। কিছু শুনতে পায় না। কিন্তু খুব শক্তি। শিকার কাছে এলেই ব্যস।

ড্রাগনটার উলটোদিকের প্রান্তের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি গা, লাল হাফপ্যান্ট পরা আদিবাসী। তার দিকে নির্দেশ করে অনিলিখা বলে উঠল,—ও ওখানে কী করছে?

ন্যান্সি এবার বাঁ-দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল,—ওদের লক্ষ করেছ? চারজন কম্পিউটার টার্মিনালে বসে আছে। আমার সহকর্মী। ড্রাগনটাকে জঙ্গলে ছাড়ার আগে ওরা দেখে নিচ্ছে কম্পিউটার দিয়ে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে কি না। ওকে আমরাই শান্ত করে রেখেছি। এরা কম্যান্ড দিলেই ড্রাগনের ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা ইলেকট্রেড ওকে হিংস্র করে তুলবে। ও আক্রমণ করতে ছুটে যাবে লোকটার দিকে। পৌঁছনোর আগেই আবার আমরা কম্পিউটার কম্যান্ডের মাধ্যমে ওকে থামিয়ে দেব। এভাবে আমরা ড্রাগনের সম্বন্ধেও জানতে পারব। ও কত দ্রুত, কীভাবে আক্রমণ করে তাও জানা যাবে।

—চোখে না দেখলে আমি তো ভাবতাম ড্রাগন শুধু গল্পই। এবার বুঝেছি কেন চিনে বলা হয় যে ড্রাগনের মুখ থেকে আগুন বেরোয়। যেভাবে সোনালি, বড়, কাটা জিভটা দ্রুত বার

করছে আর ঢোকাচ্ছে আগুন বলে ভুল করাটা স্বাভাবিক। তা ড্রাগনটার বয়স কত? এটা কি ফুলসাইজ?

কথার উত্তর এল না। ন্যান্সি একদৃষ্টে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে আছে। লেজটা সোজা করে ড্রাগনটা আদিবাসী লোকটার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। জিভটা বারবার লকলক করে বার করছে। লোকটা ওর দিকে আস্তে-আস্তে এগোচ্ছে। হঠাৎ ড্রাগনটা তীব্র হিসহিস শব্দ করে দেহের অর্ধেকটা মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে তুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর লেজ ঝাপটে আর পেছনের হাতটায় ভর করে তীব্রগতিতে ছুটে চলল লোকটার দিকে। মাঝে প্রায় পঞ্চাশফুট দূরত্ব। লোকটা কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে ড্রাগনটার দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝের দূরত্ব যখন দশফুট, ড্রাগনটা মাটি ছেড়ে প্রায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। সামনের হাতের ধারালো নখ আর দাঁত দিয়ে পড়ে যাওয়া লোকটার শরীর আঁচড়ে কামড়ে মুহূর্তে টুকরো-টুকরো করে দিল। ন্যান্সি চেঁচিয়ে উঠেছে,—স্টপ! স্টপ ইট!

হতবাক হওয়া বিজ্ঞানীর দল উত্তেজিতভাবে কীসব টাইপ করে যাচ্ছে ল্যাপটপে। ড্রাগনটা লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা তুলে হিংস্র চোখে চারদিক দেখে আস্তে-আস্তে ফিরে চলল।

ঘরে তিনজন লোক ছুটে এসে ঢুকল। আদিবাসী লোকটার রক্তাক্ত দেহটাকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় অনিলিখা এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু বলার আগেই ন্যান্সি পাশ থেকে বলে উঠল,—এরকম অ্যাক্সিডেন্ট খুব কমই ঘটে। ওরা কম্যান্ড দিয়ে থামানোর আগেই ড্রাগনটা ঝাঁপ দিয়েছিল। শেষে হঠাৎ যে ও উড়ে যাবে, সেটা বুঝতে পারা যায়নি।

—কিন্তু লোকটা একটুও ভয় পায়নি। এমনকী তখনও পালানোর চেষ্টা করল না। ওকে কি কোনও ওষুধ দেওয়া হয়েছে?

—আমাদের মস্তিষ্কে 'অ্যামিগডেলা' বলে একটা অংশ আছে। এর জন্যই আমরা ভয় পাই। ধরা যাক হঠাৎ একটা বুনো ভালুক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তোমাকে ধরতে এল; তখন অ্যামিগডেলা-ই বলে দেয় পালানো উচিত, না প্রতি আক্রমণ করা উচিত। ভয়ের অনুভূতি জাগে ওই অংশে। আমাদের কাজে যেসব উপজাতি-লোক আছে, তাদের অ্যামিগডেলা অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা আর ভয় না পায়। তা না হলে এসব পরীক্ষা করা যেত না।

—আর কিছু যাতে মনে না থাকে তাই মেমারিও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাই না?

—হ্যাঁ। ব্রেনের 'হিপ্পোক্যাম্পাস'-ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। হিপ্পোক্যাম্পাস কাজ না করায় এরা কিছুই মনে রাখতে পারে না। হিপ্পোক্যাম্পাসই ঠিক করে—কোনও ঘটনাকে মনে রাখা হবে কি হবে না। এক সপ্তাহ আগে কোনদিন সকালে আমরা কী খেয়েছি তা মনে থাকে না, অথচ কুড়ি বছর আগের কোনও একটা বিশেষ দিনের কথা মনে থাকে। দরকারি তথ্য, কোনও স্মরণীয় ঘটনা হিপ্পোক্যাম্পাসই লংটার্ম মেমারিতে গুছিয়ে রাখে।

অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠে,—তোমরা কি মানুষ! তোমাদের জন্য আজকে ওই লোকটার প্রাণ চলে গেল! তোমাদের কাজে ব্যবহার করা অনেক আদিবাসী আজ তাদের প্রিয়জনদের চিনতে পারছে না। তাদের তোমরা ধরে আনো, আবার দরকার ফুরিয়ে গেলে ছেড়ে দাও। বাইরের লোক যাতে এ-প্রোজেক্টের কথা জানতে না পারে তার জন্য এদের মেমারি নষ্ট করে দাও। তোমরা হাজার-হাজার লোকের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলছ!

—এ আমাদের সিদ্ধান্ত নয় অনিলিখা। এটা স্যারের আদেশ। ন্যান্সি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পায়ের নীচের মাটি আবার গতকালের মতো জোরে দুলে উঠল। একবার নয়। পরপর তিনবার। ভূমিকম্প হচ্ছে।

16 জুন, রাত একটা, মনুর জঙ্গল, পেরু

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অনিলিখার। পুরো ঘরটা দুলছে। আবার ভূমিকম্প। এই নিয়ে আজকে নয়বার ভূমিকম্প হল। খাটের ওপর উঠে বসল অনিলিখা। কবে এই বন্দিদশা কাটবে কে জানে! বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই। ফোনটা ওরা নিয়ে নিয়েছে। থাকলেও এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যেত না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনওরকমভাবে যাতে যোগাযোগ রাখা না যায়, তার সব ব্যবস্থাই এখানে নেওয়া হয়েছে। তবে এখানকার লোকজন খারাপ নয়। ন্যান্সি ছাড়াও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার মধ্যে ইকুয়েডরের বিজ্ঞানী ক্যাথেরিনকেও খুব ভালো লেগেছে।

ওই বলছিল ইনকাদের রাস্তার কথা। ইনকা সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ছিল ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইনকারা পাঁচশো বছর আগে তাদের পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে আন্দেজ পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিল। এখনকার ইকুয়েডরের কুইটো থেকে চিলির স্ট্যান্টিয়েগো অবধি রাস্তা ছিল। বাইশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে ছিল সে রাস্তা। জায়গায়-জায়গায় সে রাস্তা গেছে ষোলো হাজারেরও বেশি উঁচু গিরিশ্রেণির ওপর দিয়ে।

'চাসকুই' দৌড়বাজরা ওই রাস্তা দিয়ে ছুটে-ছুটে রিলে সিস্টেমে এক জায়গার খবর আরেক জায়গায় পৌঁছে দিত। এক দিনে ছয়-সাতজন চাসকুই-এর হাতবদল হয়ে খবর চলে যেত আড়াইশো কিলোমিটার দূরত্ব অবধি। সে মেসেজ কোনও কাগজে লেখা থাকত না। ইনকাদের

কোনও লেখার হরফই ছিল না। শুধু গিঁট বাঁধা নানান দৈর্ঘের দড়ির মধ্যে থাকত সে তথ্য। এই দড়িকে বলা হত 'কিপ্পু'। কীভাবে কিপ্পুতে এই তথ্য রাখা হত তা আজও কেউ জানে না। এই তথ্য পড়তে পারত বিশেষ কিছু লোক। তাই শত্রুপক্ষের হাতে গেলেও তারা এ-খবর পড়তে পারত না। খারাপ জরুরি খবর হলে বার্তা দুবার-তিনবার পাঠানো হত।

এভাবেই ইনকা সম্রাটের মৃত্যুর খবর পৌঁছে গিয়েছিল সেনাধ্যক্ষ রুমিনাহুই-এর কাছে। স্প্যানিশ সেনারাও বুঝতে পারেনি যে সামান্য একটা দড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকবে, এমন একটা দরকারী তথ্য—রাজার মৃত্যু সংবাদ। স্প্যানিশ সেনারা মিথ্যে বললেও 'চাসকুই'-এর হাতে দড়ি পেয়েই রুমিনাহুই বুঝেছিল তাদের সম্রাট-কে মেরে ফেলা হয়েছে। আর তার ঘাতকদের হাতে সে কি না তুলে দেবে ইনকা-দের স্বর্ণভাণ্ডার! কখনওই না! তাই রুমিনাহুই রাতারাতি 750 টন সোনা লুকিয়ে ফেলেছিল স্প্যানিশ সেনাদের হাতে না দিয়ে। শত অত্যাচারেও মুখ খোলেনি।

হঠাৎ অনিলিখার খেয়াল হল—হয়তো অন্যগ্রহের জীবেরাও এরকম কোনও বিপদের সম্ভাবনার কথা একাধিক বার জানানোর চেষ্টা করছে সংকেতের মাধ্যমে। তা না হলে ওরা একইরকম সংকেত বারবার পাঠাবে কেন? অন্য কোনও কারণে মেসেজ পাঠালে তা কি বারবার পাঠানো হত! বোধহয় নয়। তাহলে কি বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে? 'সেটি'-র সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে বোঝা যেত ওরা গ্যালওয়ের ওই সংকেত উদ্ধার করতে পেরেছে কি না। শেষবার

ওদের সঙ্গে অনিলিখার যোগাযোগ হয়েছিল পাঁচ দিন আগে। মনু লজে থাকাকালীন।

ওরা জানিয়েছিল ওরা সংকেতের সমীকরণের কয়েকটা ভ্যারিয়েবল উদ্ধার করতে পেরেছে। সেই দুটো সংখ্যা হল 12 আর 70। তবে পুরো সংকেত উদ্ধার করতে আরও মাসখানেক লেগে যাবে।

হঠাৎ অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এল। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ঝমঝম শব্দে জঙ্গলের সব কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেছে। বাতাসে কিসের যেন কড়া গন্ধ! এ-গন্ধটা অনিলিখা গত কয়েকদিনে পায়নি। সালফার-ডাই-অক্সাইড। তাহলে কি অনিলিখার ধারণাই ঠিক? এতগুলো ভূমিকম্প কি আগ্নেয়গিরিরই জেগে ওঠার পূর্বাভাস নয়! নিশ্চিত বড় কোনও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হতে চলেছে।

এ-এলাকার ঠিক অবস্থান বোঝা গেলে সুবিধে হত। যেখানে প্লেনে নেমেছিল, সেই বোকা মানুর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ অনিলিখার মনে আছে। বোটের জিপিএস-এর কল্যাণে। 120S,

660W,—যেখান থেকে অনিলিখারা পশ্চিম দিকে যেতে শুরু করেছিল। ওরা কি তাহলে জানাতে চাইছে 120S, 700W। হয়তো সেটাই এখানকার অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ।

মুহূর্তে অনিলিখার কাছে সব অঙ্ক মিলে গেল। ওরা কি তাহলে এখানকার আগ্নেয়গিরির সম্বন্ধেই সাবধান করতে চাইছে? কিন্তু প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে তো প্রায় ষাটটা আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে! তাহলে কি এটা সেগুলোর থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী? কী যেন জায়গাটার নাম? ইন্দোনেশিয়ার ট্যামবোরা। ইদানীংকালের মধ্যে সবথেকে বড় অগ্ন্যুৎপাত ওখানেই হয়েছিল। প্রায় এক লাখ লোক মারা গিয়েছিল 1991 সালে ওই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে।

অতীতেও অনেক শহর চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠায়। কী যেন ছিল ওই রোমান শহরটার নাম, যা ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ, পম্পেই। প্রায় দু-হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির ছাই, লাভার স্রোতে আর বিষাক্ত গ্যাসে পম্পেইতে ষোলো হাজার লোক মারা গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল সেভাবেই ছাইতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাহলে কি তার থেকেও বড় কিছু হতে চলেছে এখানে? এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল অনিলিখা।

পেরুর এ-এলাকা 'রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। এ জন্যই হয়তো আগের অধিবাসীরা এ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাছাকাছির পাহাড়ে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলে ভারী বিষাক্ত গ্যাস, লাভার স্রোত আর ছাই সবার আগে পাহাড় বেয়ে নীচু উপত্যকা এলাকায় নেমে আসবে, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন, পাইরোকাস্টিক ফ্লো। 1902 সালে এরকম ভাবেই 'সেন্ট পিয়ের' শহরের সব লোক মারা গিয়েছিল। কিছু বোঝার আগেই পাশের পাহাড়ে জেগে উঠেছিল আগ্নেয়গিরি। তার ছাই, আর বিষাক্ত গরম গ্যাস নেমে এসেছিল পাহাড় বেয়ে উপত্যকায়। এত দ্রুত ছিল সেই স্রোত যে, শহরের লোক পালানোর সময়টুকুও পায়নি। এখানকার ভবিতব্যও কি তাই? চারপাশের পাহাড়ের মধ্যে এটা তো উপত্যকা!

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল অনিলিখা। পালাতেই হবে। এই রাতের মধ্যে। ন্যান্সিকে জানাবে কি? কিন্তু ন্যান্সি পালাবে কী করে? ওর হাতে আরএফআইডি চিপ বসানো আছে। এখানকার সব বিজ্ঞানীর হাতে আরএফআইডি চিপ বসানো আছে, যাতে ড. গিল যে-কোনও সময়ে জানতে পারেন তারা কে কোথায় আছে। কালকে অনিলিখার হাতেও বসানো হবে। সুতরাং অন্য কাউকে জানানো সম্ভব নয়। তাকে একলাই পালাতে হবে।

বিছানায় এসে শুলো অনিলিখা। রাতের বেলা নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরের ক্যামেরাতে চোখ রেখে বসে নেই। একজন মেয়ে একা যে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে না তা এরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে। তবু যতটা সম্ভব সাবধান হতে হবে। অনিলিখা পালাচ্ছে টের পেলেই ড. গিল এখানকার ল্যাবে তৈরি করা হিংস্র জন্তুগুলোকে কম্পিউটার সিগন্যালের মাধ্যমে সজাগ করে তুলবে। তাদের হাত এড়িয়ে তখন পালানো সম্ভব হবে না। অনিলিখা মাথার কাছের আলো নিভিয়ে দিল যাতে ক্যামেরাতে ভালো না দেখা যায়।

খানিক শুয়ে আস্তে-আস্তে চাদরের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল অনিলিখা। চট করে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এবারে? বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয়নি। সরু চাঁদটা মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে অনিলিখা কাউকে দেখতে না পেলেও, চারদিক থেকে অজস্র চোখ নিশ্চয়ই অনিলিখাকে লক্ষ করছে। কয়েক বছর আগে এক পর্যটক ব্রাজিলের আমাজনের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। ষোলো দিন বাদে তাকে উদ্ধার করা হয়। সে যদি ষোলো দিন নিরস্ত্র অবস্থায় বাঁচতে পারে, তাহলে অনিলিখা কেন পারবে না!

জলে ঝাঁপ দিল অনিলিখা। জল বেশ গরম। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার আরেক লক্ষণ। মিনিটদশেক সাঁতরাবার পর গাছের ডালে বাধা পেতে লাগল অনিলিখা। আর সাঁতরানোর দরকার নেই, পা পাচ্ছে। গলা অবধি জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেই যেতে পারবে।

কিন্তু খানিকবাদে আবার সে ভুল ভাঙল। জল আবার বাড়ছে। আবার মিনিট দশেক সাঁতরে খানিকটা উঁচু জমি পেল। লক্ষ একটাই, যত তাড়াতাড়ি পশ্চিমের পাহাড়গুলোকে পিছনে ফেলা যায়!

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? মাটির ওপর পা রেখে জঙ্গল অতিক্রম করা এক রকম, আর আধডোবা জঙ্গল পেরোনো আরেক রকম! পিরানহা, স্টিং-রে, কুমির, অ্যানাকোন্ডা—হাজারো প্রাণীর নজর এড়ানো অসম্ভব। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবু থামার উপায় নেই। মাঝেমধ্যে গাছের ডাল ধরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার সাঁতার।

মোটামুটি দিক আন্দাজ করে এগোচ্ছে চাঁদের আলোর ভরসায়। কিন্তু এরকম জঙ্গলে পাকা শিকারিরাও পথ হারাবে। দু-তিন ঘণ্টা এভাবে যেতে থাকল অনিলিখা। পূবের আকাশ সামান্য আলো ছড়াতে শুরু করেছে। অন্ধকার স্টেজে হঠাৎ আলো ফেললে যেমন হয়, চেনা-অচেনা নানারকম জীবজন্তুর মুখ এদিক-ওদিক দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ অন্ধকার ছিল, দেখাও যাচ্ছিল না, ভয়ও লাগছিল না। নীচে ঘন সবুজ জল। গাছের পাতা পড়ে-পড়ে জলের রংই যেন বদলে দিয়েছে।

এক রাতেই অনিলিখার সাহস অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ অত সহজে মরে না। একটা ক্যাপক গাছের ডালের ওপর উঠে বসল। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখানেই বোধহয় আগ্নেয়গিরি। জেগে উঠলে লাভাস্রোতে বরফ গলে যাবে। তার সঙ্গে যুক্ত হবে বৃষ্টি। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার পরই সাধারণত জোরে বৃষ্টি হয়। সেই কাদার স্রোতে পথে যা পড়বে সব ভেসে যাবে।

সালফার ডাই-অক্সাইডের বুক জ্বালানো গন্ধ অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে এখন। সারা গা কেটে ছড়ে গেছে। ক্লান্তিতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অনিলিখার নজর পড়ল খানিকদূরে। সারি-সারি টটোরা নৌকো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দাঁড় বাওয়া প্রত্যেকটা নৌকোয় একজন কি দুজন বসে। কোনও ইন্ডিয়ান উপজাতি হবে। ওরাই এখন সবথেকে আপনজন।

অনিলিখা গাছ থেকেই পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকতে লাগল। ওদের একজনের চোখে পড়েছে। বিষাক্ত তির ছুড়বে না তো! না, আস্তে-আস্তে লোকটা তার বোট নিয়ে এগিয়ে এল। অনিলিখা গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে সামান্য সাঁতরে বোটে উঠল। লোকটা কোন উপজাতির জানা নেই। ঠোঁটটা সামনের দিকে অস্বাভাবিকরকম ঝোলা। চিবুকের সঙ্গে এসে লেগেছে। পরনে সামান্য একটুকরো কাপড়। প্রত্যেকেরই ঠোঁট একইরকম। সার-সার প্রায় চল্লিশটার মতো নৌকো। দল বেঁধে এরাও পালাচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই জানে জল এরকম গরম হলে আর এরকম গন্ধ বাতাসে ভাসলে কী করতে হয়। হাজার-হাজার বছর ওরা এই আমাজনেই কাটিয়েছে। অনিলিখাও লোকটার সঙ্গে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল।

দু-ঘণ্টা প্রায় কেটে গেল। নদীর জল এখন আরও গরম হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্য লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে জলে-গাছের মাথায়। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হল। চারপাশ কেঁপে উঠল। 'ক্যা-বুম'! মুহূর্তে পেছনে ফেলে আসা পশ্চিমের পাহাড়টার ওপর লাল ঘন মেঘ জড়ো হল। ফুলকপির মতো দেখতে সে-মেঘ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আবার আওয়াজ হল। তারপর আবার। প্রত্যেকটা আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটা মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে লাল, তারপর কালো রং ধারণ করে সেই মেঘ দ্রুত যেন কাছে চলে আসছে। একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে ঘন কালো চাদরে পাহাড়কে ঢেকে ফেলছে। ওরা প্রাণপণে নৌকো উলটোদিকে বাইতে লাগল। কিন্তু ওই কালো ধোঁয়া যেন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে আওয়াজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। 'ক্যা-ক্যা' আওয়াজ করতে-করতে ঝাঁক-ঝাঁক ম্যাকাও উড়ে যাচ্ছে। দলের-পর-দল বাঁদর

গাছের ওপর দিকে ঝড় তুলেছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছোটা জন্তুদের ছোঁয়ায় পুরো জঙ্গল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মেঘটা যেন ঘিরে ধরল অনিলিখাকেও। প্রচণ্ড গরম বাতাস আর ছোট-ছোট কাচের মতো গরম ছাই সারা গায়ে এসে লাগল। দূরের কিছু আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। বাতাস কীরকম ভারী হয়ে উঠেছে। নৌকোর ভেতরটাও এখন গরম হয়ে উঠেছে। এক দল প্যাটিক মাছ জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে বাতাসে ভেসে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ চারদিকে পাথর পড়ার আওয়াজ হতে লাগল। চারদিকের জলে-মাটিতে-গাছে পাথর এসে পড়ছে। একটা পোড়া ধাতুর গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। নিশ্চয়ই লাভাস্রোত কাছে চলে এসেছে। আশপাশের গাছে আগুন লাগতে শুরু করেছে। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। নৌকাগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। নৌকোর সামনে বসা লোকটাকেও আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আবার রাত শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ অনিলিখার মাথার পিছনদিকে একটা মাঝারি সাইজের পাথর এসে পড়ল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল অনিলিখা। গায়ে শুকিয়ে যাওয়া জামাটার পিঠের দিকটা দ্রুত ভিজে যাচ্ছে। কিছু একটা উষ্ণ তরলপ্রবাহ পিঠ দিয়ে নামছে। নিশ্চয়ই রক্ত। তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজে অনিলিখা ওপরের দিকে তাকাল।

মাথার ওপর দিয়ে একটা সামরিক হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। হাত নেড়ে হেলিকপ্টারটাকে ডাকতে থাকল অনিলিখা। দেখেছে কি না জানা নেই। তবে দ্রুত নেমে আসছে। কিন্তু অনিলিখাকে বাঁচাতে নয়। প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় নেমে এসে পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে জ্বলে উঠল। হয়তো আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের জন্য ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য এরকম উদ্ধারকার্যে হেলিকপ্টারও পাঠানো যায় না।

দাঁড়টা আর হাতে ধরার ক্ষমতা নেই। নিশ্চয়ই অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল অনিলিখা। হার মেনে নিল চোখে নেমে আসা আঁধারের কাছে।

লিমা, পেরু, 30 জুন

—আজকে কেমন লাগছে অনিলিখা?

—অনেক ভালো। তা কবে ছাড়া পাব?

—আপনি হলেন আমাদের পেরু সরকারের অতিথি। দুর্বল শরীর নিয়ে তো আর এতটা পথ যেতে পারবেন না। আর দু-এক দিনের মধ্যেই আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তারপর যখন ইচ্ছে যাবেন।

ডাক্তার আরও কিছু কথার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানলার বাইরে মেঘলা আকাশ। এত ছাই বেরিয়েছে যে পুরো দক্ষিণ আমেরিকার আকাশই ছাইয়ে ঢাকা। সূর্যের আলোরও প্রবেশ নিষেধ। এ যাত্রায় অনিলিখার প্রাণ বেঁচে গেছে শুধু এক ইন্ডিয়ান উপজাতির জন্য। ওরাই অনিলিখাকে বোট থেকে উদ্ধার করে ওদের গ্রামে নিয়ে যায়। চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে। এদের কথা আগে অনিলিখার জানা ছিল না। এর কয়েকদিন পরে আগ্নেয়গিরির ত্রাণকার্যে আসা পেরুর সামরিক দপ্তরের লোকেরা অনিলিখাকে উদ্ধার করে। পুরোটাই দুঃস্বপ্নের মতো।

কিন্তু ড. গিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। গিলের টিমের মধ্যে একমাত্র ক্যাথেরিনকে খুঁজে পাওয়া যায়। বোরা উপজাতির লোকেরা ওকে উদ্ধার করে, অনিলিখাই ওকে সনাক্ত করে টিভিতে ছবি দেখে। কিন্তু ওর কিছুই মনে নেই। কীভাবে আমাজনে এসেছিল, কি করত কিছুই বলতে পারেনি। কমপ্লিট মেমারি লস। গিলের আবিষ্কার করা প্রাণীদেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হয়তো সবই পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদাপ্রবাহে চাপা পড়ে গেছে। ওই এলাকায় উদ্ধারকার্য চালিয়েও কোনও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তো ড. গিলের আবিষ্কারের কথা কেউ আর জানতেও পারবে না। তবু ড. গিলের কথাটা কানে ভাসে অনিলিখার। বিজ্ঞানীর কাজ বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমাজকে নয়।

ঘরের ফোনটা বাজতে শুরু করেছে। মাথার কাছেই ফোনটা। কিন্তু এ-ক'দিন কোনও ফোন ওরা এ-ঘরে ট্রান্সফার করেনি। খুব দরকারি ফোন কি? ফোনটা তুলে নিল অনিলিখা। অপ্রত্যাশিতভাবে 'সেটি'-র ডিরেক্টার জিলের গলা।

—কেমন আছ অনিলিখা?

—প্রায় সুস্থ হয়ে গেছি। তা আপনারা কী করে আমার সন্ধান পেলেন?

—তোমার সন্ধান পাওয়াটা এখন খুব সোজা। পেরুর কাগজেও তো তোমার কথা বেরিয়েছে। তা ছাড়া লিমাতে ফিরে আসার পর থেকে আমরা সমানে তোমার খবরাখবর রাখছিলাম। আগে বিরক্ত করিনি তোমার অসুস্থতার জন্য।

—আপনারা কি সংকেতটা পুরো উদ্ধার করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, সেজন্যই তো ফোন করছি। তুমি মনু জঙ্গলে যেখানে গিয়েছিলে, সে জায়গারই উল্লেখ ছিল সংকেতে।

—আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। একটু পরে বুঝলেও তারজন্যই আমি আজ বেঁচে আছি। ওরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল এ বিপর্যয়ের কথা। তাই জানাতে চাইছিল যে, ওখানে

পৃথিবীর ইদানীংকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির জাগরণ হবে। আমাদের ওই এলাকা থেকে সরে যেতে বলছিল।

ফোনের অন্যদিকে জিল চুপ করে আছে। অনিলিখা আবার বলে উঠল,—ঠিক, তাই না?

—না, তাই না। ওখানে কি কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলে?

—কীরকম? একটু বুঝিয়ে বলবেন?

—এমন কোনও প্রাণী দেখেছিলে যা মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে। নতুন ধরনের কোনও জীব, ডাইনোসর বা ড্রাগনের মতো।

—কেন? তাই কি ওরা জানিয়েছিল?

—হ্যাঁ, প্রথম সংকেত, যা আমরা 'সেটি'-তে পেয়েছিলাম তাতে এরকমই কোনও প্রাণীর কথা ওরা জানিয়েছিল যা মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করতে পারে। আর জানিয়েছিল ওই প্রাণী একমাত্র আছে আমাজনের ওই এলাকায়। দ্বিতীয় সংকেত যা গ্যালওয়ের ক্রপসার্কেলে পাওয়া যায়—তাতে ওরা জানিয়েছিল এজন্য আমাদের ভয়ের কিছু নেই। ওরা বোধহয় জানত যে আগ্নেয়গিরি ওই জায়গায় জেগে উঠবে। আগ্নেয়গিরির জন্যই হয়তো ওই প্রাণী আজ আর নেই। সব নির্মূল হয়ে গেছে। কিন্তু এলই বা কোথা থেকে তা একটা বড় রহস্য। আর এমনকী প্রাণী হতে পারে যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে?

অনিলিখা কোনও উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ও সবকিছুই ডক্টর গেরার্ডকে জানিয়েছিল। গেরার্ড সাবধান করে দিয়েছেন—এ ব্যাপারে কারও কাছে কিছু না বলতে।

হয়তো কিছু জিনিস রহস্য থাকাই ভালো। ঠিক যেমন ওই ইন্ডিয়ান উপজাতির কথা, যারা অনিলিখাকে বাঁচিয়েছিল। হয়তো ওদের খোঁজ আর কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। ওদের কথা পেরুর কোনও উপজাতি বিশারদেরও জানা নেই। কোনও নথিভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ওরা পড়ে না। যখন জ্ঞান ফিরেছিল, তখন একটা জিনিস দেখেই অনিলিখা খুব অবাক হয়েছিল। ওদের কোনও ভাষা নেই। লিখিত হরফও নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে শুধু নানান আকারে নানান অবস্থানের বৃত্ত এঁকে। ওরা কি তবে অ্যালিয়েনদেরই একদল? যারা লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে আছে, অথচ আমরা কেউ জানি না। ঠিক ওই গুহার অজানা পোকাটার মতো।

লক্ষ বছর আগে যখন ওরা পৃথিবীতে এসেছিল, হয়তো ওদেরই কয়েকজন রয়ে গিয়েছিল এ পৃথিবীর টানে। যুগের পরে যুগ কেটেছে। এসেছে প্রজন্মের পরে প্রজন্ম। কিন্তু ওদের ভাষা বদলায় নি। ওদের ভাষা আজও তাই বৃত্তের ভাষা। আর সে ভাষাই ওদের রক্ষা করে।

19 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, রাত ন'টা

—অনন্ত রঙ্গরাজন?—কার্ডটা স্ক্যান করে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট বলে উঠল।

—হ্যাঁ, আমার তিন রাতের জন্য বুকিং লাগবে। আপনাদের স্যুইট-এর রেট কত?

—পার নাইট চল্লিশ হাজার টাকা, ট্যাক্স ইনক্লুড করে।

—গুড। দোতলা হলে বেটার হয়।

রিসেপশনিস্ট একটু অবাক হল। সবাই ওপরের দিকের ফ্লোর পছন্দ করে। দেড়শো তলার হোটেলের আসল সৌন্দর্যই তো ওপরের ভিউ।

—ওকে স্যার। ইউ হ্যাভ নাউ অ্যাকসেস টু রুম নাম্বার 209। আপনার কার্ডে চার্জ করে দিয়েছি।

কাঁধের ওপর কালো কোটটা ফেলে অনন্ত দ্রুতপায়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। সামান্য ট্যারা, চোখে রিমলেস চশমা। পাতলা সরু গোঁফ। নাকের সামনের দিকটা থ্যাবড়া মতো। দোতলায় উঠে গটগট করে রুম নাম্বার 209-এর সামনে এসে দাঁড়াল। মানিব্যাগটা দরজার সেনসরে স্ক্যান করতেই দরজা খুলে গেল।

ঢুকেই ড্রয়িংরুম। সঙ্গে একটা বেডরুম, বাথরুম। পেশাদারী চোখে চারদিক দেখে নিয়ে জুতো পরেই খাটের ওপর শুয়ে পড়ল অনন্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি।

আবার পুলিশকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। ওর পরিচয় এখন ডি'সিলভা নয়। ও এখন অনন্ত রঙ্গরাজন। বয়স আটত্রিশ। শ্রীলঙ্কাবাসী ব্যবসায়ী। ক্লাস টু পর্যন্ত ওখানকার প্রাইভেট স্কুলে পড়াশুনো করেছে। তারপরে বাড়ি থেকে প্রাইভেটে পড়ে কমার্স গ্র্যাজুয়েট। সারা পৃথিবীর আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অনন্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা খোঁজ রাখে না যে সাঁইত্রিশ বছর আগেই অনন্ত প্রাণ হারিয়েছে 'এজমুল্লা' জঙ্গি সংগঠনের হাতে।

এ এক অভিনব উপায়। প্রথমে ক্লোন করে শিশু তৈরি করা। বাচ্চার ডিএনএ মার্কারের ওপর নির্ভর করে তার আইডেনটিটি কার্ড তৈরি করা। এই ডিএনএ মার্কার কখনওই দুজনের এক হতে পারে না। তাই এই মার্কারের ভিত্তিতে তাকে সরকারি রেকর্ডে নথিভুক্ত করা হয়। সরকার খুশি। সে ওই শিশুকে সারাজীবন আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারবে। কোনও দুষ্কর্ম করলেই পাকড়াতে পারবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি জানতে পারবে যে এই শিশুর কোনও দুরারোগ্য অসুখ আছে কি না। সেই অনুযায়ী সে ইনসিওরেন্স কভারেজ পাবে।

কিন্তু এসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও ফাঁক আছে। সরকার তো আর দ্যাখে না যে ওই শিশুটা বেঁচে আছে কি না। ডি'সিলভার মতো টেররিস্টরা এটাই কাজে লাগায়। শিশুটাকে মেরে ফেলে তার আইডেনটিটি চুরি করে নেয়। বাচ্চাটার আর কোনও আত্মীয় না থাকায় কেউ খোঁজও করে না। একইভাবে খুন করা হয়েছিল অনন্তকে—এক বছরের শিশুকে! কথাটা মনে পড়তে

পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ডি'সিলভার মুখে। ও অবশ্য নিজের হাতে মারেনি অনন্তকে। কারণ ওর বয়সও তখন ওরকমই ছিল।

তারপর থেকে মাঝেমধ্যে ও নিজেই অনন্ত হয়ে যায়। গভর্নমেন্ট জানে অনন্তও আছে, ডি'সিলভাও আছে। ডি'সিলভা টেররিস্ট আর অনন্ত মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী, নির্ভেজাল ভালোমানুষ।

ডি'সিলভা নিজেই এরকম অনেক শিশু খুন করেছে। তবে ও সেটা করে পরবর্তী প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য, যাতে তারাও এই লুকোচুরির খেলা চালাতে পারে। নাকের ওপরে হাত বোলায় ডি'সিলভা। এটাই একটা অসুবিধে। ডি'সিলভা আর ঋকের মতো অনন্তও ঋষির ক্লোন। তাই প্রায় একরকম। কিন্তু পুরোপুরি এক হলেও মুশকিল। তাই ওর নাকটা ছোটবেলা থেকেই মোটা রাখা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তাই নিজের পরিচয় অনন্ত দেওয়ার সময় ওকে এই মেকআপ-টা করে নিতে হয়। এখন অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেছে। মেকআপ কিট নিয়ে ঘুরতে হয় এই আর কী!

আরেকটা ছোট মেক আপ করতে হয়। বিশেষ ধরনের লেন্সের সাহায্যে চোখটা যাতে সামান্য ট্যারা দেখায় তার ব্যবস্থা করে নেয়। এজন্য ডি'সিলভার সঙ্গে চোখের মনি একদম এক হয়ে যায় না। কখনও-সখনও চোখের আইরিশ স্ক্যানও করা হয় লোক সনাক্ত করতে। তাই এই ব্যবস্থা। অনন্ত তাই আজও বেঁচে আছে।

অনন্তর নিজস্ব পরিচয় আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে, অন্য বন্ধু সার্কেল আছে। অনন্তর রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। হুঁ, ওই ভুলটা করে না ডি'সিলভা। অনন্ত হয়ে যাওয়ার পরে সব থেকে বড় মেকআপ হল ওর মার্জিত ব্যবহার। ক্রিমিনাল পোশাকটা সরিয়ে ফেলে ও তখন একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ব্যবসায়ী। ব্যাবসার লাভের অংক ছাড়া যে আর কিছু বোঝে না।

এই দীর্ঘদিনের ডবলরোলের কথা ভেবে হেসে উঠল অনন্ত। শুধু একটাই আক্ষেপ। ওর অভিনয় ক্ষমতার জন্য বেশ কয়েকটা অস্কার পাওয়া উচিত ছিল। সেটা আর পাবে না।

তবে একটা জিনিস এখনও মাথায় ঢুকছে না। ও শ্রীলঙ্কা থেকে দুদিন আগে সুন্দরবন হয়ে ঢুকেছিল। পরিষ্কার মনে আছে তার আগের কথা। ভারতে আসার পর প্রথম দিনের কথাও মনে আছে। ম্যানগ্রোভ জঙ্গল, ছোট-ছোট খাড়ি। বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় পৌঁছোনো। ও একটা ট্রেনেও উঠেছিল। বেশ ভিড় ছিল, অফিসের ভিড়। কিন্তু তারপরে? কমপ্লিট ব্ল্যাকআউট। সম্বিৎ যখন ফিরল তখন ও মধ্য কলকাতার একটা পার্কে। সামনে একজন মাটিতে পড়ে আছে। ও তাকে ভালো করেই চেনে। ঋক। প্রায় একবছর ধরে

ঋককে ও চেনে, যদিও ঋক ওকে চেনে না। কমপ্লিট ডেটা সলিউশনসের উচ্চপদস্থ অফিসার ঋক।

এই সংস্থা সারা এশিয়ার সব ব্যাঙ্কের তথ্য রাখার দায়িত্বে। এখন আসলে দেশের ভাগটা প্রায় মুছে এসেছে। একই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ সব দেশে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে লেনদেন বেড়েছে। দরকার হয়েছে একই নেটওয়ার্কে থাকার, তথ্য আদানপ্রদান করার।

সহজ সরল স্বভাব ঋকের। টেররিস্টদের সহজ টার্গেট। কিন্তু ঠিক কী কারণে ও ঋককে স্টাডি করছিল এই সোজাসাপটা কথাটা ওর মনে আসছিল না। তাড়াতাড়ি ও জায়গাটা ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঋকের কার্ড ওর কাছে এল কী করে? ঋকের আইডি কার্ড নিয়ে ওর লাভ কী? বিশেষ করে ঋককে যখন ও একেবারে মেরে ফেলেনি। নাহ, একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে হবে। হয়তো ঋককে শুধু অসুবিধেয় ফেলার জন্যই ও এটা করেছিল।

20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল আটটা

একশো বারো তলার এই ফ্ল্যাটটা থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। আশেপাশে আরও এরকম উঁচু অনেক বাড়ি আছে। দূরে বেশ কয়েকটা উঁচু ব্রিজের কাজ হচ্ছে। তবু আকাশের এত কাছে ভিড়টা একটু কম। নীচের রাস্তার লোকগুলোকে প্রায় দেখাই যায় না—এতটাই দূরত্ব। অবশ্য ঘরের ভেতরে যারা আছে, তাদের সঙ্গেও কি দূরত্ব কিছু কম? এখনও ছেলে-বউ-কে মাঝেমধ্যে কেমন যেন অচেনা লাগে ঋকের।

রোজকার অভ্যেস মতো সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে এসে বসেছে ঋক। পাশে ঋভুও আছে। ও আর মেলবোর্নে যায়নি। মনিও কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছে। আশা করা যায় কয়েকদিনের মধ্যেই এসব ঝামেলা মিটে যাবে। তখন ওরা ফিরে যাবে। নানান ঝামেলার মধ্যে এটাই একমাত্র ভালো দিক। বহুদিন বাদে ওরা সবাই একসঙ্গে। অন্য দিন শুধু একা ঋক আর রজনীশ থাকে। রজনীশ রোবট। একেবারেই গল্প করার মতো সঙ্গী নয়। শুধু চুপ করে সাহেবের কথা সবসময় শুনে যায়। খুব ভালো শ্রোতা। কোনও বিরক্তি নেই। কিন্তু কোনও প্রশ্নও করে না আগ বাড়িয়ে।

—কী, দুধ-চা, লেবু চা না ভিটামিন চা?

—দুধ-চা। বলে মনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ঋক। মনিও হেসে একটু লজ্জা পেয়ে কিচেনে ঢুকে গেল। প্রশ্নটা যে স্বাভাবিক নয় তা ওরা দুজনেই জানে। ঋক শুধু দুধ-চা-ই খায়। তাই মনি প্রশ্নটা করেছিল ঋকের সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য। সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক, সমাজটাই এখন এত জটিল হয়ে গেছে। কেউ কাউকে খুব ভালো করে চেনে না। চেনার মতো সময়ই পায় না।

ঋক ইচ্ছে করে মনিকে দেখিয়ে খবরের কাগজের শেষ পাতাটা দিয়ে পড়া শুরু করল। মনি জানে ঋকের কাগজ পড়ার অভ্যেসটা ভারি অদ্ভুত। মাঝের পাতা দিয়ে পড়া শুরু করে। মনি দেখে হেসে বলে ওঠে,—যাও আর মজা করতে হবে না, ঠিক করে পড়ো।

ঋকের পাশে বসে ঋভু একটা ছোট পামটপ দিয়ে খেলে যাচ্ছে। বাতাসে লেসার দিয়ে একটা কাক তৈরি হচ্ছে আর ও গুলি করে তাকে ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। এসব খেলা দেখলে ঋকেরও খেলতে ইচ্ছে করে। নেশা হওয়ার ভয়ে খেলে না ঋক।

ঋভুর চুলগুলো খুব ঘন। ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকে ঋক। অন্যদিন এ সুযোগ তো আসে না। ঋভুর চুলগুলো একজায়গায় জড়ো করে, আবার মুঠো আলগা করে দেয়। এ যেন অধিকার সত্ত্বেও অধিকার ছেঁড়ে দেওয়ার তৃপ্তি।

ঋভুকে এবার কাছাকাছি একটা স্কুলে ভরতি করে দেবে। অস্ট্রেলিয়া তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু ইমিগ্রেশান চেকিং, ও অন্যান্য নিয়মকানুনের প্যাচে পাঁচঘণ্টা লেগেই যায়। অফিসের পর আর যাওয়া হয় না। তার থেকে বাড়িতে রেখেই কাছাকাছি কোথাও পড়াবে। হোক না একটু খারাপ স্কুল। এই যে কাল রাত থেকে ঋভু ওর সঙ্গে-সঙ্গে আছে, মনে হচ্ছে আর কিছু না হলেও চলবে। বড় মিস করে ঋভুকে।

—মনি, তোমার সঙ্গে ঋভুর ভাব হয়েছে তো? ঋভু, তোমার মার সঙ্গে কথা বলো।

মনি কাছে এসে বলে উঠল,—ঋভু সাহেবের তো সময়ই নেই। খেলা নিয়েই ব্যস্ত। তারপরে একটু থেমে ঋভুকে বলে উঠল,—ঋভু, চলো তোমার সঙ্গে লুডো খেলব।

—সেটা আবার কী?

—দেখবে, অনেক অনেক আগে লোকেরা লুডো খেলত। আমি সেদিন মিউজিয়ামে লুডো দেখে স্পেশালি অর্ডার দিয়ে তৈরি করেছি। তোমার জন্মদিনের জন্য। দাঁড়াও আনছি।

—তুমি পারো বটে মনি। কোথাকার আদ্যিকালের খেলা। তবে আমিও খেলব। বাবার মুখে শুনেছি ওরা ছোটবেলাতে খেলত। ছোটবেলাতে আমিও খেলেছি হয়তো। কে জানে! ছোটবেলার অনেক কিছুই আমার মনে পড়ে না।

ঋভু শেষ কাকটাকে গুলিতে উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল,—আন্টি রেডি হলে বোলো।

—আন্টি নয়, মা। মা বলবে। বলে ঋভুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঋক। ছেলেটার জন্য ভারি কষ্ট হয় ঋকের। নিজের মাকে বড়জোর দুমাস কাছে পেয়েছিল ঋভু। সারিতা বাচ্চার বায়না-ঝক্কি সহ্য করতে পারত না বলে ওকে খুব ছোটবেলাতেই সিঙ্গাপুরে চাইল্ড কেয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋভু তাই রোবটদের সঙ্গ যতটা পেয়েছে, মা-বাবাকে ততটা কাছে পায়নি। এসব দিক থেকে ও নিজে অনেক লাকি। যখন ওর বয়স চার, মা কোথায় যেন চলে গেল। আজও

জানে না ঋক। এখনও মনে পড়ে কাক-পাখি দেখিয়ে মা ঘুরে-ঘুরে খাওয়াত। বলত,—কে খাবে—পাখি না সোনা? আয় আয় পাখি। ওমা! কে খেয়ে নিল! ভারি দুষ্টু তো পাখিটা।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক কিছুই তো ফিকে হয়ে গেছে। মার ছবিটাও যেন এখন অন্যরকম লাগে। ছোটবেলার প্রায় কিছুই মনে পড়ে না ওর। ওর মেমারি খুব কম ছিল বলে অনেক চিকিৎসাও হয়েছে। যেটুকু মনে পড়ে, সময় পেলে সে কথাই ভাবে ঋক। আর যেন কিছু না হারিয়ে যায়।

শুধু সেদিনকার কথাটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ঘুমোচ্ছিল ঋক। রোজকার মতো অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর উঠে বসেছিল খাটে। ঘুমে প্রায় বুজে থাকা চোখের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর আভাস ধরা দিচ্ছিল। অন্যদিনের মতো মা পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছে। মাকে যেন সেদিন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। অফিসের পোশাক পরা। গায়ে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ।

—উঠে পড়ো সোনা। আমার অফিস যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সেই কখন থেকে ডাকছি।

মাকে জড়িয়ে ধরে ও বলেছিল—না, আজ তুমি যেও না। প্লিজ। আমার তো আজ স্কুল ছুটি। তুমি সার্কাসে নিয়ে যাবে বলেছিলে!

—না সোনা, আজকে না। আজকে আমার খুব দরকারি কাজ আছে। আমি আজ চটপট করে কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি চলে আসব। তারপর তোমাকে একটা সুন্দর গল্প বলে দেব।

—ঠিক তো? কালকে কিন্তু তুমি কথা দিয়ে কথা রাখোনি।

—ঠিক, ঠিক ঠিক। কালকে সূর্য ওঠার আগে তোমাকে একটা গল্প বলবই। বাঘ-শেয়ালের গল্প।—মা হাসতে-হাসতে বলেছিল।

ভারি খুশি হয়ে মাকে চুমু দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল ঋক।

মা কিন্তু কথা রাখেনি। কথা রাখতে পারেনি। পরের দিন সদ্য ফোটা ভোরের আলোয় ফুল দিয়ে সাজানো কাপড়ে মোড়া দেহটাকে দেখিয়ে কাজের মাসি কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল—তোমার মা আর নেই।

ঋক তাই জানে সবসময় কথা রাখা যায় না। সময় প্রতিমুহূর্তে রং বদলায়। আর সেই বদলানো সময়ের চেহারা কি হবে তা ভেবে বর্তমানকে অবহেলা করা চলে না।

ঋভুকে আবার জড়িয়ে ধরে বেশ খানিকক্ষণ আদর করে ঋক। বলে ওঠে—গল্প শুনবে সোনা? বাঘ-শেয়ালের?

—শেয়াল—সে আবার কি?

20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল দশটা

—আমি ইউরোপিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো থেকে জন বলছি।

ভিডিয়োফোনে জনের ছবি ফুটে উঠল। জনের আইডি কার্ড ভ্যালিডেট করে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিল ভিডিয়োফোন। আইজি ইউরোপিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো।

—বলুন। আমি মিঃ দাস। ডিরেক্টর জেনারেল এশিয়া আই-বি।

—মর্নিং, আমি ডি'সিলভার ব্যাপারে ফোন করেছিলাম। ও তো এখনও ইন্ডিয়াতেই আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, আমাদের খবর অনুসারে ইন্ডিয়াতেই আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনও আইডি কার্ড নেই বলে ট্র্যাক করা যাচ্ছে না। ও যার আইডি কার্ড চুরি করে পালিয়েছিল, সে লোকটাকে ভারতের ইস্টার্ন জোনের একটা পুলিশ স্টেশনে ধরে আনা হয়েছিল। তাকেও ট্র্যাক করা হচ্ছে। তার নাম ঋক, কমপ্লিট ডেটা সলিউশনসের একজন বড় অফিসার।

—সেসব ইনফরমেশন আমরাও পেয়েছি, তা আপনারা ঋকের হারানো আইডি ট্র্যাক করছেন নিশ্চয়ই।

—করছিলাম। কাল ওই আইডিটা কলকাতার এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এক জায়গায় পেয়েছি। ডি'সিলভা খুব সম্ভবত ওটা ফেলে কাছাকাছি কোনও ছোট শহরে পালিয়ে গেছে। তবে কার্ড না থাকলে শহর থেকে বেরোবেই বা কী করে? তা ছাড়া ওর মতো দেখতে কাউকে দেখলেই ধরা হচ্ছে। কার্ড ছাড়া তো ও না পারবে কোথাও যেতে, না পারবে বাস-ট্রেন-প্লেনে উঠতে!

—দেখুন, ডি'সিলভার মতো দেখতে যে ক'জন ক্লোন এশিয়াতে আছে সবাইকে ট্র্যাক করুন। লোকটা সাংঘাতিক ইনটেলিজেন্ট। কথার উচ্চারণ, ভয়েস এসব এমন তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে পারে যে ভয়েস রেকগনিশন যন্ত্র দিয়েও ধরা যায় না। যাকে ইচ্ছে নকল করতে পারে। তবে চোখের মনির একটা ছবি ধরা পড়ে গিয়েছিল, যখন ও ইউরোপের শেয়ার মার্কেট ধসিয়ে দিয়েছিল।

—কিন্তু সে তো অন্য লোক। বিল রুপেল। সে তো মারাত্মক ঘটনা। শেয়ার মার্কেটের নেটওয়ার্কে ঢুকে কয়েকঘণ্টা কোনওরকম শেয়ার কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল। কেউ কিনছে না দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিক্রি করতে শুরু করে দিয়েছিল। মার্কেট আধঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

—বিল রুপেল আর ডি'সিলভা একই লোক। একে আমরা, আমেরিকান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো—সবাই খুঁজছি। কুখ্যাত টেররিস্ট। ধরতে পারলে আপনি একেবারে ফেমাস হয়ে যাবেন। লোকে বলবে, সারা বিশ্ব যা করতে পারেনি, এশিয়া তা করে দেখাল।

একটু থেমে জন ফের বলে ওঠে,—লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে চারমাস আগে একঘণ্টার মধ্যে যে বারোটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাতেও এরই হাত। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের নেটওয়ার্কে ঢুকে বিভিন্ন বিমানে ভুল সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে বিমানের হয়তো কুড়িহাজার ফুট ওপরে থাকার কথা, তাকে ইচ্ছে করে দশ হাজারে নামিয়ে দিয়েছিল। জাস্ট এক ঘণ্টার মধ্যে বারোটা বিমান অ্যাক্সিডেন্ট! ভাবতে পারেন?

—ও তাতেও এর হাত ছিল বলছেন?

—বলছি মানে? একদম নিশ্চিত। খুব ডেঞ্জারাস লোক। আমরা ওর নাড়ি-নক্ষত্র জেনেও কিছু করতে পারছি না। মিডল ইস্টের বড় একটা অংশের সাপোর্ট পায়। আমি আপনাকে ওর সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস বলে রাখি। প্রথমত ও কলকাতাতেই থাকবে। কারণ যা-ই করতে আসুক না কেন, তা বড় শহরে নিশ্চয়ই সহজে করা সম্ভব। দু-নম্বর লোকটা নিজে ইঞ্জিনিয়ার। টেকনোলোজি খুব ভালো বোঝে। ফোন ব্যবহার করে না। আরেকটা কথা, যতবার ওকে কোনও দুষ্কর্ম করতে দেখা গেছে সবসময়ই দেখা গেছে ওর মতোই দেখতে একটা লোক সেসময় ওই শহরেই ছিল। ইনসিডেন্টালি এবারও ওই লোকটা কলকাতাতেই আছে। নাম অনন্ত। আমি ওর কার্ড ডিটেলস পাঠিয়ে দেব। ওকে ট্র্যাক করুন।

—অনেক ধন্যবাদ। এখনই ট্র্যাকিং শুরু করছি।

—আরেকটা জিনিস। ঋককে কিন্তু ছাড়বেন না, যতক্ষণ না ডি'সিলভা ধরা পড়ছে। আপনি তো ওর আইডি কার্ড পেয়ে গেছেন বললেন। নিশ্চয়ই ঋকের রক্ত নিয়ে তুলনা করতে দিয়েছেন যে ওটা ওরই কার্ড কি না! মিলে গেলেই নিশ্চিন্ত হবেন যে ওই ঋক।

—হ্যাঁ, সে তো করছিই। তবে আরও কয়েকঘণ্টা লাগবে।

—ওকে, বাই ফর নাউ। কী হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাদের জানাবেন প্লিজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সার্টেনলি। বলে ফোনটা কেটে দিলেন মি দাস। একটু বিরক্তির সুরে পাশে বসা আরেক অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—শুধু জ্ঞান দেওয়া, তোরা যখন পারিসনি তখন আমাদের ওপরই ছেড়ে দে! একটু থেমে ফের বললেন,—কোনও ইনফরমেশন শেয়ার করবে না। ওরা ক্রেডিট নিয়ে নেবে।

20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল দশটা

ভোরের আলো পরদার সামান্য ফাঁক দিয়ে এসে বিছানার ওপর চিত হয়ে পড়েছে। একটু এপাশ ওপাশ করে খাটের ওপর উঠে বসল ডি'সিলভা। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। বেড সাইড টেবিলে লাগানো ডিজিটাল মেনুকার্ডে চা আর টোস্ট সিলেক্ট করে আবার শুয়ে পড়ল। একটু ভাবা দরকার। এবারের মিশনটা কী? ভারতে কী জন্য আসা? ইউরেনিয়াম জোগাড়

করা, না কী কোনও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানো? প্লেন ক্র্যাশ? শপিং মলে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া?—ঠিক যেমন গতবছর মেক্সিকোতে করেছিল। সব থেকে বড় শপিংমলের এসি ডাক্টের মধ্যে বিষাক্ত সারিন গ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। বহু লোক মারা গিয়েছিল। বোঝার আগেই আবদ্ধ বাতাসে প্রাণ হারিয়েছিল অনেকে। বাচ্চা-জোয়ান-বুড়ো কেউ বাদ যায়নি।

কোনওদিন কোনও কাজে ব্যর্থ হয়নি ডি'সিলভা। কিন্তু এবার যেন কী হয়েছে! শুধু মনে হচ্ছে এবার যেন আরও বড় কিছু একটা করার কথা ভাবা হয়েছিল। যদি ঠিকভাবে করা যায় তা হলে পুরো মানব সভ্যতার ভিত নড়িয়ে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞান-শিক্ষা-উন্নয়নের নোংরা পোশাক খুলে পরিয়ে দেওয়া যাবে ধর্মের বিধি নিষেধ। ফের ফিরে আসবে মধ্যযুগীয় আইনকানুন। সেটাই তো চাই। উন্নয়নের বাঁদর নাচ নেচে কার কি লাভ হয়েছে?

ঠিক এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। দরজা না খুলে সুইচ টিপে বাইরের ট্রে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ও। চট করে বাথরুম সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে টেবিলে এসে বসল ডি'সিলভা। ব্যাগটা একটু ঘেঁটে দেখা দরকার। যদি কোনও ক্লু থাকে! ছোট ব্যাগ কোটের মধ্যে লুকোনো থাকে। কিন্তু ব্যাগ ঘেঁটে-ঘুটে কিছুই পেল না ও।

ফোন করবে? ওদের অর্গানাইজেশন-এর প্রধান ইসমাইলকে? ও তো জানবেই। না, এতটা রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। হোটেলের ফোন ট্র্যাপ করা থাকতে পারে। ফোন ট্র্যাপ করা না থাকলেও আজকাল জানলার কাচের ওপর লেসার ফেলে কম্পন দেখে ঘরের ভেতরে কী কথা হচ্ছে তা বের করা যায়। তার থেকে একবার বাইরে ঘুরে আসা যাক। ঠিক বোঝা যাবে ওর ওপর কেউ লক্ষ্য রাখছে কি না।

যেই ভাবা সেই কাজ। রুমেই আছে দু-মিনিটে কাচা, শুকনো, ইস্তিরি—সবকিছু একসঙ্গে করার যন্ত্র। চট করে টিশার্টটা ওতে ঢুকিয়ে ইস্তিরি করে গায়ে গলিয়ে নিল। আরেকটা কিনতে হবে। এটা পরেই ঘুরছে সমানে।

হাতের গ্লাভসটা ঠিকমতো আছে কি না দেখে নিল। এই দস্তানাটা কিছুতেই বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অথচ এর জন্যই সব আঙুলের ছাপ অনন্তর মতো আসে। ডি'সিলভার মতো নয়। বলা যায় না! আইডি কার্ডের বাইরেও তো আইডেনটিফাই করার জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকতে পারে। পরে হয়তো ঘরের সব আঙুলের ছাপই মিলিয়ে দেখা হল যে তা ডি'সিলভার সঙ্গে মিলছে কি না। তখনই ও ধরা পড়ে যাবে।

হোটেলের ঘরের দরজা খোলা রেখেই ও করিডরে পা বাড়াল। যাতে কারো সন্দেহ না হয় তাই হাঁটাচলার মধ্যে একটা বেশ কেয়ার ফ্রি ভাব। এদিক-ওদিক দু-একটা মুচকি হাসি—অলস চাউনি—মনে হয় যেন ছুটি কাটাতে এসেছে। হোটেলের উলটো দিকেই একটা শপিং

মল। রাস্তা পার হয়ে শপিং মলে গিয়ে ঢুকল। ঢোকার জায়গাতেই আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে। যে-ই ঢুকছে তার দু-হাতের সবক'টা আঙুলের ছাপ তার আইডির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এই বাড়াবাড়ি সতর্কতা যে ওরই জন্য তা ভালোই জানে ও। ঢোকার সময় হঠাৎ করে মেঝেতে পিছলে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম অভিনয় করল। এভাবে, সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে স্ক্যানারে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে দিল। 'ভ্যালিড ম্যাচ'। অনন্তর আইডির সঙ্গে। সিকিওরিটি মলে অভ্যর্থনা করল। অবশ্য খুব সজাগ থাকলেও যে, হাতে পরা দস্তানাটা খেয়াল করত না এ বিষয়ে ও নিশ্চিত। তবু যতটা সাবধান হওয়া যায়।

অনন্তর রেকর্ড খুব ভালো। কখনও কোনও গণ্ডগোলে পড়েনি অনন্ত। কখনও বেআইনি কিছু করেনি। এ সবই রেকর্ডেড থাকে আইডি কার্ডে। বাজে ব্যবহার করলে, কাউকে গালাগাল দিলে, কোনও নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙলে সঙ্গে-সঙ্গে তা রেকর্ড খারাপ করে দেয়। এভাবে একজনের রেটিং সমানে পরিবর্তিত হয়। বাড়ে-কমে। যার রেটিং যত ভালো সে তত বেশি আদর-যত্ন-খাতির পায়। অনন্ত যে-কোনও দোকানে স্পেশাল লাইনে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। সেখানে ভিড় কম—সাহায্য করে সুন্দরী রোবটরা। এ ছাড়া অনেক হাই সিকিউরিটি জোনেও সহজে যেতে পারে। সহজে খেলার ম্যাচের টিকিট পায়। রেকর্ড অনুযায়ী ভালো হওয়ার অনেক লাভ।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরতে থাকে ডি'সিলভা। শুধু একটা সূত্র পেলেই ও সেরকমভাবে কাজ শুরু করতে পারে। হলের মধ্যে 'ভিকটি ফর আস' ব্র্যান্ডের কিছু প্রমোশন হচ্ছে। বেশ কিছু মডেল ওই ব্র্যান্ডের পোশাক পরে মলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেদের জামাকাপড়ের নামকরা ব্র্যান্ড। কমবয়সিদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ডি'সিলভাও এদেরই শার্ট-গেঞ্জি অনেকসময় পরে। এখনও ওই ব্র্যান্ডেরই টি-শার্ট পরে আছে। হঠাৎ সামনের কাচের লিফটে নিজেকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো ও। ওর টি-শার্টও একই ব্রান্ডের। টি শার্টে কোম্পানির লোগো 'VICTORY FOR US"। কিন্তু কিছু-কিছু অক্ষর অন্যগুলোর তুলনায় অস্পষ্ট। অস্পষ্ট অক্ষরগুলো হল 'V', 'I', 'R', 'U', 'S'—ভাইরাস?

তবে কি? পুরো ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ডেঞ্জারাস ভাইরাস আছে। ও এই ভাইরাসের ক্যারিয়ার। অর্থাৎ ওর কাছাকাছি কেউ এলেই ওই ভাইরাসে সংক্রামিত হবে। অথচ ওরকিছু হবে না। আর সেটাই ওর মিশন। এখন ওর কাজ যতসম্ভব জনবহুল জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ানো—যাতে এই দুরারোগ্য অসুখ ছড়িয়ে পড়ে। আর তার ওষুধ বেরোনোর আগেই লক্ষ-লক্ষ লোক মারা যায়। ভয়ে লোকে রাস্তাঘাটে

না বেরোয়। ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে ওঠে। সভ্যতা থমকে দাঁড়ায়। একটা ওষুধ বের করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। ততক্ষণে উঠোন ফাঁকা।

ওকে নিজে থেকে কিছুই করতে হবে না। এজন্যই নিশ্চয়ই কোনওভাবে এই পরিকল্পনার কথা ওকে জানানো হয়নি—বা জানানো হলেও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীসের ভাইরাস? দুটো জিনিস নিশ্চিত। এক, ভাইরাসটা নিশ্চয়ই খুব সহজে ছড়িয়ে যায়। দুই, এমন ভাবে একে তৈরি করা হয়েছে যাতে চট করে তার কোনও ওষুধ না বেরোয়। তবে ওকে নিশ্চয়ই এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তাই ওর এখনও কোনও অসুখ হয়নি। অসুখটা কী জানতে পারলে আরেকটু আনন্দ হত।

সামনে দিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের একটা দল হেঁটে যাচ্ছিল, সঙ্গে টিচার আছে। মলের উপরদিকে একটা চিড়িয়াখানা আছে। সেখানেই হয়তো স্কুল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভালো কাজ ওদেরকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। মৃদু হেসে ওই গ্রুপটার দিকে হেঁটে গেল ডি'সিলভা। বলে উঠল,—বয়েজ, হুইচ স্কুল আর ইউ ফ্রম?

20 অক্টোবর, শুক্রবার, রাত আটটা

—ডি'সিলভা ঠিক কি চায় বলো তো? কোনও কাজ নেই—শুধু কীভাবে কোথায় গণ্ডগোল পাকানো যায়! লোককে মেরে যে ওরা কি আনন্দ পায়! চা-এ চুমুক দিতে-দিতে ঋক বলে ওঠে।

—তোমার তো ডি'সিলভাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। বহুদিন বাদে বাড়িতে বসে নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে পারছ। আমি এসেছি, ঋভু এসেছে। তাছাড়া সারা শহর তোমাকে এখন চেনে। তুমি তো রীতিমতো সেলিব্রিটি!

—হ্যাঁ, যা বলেছ! আজ অনেকগুলো টিভি চ্যানেল থেকে ফোন করেছিল। কিছু বলা বারণ বলে ফোন কেটে দিয়েছি। তা ডি'সিলভা তো আবার তোমার দেশের লোক। শ্রীলঙ্কার। দ্যাখো তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে কি না!

—ছাড়ো তো ইয়ার্কি! তবে হ্যাঁ, একদিনের জন্য এরকম বিশ্রাম আমারও ভালো লাগছে। একটু থেকে মনি বলে ওঠে,—'ও তোমাকে বলা হয়নি। আমি যে ওষুধটার কথা তোমাকে বলতাম—ওটা শেষ পর্যন্ত সব টেস্ট পাস করেছে। নানান ধরনের লোকের ওপর ওষুধটা প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোনও সাইড এফেক্ট নেই। চারটে অসুস্থ বাচ্চার ওপর পরীক্ষা চলছিল। তারাও একেবারে সেরে উঠেছে।

কীসের ওষুধ? প্রোজেরিয়ার?

হ্যাঁ, প্রোজেরিয়ার। ভারি কষ্ট হয় বাচ্চাগুলোকে দেখলে। এইটুকু বাচ্চা—কোথায় জীবনটা হেসে-খেলে-মজায় কাটাবে, তা না, রোজ মৃত্যুর দিন গুনছে। কত নিঃসঙ্গ ওরা। পরিবারের কেউ খোঁজও রাখে না।

একটু থেমে ছলছল চোখে মনিদীপা বলে ওঠে—সবার যদি এ অসুখ হত, তাহলেই বোধহয় ভালো হত। এদেরকে আমরা এরকম ঘৃণার চোখে দেখতাম না। আলাদা করে দিতাম না। জীবন বলতে তো ওদের প্রাপ্তি মোট দশ-বারো বছর। তাও সেটা যদি স্বাভাবিক হত।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে মিসেস প্রোজেরিয়া। দয়া করে আজ আর অসুখের কথা নয়। তা তুমি পাকাপাকি কলকাতায় আসছ কবে?

—আসতে চাইলেই কি আর আসা যায়! তাছাড়া এ প্রোজেক্টটা শেষ না হলে আমি নিজেই আসতে চাই না। তাও তো সপ্তাহে একদিন ইচ্ছে করলে আসা যায়। ভাবো তো, যারা মঙ্গলে কাজ করে! বছরে একবার আসতে পারে কি না সন্দেহ!

ঘরের এককোণে ঝন করে আওয়াজ হল। কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ। ঋভুর হাত থেকে দুধের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেছে।

রজনীশ হতভম্ব হয়ে ছুটে গিয়ে চোখ গোল করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছে এ ঘটনাটা একেবারেই নতুন। কখনও এঘরে কিছু ভাঙেনি। আসল কোনও কিছু ভাঙার মতো লোকই নেই।

ঋক উঠে গিয়ে আস্তে করে ঋভুকে সরিয়ে নিয়ে এল। ওর বেশ ভালোই লাগল। জিনিসপত্র না ভাঙলে কি আর বাড়িতে বাচ্চা আছে বলে মনে হয়!

ঠিক এসময় মনিদীপার ফোনটা বেজে উঠল।

—হোয়াট! বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না? কেন? আগে তো বলেছিলেন যে অফিস আর কোনও হাই সিকিওরিটি জোন ছাড়া অন্য জায়গায় যাওয়া যাবে। কাগজ পত্রও তো সই করে দিলাম।

উলটোদিকে কে কথা বলছে না শুনতে পেলেও ঋক বুঝতে পারল যে এটা থানা থেকে ওর জন্যই ফোন। এখন তাহলে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ। পুরোপুরি গৃহবন্দি। মনির গলার পারা আরও উঠছে—দেখুন, টেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যায়নি বলে তো আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন না। আমিও বলে রাখছি। আমার নাম মনিদীপা বোস। কালকেও যদি ওকে ঘরে আটকে থাকতে হয় তো আমি হিউম্যান রাইটসে যাব। দেখি আপনি কি করেন! আপনাকে না থানায় আটকে থাকতে হয়!

21 অক্টোবর, দুপুর একটা

তদন্তের রিপোর্টটা ড. রায়বর্ধন ব্রায়ানের দিকে এগিয়ে দিলেন।

—আমি শিওর ঘটনাস্থলে আরও একজন ছিলো। ঋক, ডি'সিলভা ছাড়াও অন্য কেউ। আরেকজনের পায়ের ছাপ, ডিএনএ পাওয়া গেছে।

—তা এরকম একটা পাবলিক পার্ক বেছে নেওয়া হল কেন বুঝতে পেরেছেন?

—এটা অফিসপাড়ায়। অফিসের দিন দুপুরবেলা কেউ এখানে যায় না। তা ছাড়া কিছু একটা কারণে পার্কের চারদিকে ছড়িয়ে রাখা ক্যামেরাগুলোও কাজ করেনি। মনে হয় আগে থেকেই কেউ ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যেন ওই জায়গার ক্যামেরাগুলো কাজ না করে।

—অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঋকের আইডি সরানো হয়েছে বলছেন?

—হ্যাঁ, আরেকটা খটকা আছে। এটা সরাতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। সেখানে ওরা কিন্তু কুড়ি মিনিট মতো ছিল।

—আশ্চর্য।

—আর তা ছাড়া ডি'সিলভার পাস্ট অপারেশনগুলো লক্ষ করুন। কোনওটাই ও খুব সহজ সরল ভাবে করে না। আর এখানে দুয়ে-দুয়ে চার যেন বড় সহজেই মিলে যাচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কিছু মিস করছি না তো?

—ঠিক বলেছেন। আচ্ছা ঋকের ডিএনএ টেস্টিং রেজাল্ট পেয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল পেয়েছি। তবে ওর আগের আইডি কার্ডের সঙ্গে ম্যাচ করা মুশকিল হয়ে গেছে।

—কেন?

—ডি'সিলভা ওটা ফেলে দেওয়ার আগে ড্যামেজ করেছিল। কার্ডের অন্যান্য রেকর্ডগুলো ঠিক আছে। কিন্তু জেনেটিক মার্কারের সংক্রান্ত রেকর্ডগুলো পুরো পড়া যাচ্ছে না। তবে যেটুকু দেখেছি, ম্যাচ করছে ঋকের রক্তের মার্কারের সঙ্গে। ডঃ রায়বর্ধন বলে ওঠেন।

—দেখবেন এ কথাটা ছড়িয়ে না যায়। এমনিতেই ওকে ছাড়ানোর জন্য নানান লেভেল থেকে প্রেশার আসছে। লোকটা বেশ বড়সড়ো অফিসার। ওদের আঞ্চলিক অধিকর্তা। অফিসের নানান ধরনের কাজ নাকি ওর অবর্তমানে আটকে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে দিইনি। লোকটার স্ত্রী—তারও ভালো কানেকশন আছে। সে-ও দু-বেলা ফোন করছে। খুব জাঁদরেল মহিলা। কথায়-কথায় আমাকে হিউম্যান রাইটস দেখায়।

—তা আপনি ওকে পুরোপুরি ছাড়ার কথা কবে ভাবছেন?

—আগে ডি'সিলভা ধরা পড়ুক, তবেই ওকে ছাড়া। ভালোই তো আছে। আমি তো এরকম অবস্থায় পড়লে খুশিই হতাম। বাড়িতে ছেলে-বউয়ের সঙ্গে বসে যত ইচ্ছে আড্ডা মারো, যা

ইচ্ছে খাও। টোটাল রেস্ট। নো টেনশন। কতবছর হয়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অফিসার ব্রায়ান।

চার বছর হল ওনার একমাত্র ছেলেকে দ্যাখেননি। পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল। স্পেস সায়েন্সে মাস্টার্স করার পর মঙ্গলে চলে গেল। ওখানে কৃত্রিমভাবে মানবকলোনি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। বিশাল-বিশাল গ্রিন হাউসের মধ্যে পৃথিবীর মতো জলবায়ু তৈরি করার কাজ হচ্ছে। ওকে শেষবার ফোন করেছিলেন একমাস আগে। জিগ্যেস করেছিলেন কবে ফিরতে পারবে। উত্তর পেয়েছিলেন আরও নাকি দশ-বারো বছর লেগে যাবে। আসলে ও আর ফিরবে না। বাবা-মার প্রতি ওর কোনও আকর্ষণই নেই। হবে-ই বা কেন? ছোটবেলা থেকেই অন্য মহাদেশে পড়াশুনো করেছে। বাবা-মায়ের সঙ্গ তেমন কোনও সময়ই পায়নি।

এসব কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন ব্রায়ান। স্ক্রিনে ইনস্পেক্টর ডি'সুজার ছবি ফুটে উঠল।

—স্যার, আমরা অনন্তকে সমানে ট্র্যাক করছি। কিন্তু হাতের ছাপ বা চোখের মণির ছবি কোনটাই ডি'সিলভার সঙ্গে মেলেনি।

—তা সেক্ষেত্রে আর ট্র্যাক করে লাভ কী? অন্য যাদের এরকম দেখতে তাদের উপর ফোকাস করো। দেখো তাদের মধ্যে কারও ডি'সিলভার চোখের মণির সঙ্গে মেলে কি না।

—সেটাও আমরা করেছি স্যার। তবে সবক্ষেত্রেই রেজাল্ট আপাতত নেগেটিভ। মেলেনি।

—টেস্টে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো?

—না, না, ভুল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কাছাকাছি হলেও আমরা ধরতাম। কোনওরকম চেষ্টাই বাদ রাখিনি আমরা। সবক'টা মলে, রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পোর্টে আইডি কার্ডের বাইরেও হাতের ছাপ নেওয়া আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় এর জন্য অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। লোকেরা বারবার করে হাতের ছাপ দিতে-দিতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে সময় অনেক বেশি লাগছে। জাস্ট কয়েকদিনের জন্য বলে কোনওরকমে সামলাচ্ছি। সব জায়গায় কৃত্রিম মাছি ছড়িয়ে দিয়েছি। ডি'সিলভার মতো লোক দেখলেই ক্যামেরার সাহায্যে চোখের মণির ছবি সুযোগ মতো তুলে আমাদের ডেটাবেসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা মিলিয়ে দেখছি। পুরো পুলিশ ফোর্স এসব করতে গিয়ে আর বাকি কাজের সময় পাচ্ছে না।

—তা এর থেকে বড় কাজ আর কী? এত বড় জলজ্যান্ত টেররিস্ট চোখের সামনে ঘুরছে। ওপরওয়ালা তো বলেই দিয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যে ধরতে না পারলে আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবে। বুড়ো বয়সে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে গিয়ে মরি আর কী!

—স্যার, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অনন্তর ব্যাপারে। অন্য কিছু না মিললেও ইউরোপ থেকে আপনি যা-যা পয়েন্টার পেয়েছিলেন তার বেশ কিছু মিলে গেছে।

—ইন্টারেস্টিং, কীরকম?

—লোকটা একই জামা-প্যান্ট সমানে পরে। নানান দোকানের সামনে দিয়ে জোরে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ করে কোনও একটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ওই দোকানে ঢোকার আগে নাকে একবার হাত বুলিয়ে নেয়। যেন কিছু একটা ভেবে নেয়। তারপর ঢোকে।

—এক্সসেলেন্ট। আর?

—মাঝে-মাঝে নীচু হয়ে মোজাটা ফের টানটান করে পরে। ঠিক যেমন ওরা বলেছিল। তবে সব যে মিলছে তাও নয়। যেমন বলা হয়েছিল ডি'সিলভা নাকি মুখচোরা—কারুর সঙ্গে সেধে কথা বলে না। এখানে দেখি উলটো। অনন্ত সবার সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। ডেকে-ডেকে আলাপ করে। বাচ্চাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। যেখানেই যায় বন্ধু জোগাড় করে ফেলে। আমার সঙ্গেও আলাপ করতে এসেছিল। জিগ্যেস করছিল কী করি ইত্যাদি। কীরকম টাকাকড়ি পাই।

—আর তুমিও গদগদ হয়ে বলে ফেলেছ যে তুমি পুলিশের লোক। ডি'সিলভাকে খুঁজছ। তাই তো?

—না বলিনি। ও-ই বলল, ডি'সিলভা কি আর এতদিন কলকাতাতে পড়ে থাকবে। কী করে জানল কে জানে?

—ডি'সিলভা বলেছে? তুমি শিওর?

—হ্যাঁ, হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

—আর সেটা এত কথার পরে বলছ? ইমিডিয়েটলি গেট হিম ডেড অর অ্যালাইভ। হি ইজ ডি'সিলভা। আমরা খবরে কী দেখাচ্ছি—দ্যাখোনি? একজন বড় ক্রিমিনাল ডি'সিনহা বাংলাদেশ থেকে কলকাতাতে ঢুকেছে। ডি'সিলভা নামটা তো আর আমাদের বাইরে কারুর জানার কথা নয়। কোথাও এ নাম দেখানো হয়নি। উত্তেজিত হয়ে ব্রায়ান বলে উঠল,—দাঁড়াও তুমি একা যেও না। তোমার সঙ্গে কয়েকজন মানুষ পুলিশও যেন যায়। আর এক্ষুনি। সমানে ট্র্যাকিং চালু রাখো। তোমাদের বাইরে আর কেউ যেন না জানে।

—ও.কে. স্যার—বলে ডি'সুজা ফোন কেটে দিল।

রোবট পুলিশদের নিয়ে এই এক মুশকিল। যেটা করে একদম ঠিকঠাক করে। চেষ্টার কোনও ফাঁক রাখে না। দিনরাত এক করে কাজ করে। কিন্তু অনেকসময় খুব সহজ কথা

বুঝতে ভুল করে ফেলে। কিন্তু এতবড় ভুল করার লোক তো ডি'সিলভা নয়। ও কেন একথা বলল? তা হলে কি ও খবর দেখছে না? না কি ও ডি'সিলভা নয়?

21 অক্টোবর, বিকেল চারটে

রবীন্দ্র মল। কলকাতার সবচেয়ে বড় শপিং মল। মলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মুভিং ফ্লোর। প্রায় পাঁচমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কুড়িতলা মলটা প্রায় 200টা জোনে ভাগ করা আছে। প্রত্যেকটা জোনে কয়েকটা করে সুইচিং রুম আছে। ওই রুমগুলোর মধ্যে ঢুকে প্রয়োজনমতো যেখানে যাওয়ার দরকার সেই জোন সিলেক্ট করলেই হল। ওই রুম ঝড়ের বেগে ছুটে চলবে, প্রয়োজনমতো ওপর-নীচে ওঠানামা করবে, যতক্ষণে না ওই নির্ধারিত জোনে পৌঁছোয়। পৃথিবীতে কয়েকটা মাত্র মল আছে যেখানে এই সুবিধে আছে। তাই মলে কেনার লোকের থেকে সুইচিং রুমে ঢুকে ঘোরার লোক বেশি, ভিড়ও হয় সেরকম। এই মলটা তাই ভাইরাস ছড়ানোর আদর্শ জায়গা।

ঘুরতে-ঘুরতে চারদিকে এত লোক দেখে আনন্দে মনটা ভরে গেল ডি'সিলভার। সবরকম বয়সের নানান দেশের লোক। এরা জানবেও না যে এরা সাংঘাতিক এক অসুখে আক্রান্ত হতে চলেছে। যার একটাই পরিণতি—মৃত্যু। খোলা হাওয়াতে তাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খানিকটা কম—কিন্তু মলের বদ্ধ বাতাসে বাঁচবার কোনও পথ নেই।

দুটো বাচ্চা একটা পাথরের ঘোড়ার ওপর চেপে বসতে চেষ্টা করছিল, ডি'সিলভা হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। একজনকে কোলে তুলে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিল। বাচ্চাটা, 'থ্যাঙ্ক ইউ'—বলে উঠে বসল। ডি'সিলভা চাপা হেসে অস্ফুটে বলে উঠল, 'বাই ফ্রম লাইফ'। দ্বিতীয়জনকে তুলতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল দোকানের সামনের কাচের দিকে। বাচ্চাটাকে ছেড়ে আস্তে-আস্তে কাচের দিকে এগিয়ে গেল। নিজেকে কাচের আয়নায় দেখে আর্তনাদ করে উঠল,—ও মাই গড!

কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে আস্তে-আস্তে পিছু হঠে মলের বেরোনোর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ খানিকটা পথ। অনেকক্ষণ হল ঘুরছে। সুইচিং রুম ব্যবহার করারও আর ইচ্ছে নেই। পা দুটো যেন আর শরীরটাকে টানতে পারছে না। কী করে হল? এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না।

মলের মধ্যে এশিয়া টিভির নিউজ দেখানো হচ্ছে। কতদিন খবর দেখা হয়নি। একবার দেখা দরকার। অনেক সময় অনেক কিছুর ক্লু পাওয়া যায় খবরে। মলের বাতাসে লেসারের মাধ্যমে ভাসমান নিউজ ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। এক মহিলা ইংরেজিতে খবর পড়ছেন। আরে এ তো ওকে নিয়েই খবর হচ্ছে! কিন্তু নামটা ওরকম কেন? ডিসিনহা? চোখে ভুল দেখছে না কি?

খানিক আগে যে রোবট পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হল তাকে তো ও আসল নামটা বলে দিয়েছে। দ্রুত পায়ে ও বেরোনোর গেটের দিকে এগোতে থাকে। বড় একটা ভুল করে ফেলেছে।

ঠিক এই সময় ভূতের মতো কোত্থেকে প্রায় দেওয়াল ফুঁড়ে ওই রোবট পুলিশ অফিসারটা উদয় হল। হাতে একটা বন্দুক। উলটোদিকে ছুটতে শুরু করল ডি'সিলভা। মেনটেনান্স রুমের দিকে যেতে হবে। ওখান থেকে এসি ডাক্টের মধ্যে ঢুকে যাওয়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটা শক্ত। বারবার এর-ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগল। হঠাৎ করে পিঠে একটা গুলি এসে লাগল। ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ল ও। উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে যাবে, তার আগেই বেশ কয়েকটা বন্দুক ফের গর্জে উঠল। মলের সব আলো কে যেন হঠাৎ করে নিভিয়ে দিল।

21 অক্টোবর, বিকেল পাঁচটা, ঋকের বাড়ি

—মিসেস বোস। গুড নিউজ আছে। থানা থেকে অফিসার ব্রায়ান বলছি। খানিকক্ষণ আগে ডি'সিলভা ধরা পড়েছে রবীন্দ্রমলে।

—বলেন কী! এ তো দারুণ খবর! জ্যান্ত? ফোনটাকে অডিয়ো থেকে ভিডিয়ো মোডে সুইচ করে মনিদীপা বলে উঠল।

—নাহ, শুট আউটে মারা গেছে। এত সহজে ধরা দেয়? সারা পৃথিবীর পুলিশকে এত বছর ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। অন্য একজনের আইডি ব্যবহার করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষে আমরা ওর চাল ধরে ফেলি। উফ—এই ক'দিন দু-চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। আর ক'দিন চললে আমিই হাই ব্লাডপ্রেশারে মারা যেতাম।

—তা, এবার ঋক বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে তো?

—অবশ্যই। আমি ওর অফিসেও জানিয়ে দিয়েছি। ও চাইলে কালকেই অফিসে জয়েন করতে পারে।

—আমি এক্ষুনি ওকে বলছি। বাড়িতে বসে ছুটি কাটানোর অভ্যেস নেই তো। বেরোনোর জন্য সমানে ছটফট করছে। থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার। থ্যাঙ্ক ই-উ।

—শুনেছ-ও ফোন কেটে আনন্দে চিৎকার করে উঠল মনি।

21 অক্টোবর, সন্ধে ছ'টা

—আনবিলিভেবল! আর ক'টা এরকম কেস পাওয়া গেছে? গম্ভীরভাবে বিজয়রত্নে বলে উঠলেন।

—আজ সকাল থেকে চারটে। জাস্ট শেষ দশদিনে এদের বয়স যেন দশবছর বেড়ে গেছে।

—ডাক্তার জয়বর্ধনে, আপনার কী মনে হয়? নতুন কোনও অসুখ?

—নতুন তো বটেই। এত তাড়াতড়ি বয়স বেড়ে যেতে তো কখনও দেখিনি। আর এরা কেউই প্রোজেরিয়ার রুগি নয় যে এমনিতেই অকাল বার্ধক্য হবে। সুস্থ সবল মানুষ। হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে একদিনের মধ্যে বছরখানেক বয়স যেন বেড়ে গেছে। রাতারাতি চুল পেকে যাচ্ছে। গালের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, পায়ের জোর কমে যাচ্ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে। একলাফে ছোকরা থেকে বুড়ো। আর অসুখটা মারাত্মক ছোঁয়াচে।

—তা এদেরকে কোয়ারানটাইন করা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। সঙ্গে-সঙ্গে একদম আলাদা হাই সিকিউরিটি জোনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না, সেখানে কেউ যেতেও পারে না। স্পেশাল রোবট খাবার দিয়ে আসছে। এক মাইল রেডিয়াসের মধ্যে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অলরেডি হয়তো লেট হয়ে গেছে।

—লেট কেন? তার আগেই এরা অন্যদের সংক্রামিত করেছে বলছেন?

জয়বর্ধনে একটু দ্বিধা নিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে বলে উঠলেন,—প্রথম কয়েকদিন এর প্রভাব অতটা বোঝা যায় না। এ তো আর জ্বর নয় বা হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়া নয়। আপনি আপনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন—শুধু হয়তো ক্লান্তি অনুভব করছেন। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে—ব্যস এইটুকুই। আপনার কাছাকাছি যারা আছে তারা এসময় কিন্তু ইনফেকটেড হচ্ছে। যখন আপনি দেখলেন যে আপনার বয়স একলাফে দশ বছর বেড়ে গেছে, বুঝলেন যে আপনি এ অসুখের শিকার, ততক্ষণে আপনি হয়তো কয়েক হাজারকে একই রোগের শিকার করে বসে আছেন।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট বিজয়রত্নে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন,—আপনারা কিছু লুকোচ্ছেন। আমার মনে হয় অলরেডি আপনারা আরও অনেক বেশি সংক্রমণের খবর জানেন। ঠিক কতজন এ পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে?

—প্রমাণিত কেস একশো সাতচল্লিশটা।

—আর ইনফেকটেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম কতজনকে পেয়েছেন? কোনও উত্তর না পেয়ে বিজয়রত্নে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—আই নিড দ্য নাম্বার। নাউ!

—তিপ্পান্ন হাজার সাতশো দশ। দশমিনিট আগে অবধি। সংখ্যাটা এর মধ্যে হয়তো আরো কয়েক হাজার বেড়ে গেছে। সংখ্যাটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ছে।

বিজয়রত্নে কোনওরকমে চেয়ারের হাতল ধরে বসে পড়লেন।—কী করে?

—এই ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রোগীর পাঁচ ফুটের মধ্যে এলেই হল। খুব সুস্থ-সবল লোকও ইনফেকটড হয়ে যাবে। এ-ঘরের একজনের মধ্যেও যদি এই ভাইরাস থেকে থাকে এতক্ষণে আমাদের সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে গেছে।

বিজয়রত্নেকে সবাই ডাকাবুকো প্রেসিডেন্ট বলে জানে। তার মুখেও কোনও কথা নেই। ভয়ে আতঙ্কে মুখটা কালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার জয়বর্ধনে ফের বলে উঠলেন,—তবে এ-ঘরের কারোর মধ্যে এখন এ ভাইরাস নেই। ঢোকার আগেই আমরা সবাই টেস্ট করিয়ে তবে ঢুকেছি। এজন্যই আপনার হোম মিনিস্টার আজ মিটিং-এ নেই। উনিও ইনফেকটেড।

—কী-কী করে এ অসুখ-এ ভাইরাস এল? টেররিস্ট অ্যাটাক? বসা গলায় বিজয়রত্নে বলে উঠলেন।

—নিঃসন্দেহে বলা যায় টেররিস্ট অ্যাটাক। এরকম ভাইরাস স্ট্রেন আগে কখনও দেখা যায়নি। তা ছাড়া আমাদের ধারণা, ন্যানো টেকনোলোজির সাহায্যে এ ভাইরাস সারা শরীরে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। ভাইরাস খুব কম সময়ের মধ্যেই নিজের হাজার-হাজার কপি তৈরি করছে। স্বাভাবিকভাবে এটা হয় না। এ ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে ছাড়া হয়েছে। এমন ভাইরাস যা খুব তাড়াতাড়ি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত শয্যাশায়ী হওয়ার আগে আরও অনেককে সংক্রামিত করার সুযোগ পায়।

—এ তো পুরো শ্রীলঙ্কাকে ধ্বংস করতে পারে।

—শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, পুরো পৃথিবী—পুরো সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এ ভাইরাসের শিকার হয়ে। অলরেডি শ্রীলঙ্কা থেকে টেররিস্টরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডি'সিলভা,—যে ওদের মাথা তাকে দেড়ঘণ্টা আগে ভারতে ধরা হয়েছে। শুট আউটে মারা গেছে। কিন্তু তার আগে কতজনকে ইনফেক্ট করেছে, কে জানে? বিদেশ সচিব মধুকরণ বলে ওঠেন।

—ও যে এরকম একটা ভাইরাস বহন করছিল তা আপনারা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন?

—না এখনও আমরা জানাইনি। ব্যাপারটা পলিটিক্যাল হয়ে যেতে পারে। ডি'সিলভা সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার নাগরিক।

—তা যাই হোক না কেন, আপনি ইমিডিয়েটলি জানান। তারপরে আমি নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করছি।

21 অক্টোবর, রাত আটটা

এশিয়া ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ভিডিয়ো কনফারেন্সে উপস্থিত আছে ভারত, চিন, জাপান, ইরান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ম্যালেশিয়া, হংকং, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশের পদস্থ আধিকারিকরা। স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ডাক্তার ড. বাগচী ও ড. কেভিন।

ব্লাড রিপোর্টটা ব্রায়ানের দিকে এগিয়ে দিয়ে ড. বাগচী বলে উঠলেন,—শ্রীলঙ্কা সরকার যে ভাইরাসের কথা বলেছে, ডি'সিলভার রক্তে সেই ভাইরাস পাওয়া গেছে। এখন ও কত জনকে ইনফেক্ট করেছে বলা মুশকিল। তবে এটা নিশ্চিত যে, মলে যতজন ছিল তারা প্রত্যেকেই সংক্রামিত হয়ে গেছে।

ব্রায়ান বলে উঠলেন,—ওই মলে যতজন ছিল, এমনকী আমাদের যতজন পুলিশ অফিসার ছিল তাদের সবাইকে আমরা বিশেষ একটা জায়গায় নিয়ে রেখেছি। বাইরের জগৎ থেকে তাদের পুরো আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবহার করা সব জিনিস আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

—কিন্তু এখন তো তারা শুধু ইনফেকটেড নয়। মাঝের বেশ কয়েক ঘণ্টা এরা বাস-ট্রেন চড়ে থাকতে পারে, সিনেমা হলে যেতে পারে, কোথাও খেতে যেতে পারে। সেখানে এরা আরও লোককে ইনফেক্ট করেছে। এদের বাড়ির সকলেও নিশ্চয়ই ইনফেকটেড। আমাদের তো তা হলে পুরো শহরের সব লোককে আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখতে হয়। আর ডি'সিলভা গত ক'দিনে আরও কত জনকে সংক্রামিত করেছে কে জানে?

—তো উপায়?

—উপায় একটাই। এ শহরের প্রত্যেকের ব্লাড টেস্ট করা হোক। এমনকী আমাদেরও। যার রক্তে ওই ভাইরাস ধরা পড়বে, তাকেই কোয়ারানটাইন করতে হবে।

ড. কেভিন অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন,—আমার আরেকটা কথা বলার ছিল, হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়। তবুও—গত কয়েকদিনের মধ্যে ডি'সিলভার কোনও ব্রেন মাইক্রোসার্জারি হয়েছিল। খুব পাকা হাতের কাজ। আমরা অনেক সময় মেমারি বাড়ানোর জন্য চিপ ব্যবহার করে থাকি, তা ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়। সেরকমই কোনও অপারেশন হবে।

ড. কেভিনের কথায় খানিকটা বিরক্ত হয়ে ব্রায়ান বলে উঠলেন,—আমরা এখানে অনেক বড় সমস্যার সামনে, ওসব ছোটখাটো কথা বলে প্লিজ সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের হাতে সময় সত্যিই কম।

ব্রায়ানের বস মিঃ পান্ডিয়ান বলে উঠলেন,—আমাদের খুব ছোটখাটো কথাও ভেবে দেখতে হবে। আমার কিন্তু এখনও বেশ কয়েকটা জায়গায় খটকা লাগছে। প্রথমত অনন্ত অর্থাৎ ডি'সিলভা নিজে কেন ইনফেকটেড হল? ওর তো ভ্যাকসিন নিয়ে রাখার কথা তাই না? যাতে নিজের না হয়। তা ছাড়া মলের সিকিউরিটি ক্যামেরার রেকর্ডিং থেকে দেখেছি ও কাচের আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছিল। কেন? এটা কি ওর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল?

এবার দ্বিতীয় বিষয়ে আসি। আচ্ছা, ডি'সিলভার ভারতে আসার কী দরকার ছিল? শুধু আরও কিছু লোককে সংক্রামিত করতে? তা সে তো এমনিতেই হত। শ্রীলঙ্কা থেকে গত ক'দিনে বহু সংক্রামিত লোক ইতিমধ্যেই পৃথিবীর নানান প্রান্তে গেছে। তারাই যথেষ্ট। তিন নম্বর, ও ঋকের আইডি নিল কেন? আর ঋকের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করল কেন? ওকে শুধু সংক্রামিত করার জন্য? এ তো হাতি মারতে কামান দাগা।

পাশ থেকে ব্রায়ান আস্তে বলে উঠলেন,—হাতি নয়, কথাটা হল মশা মারতে কামান দাগা।

—ওই একই হল। চার নম্বর এবং, মোস্ট ইম্পট্যান্টলি, ঋক কেন ইনফেকটেড হল না? সবাই এত সহজে ইনফেকটেড হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঋক প্রায় আধঘণ্টা ডি'সিলভার সঙ্গে থাকার পরও ইনফেকটেড হল না। কী কারণ হতে পারে? আমরা বড় কোনওরকম ভুল করছি না তো?

খানিক থেমে এশিয়ার ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান পান্ডিয়ান ফের বলে উঠলেন,—ঋকের তা হলে নিশ্চয়ই প্রতিষেধক নেওয়া ছিল। তা হলে কি ও ডি'সিলভার দলেরই লোক? ঋকের প্রোফাইল আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে ওর বউ-এর প্রোফাইলও। কী নাম যেন—মনিদীপা—কী করে সে জানেন?

ব্রায়ান বলে উঠলেন,—বিয়ের আগের সারনেম রঙ্গরাজন। ছোটবেলা কেটেছে শ্রীলঙ্কায়। ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং। ভাইরাস নিয়ে নানান রিসার্চ আছে।

ড. কেভিন পাশ থেকে বলে ওঠেন,—প্রোজেরিয়া রোগটা জানেন তো? জিনের মিউটেশন থেকে হয়। জন্মগত রোগ। খুব কম বয়সে বেশি বয়সের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। চুল পড়ে যায়। দাঁত পড়ে যায়। হাড়ের গঠন ঠিকমতো হয় না। চেহারা বড় হয় না। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যেই বাচ্চাগুলো মারা যায়। মিসেস মনিদীপা বোস প্রোজেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে উনি সারা পৃথিবীর অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন।

—আচ্ছা এরপরও আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন? ইমিডিয়েটলি ঋক ও মনিদীপাকে অ্যারেস্ট করুন! প্রোজেরিয়ার লক্ষণযুক্ত ভাইরাস তো তার পক্ষেই তৈরি করা সম্ভব যে তার ওষুধ বার করার চেষ্টা করছে—তাই না? তা ছাড়া শ্রীলঙ্কায় জন্ম। কোনও কানেকশন নেই

তো? আমি কনভিনসড। দে আর পার্ট অফ ডি'সিলভাস টিম। ওরাই এ ভাইরাস তৈরি করছে। মিঃ পান্ডিয়ান উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

21 অক্টোবর, রাত ন'টা, ঋকের বাড়ি

ম্যাসেজ চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে ছিল ঋক। চেয়ারটা তার আকার পরিবর্তন করে-করে কখনও গলাবন্ধ পোশাক হয়ে বুকে-পিঠে বা কখনও হেলমেটের মতো মাথায় এঁটে বসছিল। এতো নিখুঁত আরামের ম্যাসেজ কোনও মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আরামে বুজে আসা আধখোলা চোখে ঋক বাতাসে ফুটে ওঠা খবর দেখছিল। এসময় মনিদীপা ঘরে ঢুকল।

ঋক, তোমার জন্য যে নতুন টেম্পারেচর কন্ট্রোলড জামাটা এনেছি পরে দেখালে না তো? —মনিদীপা বলে ওঠে।

—আবার ওই জামা এনেছ, এমনিতেই তো এসিতে সারাক্ষণ থাকি। কী দরকার বলো তো ওই জামা পরার! তা ছাড়া এমনি জামার তুলনায় এগুলো বেশি ভারী হয়।

—আহা একটু পরেই দ্যাখো না! কতটুকু টাইম লাগবে!

বাধ্য হয়ে ম্যাসেজ বন্ধ করে উঠে বসে ঋক। গায়ের জামা খুলে মনিদীপার হাতে ধরা জামাটা পরতে যায় ঋক। অবাক হয়ে ঋকের দিকে তাকিয়ে মনিদীপা বলে ওঠে,—আচ্ছা, তোমার বুকের ডানদিকে যে কালো আঁচিলটা ছিল, সেটা কোথায় গেল বলো তো?

ঋক আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—ঠিকই বলেছ, অবাক কাণ্ড! আমি নিজেই এতদিন খেয়াল করিনি!

ফের ও মনির দিকে ঘুরে তাকায়। মনিকে আজ একদম অন্যরকম লাগছে। বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। মনি ঋকের তাকানো দেখে বুঝতে পেরে নিজেই সেটা বলে ওঠে,—খুব অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে জানো তো? কাল থেকে আমার গোছা-গোছা চুল উঠে যাচ্ছে। তিন-চারটে দাঁতও নড়ছে। আজকে সকাল থেকে সারা গায়ে, গাঁটে-গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা। যেন শরীরের ভার আর বইতে পারছি না। একটু থেমে মনি বলে ওঠে,—ভয় লাগে। আমি যে পেশেন্টদের নিয়ে কাজ করি—তাদেরও এরকম লক্ষণ। এ হল প্রোজেরিয়ার লক্ষণ। কিন্তু একদিনে আমার কী হল সেটাই আশ্চর্য। আর প্রোজেরিয়া তো ছোঁয়াচে রোগ নয়। এ তো জেনেটিক রোগ।

—বাবা-বাবা—দ্যাখো কী হয়েছে! ঋভুর ডাকে ঘাড় ফেরায় ওরা।

—এ কী—তোর মাথার চুল কী হল? ঋক অবাক হয়ে বলে ওঠে।

—পড়ে গেল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে। ঠিক ম্যাজিশিয়ান ওয়াং-এর মতো। দ্যাখো আঙুলগুলোও কীরকম হয়ে গেছে। ঋভু ওর আঙুলগুলো দেখায়। এ কার আঙুল! দেখে মনে হয় মধ্যবয়সি কোনও লোকের।

ঋক ছেলেকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়ে। ঋভুর একমাথা চুল রাতারাতি উধাও। কী সুন্দর একমাথা কোঁকড়ানো চুল ছিল।

মনি চট করে ঋভুকে কাছে টেনে নেয়। স্থির দৃষ্টিতে ঋকের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বলে ওঠে,—কে—কে তুমি?

অবাক হয় ঋক।—কেন?

মনি ঋভুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে খানিকটা দূরে নিয়ে যায়। খসখসে গলায় ফের বলে ওঠে,—তুমি ঋক নও, কে তুমি? ডি'সিলভা?

ঋক মনির দিকে দু-পা এগিয়ে যায়।—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ মনি? আমি—আমি ঋক।

—খবরদার, আর এক পাও এগোবে না। তোমার সব চালাকি বুঝে গেছি ডি'সিলভা। বুঝে গেছি কেন তুমি আমাকে টার্গেট করেছ! তোমার কাছে খবর ছিল আমি প্রোজেরিয়ার ওষুধ প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর তাই তুমি সবার আগে আমাদের ইনফেক্ট করেছ। যাতে তোমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। আমি খানিক আগেই খবর দেখেছি। এ ভাইরাসে শ্রীলঙ্কায় হাজার-হাজার লোক আক্রান্ত। সেখানে আমার ওষুধ বাজারে এলে তোমাদের প্ল্যান সব ভেস্তে যাবে। ঋককে কী করেছ? মেরে ফেলেছ?

—বিলিভ মি, মনি। কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে, ঋভুকে আমি কেন এরকম করব! ঋক ওদের দিকে আরও এগিয়ে যায়। কান্নায় ওর গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

আর তখনই দরজায় জোরে ধাক্কার আওয়াজ হয়। কিছু বোঝার আগেই দরজার লক ভেঙে ঘরে ঢুকে আসে কয়েকজন পুলিশ, মুখে তাদের মাস্ক পরা।

14 জানুয়ারি, রোববার, সকাল দশটা

অডিটোরিয়াম ভরতি মিডিয়ার লোকজনের সামনে স্পেশাল ডিরেক্টর ক্রাইম ব্রাঞ্চ ব্রায়ান বলতে শুরু করেন। প্রোগ্রামটা সারা পৃথিবীর বড়-বড় চ্যানেলগুলোতে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে।

—প্রথমেই বলি এটা অত্যন্ত জটিল কেস। যতটা সম্ভব সরলভাবে বলার চেষ্টা করছি। পুরো দু-হাজার বারো পাতার রিপোর্ট প্রেস কনফারেন্সের পরেই ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে দেওয়া হবে। আমরা—এর পিছনে যে টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের হাত ছিল, সেই 'এজমুল্লা'-র প্রায় সবাইকেই ধরতে পেরেছি। পুরোটা যার প্ল্যান—সেই ভ্যাসিল ডি'সিলভা পুলিশ কাস্টডি-তে সুইসাইড করেছে। বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করেছি।

—আচ্ছা, ডি'সিলভা সুইসাইড করল কীভাবে? ওকে তো রবীন্দ্রমলে গুলি করে মারা হয়েছে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে ওঠে।

—আমাকে একটু প্রথম থেকে বলতে দিন। আপনারা বুঝতে পারবেন। ডি'সিলভা পৃথিবী জুড়ে অনেকগুলো সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিল। কিন্তু ওর এবারে প্ল্যানটা ছিল সব থেকে জটিল—সবথেকে ভয়ংকর। এমন একটা চাল, যাতে পুরো মানবসভ্যতাকে চেকমেট করে দেওয়া যাবে। ওদের সংগঠন মারাত্মক এক ভাইরাস তৈরি করে—যার লক্ষণ প্রোজেরিয়া রোগের মতো। যার হবে—তার মৃত্যু হবে সংক্রামিত হওয়ার দু-তিনমাসের মধ্যে। অকাল বার্ধক্যের কারণে। নতুন ভাইরাস। এত তাড়াতাড়ি কোনও ওষুধ বার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। ভাইরাস ছড়াতে শুরু করার কয়েকদিন আগে ওরা জানতে পারল অস্ট্রিয়ার এক বিজ্ঞানী প্রোজেরিয়া-র ওষুধ বার করছে। নাম তার মনিদীপা বোস। ক্লিনিকাল ট্রায়ালের শেষ পর্যায়ে ওষুধটা। একই ওষুধ ওদের ভাইরাসের ওপরেও নিশ্চয়ই কাজ করবে। তখনই ওরা ঠিক করে নেয় মনিদীপাকে যে-কোনও ভাবে কাজে বাধা দিতে হবে—তা হলে তার মধ্যেই ওদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে। এ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করবে। তাই ডি'সিলভাদের প্রধান টার্গেট ছিল ঋক নয়—ঋকের স্ত্রী মনিদীপা।

—তা হলে ডি'সিলভা ঋককে টার্গেট করল কেন? আরেকজন সাংবাদিক চেঁচিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, সেটাই বলছি। টেররিস্টরা সবসময় দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে। মনিদীপা অবধি পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব কাজ ছিল। ও সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা পায়। তাই ওরা ঋককে বেছে নেয়। ডি'সিলভাকে এমনিতেই দেখতে একদম ঋকের মতো। ঋক কমপ্লিট ডেটা সলিউশনের (CDS) উচ্চপদস্থ অফিসার। ও ঋককে টার্গেট করে কয়েকটা কারণে। প্রথমত, ঋকের মাধ্যমে মনিদীপাকে ইনফেক্ট করা যাবে। দ্বিতীয়ত, ইনফেক্ট করা যাবে CDS-এর অফিসারদের—সাধারণভাবে যাদের কাছাকাছি আসা কষ্টকর কাজ। আর CDS-এর লোকদের আক্রান্ত করা মানে পুরো এশিয়ার ব্যাঙ্কিং সিস্টেমকে ধসিয়ে দেওয়া—যেরকম কয়েকদিন আগে হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখি।

কিন্তু ঋককে শিকার করার পিছনে সবথেকে বড় কারণটা আমরাও প্রথমে বুঝিনি। ছোটবেলা থেকেই ঋকের মেমারি-র প্রবলেম ছিল। খুব তাড়াতাড়ি সব কথা ভুলে যেত। তাই ও একটা কৃত্রিম মেমারি চিপ ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করেছিল। রেয়ার হলেও এখন কেউ-কেউ ওটা করে থাকে। কোনও কথা মনে রাখতে ব্রেনের যে অংশ কাজ করে সেই হিপ্পোক্যাম্পাস-এর কাজ সারে এই মেমারি চিপ। এই চিপ আমাদের যাবতীয় পুরোনো স্মৃতি ধরে রাখে।

এটাই ছিল ঋককে সিলেক্ট করার পিছনে সবথেকে বড় কারণ। কারণ এই চিপ বদলে দেওয়া মানে ঋক নিজেও বুঝতে পারবে না যে ও ঋক। আর তার জায়গায় স্পেশালি প্রোগ্রাম

করা চিপে যার চিন্তাভাবনা থাকবে, যার মেমারি থাকবে—ও নিজে তারই সত্ত্বা পাবে। তাই জাস্ট মেমারি চিপ বদলে দেওয়া হল। ঋক হয়ে গেল ডি'সিলভা—আর ডি'সিলভা নিজেকে ভাবল ঋক।

—তা আইডি চুরি করল কেন?

—আহা, মন দিয়ে শুনছেন না। আইডি তো চুরিই হয়নি। ঋকের আইডি ঋকের কাছেই ছিল। ও শুধু নিজেকে ডি'সিলভা মনে করছিল এই যা। নিজেকে ভাবছিল পৃথিবীর সবথেকে বড় টেররিস্ট হিসেবে, আর সেটাই হল ওর মৃত্যুর কারণ। রবীন্দ্র মলে শুট আউটে মারা গেছে আসলে ঋক।

অডিটোরিয়ামে জোর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গে নানান প্রশ্ন ভেসে এল।—তা ডি'সিলভা কোথায় গেল? পুলিশ এত বড় ভুল করল কী করে?

—ঋক বলে যাকে ভাবা হচ্ছিল, সে কি ডি'সিলভা?—কখন মেমারি চিপ বদলানো হল? —ডি'সিলভার চিপ লাগানোর কী দরকার ছিল?

বারবার অনুরোধ করার পরে চিৎকার থামলে ব্রায়ান আবার শুরু করলেন,—আমি আপনাদের সব প্রশ্ন নেব। বাট লেট মি ফার্স্ট কমপ্লিট। অন্যদিকে ডি'সিলভা ঋকের মেমারি চিপ তার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করে ঋকের পুরো স্মৃতির অধিকারী হয়ে উঠল। ঋকের শুধু স্মৃতিই যে ও পেল তা বললে ভুল হবে। ও নিজেকে সত্যিই ঋক বলে ভাবতে শুরু করল। তাই ঋকের ছেলে-বউকে ইনফেকটেড হতে দেখে ও নিজে মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে। পরে সুইসাইড করে। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের একমাত্র ভুল দিক।

ডেলি ইংলিশের সাংবাদিক জন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—তা পুরো কাজটা তো অনেক সহজেই করতে পারত। জাস্ট ঋকের সঙ্গে দেখা করে ওকে সংক্রামিত করলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যেত। তার জন্য এত কাণ্ড করার কী দরকার ছিল?

—না, হত না। কারণ সেক্ষেত্রে ঋকের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেত। ঋক নিজেও জেনে যেত যে ও সংক্রামিত। ও আর কাউকে—বিশেষত মনিদীপাকে ইনফেকটেড হতে দিত না। অন্যদিকে ডি'সিলভা আগেই এ-ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন নিয়েছিল বলে ওর কিছুই হয়নি। পরে ও নিজেই বুঝতে পারেনি যে ও এক সাংঘাতিক ভাইরাসের বাহক। রোগের ক্যারিয়ার হয়ে ও নিজের অজান্তেই সবাইকে ইনফেকট করে গেছে। বাদ পড়েনি যাদেরকে ও বউ-ছেলে ভাবছে তারাও। ও কিন্তু তখন ইচ্ছে করে কিছু করছিল না।

এ তো গেল একটা কারণ। এ ছাড়া ডি'সিলভা ঋকের মেমারি চিপ ব্যবহার করায় থানাতেও ওকে ধরা যায়নি। ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এ মনের গভীরে কে কী ভাবছে তাও বোঝা যায়। তাই ঠিক বোঝা যেত ডি'সিলভা কী ভাবছে—বানিয়ে কিছু বলছে কি না। এখানে ও নিজেই তো জানত না যে ও টেররিস্ট। তাই ধরাও পড়েনি। রিয়াল মাস্টারস্ট্রোক। টেররিস্ট বডি আর ইনোসেন্ট মাইন্ড—ডেডলি কমবিনেশন।

—আমরা কনফিউসড। ঠিক কী-কী হয়েছিল পরপর একটু বলবেন? দ্য মমার্তে-র ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক বলে উঠলেন।

—ও.কে., আমি পরপর ঠিক কী-কী হয়েছিল বলছি। ডি'সিলভা শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে ঢোকে সুন্দরবন হয়ে। লক্ষ্য ঋকের সঙ্গে দেখা করা। সঙ্গে ছিল আরেকজন টেররিস্ট। কুখ্যাত সার্জেন আজমল খান। ওরা ঋককে ট্রেনে ফলো করে। তারপর ঋক ট্রেন থেকে নামার পরে ওকে কিডন্যাপ করে ঝিলিমিলি পার্কে নিয়ে আসে।

ডি'সিলভা স্প্রে করে ঋককে অজ্ঞান করে। তারপর ডঃ আজমল খান ডি'সিলভাকে অজ্ঞান করে দুজনের ওপরেই নিপুণহাতে মাইক্রোসার্জারি করে। ঋকের মেমারি চিপ লাগানো হয় ডি'সিলভার ব্রেনে। আর স্পেশালি প্রোগ্রাম করা অন্য একটা মেমারি চিপ বসানো হয় ঋকের ব্রেনে যাতে ঋক নিজেকে ডি'সিলভা ভাবতে শুরু করে। তবে ইচ্ছে করে কিছু তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ঋক পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জন্যেই ও প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে। ঋকের কাছে ঋকের মানিব্যাগ, আইডি ছিল, ওটা কখনোই চুরি হয়নি।

একটু থেমে একটু জল খেয়ে ব্রায়ান ফের শুরু করলেন,—আজমল ঝিলিমিলি পার্ক ছেড়ে যাওয়ার আগে অনন্তের আইডি কার্ডটা ডি'সিলভার মানিব্যাগ থেকে ঋকের মানিব্যাগে চালান করে দেয়। দুজনের কাছে অন্য যে ব্যাগ ছিল তাও বদলে দেয়। ডি'সিলভার মেকআপ কিট, সঙ্গে লেখা জামা ঋকের কাছে চলে আসে। ঋকের ফোন রেখে দেওয়া হয় ডি'সিলভার কাছে। ব্যস। ইনফ্যাক্ট, ঋকের জ্ঞান আগে ফেরে। ও অবাক হয়ে দ্যাখে ওর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঋক অর্থাৎ আসলে ডি'সিলভা। ও তাই তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে চলে আসে। নিজেকে ডি'সিলভা ভেবে পুলিশের নজর এড়িয়ে নানান জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে থাকে। এখানে ও প্রথমে ঋক ও পরে অনন্তের আইডেনটিটি-এর সাহায্য নেয়।

ডি'সিলভা আগেও অনন্তের আইডেনটিটির সাহায্য নিয়ে এরকম অনেক কাজ করেছে। এবার সেটাই ঋক করল।—ডি'সিলভার মেমারির অধিকারী হয়ে। আমাদের পুরো নজর গিয়ে

পড়ে ওর ওপর। ওরা এটাই চেয়েছিল, যাতে আসল ডি'সিলভা মুক্ত হতে পারে। ওরা জানত যে অনন্ত কে আমরা ট্র্যাক করব।

আমাদের কাছে অনন্ত সম্বন্ধে ইনফরমেশন ছিল। আমরা অনন্তকে ট্র্যাক করে যখন ধরতে যাই, অনন্ত পালানোর চেষ্টা করে। আমাদের গুলিতে অনন্ত অর্থাৎ আসলে ঋক মারা যায়। ঠিক যেমনটা ওরা চেয়েছিল।

অন্যদিকে ডি'সিলভা নিজেকে ঋক ভাবছিল বলেই আমরা কেউ ওকে প্রথমে ধরতে পারিনি। ও যে ইনফেকটেড হয়নি—এ থেকেই আমরা ওকে শেষে চিনতে পারি। কারণ আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে টেররিস্টরা ভাইরাস ছড়ানোর আগে প্রত্যেকে ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছিল যাতে নিজেদের কোনও ক্ষতি না হয়।

এতটা বলার পরে ব্রায়ান একটু থেমে বলে উঠলেন,—আশা করি, পুরো ঘটনাটা আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার। সবশেষে আমাদের সবার তরফ থেকে মনিদীপা দেবীকে ধন্যবাদ জানাই। ওনার ওষুধ আবিষ্কারের জন্যই আমরা সবাই আজ রোগমুক্ত হয়েছি। ইনক্লুডিং মি। পুরো মানবসভ্যতা ওনার কাছে ঋণী। এ ভয়ানক সংক্রামক রোগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য।

পিছনের দিক থেকে একজন সাংবাদিক চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—মিঃ ব্রায়ান আমরা খবর পেয়েছি ডি'সিলভা এখনও বেঁচে আছে। সুইসাইডের খবরটা মিথ্যে।

চারদিকে সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। যেন স্কুলছুটির ঘণ্টা পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে আওয়াজ কমলে ব্রায়ান ফের বলে উঠলেন,—ডি'সিলভার প্রাণভিক্ষা কে করেছেন জানেন? সেই মহিলা যার কাছে আমরা সবাই ঋণী। ইয়েস—মনিদীপা দেবীই চান যে ডি'সিলভাকে ক্ষমা করা হোক। তার কারণ ওর আর ঋকের মধ্যে ঠিক যে জায়গায় তফাত ছিল—সেটাই তো কেটে গেছে। ও আর টেররিস্ট নয়। আর তা ছাড়া ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই এ অসুখের ওষুধ এত তাড়াতাড়ি বার করা সম্ভব হয়েছে। ডি'সিলভার শরীরে যে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছিল—তা অ্যানালাইজ করেই এ ওষুধ বার করা হয়েছে।

—কিন্তু ডি'সিলভার মতো সাংঘাতিক টেররিস্টকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও অধিকার পুলিশের নেই। কী গ্যারান্টি যে ও আবার এরকম কাণ্ড ঘটাবে না? কোনও একজন সাংবাদিক বলে ওঠে।

—আজ আমরা যখন এই প্রেস কনফারেন্স করছি, তখন আপনাদের ওই কুখ্যাত টেররিস্ট কি করছে জানেন?

মিঃ ব্রায়ান—অডিটোরিয়ামের মধ্যে ভিডিও প্রোজেকশান চালু করেন। লাইভ ছবি। মনিদীপা-ঋকের বাড়ি থেকে। ওদের কাউকে না জানিয়ে।

ড্রইংরুমের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ঋভু, ডি'সিলভা আর মনিদীপা। সামনে একটা অদ্ভুত চারটে রঙের ঘর কাটা বোর্ড। আর একটা ফুটকি দেওয়া ছোট সাদা কিউব। একেই নাকি আগে লুডো বলা হত।

ডি'সিলভা তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে,—মনি, এ ভারি অন্যায়। তুমি ঋভুর কাঁচা ঘুটি খেলে না। আর আমার একদম পাকা ঘুটি খেয়ে ফেললে! ইস, আর দু-ঘর গেলেই—না, না, অন্য কোনও চাল দাও। না হলে আমি আর খেলব না।

পাশ থেকে ঋভু চেঁচাচ্ছে, ওর গলা আরও এককাঠি ওপরে,—খেয়ে নাও মা, খেয়ে নাও। আগে বাবা তোমার একটা ঘুটি খেয়েছিল না!

লেখকের কথা

এ উপন্যাসের ঘটনা 2051-তে সত্যি না হোক এটাই মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু এ উপন্যাস যে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা সবই হয়তো থাকবে ওই সময়। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে ঋক আর ডি' সিলভা-র মধ্যে মেমারি এক্সচেঞ্জ। সত্যিই কি তা সম্ভব?

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া আর ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম হিপ্পোক্যাম্পাস বা মেমারি বানানোর চেষ্টা করছেন যা কমস্মৃতিযুক্ত, অ্যালজাইমার ও স্ট্রোকে আক্রান্ত লোকেদের কথা মনে রাখতে সাহায্য করবে। এই হিপ্পোক্যাম্পাসই আমাদের লংটার্ম মেমারির তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা দেখে।

স্বাভাবিক মেমারি-র জায়গায় ইলেকট্রনিক চিপ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম মেমারি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই ইঁদুরের ওপর সাফল্য পেয়েছেন। 2005-এ একটা প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে যাতে সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে প্রথমে ইঁদুর শ্রেণির ও পরে মানবোপযোগী ব্রেন তৈরির চেষ্টা চলছে। তাই 2050-এর আগেই আমরা হয়তো পেয়ে যাব ইলেকট্রনিক চিপ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম মেমারি।

এবার আসা যাক উপন্যাসের আরেক প্রযুক্তিতে। বর্তমানে 2000-এর মতো জেনেটিক টেস্ট ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যতে সনাক্তকরণের জন্য ও অপরাধ কমানোর জন্য এটাই হবে সবথেকে বড় হাতিয়ার। বর্তমানে ম্যালেশিয়াতে আড়াইকোটি ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে যা RFID প্রযুক্তিতে কাজ করে। চিন সরকার চিনের সব জনসাধারণের জন্য RFID নির্ভর কার্ডের ব্যবস্থা করছে।

এই কার্ডে সেই লোকটার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য থাকবে। ধর্ম, উপজাতি থেকে শুরু করে তার শারীরিক অবস্থা পর্যন্ত। ভবিষ্যতে ট্রেন স্টেশন, শপিং মল, এয়ারপোর্ট, খেলার মাঠ সর্বত্রই RFID সেনসর থাকবে যার মাধ্যমে কে কবে কোথায় যাচ্ছে সবই বোঝা যাবে। এরাই হবে সরকারের চোখ আর কান।

চোখের মণি, ভয়েস, মুখ, হাতের সব আঙুলের ছাপ সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হবে। তবে এ সবে ভুল সনাক্তকরণের সামান্য (0.1 শতাংশ) হলেও সম্ভাবনা থাকে। একদম নির্ভুল সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে জেনেটিক মার্কারের ভিত্তিতে তৈরি কার্ড। দশবছরের মধ্যে মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকায় পুরো ডিএনএ সিকোয়েন্সের মার্কার বা বৈশিষ্ট্যর ওপর নির্ভর করে এরকম আইডি কার্ড তৈরি করা যাবে। অপরাধীকে পাকড়াতে এই কার্ডই হবে প্রধান হাতিয়ার।

এবার ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর কথায় আসা যাক, এ হল লাই ডিটেকটারের পরের ধাপ। সরাসরি মস্তিষ্কের মধ্যের ব্রেনওয়েভ দেখে এ যন্ত্র বলে দেবে মনের কথা। তাই মিথ্যে বলার কোনও উপায় থাকবে না।

উপন্যাসে যে ক্লোনিং টেকনোলজি-র ব্যবহার আছে, ভাইরাস তৈরিতে ন্যানো রোবটের ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে—তাও আমরা 2050-এর অনেক আগেই পেয়ে যাব। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আর অপব্যবহার এ দুইয়ের রেসে যে জিতবে সেই ঠিক করে দেবে আগামী দিনের সমাজের রূপরেখা। শেষ হাসি হাসবে কারা—ডি'সিলভা-রা নাকি আমরা?

মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন



75000 বছর আগে, উত্তর সুমাত্রা

অনেক, অনেকটা সময় কেটে গেছে। কবে যে শেষ খেয়েছে, তাই খেয়াল নেই ছেলেটার। আরও তো অনেকে ছিল ওর দলে, কোথায় গেল তারা! শুধু মনে পড়ে দলের বুড়ো লোকটা ওকে ঘুম থেকে ঠেলে উঠিয়ে বলেছিল,—দানব জেগে উঠেছে, পালাতে হবে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

বলে দূরের পাহাড়টার দিকে দেখিয়েছিল। রেগে গেলে ওর মুখ থেকে আগুন বেরোয়।

সত্যিই তাই। ওই মুখ থেকে বেরোনো আগুনের লেলিহান শিখায় সারা আকাশ তখন লাল। বুড়ো মাথা নেড়ে বলেছিল,—আমরা কেউ বাঁচব না। দানব খেপে উঠেছে।

দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছিল ছেলেটা। উপায়ও ছিল না। ওর দিকে তেড়ে আসছিল টকটকে লাল জ্বলন্ত তরল। নীচের মাটি পাথর গলিয়ে ওই লাল তরলের নদী তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছিল। ওর লাল জিভ লোভে লকলক করছিল শিকার ধরার জন্য।

শরীর কেটে গেলে যেরকম হয়, সেরকমই চারদিকের পাহাড়-পর্বত-টিলার ফাঁক দিয়ে বইছিল লাল নদী। প্রচণ্ড গরম। কাছে এলেই—ব্যস! সব শেষ হয়ে যাবে।

যত দূরে থাকা যায়—তাই পাগলের মতো ছুটছিল ছেলেটা। কিন্তু শুধু তো পায়ের দিকে তাকিয়ে ছুটলেই হবে না, ওপর থেকেও ছিটকে আসছিল বড়-বড় পাথর। যেরকম পাথর দিয়ে ওরা শিকার করে, তার থেকে অনেক বড়। আর দানবটার সে কী গর্জন! যেন হাজারটা বাজ একসঙ্গে পড়ছে। আকাশটাও যেন গলে গলে পড়ছিল। কারণ ওটা তো আর নীল রঙের আকাশ নেই। মাথা তুলে তাকালে শুধুই কালো অন্ধকার আর ধোঁয়া। পোড়া কাঠের মতো রং। পুড়ে যাওয়া আকাশটা ছাই হয়ে নেমে আসছিল ছেলেটার চোখেমুখে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল ধোঁয়ায় আর ওই ছাইতে। দু-চোখ জ্বালা করছিল। পাঁচহাত দূরেরও কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

তবু ছেলেটা দৌড়োনো থামায়নি। ও তো কোনওদিন হারতে শেখেনি। ওর মতো পাথর ছুড়ে ওই বড় বড় জানোয়ারগুলোকে কেউ মারতে পারত না। সাঁতরে পাহাড়ি নদী পেরোতেও ওর জুড়ি ছিল না কেউ। গাছের ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে বাঁদর ধরে আনত। কিন্তু জানোয়ারগুলো আজ গেল কোথায়? পায়ের পাতা পুড়ে গেছে, সারা গায়ে ছ্যাঁকা লেগে ফোস্কা পড়ে গেছে, তবুও থেমে যায়নি। থামা মানেই মৃত্যু।

এই ক'দিন মাঝেমধ্যে গুহার মধ্যে লুকিয়েছে। আবার যখন গুহার বাতাসে দমবন্ধ লেগেছে, আগুনের ওই নদীর কাছে চলে এসেছে, ছুটতে শুরু করেছে।

আকাশের দিকে ফের তাকাল ছেলেটা। বড়-বড় পাথর এখনও ছিটকে-ছিটকে আসছে। চারদিক অন্ধকার। আর কি কখনও আলো আসবে না? ওই যে আগে রোজ নীল আকাশে লাল আগুনের থালাটা দেখা যেত, তাকেও কি অন্য সবকিছুর সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে দানবটা? তাই হবে হয়তো। নয়তো এতটা সময়েও অন্ধকার কাটল না কেন? দূরে দানবটার মুখ থেকে যে আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল, তা এখন একটু কমে এসেছে। এরকম আগুন ছেলেটা আগে কখনও দেখেনি। গাছগুলো সব পুড়ে গেছে। সাদা ছাইতে ঢেকে গেছে।

এরকমই একটা পুড়ে যাওয়া গাছের নীচের দিকের ডালে কয়েকটা সবুজ কাঁচা পাতা খুঁজে পেল ছেলেটা। চিবিয়ে খেয়ে নিল। একটু যেন তেষ্টা মিটল। পায়ের তলার মাটি আবার তেতে উঠছে। আবার কি ওই লাল নদী তেড়ে আসছে? হবে হয়তো। ছুটতে যাবে, হঠাৎ চমকে ওঠে—আরে এটা কী! ওরই মতো আরেকজন। খানিকটা দূরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। একটা মেয়ে। ওর থেকে ছোটই হবে। কাছে গিয়ে বুকের ওপর কান পাতল ছেলেটা। একটা ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। বেঁচে আছে তাহলে। পা দুটো পুরো পুড়ে গেছে। মুখটাও বেশ খানিকটা। যাক, একটু খাবার জুটল অবশেষে। জ্ঞান ফেরার আগেই মেরে খেয়ে নেবে।

জ্ঞান থাকলে, ছটফট করলে মারতে কেমন যেন লাগে। পাশ থেকে বড় একটা পাথর কুড়িয়ে আনল। থেঁতলে দেবে মাথাটা। তারপর ধুকপুকুনি থামলে আরামসে খাওয়া যাবে। রেখেও দেওয়া যাবে খানিকটা। আবার কবে এরকম খাবার পাওয়া যাবে কে জানে?

পাথরটা তুলে মারতে গিয়ে হঠাৎ ও থেমে গেল। পাথরটা পাশে নামিয়ে রাখল। ভারি মিষ্টি মুখটা। আর হাতের ওপর দিকে একটা সুন্দর পাতা আঁকা। একটু চুপ করে বসে রইল ছেলেটা। কেউ নেই—এ দানবটা তো সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। এই হোক না ওর বন্ধু।

গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে মেয়েটার চোখের পাতায় বোলাতে লাগল ও। খানিকবাদে চোখের পাতাটা নড়ে উঠল। জ্ঞান ফিরছে। বড়-বড় চোখ মেলে মেয়েটা তাকাল ওর দিকে। উঠে বসারও ক্ষমতা নেই।

কিন্তু এখানে থামলে তো চলবে না। মেয়েটাকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল ছেলেটা, লাল গরম নদী আর ছুটে আসা পাথর এড়িয়ে। দূরে একটা অন্যরকম গর্জন শুরু হয়েছে। এ আওয়াজটা ওর চেনা। এটা ওই দানবটার থেকেও সাংঘাতিক। সমুদ্রের। যখন তেড়ে আসে তখন পালানোর কোনও উপায় থাকে না। শেষে সমুদ্রকেও কি ওর দলে নিয়ে নিয়েছে দানবটা? কী সাংঘাতিক!

ত্রিবান্দ্রম, 15 সেপ্টেম্বর

অনিলিখা সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছিল। খোলা চুল উড়ছিল হাওয়ায়। পায়ের নীচে সরে সরে যাচ্ছিল কোভালাম বিচের মসৃণ বালি। বিচের ওপরেই একটা পাঁচতারা হোটেলে ও এসে উঠেছে অফিসের কাজে। সারাদিন মিটিং চলেছে। দিনের শেষে সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত দেখতে বেরিয়ে পড়েছে একাই। কিন্তু সূর্যাস্তের দেখা মেলেনি। মেঘের ফাঁকে চোখ এড়িয়ে কখন যে সূর্য শেষ ডুবটা মেরেছে তা ঠিক বোঝা যায়নি। উধাও হওয়ার আগে একটা সোনালি আলোর রেশ দিগন্তরেখার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

মুগ্ধ হয়ে ওই দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল অনিলিখা। তারপর ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে বালির ওপর হাঁটছিল। আর শুনছিল ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের কথা বলা। বিচে এখন বেশি লোক নেই। এখানে বেশিরভাগই প্রাইভেট বিচ—হোটেলগুলোর নিজস্ব। কয়েকটা কুকুর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে কয়েকজন বিদেশিকে দেখা যাচ্ছে। এরা বিদেশ থেকে এসে এই হোটেলগুলোতে লম্বা ছুটি কাটিয়ে যায়। তাই কোনও তাড়া থাকে না। আজ সমুদ্রে কেউ সাঁতারে নামেনি। কেউ কেউ শুধু মাঝে মাঝে শান্ত সমুদ্রে পা ভিজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আনমনে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল অনিলিখা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, দূরে উলটোদিক থেকে একজন এগিয়ে আসছে। খুব পরিচিত হাঁটাটা। চেহারাটা স্পষ্ট হতে শুরু করল। রাজা কি?

ঠিক তাই—আরেকটু কাছে আসতেই অনিলিখা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বেশ কয়েকবছর আগে রাজার সঙ্গে একই সঙ্গে হার্ভাডে পড়েছে অনিলিখা। সাবজেক্ট যদিও আলাদা ছিল। রাজার সাবজেক্ট ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। তবু ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দোনেশিয়ার ছেলে। পুরো নাম ছিল অর্ধরাজা। ওরা সবাই রাজা বলেই ডাকত। এমনিতেও ইন্দোনেশিয়াতে কেউ পুরো নাম ধরে নাকি ডাকে না। তা ও এখানে কী করছে?

—রাজা! বলে চেঁচিয়ে উঠল অনিলিখা।—তুমি এখানে? ভারতে?

রাজা একটু চমকে উঠে হাসিমুখে এগিয়ে এল।

—এখানে কী করছ? ভারতে এসেছ আর আমাকে জানাওনি?

—হ্যাঁ, হঠাৎই প্ল্যান করেছি। তা তুমি তো এখানে থাকো না?

—না, অফিসের কাজে এসেছি। তা তুমি আছ কোথায়?

—এখানেই। কাছেই একটা হোটেলে। অনেকদিন কোথাও বেড়ানো হয়নি। তাই হঠাৎই ছুটিতে আসার প্ল্যান করলাম। তোমার কথা খেয়াল হয়নি।

—কতদিন আছ? কলকাতা আসছ কি?

—নাহ, কলকাতায় আর যাব না। কালই ফিরে যাচ্ছি। বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজা বলে উঠল,—এখন আমার একটু তাড়া আছে। তোমার নাম্বারটা দাও। আমেরিকায় ফিরে পরে কথা বলব।

অনিলিখার নাম্বারটা নিয়ে যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকেই দ্রুত আবার ফিরে চলল রাজা। অনিলিখা একটু অবাকই হল। এতদিন বাদে দেখা—সামান্য কয়েকটা কথা বলারও সময় নেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। প্রথমদিকে ফোনে, ই-মেলে যোগাযোগ ছিল। পরে সেই যোগাযোগটা রাখা দুজনের পক্ষেই আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও...।

সত্যি, জিনিয়াস বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল রাজা। তা না হলে ইন্দোনেশিয়ার একটা ছোট গ্রাম থেকে এভাবে হার্ভাডে পড়ার সুযোগ করে নেওয়া সহজ ছিল না। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়। সব বিষয়ে দারুণ কৌতূহল ছিল রাজার। সব সময় বই নিয়ে বসে থাকত। যাকে বলে বইয়ের পোকা। তবে শুধু পড়ার বই নয়, সবরকমের বই। তবে মজার বিষয়—আমেরিকায় পড়তে গেলেও আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুব খারাপ। বলত—সারা পৃথিবীর মধ্যে খাঁটি মানুষ যদি খুঁজে পেতে হয় তাহলে সুমাত্রায় যেতে হবে। তা খাঁটি মানুষের সংজ্ঞাটা কী? ওর মতে আমাদের জিনে এত ভেজাল ঢুকেছে যে সত্যিকারের মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যত বড় সভ্যতা তত বেশি ভেজাল। সত্যিকারের মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, তারা নাকি আছে সুমাত্রার জঙ্গলে। তাদের জীবনে গত হাজার বছরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ ব্যাপারটা সবার কাছেই খুব হাস্যকর ছিল। কিন্তু এ নিয়ে রাজাকে খেপালেও ও খেপত না। পরের দিকে প্রসঙ্গটা তুলতই না।

রাজার ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখা উচিত ছিল। আর কোন হোটেলে উঠেছে, সেটাও তো ঠিক জানা হল না। বিচ এখন প্রায় ফাঁকা। সূর্য ডুবে গেছে। দূরের হোটেলগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। ফেরার রাস্তা ধরল অনিলিখা।

জেনুয়ার জেল, 1299, 16 জানুয়ারি

(বর্তমান ইতালি) মার্কোপোলো ও পিসা

রাস্তিশিয়ান দে পিসা ও মার্কোপোলো দুজনে একই সঙ্গে জেনুয়ার জেলে বন্দি। ভেনিস যুদ্ধে হেরে গেছে জেনুয়ার কাছে। ভেনিসের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মার্কোপোলো তাই জেনুয়ার জেলে। তার সঙ্গে একই সেলে পিসা। পিসা ভালো গল্প লেখে। মার্কোপোলোকে সঙ্গী পেয়ে সে ভারি খুশি। চিন-সুমাত্রা-ভারতে বহু বছর কাটিয়েছে মার্কোপোলো। তাই ওর কথা শুনে পিসা লিখে চলেছে ভ্রমণের বিবরণ।

—তারপর মার্কো, তুমি ল্যাম্বির (বর্তমান সুমাত্রা) কথা বলছিলে কাল—তারপর কী হল?

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। থাইল্যান্ড থেকে ম্যালে পেনিনসুলা ধরে ল্যাম্বিতে পৌঁছোলাম। কিন্তু তখন হাওয়া ঠিক দিকে বইছিল না। বাধ্য হয়ে ওখানে থামতে হল। ওখানকার লোকেদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলি। ওখানে সবাই মূর্তিপূজা করে। আগে বেশিরভাগ হিন্দু ছিল। পরে আরব দেশের সওদাগরদের প্রভাবে, অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে।

ওদের সম্বন্ধে একটা কথা শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না, আর যদি বা করো, যারা তোমার লেখা পড়বে তারা তো করবেই না। ওখানে কিন্তু লোকেদের বিশাল বিশাল লেজ। বেশ মোটা লেজ।

ইয়া তাগড়াই চেহারা। ওদের অনেকে পাহাড়ে থাকে। ওখানে পৃথিবীর সেরা কর্পূর পাওয়া যায়। তার দাম সোনার থেকেও বেশি। কর্পূর আর মশলাপাতি কিনতে প্রচুর সওদাগর ওখানে যায়। ওখানকার লোকেরা রুটি খায় না। খায় শুধু ভাত। সঙ্গে দুধ আর মাংস। ওখানে কিছু বিশাল বিশাল গাছ আছে। আকাশছোঁয়া। এমন ঘন তাদের পাতা যে মাথা তুললে আকাশ দেখা যায় না। কিন্তু ওই গাছের ছাল খুব পাতলা। ছালের নীচে একধরনের ময়দার মতো জিনিস থাকে। ওখানকার লোকেরা ওই ময়দা দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করে খায়। ওখানকার পাহাড়ে অনেক সোনা পাওয়া যায়। তোমাদের পিসায় যেমন পাথর, ওখানে তেমন সোনা অফুরন্ত। ওখানকার নামই তাই স্বর্ণদ্বীপ।

—তাই নাকি? তা তুমি সেখান থেকে সোনা নিয়ে আসনি?

—আমাকে কুবলাই খান এত দামিদামি রত্ন দিয়েছিল যে তা সাবধানে নিয়ে আসতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। তা ছাড়া আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের রাজকন্যা ছিল—তাকে ছেড়েই বা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি কী করে! পারস্যের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু আমার ভরসাতেই রাজকন্যাকে পাঠিয়েছিল কুবলাই খান। সাবধানে তাকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই ওকে ফেলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তো আর ল্যাম্বির সোনাদানা আর মশলাপাতি জোগাড় করতে যাইনি। নেহাতই চিন থেকে ভেনিস যাওয়ার পথে ওখানে আটকে পড়েছিলাম, তাই। অনুকূল হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আমি ল্যাম্বিতে পাঁচ মাস বসেছিলাম। আমার সঙ্গীরা মহাফূর্তিতে ছিল, আর আমি রোজ ভাবতাম কবে ভারত রওনা হতে পারব।

—তা যা বলছিলে। ওখানকার লোকগুলো কেমন?

—ওখানে বেশিরভাগ লোক ব্যবসা করতে আসে। তারা ভদ্র। তারা ভারত, চিন এসব জায়গা থেকে আসে। কিন্তু, একটু ভেতরে যাও, ওখানকার জঙ্গলে পাহাড়ে অসভ্য লোকের

বাস। তারা জ্যান্ত মানুষ ধরে খায়। তারা সব আধাপশু। তবে তাদের থেকেও খারাপ আরেকদল লোক আছে। পাহাড়ের গুহাতে অনেক গভীর জঙ্গলে থাকে ওরা।...থাক সে কথা।

—কেন, থাকবে কেন? বলো!—আমাকে তো সবই বলছ।

—আচ্ছা, বলছি। কিন্তু ওদের কথা খবরদার লিখো না। তাহলে আমি-তুমি কেউ রেহাই পাব না। আমি সংক্ষেপে বলছি।

ফের বলে ওঠে মার্কো,—বুঝতেই পারছ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে আমি যাব না তা কি হয়! তার জন্যই তো চব্বিশ বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। শুধু সোনার লোভে নয়। আমাকে ওখানকার একজন ওদের কথা বলেছিল। ওদের কাছে গেলে মানুষ নাকি বাঁচে না। ওদের গায়ে নাকি সাংঘাতিক জোর। আর তেমনি হিংস্র। তারপর কৌতূহলবশত আমি শ-পাঁচেক লোক নিয়ে ওরা পাহাড়ে যেখানে থাকে সেদিকে গিয়েছিলাম।

তখন শীতের সময়। আমরা প্রায় পাঁচদিন জঙ্গল পেরিয়ে ওই জায়গার কাছে গিয়েছিলাম। জঙ্গলে ঘেরা বড় পাহাড়। ভারি সুন্দর সে জায়গা। তারই ওপরের দিকে ওদের বাস। ওদের কথা অন্যদের বললে নাকি অভিশাপ লাগে। এটাই নাকি নিয়ম। ওদের আমি দেখিনি। কিন্তু আমার দলে পাঁচশো জন ছিল। তিনশো জনের একটা দল প্রথম দিন গিয়েছিল, একজনও ফেরেনি। তারপর আরও পঞ্চাশ জন যায়, তারাও ফেরেনি। পরে এক স্থানীয় লোক আমাকে বলে যে ওখানে গেলে কেউ নাকি ফেরে না। লোকটা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই বলেছিল।

এরপর আমরা ওখান থেকে ফিরে আসি। একমাস বাদে পালে হাওয়া লাগলে ওখান থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আর যাই লেখো না কেন—ওই পাহাড়ের লোকগুলোর কথা লিখো না। ওরাই নাকি আদি, আসল মানুষ।

—ঠিক আছে, কথা দিলাম। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। তোমার দলের অত লোক বিপদে পড়ল, মারা গেল—আর তুমি একবারও গিয়ে দেখলে না। অসম্ভব! তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। ভেনিস-জেনুয়ার যুদ্ধে তোমার বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে ঘোরে। কীভাবে তুমি তরবারি নিয়ে নিজে যুদ্ধে নেমেছ, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছ—সেই কথা। তোমার জাহাজ সবার পরে জেনুয়ার অধীনে আসে। তোমাদের পুরো সৈন্যদল যখন আত্মসমর্পণ করেছে, তুমি তখনও হাল ছাড়োনি। তুমি বলতে চাও যেখানে তোমার দলের অত লোক মারা পড়ল, তুমি সেখান থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এলে! এ কথা আমি বিশ্বাস করব! ঠিক করে বলো কী হয়েছিল।

সেলের অন্ধকারে প্রায় মুখ লুকিয়ে মার্কোপোলো আস্তে-আস্তে বলে উঠল,—পিসা, আমাদের চারপাশে যা হয় সব কি আমাদের জানা? সব কি আমরা বুঝি? ওই আকাশের দিকে

দ্যাখো। তারাগুলো ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় ফিরে আসে। সূর্যটা রোজ আমাদের পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। অতটুকু একটা জিনিস—কিন্তু কী তেজ! আমরা কি এসব বুঝি? ঠিকই ধরেছ। আমিও ছিলাম ওদের সঙ্গে। দুটো অভিযানেই। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। এতটুকুই তোমার জানার জন্য যথেষ্ট। নাও, এবার তোমার গল্প শোনাও।

—ঠিক আছে, ল্যাম্বির কথা তো অনেক হল। তোমাকে আজ আমার লেখা একটা গল্প বলি, আশাকরি ভালোই লাগবে।

পিসা ওর গল্প বলতে শুরু করে জেলের আধা অন্ধকার খুপরিতে।

সানফ্রান্সিসকো, 20 আগস্ট

প্রফেসার জ্যাসন ইগার ফোনটা অন করলেন। 38টা মিসড কল। 12টা মেসেজ। মিসড কলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিজের উদ্দেশ্যে ধিক্কার সূচক একটা আওয়াজ করে মাথা নাড়লেন। নাহ। এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়াটা উচিত হয়নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন—আলু না পেঁয়াজ কিনতে! নাকি দুধ? পথে হঠাৎ করে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। আর এটাই কাল হল। আলোর রেখা হঠাৎ হঠাৎ করে জ্বলে উঠে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ চোখে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয়নি। কমেট শাওয়ার। দুর্লভ ঘটনা। অবাক হয়ে দেখছিলেন প্রকৃতির এই খেলা। সঙ্গে টেলিস্কোপও ছিল। তাতে চোখ লাগিয়ে কাটিয়েছেন বেশ কয়েক ঘণ্টা। তারপরে ওনার অভ্যাসমতো লিখে রাখতে চেয়েছিলেন। তা লিখতে লিখতে কখন যে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন কে জানে!

কেউ যাতে জাগতিক কোনও ব্যাপারে বিরক্ত না করে তাই ফোনটা শুরু থেকেই বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর চালু করা হয়নি। আরেকবার ফোনে চোখ রাখলেন। শেষ মেসেজটা লোকাল পুলিশের। তার মানে পুলিশেও খবর দিয়েছে! কী অবস্থা! জ্যাসন কি বাচ্চা নাকি, যে হারিয়ে যাবে! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কয়েকমাস আগে একটা কমেটের কক্ষপথের জটিল অঙ্ক মিলছিল না বলে, বাড়িতে না জানিয়ে তিনদিন একটা হোটেলে ছিলেন। তা, সেটা তো আর রোজকার ব্যাপার নয়!

বাড়িতে ফোন করতে যাবেন, হঠাৎ গাড়ির কাচের জানলায় ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে মুখ ঘোরালেন। দুজন লোক। অচেনা। নির্ঘাত পুলিশের লোকই হবে। ওনার খোঁজে এসেছে। দরজার লক খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বলতে যাবেন—তার আগেই মুখের ওপর কে যেন রুমাল চেপে ধরল। কিছু বলার সুযোগ দিল না। জ্ঞান হারানোর আগে জ্যাসন শুধু এটুকুই বুঝলেন যে তারা পুলিশের লোক নয়। ওনার সাবজেক্টেরও লোক নয়। কমেট শাওয়ার নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। ওনাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে।

জোহানসবার্গ, 20 আগস্ট

মার্কের মনটা আজ খুব খারাপ। এরকম মন খারাপ হলে উনি সাধারণত টেলিস্কোপে চোখ রাখেন। দূরের তারাগুলোর দিকে তাকালে নিজের সমস্যাগুলোকে অনেক ছোট ছোট লাগে। হারিয়েই যায়। কিন্তু দিনের বেলা সে উপায় নেই। খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। নাহ, খবরগুলো পড়তে ইচ্ছে করছে না। টিভি চালালেন। বাস্কেটবল ম্যচ দেখাচ্ছে। কিন্তু তাতেও দু-মিনিটের বেশি বসে থাকতে পারলেন না। মনটা বড় অস্থির লাগছে। পাশের ঘরে রবিন শুয়ে। একবার গিয়ে আবার ফিরে এলেন। রবিনের অবস্থা আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। শরীরের সব মাসল জবাব দিয়ে দিয়েছে। শুধু অনুভূতি আর বাঁচার ইচ্ছেটা রয়ে গিয়েছে। আর ক'টা দিন। তারপর সব শেষ। পনেরো বছরের ছেলেটাকে আর কোনওদিন দেখতে পাবেন না মার্ক।

অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও চিকিৎসা নেই এ অসুখের। গত ছ'মাস ধরে রবিন শয্যাশায়ী। হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। কথাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। তবু তো প্রাণ আছে। একটা উপলব্ধি আছে। চলে গেলে এ-ঘরে আর এক মুহূর্তও কাটাতে পারবেন না মার্ক।

ফের রবিনের ঘরে ঢুকলেন মার্ক। পাশে গিয়ে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ওর মা অনেক বছর আগে মারা গেছেন। মার্কের কাছেই মানুষ রবিন। অন্য বাবাদের তাদের ছেলেদের সঙ্গে যতটা যোগাযোগ থাকে, মার্কের সঙ্গে রবিনের যোগাযোগ তার থেকে অনেক বেশি। কাজের বাইরে বেশিরভাগ সময় কাটে ছেলেকে নিয়ে। যখন ও হাঁটতে পারত, তখন ওকে নিয়ে মার্ক নানান জায়গায় ঘুরতে যেতেন। কিন্তু শেষ কয়েকমাস ওকে নিয়ে কোথাও-ই যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, রবিনকে নিয়ে হুইলচেয়ারে ঘুরতে হবে। গাড়ির সিটে কোলে করে নিয়ে বসাতে হবে। নানান ঝামেলা।

কথাটা খেয়াল হতেই মার্কের মনে হল—আজকেই, হ্যাঁ, আজকেই তো রবিনকে নিয়ে বেরোনো যায়। কাছেই একটা জায়গায় লায়ন সাফারি আছে। সেখানে নিয়ে গেলে রবিনের খুব ভালো লাগবে। যেই ভাবা—সেই কাজ। আধঘণ্টার মধ্যে রবিনকে নিয়ে মার্ক বেরিয়ে এলেন।

লায়ন সাফারি বাড়ি থেকে দেড়ঘণ্টার রাস্তা। গাড়ি জোহানেসবার্গ থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক ছুটে চলল প্রিটোরিয়ার দিকে। তারপর ডানদিকে অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে উঠল। এ রাস্তাটা বিশেষ নিরাপদ নয়। কয়েকটা জায়গায় রাস্তার ধারে লেখাও আছে যে এখানে কিডন্যাপিং ও মার্ডার বেশি হয়। সাউথ আফ্রিকায় অবশ্য এরকম ওয়ার্নিং প্রায়শই দেখা যায়।

মার্ক একবার রবিনের মুখটা দেখে নিলেন। কথা না বললেও রবিনের মুখে একটা আনন্দের ছাপ। ওর মুখে এই হাসির ছোঁয়া দেখতে চাঁদে যেতেও রাজি মার্ক। স্টিরিয়োর গানটা চালিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে ব্রেক করে গাড়িটাকে কোনওভাবে থামাতে পারলেন মার্ক। রাস্তা জুড়ে একটা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে! কী ব্যাপার! দেখতে গাড়ি থেকে নামলেন। ট্রাকের দিকে এগোতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওকে জাপটে ধরে মুখের ওপর একটা রুমাল চেপে ধরল। 'রবিন' বলে চেঁচানোরও সময় পেলেন না মার্ক। অবশ্য চেঁচালেও রবিন তো আর ছুটে এগিয়ে আসত না। অচৈতন্য মার্ককে টেনে নিয়ে তোলা হল ট্রাকের পিছনে।

মেক্সিকো সিটি, 19 আগস্ট

পেড্রো ওর দশ বাই দশফুট সেলে চুপচাপ বসেছিল। সময়টা যেন এই সেলের অন্ধকারের মতোই থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভাবছিল নিজের কৃতকর্মের কথা। ওর ক্ষেত্রে কি এ শাস্তিটা লঘুদোষে গুরুদণ্ড নয়? সরকারের কিছু খারাপ কাজের কথা ফাঁস করেছিল ও। কীভাবে সরকার সবার ফোন ট্র্যাপ করে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে তথ্য জোগাড় করে, অন্য দেশের গোপনীয় খবর সংগ্রহ করে—এসব নিয়ে বিদেশের একটা পত্রিকায় লিখেছিল ও। তারপরই ওর ওপর একটা সাজানো খুনের চার্জ আনা হল। ফলত দশ বছর জেল। হাইসিকিউরিটি জেল। কিন্তু সে জেলেরও ক্ষমতা ছিল না 170 IQ-র পেড্রোকে রোখার। দু-বছরের মধ্যে জেল থেকে পালাল পেড্রো।

কথাটা মনে পড়তেই হেসে উঠল পেড্রো। জেলে কাঠের কাজ করতে হত ওদের। রোজ একঘণ্টার জন্য জেলের ওয়ার্কশপে কাঠের নানান জিনিস বানাতে দেওয়া হত। জেলরক্ষীদের সতর্ক প্রহরার মধ্যেই সবার চোখ এড়িয়ে একটার পর-একটা দরজার চাবি বানিয়ে ফেলল পেড্রো। প্রত্যেকটা দরজার তালা আলাদা, চাবি আলাদা। প্রথম দিকের কয়েকটা দরজার চাবির ছাঁচ তৈরি করা অতটা শক্ত ছিল না, কারণ এই পথ দিয়েই ওদের রোজ ওয়ার্কশপে কাজে নিয়ে যাওয়া হত। একবার তালার দিকে তাকিয়ে চাবি আন্দাজ করে সবার চোখ এড়িয়ে ওয়ার্কশপে চাবি তৈরি করা।

জেলের কয়েকজন সঙ্গী অবশ্য একথা জানতে পেরেছিল। তবে তারা পেড্রোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা জানত যে যদি জেল থেকে পালাতে হয়, তাহলে এই অসামান্য প্রতিভাবান বন্দির সাহায্যেই পালাতে হবে। প্রথম চারটে গেটের চাবি তৈরি করতে সময় লেগেছিল দু-মাস। কারণ শুধু দু-সেকেন্ড সময় পাওয়া যেত ওই চাবি টেস্ট করার। সঙ্গের রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে একবার কি-হোলে কোনওক্রমে মোচড় দিয়ে ছাপ তুলে নিত।

ওগুলো তো তা-ও সহজ ছিল। মুশকিল হল পরের ছ'টা গেট—যেখান দিয়ে পেড্রো কখনই যাওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তা সে যত শক্ত কাজই হোক না কেন। তিনদিন জেলারের চোখ এড়িয়ে অসম্ভব রিস্ক নিয়ে বাকি কয়েকটা গেটের তালা একনজর দেখতে পারল পেড্রো। শুধু তার ওপর আন্দাজ করেই চাবি বানিয়ে ফেলল। ফলত ছ-মাসের অবিরাম চেষ্টার পর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে দেশের সব থেকে হাই সিকিউরিটি জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেল।

দেশ ছেড়ে পালানোর অনেক চেষ্টা করেছিল পেড্রো। সম্ভব হয়নি। ছ'মাস পরে আবার ফিরতে হল শ্রীঘরে। তারপরে আরও একবছর কেটে গেছে। এবারেও একই জেলে। কিন্তু এবার আরও অনেক বেশি সতর্কতা। জেলের মধ্যে 322 নং সেলে যে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান অপরাধী আছে তা জেলের জমাদাররাও জানে। তাই সবদিক দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা। কোনও ফাঁক নেই। আগের বারের মতো পেড্রোকে কাঠের কাজ করতে দেওয়া হয় না, পোশাক তৈরি করতে দেওয়া হয় না। তিন-চার জন সিকিউরিটি গার্ড আসে খাওয়ার সময়। খুব সাবধানে খাবার দিয়ে চলে যায়। কোনও কথাও বলে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা উপায় পেড্রো বার করেছে। সময় একটু বেশি লাগবে। বছরখানেক লেগে যেতে পারে। তবু একটা জিনিস পেড্রো বুঝতে পেরেছে গত দু-বছরে। জীবন কত দামি। তাকে দশ বাই দশ ফুটের একটা ঘরে শেষ করে দেওয়া যায় না। আর এই আশার নামই জীবন। জীবনে কখনও এই আশা ছাড়তে রাজি হয়নি পেড্রো।

একটু ঝিমোচ্ছিল পেড্রো। হঠাৎ সেলের দরজা খুলে গেল। পরিচিত যারা আসে তাদের সঙ্গে আরও একজন আজকে। কী ব্যাপার? ওর প্ল্যানের কথা টের পেয়ে গেল নাকি?

ওকে নিয়ে এগিয়ে চলল লোকগুলো। অন্যদিনের মতো সতর্ক দৃষ্টি নেই ওর ওপর। সোজা জেলারের কাছে। পরের আধঘণ্টা স্বপ্নের মতো কাটল পেড্রোর। ও মুক্ত। সম্পূর্ণ মুক্ত। ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে একটা কাজ করতে হবে। কী কাজ? খুব খারাপ কোনও কাজ? নাকি ওকে মেরে ফেলারই কোনও চক্রান্ত করেছে এরা? সাবধানি হয়ে লোকটার সঙ্গে এগোতে লাগল পেড্রো।

অবশেষে খোলা আকাশের নীচে আসতেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল। মৃত্যু হোক, তবু তা আসুক খোলা আকাশের নীচে। জেলের ঠিক বাইরেই একটা দামি মার্সিডিজ অপেক্ষা করছিল ওর আর সঙ্গের লোকটার জন্যে। গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। পেড্রোও পিছু-পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ফিনিক্স-সোনোরান ডেজার্ট, 22 আগস্ট

অটিজম রিসার্চ সেন্টার। অবশ্য নামেই তা। রিসার্চের কাজের সঙ্গে এই নামের কোনও যোগাযোগ নেই। অনেক বাচ্চা আছে। তাদের মধ্যে অটিস্টিক বাচ্চা যেমন আছে, স্বাভাবিক বাচ্চাও আছে। কোত্থেকে এসব বাচ্চা ওরা জোগাড় করে তা রহস্য। এদের খোঁজও কেউ নিতে আসে না। কিন্তু এসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যায় না।

আজও একটা জিনিস অবাক লাগে ক্রিসের। এই রিসার্চ সেন্টার চলে কার টাকায়? শুনেছে বড় একটা গ্রুপ এর পিছনে আছে। কিন্তু তাদের ম্যানেজমেন্টের কাউকে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না।

অবশ্য এ নিয়ে ক্রিসের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। ও যথেষ্ট টাকা পায়। সরকারি রিসার্চ সেন্টারগুলোতে, এমনকী সেরা প্রাইভেট রিসার্চ সেন্টারগুলোতে এর অর্ধেক স্যালারিও পেত না। আর শুধু ও নয়, ওর সতীর্থ বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তাই বিশেষ আগ্রহ না দেখানোই ভালো।

আজকের দিনটা বিশেষ একটা দিন। প্রায় তিনমাস ধরে একটা নতুন জিনথেরাপির ওপর গবেষণার পর প্রথম টেস্ট হবে একদল বাচ্চার ওপরে। এদের প্রত্যেকের ওপরেই একটা বিশেষ ধরনের জিনথেরাপি করা হয়েছে। বিশেষ একরকম রেটো-ভাইরাস এদের জিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকদিন আগে। তা নিয়মমাফিক কাজ করছে কিনা তা আজ দেখা হবে।

ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল ক্রিস। মরুভূমির মধ্যে খানিকটা বেখাপ্পা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটা। যতদূর দেখা যায়—সোনোরান ডেজার্ট, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ। লোকজনের চোখের আড়ালে বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু পাঁচিল, বাইরে কড়া নিরাপত্তা। তার মধ্যে এই বাড়ি, বাইরে এখন তাপমাত্রা 50 ডিগ্রির মতো। প্রচণ্ড চড়া রোদ। দু-মিনিটের বেশি দাঁড়াতে কষ্ট হয়। বাইরের এই রুক্ষতা যেন ক্রিসের চরিত্রের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বাচ্চাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও কোনও দ্বিধা হয় না ক্রিসের। যারা আসে তারা সব গিনিপিগ। কেউ মারা গেলেও কারুর কিছু আসে যায় না।

ঘরের ভেতরে ঢুকে এল ক্রিস। তারপর ঘরের অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে লবি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। খানিকটা এগিয়ে ডানদিকের রিসার্চ ল্যাবে ঢুকে পড়ল। পল, রবিন ও অন্যান্য অ্যাসিট্যান্টরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। পাশের ঘর আর এ-ঘরের মধ্যে একটা কাচের দেওয়াল আছে। তা দিয়ে পাশের ঘরে কী হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কফি মেশিন থেকে কফি নিয়ে চেয়ারে এসে বসল ক্রিস।

—আমরা রেডি?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এবার শুরু করব। রবিন বলে উঠল।

পাশের ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হল। দেখার জন্য প্রত্যেকে নাইট-ভিশন চশমা পরে নিল।

এবার সুইচ টিপে পাশের ঘরের দরজা খুলে দিল রবিন। দরজা দিয়ে আটটা বছর তিন-চারেকের বাচ্চা ঘরে ঢুকল। ঘরে নানান খেলার জিনিস ছড়িয়ে রাখা আছে। কয়েকটা পাজলের ব্লক, চেসবোর্ড, বেশ কয়েকটা গাড়ি, পুতুল। ওরা ঢুকে খেলনাগুলো নিয়ে খেলায় মেতে উঠল! ঘরের অন্ধকারের জন্য কারও কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না। একটা বাচ্চা দু-মিনিটের মধ্যেই দুরূহ রুবিক কিউব পাজল সলভ করে ফেলল।

পল বলে উঠল,—আশ্চর্য! দেখলেন ক্রিস!—কী অসামান্য ইনটেলিজেন্স। এবার আমি আস্তে-আস্তে ঘরের উষ্ণতা কমাব আর সঙ্গে সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাড়াব।—রবিন বলে উঠল।

ঘরটা আস্তে-আস্তে ধোঁয়ায় ভরে গেল। বাইরে থেকে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাচ্চাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না।

উত্তেজনায় রবিন ক্রিসের হাত ঝাঁকিয়ে বলে উঠল,—কাজ করছে! 15 ppm আমরা কোনওভাবে সহ্য করতে পারতাম না। অথচ এখনও ওদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা যা সহ্য করতে পারি ওরা তার থেকে অনেক বেশি সহ্য করতে পারছে। আর একটুক্ষণ দেখা যাক।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। মনিটরগুলোতে বাচ্চাগুলোর হার্টবিট, পালসরেট, অন্যান্য শারীরিক অবস্থা দেখা হচ্ছে।

হঠাৎ পল হাত তুলল,—শিগগিরি ওদের বার করো—দুটো বাচ্চা সহ্য করতে পারছে না। ওই দ্যাখো।

খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে দুজন ঠিক স্বাভাবিক নেই। খেলনা ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ অপারেশন শুরু। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক ওই ঘরে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে বার করে নিল। মেডিক্যাল এমার্জেন্সি টিম রেডি ছিল। তাড়াতাড়ি ওদের দেখতে শুরু করল। কোনও বিপদ হয়নি। বাচ্চাদুটো মোটামুটি ঠিকই আছে।

তবে এক্সপেরিমেন্ট সেদিনের মতো শেষ। ক্রিস পলকে বলে উঠল,—আমরা ঠিক দিকেই এগোচ্ছি। তবে একেক জনের ওপর প্রভাবটা একেকরকম হচ্ছে। আমাদের আরও এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। আরও টেস্ট সাবজেক্ট লাগবে। বেশ কিছু বাচ্চা আরও দরকার।

ত্রিবান্দ্রম, 20 সেপ্টেম্বর

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে গানের সিডি কেনার জন্য কেরালা গভর্নমেন্টের একটা দোকানে ঢুকল অনিলিখা। বেশ বড় দোকান। শুধু স্থানীয় রাগাশ্রয়ী গান, বাঁশির সিডি নয়, নানান ধরনের চাদর, বিশেষ ধরনের শাড়ি, কথাকলি নাচের মুখোশ, চন্দন কাঠের ওপর কাজ করা মূর্তি, বিভিন্ন স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র—সবই আছে।

চন্দন কাঠের ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি আর-একটা শাড়ি কিনে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ অনিলিখার চোখ পড়ল পাশের গাড়িতে। মাঝের সিটে একটা গুন্ডামতন চেহারার মাথা কামানো কালো মুশকো লোক বসে আছে। আর তার পাশে ঠিক সেরকমই এক নিতান্ত ভদ্রোচিত চেহারার লোক। ফরসা রং, চোখা চোখা নাক মুখ, সাদা দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। লোকটা সিটে ঘাড় এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। সায়েন্টিস্ট স্বরাজ পল না?

অনিলিখার গাড়ির ড্রাইভার গাড়িতে নেই। আশেপাশে কোথাও গেছে। তাকে ফোন করে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল অনিলিখা। পাশের গাড়িটা লক্ষ করতে লাগল। পাশের গাড়ির ড্রাইভার একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট নিয়ে খানিকবাদে ফিরে এল। তারপর তাড়াহুড়ো করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আধমিনিটের মধ্যে অনিলিখার গাড়ির ড্রাইভার কিষেণও এসে উপস্থিত। চট করে গাড়িতে উঠে অনিলিখা এয়ারপোর্টের উলটোদিকে গাড়ি চালাতে বলল।

—কিষেণ, ওই যে দূরে সাদা টয়োটা গাড়িটা দেখছ ওটাকে ফলো করো। খুব দরকার।

—এয়ারপোর্টে যাবেন না? আপনার তো ফ্লাইট আছে!

—-এয়ারপোর্ট পরে। আগে ওই গাড়িটাকে ফলো করো। খুব আর্জেন্ট।

একটু রহস্যের গন্ধ পেয়ে কিষেণ আর কোনও কথা না বলে ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল। আর দূর থেকে আগের গাড়িটাকে ফলো করে এগোতে থাকল।

স্বরাজ পলকে অনিলিখা ব্যক্তিগতভাবে চেনে না। ইসরোর সঙ্গে যুক্ত নামকরা মহাকাশ বিজ্ঞানী। নামটা শোনা। পরশুদিন খবরের কাগজে ওনার একটা ছবি আর খবর ছিল। চাঁদিপুরের বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ওখানকার বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে বেরিয়েছিলেন। আর বাড়িতে ফেরেননি। কারুর সঙ্গে যোগাযোগও করেননি। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলছে। তা উনি হঠাৎ করে এখানে!

ত্রিবান্দ্রম থেকে দক্ষিণের দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি। কন্যাকুমারিকার দিকে। ত্রিবান্দ্রমের মূল শহর ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল গ্রামের পথ দিয়ে। দু-পাশে ধানখেত, নারকোল আর পাম গাছের সারি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-একটা বাড়ি। প্রত্যন্ত এলাকায় চলে এসেছে ওরা।

প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে বড় রাস্তা থেকে বাঁ-দিকে ঘুরল সামনের ইনোভা গাড়িটা। সরু পিচের রাস্তা। মিনিট দশেক বাদে একটা বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল!

কিষেণকে গাড়ি নিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়াতে বলে অনিলিখা হেঁটে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। একটু দূরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। গেটে কাউকে না দেখে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল অনিলিখা। ইনোভা গাড়িটা বাঁ-দিকে পার্ক করা আছে। চারপাশে পরপর বেশ কয়েকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কটেজ। খানিকটা এগোলে পিছনের দিকে বড় তিনতলা একটা বাড়ি। বাড়িটার দিকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল অনিলিখা। হঠাৎ চেনা গলার ডাকে ঘাড় ঘুরিয়ে চমকে উঠল অনিলিখা। রাজা। ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

—চলো অনি, এতটা যখন এসেই পড়েছ, ভেতরে এসো, এমনিতেও তোমার মতো একজনের আমাদের দরকার ছিল। আর্যভট্টর দেশের লোকেদের মাথা খুব পরিষ্কার।

অনিলিখাকে নিয়ে রাজা বাড়িটার মধ্যে ঢুকল।

ত্রিবান্দ্রম, 20 সেপ্টেম্বর—চব্বিশ দিন বাকি

অনিলিখাকে নিয়ে রাজা একটা প্যাসেজ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল। ডানদিকে সার দেওয়া ঘর। বাড়িটা বোধহয় স্কুলবিল্ডিং বা বড় সরকারি বিল্ডিং ছিল। সব ঘরের দরজায় তালা। খানিক আগে গিয়ে প্যাসেজটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। তারপর আর একটু এগিয়ে একটা বড় কাঠের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

রাজা এগিয়ে গিয়ে কাঠের দরজার হাতলের সামনে হাত রাখল। দরজাটা অদ্ভুতভাবে পাশাপাশি সরে গেল। সামনে ছোট একটা কাচে ঘেরা জায়গা। তারপরে একটা বিশাল বড় ঘর। ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ অনিলিখার মুখে কোনও কথা এল না। অবাক হয়ে অনিলিখা বলে উঠল—এখানে এসব কী? স্যাটেলাইট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার?

বিশাল ঘরটার সিলিং-এর হাইট অন্তত চল্লিশ ফুট। আর তার মধ্যে দশটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট অনায়াসে ঢুকে যায়। সারি দিয়ে পরপর কন্ট্রোল ডেস্ক। তার ওপর অত্যাধুনিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্যানেল। প্রত্যেকটাতে ডিসপ্লে, সিমুলেটর, অজানা কিছু যন্ত্র। ঘরের মধ্যে অন্তত কুড়িজন লোক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। সামনের পুরো দেওয়াল জুড়ে রাখা বিশাল এল.ই.ডি. প্যানেলে বিশাল পৃথিবীর ম্যাপ। তার মধ্যে বিশেষ কতগুলো জায়গায় লাল-হলুদ আলো দপদপ করছে।

—কী ব্যাপার রাজা? এসব কী?

—চলো ক্যাফেতে যাওয়া যাক! পাঁচ মিনিটে তোমাকে সব বলে দিই। আমার হাতেও একদম সময় নেই।

খানিকবাদে ওই বাড়িরই আরেকটা বড় ঘরে ওরা এসে ঢোকে। সার দিয়ে চা-কফির মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা। চট করে মেশিন থেকে দুটো কফি নিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসে রাজা বলে উঠল,—

—আমাদের খুব বিপদ অনিলিখা। উই আর অন দ্য ভার্জ অফ এক্সটিংকশন। সারা পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা অ্যাসটেরয়েড ঠিক চব্বিশ দিন বাদে আমাদের এই পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। ভাবতে পারছ?

—সে কী! পৃথিবীতে ধাক্কা মারতে পারে এমন প্রায় সব স্যাটেলাইটকেই তো আমরা চিহ্নিত করে ফেলেছিলাম। হঠাৎ করে এই অ্যাসটেরয়েডটা এল কোত্থেকে?

—ওই, ওই যে 'প্রায়' কথাটা বললে। এক কিলোমিটারের থেকে বড় নব্বই শতাংশ পাথরকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বাকি দশ? দু-মাস আগে নিউ মেক্সিকোর এক মিটার লম্বা একটা টেলিস্কোপে যতক্ষণ না এই অ্যাসটেরয়েডটা ধরা পড়েছিল, ততক্ষণ আমরাও তোমার মতো নিশ্চিন্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম আমরা বোধহয় সব অ্যাসটেরয়েডের কথাই জানি। তারপরে হঠাৎ এই শনির উদয়। হ্যাঁ, এই অ্যাসটেরয়েডটার নাম দেওয়া হয়েছে শনি।

—তা এ ধাক্কা মারলে কী হবে?

—প্রাণের কোনও চিহ্নই থাকবে না বলতে পারো। কারণ এক কিলোমিটারের বেশি কোনও অ্যাসটেরয়েড ধাক্কা মারলে তার প্রভাব কোনও একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। হিরোশিমার মতো দশ হাজারটা পরমাণু বোমা একসঙ্গে ফাটলে যা ফল হয় তাই আর কি! ঠিক যেমন পঁয়ষট্টি লক্ষ বছর আগে ডাইনোসরদের যুগ শেষ হয়েছিল এরকমই একটা অ্যাসটেরয়েডের আঘাতে—তেমনই হতে চলেছে। এবার আমাদের পালা। ওই যে আমরা ভাবতাম আমরা খুব বুদ্ধিমান—আমরাই দু-মিলিয়ান বছর ধরে রাজত্ব করব—সব ভুল।

রাজা খানিকক্ষণ থেমে ফের উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—তবে সব কিছু এখনও শেষ হয়নি অনিলিখা। এখনও উপায় আছে। আর তাই আমরা সমবেত হয়েছি। এখানে যাদের দেখছ তারা সবাই মহাকাশ বিজ্ঞানে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে কেউ মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে মহাকাশে গেছেন, তো কেউ স্পেস ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। মহাকাশ যাত্রার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। অনেকের আবার এ বিষয়ে প্রচুর রিসার্চ আছে। এঁরা সবাই বাড়িঘর-পরিবার ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন।

—অনেককে না জানিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছ, তাই না? স্বরাজ পলের মতো?

—করতে হয়েছে অনিলিখা। মনে রেখো এ বিষয়ে পৃথিবীর সেরা মেধাকে একসঙ্গে না করতে পারলে কোনও সমাধান বেরোবে না। আর তখন এ পৃথিবীই থাকবে না। আমরা কেউ থাকব না। না থাকবে আমাদের পরিবার—না থাকবে আমাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন কেউ না! ঘটা করে ডেকে আনলে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেত না।

—কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে কি সম্ভব?

—সেটাই তো চ্যালেঞ্জ অনিলিখা। আমরা কুড়ি বছরের কাজ দু-মাসে করার চেষ্টা করছি। প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মুহূর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান। এই যে তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলছি, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে অনিলিখা। তুমি ঠিক এ বিষয়ের না হলেও তোমার অসম্ভব ট্যালেন্ট সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো। আমরা সবাই এ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তোমার চিন্তাভাবনার খোলা হাওয়া আমাদের দরকার। তবে বাড়ির কাউকে এ ব্যাপারে জানাতে পারবে না।

—কিন্তু ওরা তো চিন্তা করবে। হয়তো পুলিশে খবর দেবে। তখন?

—ওসব চিন্তা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। আমার লজিস্টিক্স টিম সব সামলে নেবে। হয়তো অন্য কোনও কারণ জানানো হবে।

—ঠিক আছে রাজা। বাড়িতে অন্তত একটা ফোন করে দিই।

—একটাও না,—অস্বাভাবিকরকম জোরে শাসনের সুরে বলে উঠল রাজা। তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বলল,—এমনিতেও পুরো এলাকার সবরকম নেটওয়ার্ক ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। এখানে যারা আছে তারা কেউ চাইলেও এ-প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। এটাই এখানকার নিয়ম। ভাবতে পারছ কী হবে যদি এই অ্যাসটেরয়েডের ধাক্কার কথা বাইরে কোনওভাবে জানাজানি হয়ে যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে। আইনকানুন ভেঙে পড়বে। প্যানিক ছড়িয়ে পড়বে। আমরা আমাদের ধ্বংস আরও তাড়াতাড়ি ডেকে আনব।

অনিলিখাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রাজা ফের বলে উঠল,—আর তোমাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে আমরাই ইচ্ছে করে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। তা না হলে কারও পক্ষে এখানে ঢোকাও সম্ভব নয়—বেরোনোও সম্ভব নয়। সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেও।

—তা হঠাৎ করে এখানে? এখানে তো কোনও সুযোগ সুবিধেই নেই। অনিলিখা এতক্ষণে কফিতে চুমুক দিয়ে বলে উঠল।

—আমরাই চাইনি মূল মহাকাশ কেন্দ্রগুলোতে এ নিয়ে কাজ করতে। তাতে খবর ছড়িয়ে যেত তাড়াতাড়ি। এরকম টপ সিক্রেট প্রোজেক্টে অনেক অসুবিধে। আমরা তাই অন্য উপায়

বেছে নিয়েছি। আমরা চারটে টিমে কাজ করছি। চারটে টিম চার ধরনের পদ্ধতিতে অ্যাসটেরয়েডের ধাক্কা আটকানোর চেষ্টা করছে। আমেরিকার টিমটা ফ্লোরিডায়। কেনেডি স্পেস সেন্টারের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে কাজ করছে। দ্বিতীয় টিমটা জার্মানির মিউনিখে। জার্মানির কলম্বাস কন্ট্রোল সেন্টারের কাছাকাছি একটা জায়গায় আছে। তৃতীয় টিমটা জাপানের সুকুবা স্পেস সেন্টারের কাছে অপারেট করছে। আর চতুর্থ টিম—আমরা। এখানে। বিক্রম সারাভাই স্পেস স্টেশনের কাছে।

আমরা এসব কেন্দ্র থেকে সবরকম প্রযুক্তিগত সাহায্য পাচ্ছি, আবার একইসঙ্গে গোপনীয়তাও রক্ষা হচ্ছে। কারণ আমরা কাজ করছি এসব মহাকাশ কেন্দ্রের বিশেষ কিছু লোকের সঙ্গে। আমাদের কাজটা তো রকেট তৈরি করা নয় বা লঞ্চ সেন্টার তৈরি করাও নয়। আমরা শুধু সারা বিশ্বের সবক'টা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, লঞ্চ সেন্টার আর মিশন কন্ট্রোল সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করে এই প্রোজেক্টটাকে পরিচালনা করছি।

—তা, টিমগুলো কাজ করছে কীভাবে?

—আমেরিকার টিমটা কাজ করছে পারমাণবিক রকেটের ওপর। রকেটের সাহায্য পরমাণু বোমা ছোঁড়া হবে। প্রচণ্ড গতিতে গিয়ে ধাক্কা মারবে অ্যাসটেরয়েডকে। পৃথিবীতে ঢোকার আগেই অ্যাসটেরয়েড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এতে সমস্যা আছে। ভাঙা বড় টুকরো পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে পারে, তবে এটাই প্রধান সমস্যা নয়। সমস্যা হল এ ধরনের রকেট ছোঁড়ার অনুমতি পাওয়া। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই অন্য কোথাও গিয়ে পড়বে। আর তাতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলে যে কী হবে! সারা পৃথিবী একজোট হয়ে সম্মতি দিলে তবেই এরকম রকেট ছোঁড়া যাবে। তবে পরমাণুবোমা অন্য কোনওভাবে অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসানো যায় কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে।

—জার্মানির টিমটা?

—বুঝতেই পারছ জার্মানির টিমটা ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি আর রাশিয়ার ফেডারেল স্পেস এজেন্সির সঙ্গে মূলত কাজ করছে। ওরা সৌরশক্তি চালিত মেশিন অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে। ওপরে ওখানে তো আর সূর্যের আলোর অভাব নেই। ওই মেশিন সৌরশক্তিতে চলবে আর আস্তে আস্তে অ্যাসটেরয়েডের মুখ ঘুরিয়ে দেবে। মুশকিল হল, সময় খুব কম। এতটুকু সময়ের মধ্যে এত শক্তিশালী একটা মেশিন তৈরি করা, তাকে ঠিকভাবে অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসানোও চাট্টিখানি কথা নয়। পাঁচ-ছ'বছর সময় পাওয়া গেলে এভাবে কিছু করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন তো মাঝে কয়েকটা দিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজা। পাশের কাচের জানলার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে এরকম হতে পারে। আমার দু-মাস সবে বিয়ে হয়েছে। ওকেও কিছু জানাইনি। হয়তো আর দেখাও হবে না।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—তৃতীয় টিম জাপানের। ওই টিমের কাজটা খুব অভিনব। ওরা ভাবছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে একটা বড় লেন্স পাঠানোর কথা—যার সাহায্যে সৌরশক্তিকে অ্যাসটেরয়েডের ওপর ফোকাস করা হবে। এতে অ্যাসটেরয়েডের কিছু অংশ পুড়ে যাবে আর ভর কমে যাওয়ার জন্য অ্যাসটেরয়েডের গতিপথ আস্তে আস্তে পালটে যাবে। এখানে কিছুটা কাজ এগিয়েছে। তবে প্রশ্ন হল গতিপথ যতটা পালটানো যাবে তা যথেষ্ট কি না।

—আর এখানকার টিমটা?

—আমরা ভাবছি একটা মহাকাশযান পাঠাব যা ওই অ্যাসটেরয়েডের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সরাসরি অ্যাসটেরয়েডের গায়ে না বসে পাশাপাশি যাবে আর অভিকর্ষ বলের সাহায্যে অ্যাসটেরয়েডকে কাছে টেনে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

—তা তার জন্য তো বিশাল মহাকাশযান পাঠাতে হবে।

—হ্যাঁ, সেটাই তো সমস্যা। কতটা কন্ট্রোল দরকার ভাবতে পারছ? মাত্র এ-ক'দিনে কতটা সরানো যাবে সেটাই প্রশ্ন। আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব বেশি পে-লোড পাঠাবার, যাতে অভিকর্ষবল জোরদার হয়। আর যতটা সম্ভব গতিপথ পালটানো যায়। মুশকিল হল, এ পর্যন্ত মহাকাশে যত পে-লোড আমরা পাঠিয়েছি, এক্ষেত্রে দরকার হবে তার হাজারগুণ বেশি পে-লোডের। তবে সেটাও যদি কাজ না করে—

রাজা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—চলো এবার কাজে নেমে পড়া যাক। তোমার দায়িত্ব কী হবে তা বুঝিয়ে বলি। মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন। বলে রাজা অনিলিখাকে নিয়ে দ্রুতপায়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রোজেক্ট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার,
ত্রিবান্দ্রম, 24 সেপ্টেম্বর—কুড়ি দিন বাকি

কয়েকটা দিন ঝড়ের মতো কেটে গেল। দিনরাত কাজ চলছে। এ তো আর শুধু পরিকল্পনা আর গবেষণা নয়, সেই পরিকল্পনাকে সাকার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবস্থাও নিতে হচ্ছে।

এতগুলো স্পেস এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও একটা ব্যাপার। তার মধ্যে ইজরায়েলের স্পেস এজেন্সিও যেমন আছে, তার শত্রুদেশ ইরানের স্পেস এজেন্সিও আছে। চিনের স্পেস

অর্গানাইজেশনও আছে। জাপানের এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি আছে। একই সঙ্গে সবরকম গোপনীয়তাও অবলম্বন করতে হচ্ছে। দেখা হচ্ছে কোথায় কোন লঞ্চ সেন্টার আছে, সেখান থেকে অতীতে কী ধরনের রকেট ছোঁড়া হয়েছে, তাদের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা কীরকম। সবচেয়ে বড় কী রকেট আছে—তাদের কোন উচ্চতা পর্যন্ত পাঠানোর ক্ষমতা আছে। তারপরে প্রয়োজনমতো তাদের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে।

অনিলিখা রাজাকে মূলত সাহায্য করছে পুরো প্রোজেক্টের ম্যানেজমেন্টে, নতুন চিন্তাভাবনা জোগাতে, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

রাজা সত্যিই দক্ষ প্রশাসক। এতজন নামকরা বিজ্ঞানীকে হঠাৎ এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদেরকে দিয়ে একসঙ্গে কাজ করানো সোজা কথা নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে, ইগো আছে। অনেকে এরকম টিমে কাজ করতে অভ্যস্তই নয়। তা ছাড়া নানান দেশের নানান ভাষার সমস্যা—নানানরকমের ব্যবহার—এসব সমস্যা তো আছেই; অনিলিখার সামনেই সেদিন নাসার সায়েন্টিস্ট ডক্টর স্টিভেন আর রাশিয়ান কসমোনট কোটভ ওলেগের মধ্যে কাজের পদ্ধতি নিয়ে এমন তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে, রাজা এসে মধ্যস্থতা না করলে কী হত বলা মুশকিল।

এদের মধ্যে অনেকেরই মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে। কেউ কেউ আবার মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করেছে। যেমন জাপানের ডক্টর ওয়াকাটা। ইনি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আগে কাজ করেছেন। রোবোটিক্স অপারেশনের সব দায়িত্ব পালন করেছেন। কীভাবে মহাকাশে রোবোটিক্স আর্ম ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে উনি এক্সপার্ট। আবার কারো কারো রিকের মতো বহুমুখী অভিজ্ঞতা। রিকের কথাই বলা যাক। প্রথমে স্পেস ফ্লাইটের জন্য সফটওয়্যারের ওপর কাজ করেছেন। পরে ককপিটের ডিজাইনের ওপর কাজ করেছেন। তারপর অ্যাসটনটের ট্রেনিং নিয়ে তিনটে মহাকাশ যাত্রায় মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। মহাকাশে চল্লিশ দিন কাটিয়েছেন। মহাকাশে হেঁটেওছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ। না জানিয়ে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে।

যেমন মার্ক। মূলত গণিতজ্ঞ। অ্যাসটেরয়েডের কক্ষপথ গণনায় ওনার মতো এক্সপার্ট খুব কম আছে। থাকেন জোহানেসবার্গে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ওনাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। উনি মাঝেমধ্যেই রাজার ওপর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন। তবে কাজ বন্ধ করেননি।

এসবের মধ্যেই রাজা ঠান্ডা মাথায় কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। নিয়মের কোনও নড়চড় নেই। প্রত্যেকদিন তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর কুড়ি মিনিটের জন্য টিমের মধ্যে কাজের

সমন্বয়ের জন্য টিম মিটিং হচ্ছে। দিনে একবার প্রত্যেকটা টিম এক ঘণ্টার জন্য অন্য টিমগুলোর সঙ্গে কথা বলছে। কোন টিম তাদের কাজে কতটা এগিয়েছে, তা অন্য টিমকে জানানো হচ্ছে। তাদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া রাজার প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট টিমের সঙ্গে নানান মহাকাশ সংস্থার কথাবার্তা চালু আছে।

রাজা অনিলিখাকে একবার বলেছিল,—প্রথমবার সারা বিশ্ব একজোটে কাজ করছে। আমি নিজেও সবার কাছ থেকে এতটা সাপোর্ট পাব তা ভাবতে পারিনি। আমরা দেশভাগ ভুলে একসঙ্গে কাজ করলে কী না পারি? তবে যাকে বলে মরণকালে হরিনাম।

অনিলিখা বলে উঠল,—কেন, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের কাজে পৃথিবীর নানান দেশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রায় গত পনেরো বছর ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারের কাজ তো এভাবে চলছে।

—সে আর ক'টা দেশ! তা-ও অনেক লিখিত অলিখিত নিয়ম আছে। বাধা নিষেধ আছে। এখানে পৃথিবীর যে-ক'টা দেশে মহাকাশ প্রযুক্তি খানিকটা এগিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। প্রথমবার সারা পৃথিবী এক আকাশের তলায়। উপায় একটা বেরোবেই।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজা।—মুশকিল একটাই। আর মোটে কুড়িদিন বাকি।

ত্রিবান্দ্রম, 26 সেপ্টেম্বর—আঠেরো দিন বাকি

—ডক্টর ন্যাশ, এ মেলটা কি আপনারই লেখা? রাজা বলে উঠল।

ডক্টর ন্যাশ ওনার ডেস্কে সিম্যুলেটর নিয়ে কী সব করছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। কাগজটা একঝলক দেখামাত্র ওনার কানদুটো লাল হয়ে উঠল। ডক্টর ন্যাশ ইংল্যান্ডের লোক। 'অ্যাসটেরয়েডরা যখন সূর্যের কাছ দিয়ে যায়, তখন তাপ গ্রহণ করে। পরে সে তাপ যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার গতিপথে সামান্য পরিবর্তন হয়।' ডক্টর ন্যাশ এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। অত্যন্ত সজ্জন, পণ্ডিত ব্যক্তি। উনিও ভারতের টিমে আছেন।

রাজা বলতে থাকে,—আপনি লিখেছেন যে আপনি অন্তত এটা দেখবেন যে অ্যাসটেরয়েডের আঘাতে ইংল্যান্ডের বড় কোনও বিপদ না হয়। এ-ও লিখেছেন যে গতিপথে সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব হলে ইংল্যান্ড বা আয়ার্ল্যান্ডের তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। অ্যাসটেরয়েড আফ্রিকার ভূখণ্ডে এসে পড়বে। রকেট ছোঁড়া সম্ভব হলে এটা আপনি নিশ্চিত করবেন। এখানে আসার আগে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সাংকেতিক মেসেজে পাঠালেও আমার উদ্ধার করতে অসুবিধে হয়নি। এই মেলটা কাকে করেছেন তা-ও আমরা জেনে গেছি। আমাদের লক্ষ্য পুরো পৃথিবীকে বাঁচানো, কোনও একটা দেশকে নয়। তাই না?

ডক্টর ন্যাশ মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

রাজা ফের বলল,—আমি এ-ও জানি যে G8-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটে দেশের শীর্ষনেতাকে দুদিন আগে আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিনে এক পাবে মাঝরাতে আলোচনা করতে দেখা গেছে—যার মূল বিষয় ছিল কীভাবে সেই তিনটে দেশকে এই অ্যাসটেরয়েডের আঘাত থেকে রক্ষা করা যায়। আমি নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে আরও কেউ আছে যার হয়তো এরকম কোনও সংকীর্ণ স্বার্থ আছে।

নাইজেরিয়ার বিজ্ঞানী ডঃ আজিজ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন,—এ জন্যই আমরা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করি না। বাকি পৃথিবীতে আর কোনও লোক বেঁচে না থাকলেও ওদের কিছু আসে যায় না।

ব্যস, পুরো ঘরে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। প্রায় মাছের বাজারের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীর অনেক চেষ্টার পরে পরিস্থিতি আয়ত্তে এল।

অনিলিখা শান্তভাবে বলতে শুরু করল,—আপনারা সবাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোক। আমিই বরঞ্চ এ বিষয়ের নই। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে এ সংঘাত হলে কোনও দেশই রক্ষা পাবে না। কিছু দেশ হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু যারা পড়ে থাকবে তাদের অবস্থা হবে আরও খারাপ। পুরো আকাশ ঢেকে যাবে ধুলোয়। মাসের পর-মাস, বছরের পর-বছর সে ধুলোর বাষ্পে ঢেকে যাবে সূর্যের আলো। থাকবে না কোনও গাছপালা, থাকবে না কোনও খাদ্য। আমরা কেউ থাকব না। আসুন, আমরা এখানে রাজনীতি থেকে দূরে থাকি। দেশের সীমারেখা ভুলে যাই। আমাদের একটাই দেশ। তা হল পৃথিবী। আমরা তাকে বাঁচাবই। এখনও আঠেরো দিন বাকি।

মিউনিখ, 30 সেপ্টেম্বর—চোদ্দো দিন বাকি

ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এ চারটে টিমেরই প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিস উপস্থিত। এরাই প্রোজেক্টের পুরো প্ল্যান নিয়ন্ত্রণ করে। জার্মান টিমের প্রধান অ্যাক্সেল ওয়াইজ ঘুম জড়ানো গলায় বলতে শুরু করলেন,—নাহ, কোনওভাবেই সম্ভব নয়। দশ বছরের কাজ কি আর দু-মাসে করা যায়! তবু আমরা হাল ছাড়িনি।

একটু থেমে ফের শুরু করলেন,—কাজাখস্তানের বৈকনুর কসমোড্রোম, ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি, মস্কোর মিশন কন্ট্রোল সেন্টার গত দেড়মাস ধরে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে গেছে আমাদের সঙ্গে। গুড নিউজ হল তার জন্য এখন আমরা একটা প্রোটন রকেট বৈকনুর কসমোড্রোম থেকে লঞ্চ করতে প্রস্তুত। তাতে আমরা রোবোটিক্স ল্যাবরেটরিও বসিয়ে দিয়েছি। সৌরশক্তি চালিত যন্ত্র রোবো দু-ঘণ্টা আগে রেডি হয়ে গেছে, যদিও তার শক্তি খুবই সীমিত। আমাদের স্পেস টাভেল এক্সপার্ট থিওডরও প্রস্তুত। থিওডরের মতো স্পেস ট্রাভেলে অভিজ্ঞ

কসমোনট সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে। কিন্তু এতসব করার পরেও রকেট পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না।

—কেন? অ্যাসটেরয়েডে রোবো বসাতে কোনও মুশকিল হচ্ছে? জন এদিক থেকে বলে উঠল।

—বুঝতেই পারছ সে কাজটা সোজা নয়। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল অ্যাসটেরয়েড এখন পৃথিবীর এত কাছে চলে এসেছে যে এই চোদ্দো দিনে গতিপথে যা পরিবর্তন করা যাবে, গণনা করে দেখা যাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। দেখো—ট্যাজেক্টরির কতটুকু পরিবর্তন হবে—বলে অ্যাক্সেল ওখানকার কনফারেন্স রুমের ডিসপ্লেতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

—আগের গতিপথ আর নতুন পরিবর্তিত গতিপথের মধ্যে প্রায় কোনওই তফাত নেই। এমনকী পৃথিবীর যে জায়গায় অ্যাসটেরয়েড ধাক্কা মারত, তার সঙ্গে পরিবর্তিত জায়গার দূরত্ব হবে বড়জোর চারশো কিলোমিটার।

অ্যাক্সেল একটু কেশে নিয়ে ফের বলে উঠলেন,—অ্যাসটেরয়েড এখন এত কাছে এসে গেছে যে আমার মনে হয় না ইনডাইরেক্ট মেথডগুলো দিয়ে আর কোনও কাজ হবে। ওই সাইজের অ্যাসটেরয়েডকে এত কম সময়ের মধ্যে সরাতে যা শক্তির প্রয়োজন, তার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ শক্তিসম্পন্ন মেশিন পাঠানোর ক্ষমতাও আমাদের নেই। এখন উপায় সরাসরি ধাক্কা।

কায়টো টাকাহাসি জাপানের টিমের প্রধান। উনিও অ্যাক্সেলের সপক্ষে বলে উঠলেন,—আমরা জাপানে কোনও কিছু সহজে ছেড়ে দিই না। শেষ পর্যন্ত আশা রাখি। কিন্তু আমাদের টিমেরও এই ধারণা। আমাদের লেন্স তৈরির কাজ প্রায় আশি শতাংশ হয়ে গেছে। আমরা এখন থেকে ঠিক চারদিন তিন ঘণ্টার মধ্যে ওই লেন্স ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করেছি। কিন্তু ওখানে ঠিকভাবে লাগাতে, অ্যাসেম্বল করতে, লেন্সের সাহায্যে সৌরশক্তি কেন্দ্রীভূত করে অ্যাসটেরয়েডে ফেলার জন্য প্রস্তুত হতে আরও অন্তত বারো ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ, পড়ে থাকবে ন'দিন-ন'ঘণ্টা। তাতে অ্যাসটেরয়েড যতটাই ভস্মীভূত হোক না কেন—তা যথেষ্ট নয়। ওইটুকু ভর কমলে গতিপথ কিছুই পালটাবে না। আমাদের সফল হওয়ার প্রোবাবিলিটি হাজার ভাগের একভাগ।

তা ছাড়া এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্রযুক্তি পরীক্ষিত নয়। এত দ্রুত ধাবমান অ্যাসটেরয়েডের গতির সঙ্গে লেন্সের দিক পরিবর্তনের তাল মেলাতে হবে। আমারও মনে হয় আমরা আলাদা আলাদা করে চেষ্টা না করে এখন একটাই উপায় ঠিক করি। তাতে অন্তত কিছু যদি করা সম্ভব হয়।

আরও বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। একটা কথাই বোঝা গেল যে প্রত্যেকেই অসহায়। প্রত্যেকেই ভাবছে যে অন্য কেউ যদি কিছু মির্যাকল করে দেখায়। 'অসম্ভব' কথাটা প্রথমবার সত্যি মনে হল অনিলিখার। যত সময় যাচ্ছে একটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যেকের মধ্যে —চোখে-মুখে, হাঁটাচলায়। অনিলিখা নিজেও তার বাইরে নয়। সত্যিই কি আর চোদ্দো দিনে সব শেষ হয়ে যাবে!

ঘরে ফিরে এসে ফোনে সেভ করে রাখা আগের ছবিগুলো দেখল অনিলিখা। মা-বাবা-বন্ধুদের ছবি। আর কি কখনও দেখা হবে? ইস, কত কিছুই তো করার ছিল।

প্রোজেক্ট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, ত্রিবান্দ্রম,

4 অক্টোবর—ঠিক দশ দিন বাকি

—স্ক্রিনে বারচার্টে ফুটে উঠছে—উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের প্রস্তুতি 50 শতাংশ, রকেটের প্রস্তুতি 40 শতাংশ—কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রস্তুতি 20 শতাংশ, মহাকাশযানের মাধ্যমে অ্যাসটেরয়েডকে গতিপথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি 20 শতাংশ।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল রাজার। আর মোটে দশ দিন বাকি। বিশেষ মিটিং ডাকা হয়েছে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাজা বলতে শুরু করল,—আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর এই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সত্যিই কোনও অর্থ নেই। আমরা ব্যর্থ।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—আমাদের যে পে-লোড দরকার অ্যাসটেরয়েডকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আমরা কোনওভাবেই পাঠাতে পারব না। আমরা আমেরিকার দুটো, রাশিয়ার তিনটে, ভারত ও জাপানের একটা করে রকেট উৎক্ষেপণের জন্য রেডি করেছি। কিন্তু মুশকিল দুটো। এক, তাতেও যথেষ্ট পে-লোড পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। দুই, প্রত্যেক মহাকাশযানকে নির্ভুলভাবে অ্যাসটেরয়েডের পাশে পাশে যেতে হলে যে প্রস্তুতি দরকার তা আমাদের কোনওভাবেই নেই।

কথাটা বলে রাজা চুপ করে গেল। কনফারেন্স রুমে সম্পূর্ণ নীরবতা। আসলে কারও কিছু বলার নেই। ডঃ ক্রিশ্চিয়ানো বলে উঠলেন,—এখন একমাত্র ভরসা অ্যাসটেরয়েডে সরাসরি আঘাত। আমি আগেই বলেছিলাম এ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই, শুধু শুধু এতগুলো দিন নষ্ট হল!

—নষ্ট নয় ক্রিশ্চিয়ানো। আমরা যা করেছি তা সম্পূর্ণভাবে ওদের কাজে লাগবে। আমরা আমেরিকার টিমের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে কাজ করেছি। আমরা কী করছি, ওরা তা সবই জানে। ওরা অনেকটাই এগিয়েছে। আমাদের কাজ হবে আগামী কয়েকদিন ওদেরকে

সবরকমভাবে সাহায্য করা। ওরাই এখন একমাত্র ভরসা। সরাসরিভাবে যদি অ্যাসটেরয়েডকে ধাক্কা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু খুব কাছে চলে এলে সেটাও করা যাবে না।

ফ্লোরিডা মিশন কন্ট্রোল সেন্টার,

10 অক্টোবর—চার দিন বাকি—

ডক্টর লেনো সবাইকে শুভ সম্ভাষণ করে বলতে শুরু করলেন,—আমাদের যা কিছু করার তা পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে। গত দু-তিনদিন এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত সব বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বাকি তিনটে টিম আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছে। কিন্তু তা-ও এটা ঠিক যে আমাদের প্রস্তুতি যে অবস্থায় তাতে সরাসরি ধাক্কা মারার সম্ভাবনা এখন 1 শতাংশেরও কম।

এই দেড় কিলোমিটার ব্যাসের অ্যাসটেরয়েড আমাদের দিকে যে গতিবেগে ধেয়ে আসছে তাকে মিশাইল দিয়ে মারতে গেলে, মিশাইল এতটাই নিখুঁতভাবে ছুড়তে হবে যা এক কথায় অকল্পনীয়। সাহারা মরুভূমিতে একটা ছুটন্ত উটের পিঠের বস্তায় রাখা একটা ছুঁচকে এখান থেকে ছোঁড়া একটা আধইঞ্চির মার্বেল দিয়ে তাক করার থেকেও এ কাজ হাজারগুণ শক্ত। তাই আমরা দুটো প্ল্যান করেছি।

প্রথম প্ল্যান, আই সি বি এম মিসাইল প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গত দেড়মাসে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এর ডিজাইনে অনেক পরিবর্তন এনেছি। এর রেঞ্জ অনেক বাড়িয়েছি। এর শক্তি, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানার ক্ষমতাও অনেক বাড়িয়েছি। এর জন্য আমরা যে রকেট দুটো তৈরি করেছি সেগুলো পাঁচটা স্টেজের। শেষ স্টেজটাকেও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শেষ স্টেজটাতে পাঁচটা ওয়ারহেড আছে, তা পাঁচটা পারমাণবিক বোমা অ্যাসটেরয়েডের ওপর নিক্ষেপ করবে। যদি একটাও লাগে তো আমরা নিশ্চিন্ত। অন্তত পুরো পাথরটা পৃথিবীতে আঘাত হানবে না। আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম নিশ্চিত করবে যে পাথরটাকে লক্ষ সীমার মধ্যে ঠিকভাবে খুঁজে না পেলে ওই পারমাণবিক ওয়ারহেডগুলো কার্যকরী হবে না। বিস্ফোরণ হবে না।

—তা আমরা কি টুকরো হয়ে যাওয়া পাথরগুলোর কথা ভেবেছি? প্রফেসার জ্যাসন ইগার ত্রিবান্দ্রম মিশন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে বলে উঠলেন।

—না প্রফেসার। ওগুলোর কথা এখন ভাবার সময় নয়।

জানি ওই পাথরের গুঁড়ো অন্য ধরনের সমস্যা তৈরি করবে। আমাদের স্যাটেলাইটগুলোকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু আপাতত আমরা শুধু কিছুটা সময় পাওয়ার চেষ্টা করছি।

—কিন্তু এরকম এতগুলো নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড যুক্ত দুটো রকেট ছোড়ার অনুমতি পাওয়া তো এককথায় অসম্ভব। আমি যতদূর জানি বিভিন্ন দেশের মধ্যে চব্বিশটারও বেশি এগ্রিমেন্ট আছে এরকম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত রকেট ছোড়ার বিরুদ্ধে। পাওয়া যাবে এ পারমিশন! ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার স্টিভেন প্রশ্নটা করে।

একটু হাসলেন ডক্টর লেনো। বলে উঠলেন,—বললাম না চব্বিশ ঘণ্টা আরও সময় আছে। তার মধ্যে পরের কুড়িঘণ্টা অন্তত লাগবে উৎক্ষেপণের যাবতীয় প্রযুক্তিগত বিষয়ের প্রস্তুতি দেখতে। ওই কুড়িঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ ঘণ্টার কাজ সারতে হবে। সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে আমাদের রকেট লঞ্চ সিকুয়েন্স চালু করতে হবে। তাহলে, পড়ে রইল আধঘণ্টা। ওই আধঘণ্টায় আমরা সব দেশের সম্মতি জোগাড় করব।

বলে একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—কিছু জিনিস কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই করতে হয়। স্পেশালি যখন তাতে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জুড়ে থাকে।

—আর দ্বিতীয় প্ল্যান?

—একটা ম্যানড স্পেসক্রাফট গিয়ে ধাক্কা মারবে পাথরটাকে।

—কে চালাবে সেই মহাকাশযান? অনিলিখা জিজ্ঞাসা করল।

—দুজন মহাকাশচারীকে আমরা নির্বাচন করেছি এর জন্য। বিখ্যাত রাশিয়ান কসমোন্যাট ওলেগ। ওলেগের মতো মহাকাশযান চালানোর অভিজ্ঞতা খুব কম লোকের আছে। তার সঙ্গে যে যাবে তাকে অনেকেই চেনে না। নাম পেড্রো। পেড্রোকে আমরা গত দেড়মাস ধরে তৈরি করেছি মহাকাশ যাত্রার জন্য। পেড্রো তার নিজের ক্ষমতায় পৃথিবীর হায়েস্ট সিকিউরিটি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া আগে যুদ্ধবিমান চালানোর অভিজ্ঞতাও ওর আছে। তাই এ ট্রেনিং নিতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি।

—তা এ প্ল্যানটা কি প্রথম প্ল্যানটা ফেল করলেই নেওয়া হবে?

—হ্যাঁ, আমরা তাই ঠিক করেছি, তবে সময় এত কম যে যদি প্রথম প্ল্যান ঠিকমতো কাজ না করে তার ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যে এই ম্যানড স্পেসক্রাফট পাঠাতে হবে, যা সরাসরি আছড়ে পড়বে অ্যাসটেরয়েডের বুকে। আমরা পরের চব্বিশ ঘণ্টায় প্রতি ঘণ্টার প্রগ্রেস জানাব। পুরো পৃথিবীর ভাগ্য ঠিক হবে আমাদের হাতে আগামী কয়েক ঘণ্টায়। আপনাদের সবার সম্পূর্ণ সাহায্য যেন আমি পাই।

বলে লেনো ভিডিয়ো কনফারেন্সিং শেষ করলেন। প্রত্যেকে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

10 অক্টোবর, বিবিসি ব্রেকিং নিউজঃ

লাইভ ফ্রম বৈকনুর কসমোড্রোম, কাজাখস্তান

খানিক আগেই আমাদের কাছে খবর এসেছে পৃথিবীর দুটো রকেট লঞ্চ সেন্টার থেকে অভূতপূর্বভাবে একইসঙ্গে দুটো রকেট পাঠানো হচ্ছে। কী কারণে তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের করেসপন্ডেন্ট পেটোভা বৈকনুর থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে। ওভার টু ইউ পেটোভা।

—আমাদের সঙ্গে আছে এ প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রাশিয়ার মস্কো মিশন কন্ট্রোল সেন্টারের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার—ওলেগ।...ওলেগ, হঠাৎ করে এভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রকেট ছোড়া, —আপনি কী বলবেন এ ব্যাপারে?

—না, এটা যুদ্ধকালীন তৎপরতা নয়। আমরা জানি যে বড় কোনও অ্যাসটেরয়েড কোনও না-কোনও সময়ে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। তাই আমরা দেখতে চাই যে বাইরে থেকে কোনও অ্যাসটেরয়েড পৃথিবীর দিকে ছুটে এলে আমরা একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আঘাত করার ক্ষমতা রাখি কিনা। এজন্যই আমরা দুটো জায়গা থেকে দুটো রকেট পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছি।

—তা এরকম কোনও পাথরের পৃথিবীতে আঘাত করার সম্ভাবনা কি আপনারা দেখছেন?

—না, একেবারেই নয়, অন্তত আগামী একশো বছরে তো নয়ই। তবে আমরা যদি এখন থেকে মোকাবিলার প্রস্তুতি না নিই যখন দরকার হবে, তখন আমরা কিছুই করতে পারব না।

—তা, প্রশ্ন উঠছে যে এত গোপনীয়তার সঙ্গে এ প্রোজেক্ট করা হল কেন? এমনকী মস্কো মিশন কন্ট্রোল সেন্টারেরও বেশিরভাগই নাকি এ প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানত না।

—দেখুন, এই প্রথমবার আমরা অনেকগুলো দেশ মিলে এ ধরনের রিসার্চ প্রোজেক্টে কাজ করছি। এতগুলো স্পেস এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় একটা খুব দরকারি জিনিস। একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ রাখতে হয়েছে যে আমরা যেন অহেতুক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ না করি। অন্য প্রোজেক্টগুলোর কাজেও যেন কোনও ব্যাঘাত না তৈরি করি, তাই।

একটু হেসে পেটোভা বলে উঠল,—তা আপনি যদি আমাদের দর্শকদের একটু বুঝিয়ে বলেন যে আপনারা ঠিক কী করতে চলেছেন।

ওলেগ বলতে শুরু করলেন,—খুব সংক্ষেপে বলছি। আমরা মাল্টিস্টেজ রকেটের সাহায্যে তৈরি মিসাইলের মাধ্যমে দেখতে চাইছি, বিভিন্ন রকেট থেকে একই লক্ষ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দরকার হলে আমরা তা করতে পারি কি না। তা এক্ষেত্রে তো সত্যি কোনও পাথর নেই, তাই

আমরা নজর রাখব ওদের গাইড্যান্স সিস্টেম কতটা নিখুঁতভাবে কাজ করে তার ওপর। একটা কল্পিত টার্গেটের কত কাছে আমরা কোনও মিসাইল ছুঁড়তে পারি—এ তারই পরীক্ষা।

—তা এটা কি ট্যাক্সপেয়ারদের টাকা নষ্ট করা নয়? শুধু শুধু কবে একটা পাথর আসতে পারে তা ভেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

ওলেগ হেসে বললেন—তা সে তো মানুষের চাঁদে যাওয়াও পয়সা নষ্ট ছিল। তাই না?...ওলেগ বলতে থাকেন।

মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, ত্রিবান্দ্রম,
11 অক্টোবর সন্ধে ছ'টা, তিন দিন বাকি

অবশেষে যুদ্ধ শুরু। কনফারেন্স রুমে সবার নজর সামনের মনিটরে। নয়তো দেওয়ালের ডিসপ্লেতে, মাঝেমধ্যে নোটস নেওয়ার জন্য পাতা ওলটানোর শব্দ। আর রকেট লঞ্চের অ্যানাউন্সমেন্ট। সামনের বিশাল ডিসপ্লেতে দুটো রকেটের লঞ্চ সিকুয়েন্স দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে স্ক্রিনের কোণে দেখানো হচ্ছে টেলিস্কোপ থেকে পাঠানো ধাবমান অ্যাসটেরয়েডের ছবি।

একই সঙ্গে দুটো রকেট ছোড়া হচ্ছে। একটা আমেরিকার ফ্লোরিডার কেপ কার্নিভাল থেকে। অন্যটা কাজাখস্তানের বৈকনুর কসমোড্রোম থেকে। লক্ষ্য এক—ওই অ্যাসটেরয়েড। দুটো থেকেই শেষ স্টেজে বেরিয়ে আসবে পরমাণু ওয়ারহেড, যা গিয়ে ধাক্কা মারবে অ্যাসটেরয়েডকে।

কেপ কার্নিভাল থেকে ছাড়া হবে বিশেষভাবে প্রস্তুত ডেল্টা রকেট—যার পরমাণু ক্ষেপনাস্ত্র ছোড়ার ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে বৈকনুর থেকে ছোড়া হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি একটা প্রোটন রকেট।

দুটো রকেট উৎক্ষেপণের টেকনিকাল ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে আট ঘণ্টা আগে। তবে কোনও সরকারি অনুমোদন নেওয়া হয়নি। সেটা নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি। তিনঘণ্টা আগে লঞ্চ সিকুয়েন্স চালু করা হয়েছে।

অনিলিখা আর এখানকার বাকি বিজ্ঞানীদের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। পুরো উৎক্ষেপণটাই এখন দুটো জায়গার মিশন কন্ট্রোল সেন্টারের হাতে। এখানে সবাই শুধু দেখছে রকেট উৎক্ষেপণের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। মূলত দর্শকের ভূমিকায় হলেও দরকার মতো এখান থেকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই অস্থিরতা, প্রত্যেকের মধ্যেই টেনশন। পাশেই টেবিলে কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু হুঁশ নেই। এতটাই মন দিয়ে সবাই লঞ্চ সিকুয়েন্স দেখছেন।

অনিলিখা দেখল যে একমাত্র মার্ক খুব উদাসীনভাবে পাতায় কীসব হিজিবিজি লিখে যাচ্ছেন। কাল মার্ক আর রাজার মধ্যে ক্যাফেতে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। মার্ক যে-কোনওভাবে বাড়ি যেতে চান, অসুস্থ ছেলেকে দেখার জন্য। পরশুদিন নাকি কমপ্লেক্স থেকে বেরোনোর ও চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। সিকিউরিটি ধরে ফেলে। মার্ক আঙুল তুলে উত্তেজিতভাবে কীসব বলছিলেন রাজাকে। কাছে গিয়ে না শুনলেও তা যে ওই প্রসঙ্গেই কিছু, তা নিয়ে সন্দেহ নেই অনিলিখার।

অনিলিখা আগে একবার রাজাকে বলেছিল মার্ককে বাড়িতে যেতে দেওয়ার জন্য। রাজা কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল,—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না অনি। এমনিতেও যা শুনেছি ছেলেটা দু-একদিনে মারা যাবে। গিয়ে কী লাভ! অ্যাসটেরয়েডের কথা বাইরে গিয়ে মিডিয়াকে জানালে কী হবে ভেবেছ? আর সেটা উনি জানাবেনই।

মার্কের চিন্তা ছেড়ে সামনের স্ক্রিনে চোখ রাখল অনিলিখা। উৎক্ষেপণ ঠিক দু-মিনিট বাকি।

অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে—

T-2 মিনিট—রিপোর্ট রেঞ্জ স্ট্যাটাস।

অন্য একটা গলায় শোনা গেল—রেঞ্জ গ্রিন, হাইড্রলিক প্রেশার 4000।

T-90 সেকেন্ড—লিক্যুইড অক্সিজেন ট্যাঙ্ক টু ফ্লাইট প্রেশার।

T-80 সেকেন্ড—ফার্স্ট স্টেজ লিক্যুইড অক্সিজেন 100 পার্সেন্ট।

T-60 সেকেন্ড—লঞ্চ এনেবেলড সুইচ 'অন' পজিশন।

একটা অজানা উত্তেজনায় অনিলিখার সারা শরীর যেন শিহরিত হয়ে উঠল। মানবসভ্যতার সব আশা ভরসা এই রকেটের ওপরে। এ-দুটো রকেট পাঠাবার পিছনে অনিলিখারও অনেক অবদান আছে। ঠিক বা ভুল—দুটোতেই ওর দায়িত্ব আছে।

T-30 সেকেন্ড—ড্রেন ভালব ক্লোজড।

T-20 সেকেন্ড—ফ্লাইট লক ইন।

T-10 সেকেন্ড—আর্থ লঞ্চ ভেহিকল ইগনিশান সিস্টেম—প্রোসিড ইগনিশান।

T-7 সেকেন্ড—মেন ইঞ্জিন স্টার্ট।

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0—প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে ডেল্টা রকেট মাটি ছেড়ে মহাকাশের দিকে ছুটতে শুরু করল। পুরো লঞ্চ সাইট ঢাকা পড়ে গেছে ব্লাস্টের আগুনে। ডেল্টা আমেরিকার মাটি ছাড়ার ঠিক 8 সেকেন্ড বাদে কাজাখস্তানের মাটি ছাড়ল প্রোটন রকেট—মানুষ বিপদে পড়লে যে দেশভাগ ভুলতে পারে, তারই প্রমাণ রেখে।

মনিটরে এক অক্ষে সময়, অন্য অক্ষে রকেটের গতিবেগ, উচ্চতা আর উৎক্ষেপণস্থল থেকে দূরত্ব দেখানো হচ্ছে। বড় স্ক্রিনে একইসঙ্গে দুটো রকেটকে দেখানো হচ্ছে। ডেল্টা আর প্রোটন মিশন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে দুটো উৎক্ষেপণের ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। টেকনিকাল ভাষায়।

1 মিনিট 20 সেকেন্ড—8 নটিক্যাল মাইল উচ্চতা, বেগ 5000 মাইল প্রতি ঘণ্টা, চেম্বার প্রেশার ঠিক আছে।

1 মিনিট 40 সেকেন্ড—12 নটিকাল মাইল উচ্চতা, বেগ 7600 মাইল প্রতি ঘণ্টা। ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ খুব ভালো দেখাচ্ছে।

3 মিনিট 30 সেকেন্ড—ইগনিশন অন সেকেন্ড স্টেজ। গুড স্টেবল বার্ন। ফার্স্ট স্টেজ সেপারেশন।

4 মিনিট 30 সেকেন্ড—53 নটিকাল মাইল উচ্চতা, গুড ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইন সেকেন্ড স্টেজ। চেম্বার প্রেশার লুকস গুড।

রকেট যত এগোচ্ছে সে তার আগের স্টেজকে ফেলে পরবত. স্টেজগুলো নিয়ে আর আরও কম জ্বালানি নিয়ে গতিপথ অনুযায়ী ছুটে চলেছে। প্রত্যেকটা স্টেজেরই আলাদা আলাদা মোটর, আলাদা গাইড্যান্স সিস্টেম।

অনিলিখা টেকনিকাল অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে বুঝছে যে নিখুঁতভাবে ঠিক পরিকল্পিত গতিপথেই দুটো রকেট এগিয়ে চলেছে।

পনেরো মিনিটের মাথায় অভীষ্ট অ্যানাউন্সমেন্টটা হল।

—নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড লঞ্চড সাকসেসফুলি।

হাততালির ধ্বনিতে ঘর প্লাবিত হল। পরমাণুবোমা যে কখনও এত আনন্দ দিতে পারে তা কনফারেন্স রুমের অবস্থা না দেখলে ভাবা যেত না। সব বিজ্ঞানীরা উঠে দাঁড়িয়ে একে অপরকে কনগ্রেচুলেট করছে। মিশন কন্ট্রোল সেন্টার গুলোতেও একই অবস্থা। আনন্দের সব বাঁধন খুলে গেছে। এ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সবাই জানে যে এ মিশনের গুরুত্ব অন্যরকম। এ এক নতুন ভোরের সন্ধান।

রাজা এবার সত্যি কথাটা মনে করাল সবাইকে।

—আমরা কিন্তু এখনও জানি না ওই মিসাইলগুলো অ্যাসটেরয়েডকে ধাক্কা মারবে কিনা। সেটা আমরা জানতে পারব আরও এক ঘণ্টা বাদে। তবে হ্যাঁ, আমাদের দুটো রকেটকেই নির্ভুল লক্ষ্যে ছোঁড়া হয়েছে। যতটা সতর্কতা নেওয়া সম্ভব, আমরা নিয়েছি। বাকিটা ভাগ্য।

11 অক্টোবর, রাত 10টা

কনফারেন্স রুমে পিন ড্রপ সাইলেন্স। এ নিস্তব্ধতা অন্য ধরনের। যখন কেউ জানে মৃত্যু অবধারিত—তাকে কোনওভাবে এড়ানোর উপায় নেই, তখন বোধহয় এরকম স্তব্ধতাই নেমে আসে। সবার মুখে-চোখে হতাশা। আর কোনও আশা নেই। খানিক আগেই খবর এসেছে যে ডক্টর লেনো আত্মহত্যা করেছেন। ডেল্টা, প্রোটন দুটো মিশনই ব্যর্থ হয়েছে। পরমাণু বোমা অ্যাসটেরয়েডের ধারেকাছে দিয়েও যায়নি। এখনও টেলিস্কোপে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অ্যাসটেরয়েডের দাপুটে চেহারা! সে কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। আর মোটে তিনদিন বাকি। তারপর সব শেষ।

ব্যাক আপ প্ল্যানও কাজ করেনি। ওলেগ আর পেড্রোর মহাকাশযান দু-ঘণ্টা বাদে পাঠানো হয়েছিল। সেটাও অ্যাসটেরয়েডকে ছুঁতে পারেনি। ওই মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগও শেষ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদের আত্মত্যাগ বৃথা। অবশ্য শুধু ওরা নয়, সবারই একই অবস্থা হবে। শুধু কয়েকঘণ্টা কমবেশি আর কি। বিজ্ঞানীদের হাতে যে-ক'টা উপায় ছিল, সবক'টাই ব্যর্থ।

এর মধ্যে এখনও বোধহয় ডঃ জ্যাসন ইগার আশা ছাড়েননি কিংবা বরাবরের মতো উনি এখনও ওনার অঙ্ক ঠিক মিলেছে কিনা তা দেখে যাচ্ছেন। গতিপথটা মনিটরে দেখে খাতায় কীসব অঙ্ক কষে যাচ্ছেন। আর মাঝেমধ্যে মাথা নাড়ছেন।

স্টিভেন বলে উঠলেন,—আর তো কোনও আশা নেই। এবার আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হোক।

ওয়াকাটাও তার সপক্ষে বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, আমিও চাই শেষ মুহূর্ত আমার পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাতে। আমাকে যেভাবে হঠাৎ করে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাতে ওরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় আছে। আমি এক্ষুনি ওসাকায় ফিরতে চাই।

সবারই একই মত। সবাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে চায়। রাজা সবাইকে আশ্বস্ত করে বলে উঠল,—আপনারা নিশ্চিন্ত হন। আমি কালকে সকালেই সবার ফেরার ব্যবস্থা করব। নিশ্চিত করব যাতে শেষ মুহূর্তে আপনারা আপনজনের সঙ্গে থাকতে পারেন। আপনাদেরও যেমন তাড়া আছে, তেমন আমারও তাড়া আছে। তবে তার আগে একটা খুব দরকারি কথা বলতে চাই। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে। অ্যাসটেরয়েড যে ধাক্কা মারবে—এটাই এখন নিয়তি। আমরা হয়তো থাকব না। কিন্তু মানবজাতি যাতে চিরতরে মুছে না যায় তার একটা উপায় আছে।

—সে আবার কী করে সম্ভব? স্বরাজবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি। কথাটা খুবই গোপনীয়। এ কথা আমি আমার বাবার কাছ থেকে ওনার মৃত্যুর কিছুদিন আগে শুনি। আমি আজীবন এ কথা গোপন রাখব—এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আজ নিতান্ত বাধ্য হয়ে এ কথা বলছি।

আজ থেকে পঁচাত্তর হাজার বছর আগে সুমাত্রার টোবা এলাকায় একটা ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। গত কুড়ি লক্ষ বছরের মধ্যে এটাই ছিল সবথেকে বড়। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পুরু ছাই-এর আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়। সব গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়। বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইডে বাতাস ভরে যায়।

ডঃ আজিজ একটু অসহিষ্ণু� ভাবে বলে ওঠেন,—তা এখন এসব শুনে কী লাভ?

—আমাকে পুরোটা বলতে দিন, বুঝতে পারবেন। আজ থেকে ঠিক আশি হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ হোমো স্যাপিয়েন্সরা প্রথম আফ্রিকার বাইরে পা রাখে। আফ্রিকা আর আরব দেশের মাঝখানে রেড সি। মোটে এগারো কিলোমিটার সমুদ্র দূরত্ব পেরোলেই আরব। কিন্তু এর আগে কখনও মানুষ এইটুকু দূরত্বও পেরোয়নি।

'গেট অফ গ্রিফ' বলে পরিচিত ওই পথ পেরিয়ে কুড়ি-বাইশজনের দুঃসাহসী একটা দল আরব দুনিয়ায় প্রথমবার প্রবেশ করে। তারপরে খাবারের সন্ধানে ও আরও ভালো জীবনের খোঁজে আজকের ইয়েমেন, ওমান, পাকিস্তানের সমুদ্রতীর বরাবর হেঁটে ভারতে প্রবেশ করে। ভারত থেকে বার্মা, থাইল্যান্ড, ম্যালেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালি, টিমোর ও আরও ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে এরা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছোয়। আর এই পথটা যেতে কয়েক হাজার বছর আর বেশ কয়েকটা প্রজন্ম লেগেছিল।

পঁচাত্তর হাজার বছর আগে সুমাত্রায় যখন অগ্ন্যুৎপাত হয়, তখন এদের ছোট একটা অংশ সুমাত্রা পেরিয়ে গেলেও ওদের বড় অংশটা সুমাত্রা আর ভারতে ছিল। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠায় তাদের প্রায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। হাতে গোনা সামান্য যে-ক'জন বেঁচে রইল তারা আশ্রয় নিল পাহাড়ের গুহায়—সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড আর অ্যাসিড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য।

কিন্তু গুহাতে লুকোলেই তো আর বাঁচা যায় না। খাবার চাই। খাবার আসবে কোথা থেকে? চারদিকে যেদিকেই যাও, হাজার হাজার মাইল তখন ছাই-এ ঢাকা, একইসঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা কমে গেছে বেশ কয়েক ডিগ্রি। ফসল, উদ্ভিদ সব নষ্ট হয়ে গেছে।

অনিলিখা যোগ করল,—প্রথমে তাই সব তৃণভোজী প্রাণীরা মারা গেল। তারপর মারা গেল তাদের খেয়ে বেঁচে থাকে যারা, সেই সব মাংসাশী প্রাণীরাও। পুরো ফুড চেনই ইম্প্যাক্টেড। পড়েছি যে কয়েক বছরের মধ্যে সুমাত্রা, ওই এলাকার সব দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, প্রায় পুরো

দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়াতে প্রাণের কোনও চিহ্ন ছিল না। মানবজাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল।

পুরো এশিয়াতে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বেঁচে রইল আরশোলা, ব্যাঙের মতো কিছু প্রাণী।

—আর কয়েকজন মানুষ যারা অত সহজে হার মানতে শেখেনি। কথার খেই ধরে রাজা বলে উঠল।

অনিলিখা বলে উঠল,—তাই? কী করে জানলে?

—আজও ওদের বংশধরেরা সুমাত্রায় বেঁচে আছে। ভাবতে পারো তাদের জিনে কী অসম্ভব লড়াকু ক্ষমতা! শুধু যে তারা পায়ে হেঁটে, কাঠের ভেলায় সমুদ্র পেরিয়ে, শ্বাপদ জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে সুমাত্রায় পৌঁছেছিল তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে বড় ভলকানিক ইরাপশনের মধ্যেও লড়াই করে বেঁচেছিল।

—তুমি সুমাত্রার কোন আদিবাসীদের কথা বলছ? শুনেছি ওখানে 'বাটাক' বলে এক সম্প্রদায় আছে যারা একশো বছর আগেও মানুষ খেকো ছিল। ডক্টর ন্যাশ বলে ওঠেন।

—না, আমি যাদের কথা বলছি, তাদের কথা পুরো পৃথিবীর কাছেই অজানা। গেউরেদঙ পাহাড়ের গভীর গুহায় তাদের বাস। চারদিকে সুমাত্রার গভীর রেনফরেস্ট—পৃথিবীর সব থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এটা একটা। আধুনিক মানুষের যাতায়াত এ অঞ্চলে নেই বললেই চলে। শুধু যায় চোরা কাঠের ব্যবসায়ীরা। তা, তারাও কখনও এদেরকে দেখেনি। হয়তো এদের অদ্ভুত জীবনযাত্রার জন্য।

—এরা কি নিশাচর? অনিলিখা জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক ধরেছ অনি। গুহার অন্ধকারে এরা হাজার হাজার বছর কাটিয়েছে। ধুলোয় ঢাকা পৃথিবীতে তখন আলোর প্রবেশও নিষিদ্ধ। আগুনের ব্যবহারও এরা শেখেনি। অভিযোজনের জন্য এখন এরা পুরোপুরি নিশাচর। রাতের বেলা স্পষ্ট দেখতে পায়। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। খাবার অভ্যাসও অদ্ভুত। পোকামাকড়, আরশোলা, ব্যাং, সাপ—এই হল এদের প্রধান খাদ্য। হবেই তো। হাজার হাজার বছর ধরে এরা ছাইয়ে ঢাকা পৃথিবীতে স্বাভাবিক খাদ্য খুঁজে পায়নি। আর এরা মেয়েদের পুজো করে। কেন জানি না।

—তা রাজা, তুমি এদের কথা বলছ কেন? তুমি কি এদের মাধ্যমে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভাবছ? ডক্টর জ্যাসন ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। সুমাত্রায় আগ্নেয়গিরির পরবর্তী অবস্থা আর অ্যাসটেরয়েড সংঘর্ষের পরে পৃথিবীর যে অবস্থা হবে—তার মধ্যে অনেক মিল। ধুলোর মেঘে আটকে যাবে

সূর্যের আলো। সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র শীতের আবির্ভাব হবে। সূর্যের আলোর অভাবে হারিয়ে যাবে যাবতীয় উদ্ভিজ্জ। মারা যাবে সব শাকাহারী জীব। শুরু হবে অ্যাসিড বৃষ্টি। মিলিয়ে দেখুন সুমাত্রার আগ্নেয়গিরি আর অ্যাসটেরয়েডের সংঘাতের পরের ছবি। একই ছবি দেখতে পাবেন। তাই এ ধরনের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে শুধু ওরাই। আর এরা যেরকম খায়, তাতে খাবারেরও কোনও অসুবিধে হবে না। মানবজাতিকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তো সে স্বপ্নকে সাকার করতে পারে একমাত্র এরাই।

—তুমি কী বলছ রাজা! আমাদের প্রতিনিধি হবে একটা অসভ্য, অনুন্নত উপজাতি—যারা গত আশি হাজার বছরে কোনও সভ্যতার আলো দেখেনি! যাদের মধ্যে না আছে শিক্ষা-দীক্ষা, না আছে মানুষের কোনও হাবভাব—। ডক্টর ন্যাশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন।

রাজা উত্তেজিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় বলে উঠল,—উপায়? আর তা ছাড়া আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা সবাই এদেরই বংশধর। পরবর্তী সময়ে এরাই আবার আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অনুন্নত কাদের বলছেন? জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ে এরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এরা আশি হাজার বছর ধরে পরিবেশকে হার মানিয়েছে। জেনেটিক বিচারে এদের রক্ত আমাদের থেকে অনেক বেশি শুদ্ধ। এদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও আমাদের থেকে অনেক বেশি।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—আরেকটা কথাও বলি। গত দশ বছর ধরে পৃথিবীর কিছু ল্যাবরেটরিতে আমরা এদের জিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলাম। খুবই গোপনীয় ভাবে। দেখছিলাম কীভাবে এদের জিন থেকে ভালো কিছু গুণ নিয়ে জিনথেরাপির মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতা আরও বাড়ানো যায়। ভাগ্যক্রমে ঠিক এক মাস আগে আমরা এতে সফল হই। ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর আমরা এ পরীক্ষা করছিলাম। বড়দের নিয়ে এ কাজ করা অনেক শক্ত। তাই শুধু এরা নয়, এদের সঙ্গে এই পরিবেশে বাঁচার ক্ষমতা পেয়েছে বেশ কিছু ছোট বাচ্চা—যারা হবে ভবিষ্যতে মানবসভ্যতার প্রতিনিধি। আমাদের মানবসভ্যতা সৌরজগতের একমাত্র সভ্যতা, হয়তো পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যেই। তাকে এত সহজে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

—অসাধারণ আইডিয়া রাজা। কিন্তু তুমি খবরটা এত গোপন করে রেখেছ কেন? এ তো আমরা সারা বিশ্বকে জানাতে পারি। বিজ্ঞানী ওয়াকাটা উত্তেজিত হয়ে রাজার হাত ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন।

—অবশ্যই জানানো হবে। তবে এখনও সে সময় আসেনি। এরা যতবারই গুহা ছেড়ে বেরিয়েছে, আমরা অকারণে এদের পশুর মতো শিকার করেছি। আমি চাই না এ খবর নিয়ে

কোনও ধরনের আলোড়ন হোক, জানাজানি হোক আর আমরা এদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলি।

রাজা এবার খানিকটা হালকা মুডে সবার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। অনিলিখাকে দেখিয়ে বলে উঠল,—দেখুন, আপনারা সব মনমরা হয়ে বসে আছেন, আর অনিকে দেখুন! এরমধ্যেও একটা ভারি সুন্দর শাড়ি পরে সেজেগুজে এসেছে। এটাই হল স্পিরিট। কখনও ওকে দেখেছেন মনমরা হয়ে বসে থাকতে! ও হারতে জানে না। ওকে দেখলেই মনে হয় এখনও আশা আছে।

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—হ্যাঁ, নতুন শাড়িটা তো আর পরার সুযোগ নাও হতে পারে, তাই পরে চলে এলাম। তবে তোমার কথা শুনে সত্যিই স্বস্তি পেলাম। তা ওই বাচ্চাগুলো এখন কোথায় আছে?

রাজা অনিলিখাকে বোঝাতে এগিয়ে গেল।

মিশন কন্ট্রোল সেন্টার ত্রিবান্দ্রম, 12 অক্টোবর

ভোর চারটে। অনিলিখার ঘরের ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। প্রথমবার ধরতে না-ধরতেই কেটে গেল। আবার রিং। এবার ধরতেই উলটোদিকে রাজার গলা। জরুরি মিটিং। এখনই সবাইকে কনফারেন্স রুমে চলে আসতে হবে।

অনিলিখার শুতে কাল অনেক রাত হয়েছিল। এই দু-দিনের মধ্যে অনেক কিছু করার আছে। সেটারই প্ল্যান করছিল অনিলিখা। দুঃস্থ ছাত্রদের একটা সংস্থার সঙ্গে অনিলিখা বহুদিন যুক্ত। এই দুদিনের মধ্যে ওদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটানোর ইচ্ছে আছে। কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটা অনাথ আশ্রমে অনিলিখা প্রায়ই যায়। ওদের গান, কবিতা আবৃত্তি শেখায়। ওদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক করাবে বলে শেষবার কথা দিয়ে এসেছিল। কথা দিয়ে কথার খেলাপ অনিলিখা কখনও করে না। তা সময় হবে কি ওদেরকে দিয়ে নাটকটা করানোর? আরও অনেক অনেক কিছু করার ছিল। বহুদিন ধরে ওর ইচ্ছে ছিল প্লেন চালাতে শেখার। এসব এলোপাথাড়ি চিন্তা সামলে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। তারপরে ঘুমের অকাল বিয়োগ ঘটিয়ে এই ফোন।

কোনওরকমে প্রস্তুত হয়ে কনফারেন্স রুমে আসতে অনিলিখার মিনিট পাঁচেক লাগল। আরও দু-তিন মিনিটের মধ্যে সবাই এসে গেল। রাজা বলতে শুরু করল,—

—একটা খুবই আনন্দের খবর আছে। অ্যাসটেরয়েডের সংঘাত হচ্ছে না। আমরা এ যাত্রায় বেঁচে গেছি।

—কী করে!

—সেটা বলছি। তবে ধাক্কা যে লাগছে না, তা নিশ্চিত।

—হচ্ছে না! প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ স্কুলছুটি হলে বাচ্চাদের যেরকম হয়! এ ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরছে। ডক্টর আজিজ আবার নাচতে শুরু করে দিলেন। স্বরাজবাবুও তাতে যোগ দিলেন। শুধু ডক্টর জ্যাসন বোধহয় আগেই জানতেন। উনি সেরকম অবাক হয়েছেন বলে অনিলিখার মনে হল না।

রাজা বলল,—ডক্টর জ্যাসন, আপনিই এ ব্যাপারটা সবাইকে বিস্তারিত বলুন। আপনার জন্যই এ কথা জানতে পেরেছি, একটু দেরিতে যদিও।

ডক্টর জ্যাসন বলতে শুরু করলেন,—আমার প্রথম সন্দেহ হয় তখনই, যখন দেখি আমাদের পাঠানো তিন-তিনটে রকেটই ব্যর্থ হয়েছে। আমার চোখে পড়ে অ্যাসটেরয়েডের কক্ষপথ যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমি ও মার্ক গতকাল অনেকক্ষণ ধরে এটা নিয়ে পর্যালোচনা করি। খুব জটিল গণনা। কাল রাত বারোটা নাগাদ নিশ্চিত হই। দেখি, আমাদের ধারণা ঠিক। উর্ট বলয়ের একটা কমেটই এই বিচ্যুতির কারণ। কালকে ওই কমেটের নিউক্লিয়াস আর ওই অ্যাসটেরয়েড পরস্পরের কাছ দিয়ে যায়। আর তারই জন্য অ্যাসটেরয়েডের গতিপথের হঠাৎ এই পরিবর্তন। ওই কমেটকে ধন্যবাদ—এই মহাবিশ্বের নিয়ন্তাকে ধন্যবাদ—অনেক অনেক ধন্যবাদ, উনি আমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে আমরা কতটা অসহায়। নাউ এনজয়! শ্যাম্পেনের বোতলটা ওপরের দিকে তুলে ধরে ডক্টর জ্যাসন শেষ করলেন।

ডক্টর জ্যাসনের কথা শোনার ধৈর্যও এখন আমাদের নেই। এ-ক'টা দিন যা টেনশনে কেটেছে! কে কবে দেশে ফিরবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এরমধ্যে রাজা সবাইকে চুপ করার অনুরোধ করে বলতে শুরু করল।

—আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে সুজাক উপজাতি দেখাতে অনুরোধ করেছেন। 'সুজাক' নামটা আমারই দেওয়া। এখান থেকে সুমাত্রা দূর নয়। আমি চার্টার্ড প্লেনের ব্যবস্থা করেছি। এখান থেকে সুমাত্রার মেডান পর্যন্ত চার্টার্ড প্লেনে যাব। তারপরে সেখান থেকে গাড়িতে। ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনওরকম চিন্তা করবেন না। দুদিনের মধ্যে ফিরে এসে আমরা যে যার দেশে ফিরে যেতে পারি। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে জোরাজোরি করব না। যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরাই যাবেন। তবে এটুকুই বলব যে যাঁরা যাবেন না, তাঁরা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম মানুষ দেখার এক অসাধারণ সুযোগ হারাবেন। এ সুযোগ বারবার আসবে না।

সবাই একবাক্যে রাজি। এরকম সুযোগ কে হাতছাড়া করে! সারা পৃথিবী এখন এদের কথা জানে না। তা ছাড়া সুমাত্রার আকর্ষণ! যার আগের নাম ছিল স্বর্ণদ্বীপ। সুমাত্রার বন-জঙ্গল-

পাহাড়—তার আকর্ষণই বা কম কীসের?

রাজা আবার বলতে শুরু করল,—তবে একটা শর্ত আছে। ফেরার আগে অবধি কেউ সুজাক উপজাতির কথা কাউকে জানাতে পারবে না। নো ফোন-ক্যামেরা-ল্যাপটপ-আইপ্যাড। এসব কোনও কিছু নিতে দেওয়া হবে না। আর আমরা ফিরে এসেই একেবারে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক?

কিছু বিরোধিতা ছিল, তবে শেষে সবাই এ শর্ত মেনে নিল। ঠিক হল দুপুর বারোটায় সুমাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া হবে। রাজা এইটুকু সময়ের মধ্যেই সবকিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

এতক্ষণে অনিলিখা লক্ষ করল যে কনফারেন্স রুমে সবাই আছে, শুধু মার্ক নেই, রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মার্ককে দেখছি না, মার্ক কোথায়?

রাজার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

—কাল রাতে ওর ছেলে মারা গেছে, ওকে আমি তাই আজ সকালে যেতে দিয়েছি। এই খানিক আগেই চলে গেলেন।

—খুব অন্যায় করেছ রাজা। ওনাকে এভাবে আটকে রাখা একদম উচিত হয়নি। অন্তত মৃত্যুকালে তো উনি ছেলের সঙ্গে থাকতে পারতেন।

রাজা কোনও কথা বলল না, চুপ করে রইল।

কনফারেন্স রুম থেকে নিজের ঘরে ফেরার সময় অনিলিখা মার্কের রুমে একবার উঁকি মারল। ঘর ফাঁকা, লাগেজ, জামাকাপড় কিছু নেই। মার্কের সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল অনিলিখার। খুব ভালো লোক বলে মনে হয়েছিল মার্ককে। ছেলের জন্য খুব চিন্তায় ছিলেন। ঘর যেরকম পরিষ্কার, তাতে মনে হল না যে মার্ক খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছেন। বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ির মধ্যে শুধু একটা কাগজ পড়ে আছে।

অনিলিখা কাগজটা তুলে নিল, কারণ কাগজটায় যে ভাষায় লেখা তা খুব ইন্টারেস্টিং। অনিলিখার চেনা। প্রাচীন মিশরীয় হরফে লেখা। জিন ফ্র্যাঙ্কোয়িসের লেখা পড়ে প্রথম এ ভাষার ওপর কৌতূহল হয় অনিলিখার। শিখেও ফেলে। প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের হরফে লেখা হত। প্রথম ধরন হল হাইরোগ্লিফিক। এ হরফে মূলত ছবির ব্যবহার হত। এই হরফে লেখা হত প্রাচীন মিশরের স্তম্ভে, মন্দিরে বা কবরে।

দ্বিতীয় ধরনের হরফ হল হাইর্যাটিক। লেখা হত ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে, ব্যবসার কাজে প্রধানত এই হরফ ব্যবহার করা হত।

তৃতীয় ধরনের হরফ হল ডেমোটিক। অন্য দুই হরফের থেকে সৃষ্টি এই হরফের। প্রাচীন মিশরে দৈনন্দিন কাজকর্মে, ব্যবসার কাজে প্রধানত এর ব্যবহার ছিল। গল্পও লেখা হত। এ হরফে লেখা সোজা। কিন্তু পড়া খুব শক্ত।

এই কাগজের টুকরোতে লেখা হয়েছে ডেমোটিক হরফে। একটু কষ্ট করেই পড়তে হল অনিলিখাকে।

তাতে লেখা—'আমি যে-কোনও ভাবে তোমাকে বাঁচাব। বাঁচাবই।'

লেখাতে শপথ নেওয়া হয়েছে মিশরের সূর্যদেবতা 'রাহ'-এর নামে।

চোখে জল এসে গেল অনিলিখার। সত্যিই ছেলেকে খুব ভালোবাসত মার্ক। তাকে জোর করে এভাবে অসুস্থ ছেলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাটা একেবারেই উচিত হয়নি। মার্ক হয়তো এই দুর্ভাবনার মধ্যে মনোবল পাওয়ার জন্য সূর্যদেবতাকে উদ্দেশ্য করে লিখে রেখেছিলেন। আজকে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ফেলে দিয়েছেন। তবে...অনিলিখার কপালে একটু ভাঁজ পড়ল। কাগজটাতে ফাউন্টেন পেনে লেখা। মার্ক তো ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতেন না।

অনিলিখা মার্কের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল। বেশি সময় নেই। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। দু-দিনে ফিরে আসতে হলে পুরো ট্রিপটাতেই যে খুব ধকল সহ্য করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। আর বিশেষ করে যখন সে পথে সুমাত্রার বন-জঙ্গল-পাহাড়-সুজাক উপজাতি, এসব আছে।

মেডান। সুমাত্রা—12 অক্টোবর

মেডান। উত্তর সুমাত্রার একটা বড় শহর। শক্তিশালী 'অ্যাসে' সুলতানরা 1873 সাল পর্যন্ত এসব জায়গায় রাজত্ব করত। দীর্ঘ তিরিশ বছরের যুদ্ধের পরে তা ডাচদের অধীনে আসে। তাই শহরময় ডাচ স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়ানো। মেডান অবধি চার্টার্ড প্লেনে এসে মেডান থেকে দুটো গাড়ি নেওয়া হয়েছে। গাড়ির অবস্থা যথেষ্ট ভালো হলেও রাস্তার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। সমুদ্রতীর ধরে গাড়ি উত্তরের দিকে চলেছে।

সুমাত্রার সরকারি টুরিস্ট বোর্ড হল ন্যাট্টাবু। তা, ন্যাট্টাবু থেকে গাড়ি নেওয়ার সময় রাজা লেক তাওয়ার দেখার কথা বলেছে। লেক তাওয়ার দেখার যে বিশেষ লোক হয় না, তা সংস্থার লোকেদের হাবভাব দেখেই বোঝা গেছে। ওরাই বলে দিল যে এ পথে গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। তারপর ওখান থেকেই 'অ্যান্ডি' বলে একজনকে গাইড হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ছোটখাটো চেহারা, চওড়া মিলিটারি গোঁফ। জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরা। তবে একটু খেয়াল

করলেই দেখা যাবে যে প্যান্টে নানান ধরনের মেরামতি সেলাই। নেহাত অবস্থার বিপাকে পড়েই অ্যান্ডি গাইড হয়েছে।

বারবার সুনামিতে, ভূমিকম্পে উত্তর সুমাত্রার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক লোক মারা গেছে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষত অনেকটা মুছেও গেছে। পথের দুধারে অনেক রাবার আর নারকোল গাছ। মাঝেমধ্যে বিস্তৃত ধানজমি। কোথাও কোথাও কফির চাষ হচ্ছে। সুমাত্রা কফির জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এখানকার চাষিদের মাথায় বিশেষ ধরনের শোলার টুপি। এক সময় এসব জায়গায় প্রচুর তামাকের চাষ হত। এখানকার তামাকের নাম ছিল বিশ্বময়।

প্যাসোলায় পৌঁছোতে-পৌঁছোতে রাত আটটা বেজে গেল। ঠিক হল ওখানেই রাত্রিবাস। এখানে বড় হোটেল নেই। সাধারণ লোকেরাই বাড়ি ভাড়া দেয়। অনিলিখারা যে-বাড়িতে ভাড়া নিল, সে বাড়ির এক বৃদ্ধা দুদিন আগে মারা গেছে। বৃদ্ধার মৃতদেহ চেয়ারে বসিয়ে রাখা আছে। গায়ে ইকাট নামের এক শুকনো রঙিন কাপড় জড়ানো।

এখানে এরা সব মেরাপু ধর্মাবলম্বী। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনেক খরচ বলে কয়েকজনের কবর এরা একসঙ্গে দেয়। এজন্য অনেক সময় মৃতদেহ বছরের পর বছর বাড়িতেই ফেলে রাখা হয়। অনিলিখা ওদেরকে এরজন্য বেশ কিছু অর্থসাহায্য করল যাতে বৃদ্ধার কবর পরের দিনই হয়ে যায়।

দলের সবাই ক্লান্ত। যে যার মতো শুতে চলে গেল। অনিলিখার তেমন একটা ক্লান্ত লাগছিল না। বাড়ির সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ করল। বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প শুরু করল, নানান দেশের। ওদের এলাকার প্রধানের সঙ্গে আলাপ হল। প্রধানও অনিলিখাকে নানান স্থানীয় গল্প বলল, যেমন—ওরাং পেনডেকের কথা। এরা হল একধরনের বনমানুষ। দেখতে শিম্পাঞ্জি আর মানুষের মাঝামাঝি। এদের গায়ে নাকি অসম্ভব জোর। টেনে ছোট গাছ তুলে নিতে পারে। তবে এদের দেখা পাওয়া নাকি সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। এদের নিয়ে অনেক গল্প-গাথা আছে, কিন্তু কেউই দেখেনি।

এসব নানান গল্প চলল অনেক রাত অব্দি। ওরা অনিলিখার মতো একজনকে পেয়ে ভারি খুশি। আরও খানিক পরে অনিলিখা যখন শুতে গেল, তখন ও ওদেরই একজন হয়ে গেছে।

উত্তর সুমাত্রা, 13 অক্টোবর

পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ অনিলিখারা প্যাসোলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ —বিকেল হওয়ার আগে যদি পৌঁছোনো যায়। রাস্তার ধারের পাইন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে মাঝেমধ্যেই উঁকি মারছিল সমুদ্র আর সাদা বালুচর। ডিঙি নৌকোগুলোতে কালো পাল। কালো রং এখানে সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই চারদিকে কালো রং।

অনিলিখা ইতিমধ্যেই অ্যান্ডির সঙ্গে ভালো আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। অ্যান্ডির কাছ থেকেই জানল যে এখানকার লোকেদের আচার-ব্যবহার খুব অদ্ভুত। এরা শরীরের কিছু অংশে কখনই জল লাগায় না। মুরগির শুধু মাথা আর পা খায়। সমুদ্রের দানবের পুজো করে। তাকে খুশি করতে বাড়ির বাইরে খাবার রেখে দেয়। এসব জায়গায় বেশিরভাগই বাটাক সম্প্রদায়ের।

তবে ভাগ্য ভালো এখন আর এরা মানুষ খায় না।

অনিলিখারা বিরুইন পৌঁছোল দুপুর বারোটা নাগাদ। ওখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রার শুরু। দুপুরের খাবার সারা হল একটা ছোট গ্রামে। খাবার চয়েস বেশি নেই। দড়িতে সার দিয়ে বাঁধা বাদুড়। তার স্টু। অনিলিখা আপেল-কলা খেয়ে কোনওরকমে পেট ভরাল। গ্রামের বাড়িগুলোর সামনে কফি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা রাস্তায় গুলি-ডান্ডা খেলছে। ঠিক যেন ভারতেরই ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটা পেরোনোর ঘণ্টাদেড়েক বাদ থেকে পাহাড়ি রাস্তা শুরু হল। আঁকাবাঁকা রাস্তা। ধারে খাদ। পুরো সুমাত্রার পশ্চিম বরাবর ব্যারিসন পাহাড়শ্রেণি। অনেকগুলো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে এই পর্বতশ্রেণিতে। এদের মধ্যে অনিলিখাদের গন্তব্য গেউরেদঙ পর্বত। ওখানেও দুটো আগ্নেয়গিরি আছে।

পথের চেহারা খানিকক্ষণের মধ্যেই বদলে গেল। সরু পাহাড়ি পথের একদিকে খাদ। অন্যদিকে ঘন জঙ্গল। কখনও বা আকাশ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে সুউচ্চ গাছের আড়ালে। দু-ধারের গাছের মধ্যেও শৃঙ্খলার অভাব। নানান আকারের নানান ধরনের গাছ। এ যেন বাচ্চা ছেলের তুলির আঁচর। বাতাসে একটু ঠান্ডা স্যাঁতস্যাতে ভাব। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাঝেমধ্যে রাস্তাই হারিয়ে গেছে নদীর হালকা জলস্রোতে। এ জঙ্গলে আজও বাঘ, হাতি, পাইথন, ভালুক, ওরাং ওটাং সবই আছে। চোরাকাঠের কারবারীদের পাল্লায় পড়ে সুমাত্রার অনেক জায়গায় বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেলেও, এদিকের জঙ্গলে তেমন দাগ পড়েনি। তাই এদিকে এরকম গা-ছমছমে জঙ্গল।

রাজা পুরো পথটাই খুব চুপচাপ। অনিলিখার পাশে বসলেও পুরো পথটা হুঁ-হ্যাঁর বেশি কিছু কথা বলেনি। তবে ও যে অনেকবার এদিকে এসেছে তা নিশ্চিত। তাই ড্রাইভার প্রায় ওরই কথা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে।

বিকেল পাঁচটায় ওরা একটা জায়গায় পৌঁছোল, যেখানে এসে গাড়ি যাওয়ার পথ শেষ হয়ে গেছে। এরপরে হাঁটা পথ গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। হেঁটে এখনও প্রায় তিন মাইলের মতো যেতে হবে। দূরে আগ্নেয়গিরির মুখ দেখা যাচ্ছে। একটা না, দুটো। আর তার দিকে তাকালে—মাঝখানে শুধুই সুমাত্রার আদিম, অকৃত্রিম জঙ্গল।

ডক্টর ন্যাশের এই সময়ে ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে একটু আপত্তি ছিল। শুধু উনি নন, সবারই একটু হলেও দ্বিধা ছিল। সুমাত্রার এসমস্ত জঙ্গলে বাঘ থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুমাত্রার অন্যসব জঙ্গলে বাঘ, হাতি এসব আর দেখা না গেলেও এদিকে এদের থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই প্রবল। রাজাই এ এলাকা সবথেকে ভালো করে চেনে। গাইড অ্যান্ডি আর ড্রাইভাররাও এদিকে কখনও আসেনি। অ্যান্ডি বলল,—ওরাং পেনডেকের দেখা এদিকেই পাওয়া গেছে। যদিও বছরে এক-আধবার।

সুজাক উপজাতি আর ওরাং পেনডেক যে একই জীব, এরকম একটা ধারণা অনিলিখার মনে তৈরি হয়েছে।

রাজা বলে উঠল,—আমরা যদি সুজাক উপজাতির দেখা পেতে চাই, তা হলে এখনই যাওয়া উচিত। হেঁটে যেতে ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। কাছাকাছি কোনও গ্রামও নেই। সব থেকে ভালো হবে গাড়িতে বা ক্যাম্পে রাত না কাটিয়ে, আজ রাতেই গুহা দেখে ফিরে যাওয়া। আমি তো আগেও এসেছি, কোনও ভয় নেই।

কারুর কাছেই এ প্রস্তাবের কোনও বিকল্প নেই। নিশাচর এক উপজাতি দেখতে হলে তো এ সময়েই যেতে হবে। অগত্যা ড্রাইভার দুজন আর অ্যান্ডি গাড়িতেই রইল। অ্যান্ডির শরীর খারাপ লাগছে, ও তাই সঙ্গে যেতে চাইল না।

অনিলিখারা সরু চড়াই পথ ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পায়ের নীচে ঝরা পাতার মচমচ আওয়াজ। রাজা সবার সামনে যাচ্ছে। ওর হাতে একটা বন্দুক। বাকি সবার হাতে টর্চ, জলের বোতল, গাছকাটার ছুরি। গাছপালা সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সবরকম উচ্চতার গাছ আছে। মাটির কাছেও গাছ-আগাছার ভিড়। নরম কাদায় হাতির পায়ের ছাপ। এসব জঙ্গলে হঠাৎ করে সুমাত্রার গন্ডারের মুখোমুখি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যেতে যেতে ওরা একদল ওরাংওটাং-ও দেখল। বেশ আয়েস করে গাছ থেকে ঝুলতে ঝুলতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখছিল। তা এভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটে গেল। একফালি চাঁদ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চারদিক আরও মায়াময় করে তুলেছে।

ডক্টর স্টিভেন একবার বললেন,—কী রাজা! এতক্ষণ লাগছে—ভুল পথে চলে আসিনি তো?

রাজা সংক্ষেপে জানাল,—না, না, ঠিক পথেই চলছি। আর আধঘণ্টা বড়জোর।

ওপরের দিকে তাকালে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারাখচিত আকাশ। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে শুরু হচ্ছে ঝিঁঝি পোকার তান। দূরে কোনও ছোট ঝরনার ঝিরঝিরানি শব্দ। রাতের স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে ওই ঝরনার স্রোতের আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। বাঘ একদম

কাছে চলে এলেও পায়ের শব্দ শোনার কোনও উপায় নেই। মাঝে মাঝে পাখির ডানার ঝটপটানির আওয়াজ। হঠাৎ এরমধ্যে রাজা বলে উঠল,—এই তো এসে গেছি। দূরে গুহা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় বেশ কয়েকটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে। ওপরের দিকে আরও প্রায় আধমাইল রাস্তা—পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যাতারার পাশে। রাজা সবাইকে টর্চের আলো জ্বালাতে বারণ করল। আলো ওরা সহ্য করতে পারে না। এমনিতেও এতটা পথ হাঁটার পর চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে চাঁদের আলোয় পথ চলতে। গুহার সামনের দিকটা খানিকটা পরিষ্কার। দেখেই বোঝা যায় গাছ-আগাছা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাইরে থেকে গুহার ভেতরের কিছুই বোঝার উপায় নেই। ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাঁদের আলো রাজার জিনসের শার্টের পকেটে গোঁজা পেনের ওপর পড়ে চকচক করে উঠে হারিয়ে গেল। রাজা সবার আগে ঢুকল। তার পেছন পেছন সবাই। অনিলিখা কী যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গুহার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ সামনে দুটো চোখ জ্বলে উঠল। চাঁদের আলোয় একপলক তাকিয়েই অনিলিখা বুঝল যে সামনে—ওর আর গুহার মাঝে একটা হায়েনা। কীরকম একটা জঙ্গুলে হিংস্রতার সঙ্গে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছে। এরা মানুষকে আক্রমণ করে না। তবু অনিলিখা চুপ করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ গুহার মধ্যে থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। ডক্টর ন্যাশের, ডক্টর আজিজের, ডক্টর অ্যালান ডকের, ডক্টর ওয়াকাটার, স্বরাজবাবুর। মুহুর্মুহু আর্তনাদে চারদিকের রাতঘুম ভেঙে গেছে। প্রতিমুহূর্তে একটার পর একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠে ফের স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এক নিমেষে অনিলিখার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সুজাক উপজাতির লোকেরা তাহলে কি নরখাদক? সুমাত্রার নরখাদক বাটাক উপজাতির কথা ও আগেই শুনেছে। আর সবাইকে নিরস্ত্র করে এদের হাতে তুলে দেওয়াটা কি রাজারই প্ল্যান? যাতে ফিরে গিয়ে কেউ এদের কথা কখনও না বলতে পারে। কাউকে না জানাতে পারে।

ভাগ্যিস রাজার বুক পকেটের দিকে নজর পড়েছিল অনিলিখার। আর তাই ও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল। কারণ মার্কের ঘরে খুঁজে পাওয়া ফাউন্টেন পেনে কাগজের ওই লেখা মার্কের নয়, রাজার। যাতে লেখা ছিল 'আমি যে-কোনওভাবে তোমাকে বাঁচাব, বাঁচাবই।' ওটা 'তোমাকে' নয়। 'তোমাদের'-কে হবে, কারণ ডেমোটিক ভাষায় এই দুটো শব্দের মধ্যে কোনও তফাত নেই। অর্থাৎ রাজা বলেছিল যে করে হোক সুজাকদের বাঁচাবে। আর তাই—

তাহলে কি মার্ককেও রাজাই হত্যা করেছে? আর তখনই ওই কাগজটা ওর পকেট থেকে মার্কের ঘরে পড়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে অনিলিখা বুঝল যে সুমাত্রার জঙ্গলের বাঘ ও গন্ডারের থেকেও অনেক বেশি বিপদ ওর খুব কাছেই। গুহার ভেতরে কারুর সাহায্যের জন্য এগোবে কি?...কিন্তু খালি হাতে? না, তার কোনও মানে হয় না। উলটোদিকের জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে শুরু করল অনিলিখা। হঠাৎ, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। পা ঘেঁষে চলে গেল গুলিটা। মাটিতে পড়ে গেল অনিলিখা। কোনওরকমে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে সামনে রাজা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বন্দুক।

—স্যরি অনি। তোমাকেও এদের স্বার্থে মরতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে এ ঘটনার কথা, এদের কথা তুমি গোপন রাখবে। আর আমার কাছে এদের প্রাণের থেকে দামি কিছু নেই।

বন্দুকটা আবার গর্জে উঠল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বাঁদর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজার ওপর। রাজার বন্দুকটা ছিটকে পড়েছে। ও শুয়ে পড়েছে, আর বাঁদরটা ওর বুকের ওপরে। রাজা বাঁদরটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। বাঁদরটা ওর বুক আর পেটের মাংস কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

এ দৃশ্য সহ্য করা অনিলিখার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের সব শক্তি একসঙ্গে করে ও ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ পাশের গাছে ঝড় তুলে কী একটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। ওইরকমই আরেকটা বাঁদর। নাহ, ঠিক বাঁদর নয়। উচ্চতা সাড়ে চার ফুট। অসম্ভব চওড়া কাঁধ। বিশাল চওড়া বুক, শক্তিশালী হাত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পা অপেক্ষাকৃত সরু ও ছোট, সাধারণ মানুষের মতো। কোটরে বসা চোখদুটোতে হিংস্রতার ছাপ। মুখে রক্ত লেগে আছে। গরিলা আর শিম্পাঞ্জির সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও আজকের মানুষের সঙ্গেই সবথেকে বেশি মিল। এরাই তাহলে প্রথম মানুষ! যাদেরকে রাজা বলে সুজাক, এখানকার লোকেরা বলে ওরাং-পেনডেক।

অনিলিখা বুঝতে পারল ওর শেষমুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। ওর অবস্থাও রাজার মতো হতে চলেছে। এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে-পেটে কামড়াতে শুরু করবে মানুষটা। চোখ বন্ধ করে ফেলল অনিলিখা। এক মিনিট কেটে গেল। দু-মিনিট। কই কিছুই হল না তো! অনিলিখা চোখ খুলল সাহস করে। লোকটা উধাও।

তবে কি এরা মেয়েদের খায় না? রাজা বলেছিল যে ওরা মেয়েদের পুজো করে। কিন্তু এটা এসব পর্যালোচনার সময় নয়। আহত পা নিয়েই অনিলিখা বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে আরম্ভ

করল। শুধু চাঁদের আলোর ভরসায়। ওর মনে হচ্ছিল সামনে যেন কেউ ওর জন্য পথ করে দিচ্ছে। বনজঙ্গল ঝোপঝাড় সরিয়ে সরিয়ে কী যেন ওর আগে আগে চলে যাচ্ছিল। তা না হলে এই রাতে ওর একার পক্ষে পথ চেনা অসম্ভব হত।

নীচে দুটো গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ড্রাইভার নেই। গাড়িতে চাপ চাপ রক্ত। অর্থাৎ, ওদেরকেও রেহাই দেয়নি এই নরখাদকের দল। গাড়ি স্টার্ট করল অনিলিখা। ফেরার পথ ধরল। ফেরার পথে ট্যাবেগাও-তে ও পুলিশ রিপোর্ট লেখাল। ওরাও নরখাদক মানুষের কথা আগে শুনেছে। আর ঠিক এই কারণে চোরাকাঠ শিকারিরা, পামওয়েলের সন্ধানী ব্যবসায়ীরা এখানে ঢোকে না। হঠাৎ করে ওরা কেন ওখানে এসেছিল, তা নিয়ে অনিলিখাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ও ইচ্ছে করেই সুজাক উপজাতির কথা কিছু বলল না। ওরা অনাবিষ্কৃত হয়েই থাক—বেঁচে থাক ওদের মতো করে।

75000 বছর আগে, সুমাত্রা

অবশেষে চোখ মেলল ছেলেটা। গত কয়েকদিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। ওঠার চেষ্টা করল, পারল না। অনেকদিন খাওয়া হয়নি। হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে। সারা গায়ে ক্ষতের চিহ্ন। কোনওরকমে মাথা তুলে চারদিকটা দেখে নিল একবার। এ গুহার মধ্যেও জল ঢুকে গেছে। শুধু সামান্য জায়গা বাকি। গুহার ছাদ আর নীচের জলের স্রোতের মধ্যে বড়জোর দু-হাত ফাঁকা।

ভাগ্যিস উঁচু পাথরটা পাওয়া গিয়েছিল! পাথরটা কোনওরকমে জলস্রোতের ওপরে মাথা তুলে আছে। তবে, তাও কতক্ষণ? বাইরে আর ভেতরে একইরকম অন্ধকার। শুধু জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ। এই বুঝি তেড়ে এল! মেয়েটা-মেয়েটা কোথায়?

এই এক মাসে ও ওরই মতো আরও দুজনকে খুঁজে পেয়েছিল। তারা তাদের মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ওকে অসুস্থ দেখে ফেলে চলে গেছে। শুধু মেয়েটা ছেড়ে যায়নি। এই এক মাস যা খাবার পেয়েছে দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। যেদিন খায়নি, দুজনেই খায়নি। এই যে ওর শরীর এত খারাপ, ওকে তো ফেলে মেয়েটা চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। পাশে বসে থেকেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন কোথায় গেল? নাহ, মেয়েটারই বা কী দোষ! ওর সঙ্গে এই গুহায় আটকে থেকে সেধে মৃত্যু ডেকে আনার তো কোনও কারণই নেই। খানিকবাদে এ গুহাতেও হয়তো জল ঢুকবে। ওর যা শরীরের অবস্থা ও কোনওভাবেই নড়তে পারবে না। জলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। নাহ, যদি চলে গিয়ে থাকে তো ঠিকই করেছে মেয়েটা।

হঠাৎ একটা পাথরের শব্দ এল কাছ থেকে। চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটা। ওই-ওই তো মেয়েটা! পাথর দিয়ে কিছু একটা থেঁতলে মেরেছে। এক হাতে কিছু একটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কিছু একটা ওর মুখে গুঁজে দিল।

আহ, কী সুন্দর! এক টুকরো মাংস। কতদিন বাদে যে এটুকু খাবার জুটল! মেয়েটা হাসছে। ভারি সুন্দর চোখের পাতা মেলে। ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ফোঁটাটা আঙুল দিয়ে মুছে মেয়েটা ওর হাতের মুঠোটা চেপে ধরল। এখনও সব শেষ হয়নি। আমরা বাঁচবই।

কলকাতা, 18 অক্টোবর

—বিশ্বজিৎদা, খবরটা দেখেছ? রুজু বাংলা খবরের কাগজটার তৃতীয় পাতার কোণের দিকটা এগিয়ে দিল। ছোট খবর।

বিশ্বজিৎদা খুব আনমনে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হাতে ধরা একটা বই কাছে দূরে করে নিজের নতুন চশমাটা টেস্ট করছিল, আর গুনগুন করে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজছিল।

—কী হল বিশ্বজিৎদা! খবরটা দ্যাখো।

তবু বিশ্বজিৎদার কোনও সাড়াশব্দ নেই। মিলন পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা রুজুর হাত থেকে টেনে নিয়ে একঝলক দেখে বলে উঠল,—অ্যাঁ, অ্যাসটরয়েডের ধাক্কার সম্ভাবনা! বলিস কীরে!

—কী? কীসের খবর? অ্যাসটেরয়েডে আমাদের সবারই খুব আগ্রহ।

রুজু এবার খবরটা পড়তে শুরু করল—'ঠিক যেমন—হঠাৎ করে দেখা দিয়েছিল অ্যাসটেরয়েড 2015 SX তেমনই আবার হঠাৎ করে হারিয়েও গেল। নাসার বিজ্ঞানীরা রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, যখন দশ দিন আগে এক সাধারণ পর্যবেক্ষকের টেলিস্কোপে এই অ্যাসটেরয়েড ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের চেনাজানা অ্যাসটেরয়েডের মধ্যে এটা ছিল না। পৃথিবী থেকে চাঁদের যতটা দূরত্ব তার এক চতুর্থাংশ দূরত্ব দিয়ে 14 অক্টোবর এই বিশাল পাথরের টুকরোটার যাওয়ার কথা ছিল।

এত কাছ দিয়ে এত বড় পাথর এখনও পর্যন্ত যায়নি। পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মজার কথা হল 14 অক্টোবরের দুদিন আগেই সেটা ভ্যানিশ। ম্যাজিকের মতো উধাও অ্যাসটেরয়েড। কী করে কেউ জানে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানী রন ওয়াইল্ড বলেছেন যে এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে আমরা এখনও মহাবিশ্বের কিছুই বুঝি না।

—দেখেছিস? বলেছিলাম না সেদিন! ডাইনোসরদের মতো আমরাও একদিন অ্যাসটরয়েডের ধাক্কায় শেষ হয়ে যেতে পারি—বলেছিলাম না? প্রতীক সবজান্তার মতো বলে উঠল।

—গাঁজাখুরি গল্প। এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সুর ছেড়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—এসব খবর কোথা থেকে আসে জানিস! স্রেফ সাংবাদিকদের মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশ থেকে। হয়তো জায়গাটা রাখা ছিল কোনও একটা কেচ্ছা কাহিনির জন্য। ঘটেনি সেরকম কিছু। ব্যস, এই খবর! ওই পাথরটা কবে আসবে তাও জানা ছিল না। তাই ভ্যানিশ হলেও কেউ প্রশ্ন করবে না। শুধু তোদের মতো কয়েকটা গজমূর্খ টেবিলে রাখা শিঙাড়া ঠান্ডা করে এসব আলোচনা করে যাবে।

বলে বিশ্বজিৎদা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলে প্লেটে রাখা একটা সিঙাড়া তুলে নিল।

তোমরা যারা আমাদের শনিবারের আসর সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত নও, তাদের বলি—প্রত্যেক শনিবারে উত্তর কলকাতার পুরোনো পাড়ায় রামতনু বোস লেনের একটা বাড়িতে আমরা জনাকুড়ি জমায়েত হই। বেশিরভাগের বয়স কুড়ির নীচে হলেও, বিশ্বজিৎদা, শ্যামলদা, দেবুদা—এরাও আমাদের আড্ডায় যোগ দেয়। আর কালেভদ্রে আসে অনিলিখাদি। অনিলিখাদির এমন এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে যার তুলনা পাওয়া মুশকিল। অনিলিখাদি উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা, সবার বিপদে সবসময়ে এগিয়ে যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। আর কলকাতায় থাকলে হঠাৎ হঠাৎ এ আসরে উদয় হয় বিদেশের নানান ধরনের চকোলেট নিয়ে। তবে তার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ অনিলিখাদির গল্পে। তাই আমরা সবসময় অনিলিখাদির অপেক্ষায় থাকি।

আজকে বিশ্বজিৎদার কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে চটি খোলার আওয়াজ। অনিলিখাদি ঘরে ঢুকল। একমুহূর্তে আমাদের আড্ডার ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা ভ্যানিশ। একটু যেন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হেঁটে চেয়ারে এসে বসল অনিলিখাদি। হাতে দুটো বই, তারমধ্যে একটা অ্যাসটেরয়েডের ওপরে লেখা। আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল,—অ্যাসটেরয়েডের ওপর খুব সুন্দর বই—তোরা পড়িস।

—কী আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে? আমরা এইমাত্র অ্যাসটেরয়েডের পৃথিবীতে ধাক্কা মারা নিয়ে কথা বলছিলাম। মনীশ বলে উঠল।

—এই দ্যাখো। অ্যাসটেরয়েড নিয়ে একটা খবর বেরিয়েছে। সত্যিই কি ধাক্কা মারার সম্ভাবনা ছিল? রুজু কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিশ্বজিৎদা ঠাট্টা করে বলে উঠল,—দাঁড়া, অনিলিখাকে একটু বসতে দে। এতদিন বাদে এল। এসব হল ওর কাছে পুরোনো খবর। অ্যাসটেরয়েডের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার—সব অনিলিখার জানা।

বলে একটু সিরিয়াসভাবে অনিলিখাদিকে ফের প্রশ্ন করল,—তা তোমার এ খবরটার ব্যাপারে কী মনে হয়? পুরো বানানো গল্প, তাই না?

অনিলিখাদি মুচকি হেসে একটু যেন সময় নিয়েই বলে উঠল,—এই একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত। পুরোপুরি বানানো।

রহস্য যখন সংখ্যায়



স্যাভান্ট কাদের বলে জানিস?

বিশ্বজিৎদা আমাদের সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে উঠল, —কিছু লোক আছে যাদের হাবভাব অস্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু যদি খেয়াল করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে তাদের অসাধারণ কিছু ক্ষমতা আছে। যেমন ধর, একটা টেলিফোন ডাইরেকটরি একবার পড়ে সে সবার নাম ও ফোন নাম্বার মনে রেখে দিতে পারে। কোন পাতায় কি আছে ছবির মতো মনে করে রাখতে পারে।

—তুমি তো 'রেনম্যান' সিনেমার লোকটার কথা বলছ, তাই না? প্রতীক বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, 'রেনম্যান' যাকে ভিত্তি করে লেখা সে হল এরকম স্যাভান্ট। এদের অনেকের অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। আবার কেউ কেউ মুখে মুখে জটিল গণনা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলে। একজন স্যাভান্ট তো দেখলাম ডেসিম্যালের পরে বাইশ হাজার পাঁচশো ডিজিট পর্যন্ত ভাগ করে বলে দিল।

—ডেসিম্যালের পরে বাইশ হাজার পাঁচশো ডিজিট! অসম্ভব!

—তার মানেই ভাব, আমাদের ব্রেন কত শক্তিশালী। ওরা পারে মানে নিশ্চয়ই ব্রেনের ক্ষমতা আছে এসব ক্যালকুলেশন করতে পারার। ওরা ব্রেনকে ব্যবহার করতে পারে। আমরা পারি না। একটু থেমে পল্লবকে লক্ষ করে প্রশ্ন ছুড়ল বিশ্বজিৎদা, বলত 2/1-তে কত হয়?

মাথাটা খানিকটা চুলকে পল্লব বলে উঠল, 'কত বললে? 13/2।'

'খুব বুঝেছি। তোকে উলটে বুঝিয়ে রাখলেও উত্তরটা বেরোবে না। কিন্তু ওরা বলে যেত 0.15384...দশমিকের পরে যত ইচ্ছে ডিজিট ওরা ইচ্ছেমতো বলে যেতে পারে। এসব স্যাভান্টদের অনেকেরই অটিজম থাকে। কেন না—

বিশ্বজিৎদাকে থেমে যেতে হল, কারণ দরজাটা খুলে গেছে। অনিলিখা ঘরে ঢুকেছে। শনিবারে শনিবারে মিলনদের বাড়িতে আমরা সব জড়ো হই। তার মধ্যে অনিলিখাই অনিয়মিত। কিন্তু ওর আসা মানেই আমাদের কাছে সারা বিশ্বের দরজা খুলে যাওয়া। পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সব খবর অনিলিখার ঠোঁটস্থ। বিশ্বজিৎদা যে থেমে গেল তা স্বাভাবিক। অনিলিখার সামনে ও আজকাল মুখ খুলতে বিশেষ সাহস পায় না।

চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে অনিলিখা বলে উঠল,—এ জন্যই তো স্যাভান্টদের নিয়ে এখন এত রিসার্চ হচ্ছে। ওদের ব্রেন কীভাবে কাজ করে তা জানা গেলেই ব্রেনের অনেকটা রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু আছে। নাম লুকা ম্যাত্তাজ্জি। ইতালিয়ান। বিখ্যাত নিউরো সার্জেন। ও এসব নিয়ে অনেক রিসার্চ করছে।

—তা, তোমার ব্রেন নিয়েও একটু রিসার্চ করতে বলো। ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি নিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে অনিলিখা বলতে থাকে,—লুকার সঙ্গে অনেকদিন বাদে এবার দেখা হবে।

—কলকাতায় আসছে বুঝি?

—নাহ, আমি ইতালি যাচ্ছি।

—কবে?

—নেক্সট উইকে।

—তা, এতদিন বলোনি যে! আমি, বুবলু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠি।

—ইতালিতে যাব বলে সেই তিনমাস আগে সেনজেন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। পরশু খবর এসেছে অ্যাপ্রুভড। তা ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত যাওয়ার কথা কী করে বলি?

—তা, শুধু ইতালি? না পুরো ইউরোপ?

—না, পুরো ইউরোপ ঘুরতে আরও সময় লাগবে। অতদিন সময় পাব না। ইতালিতে অনেক দেখার জিনিস আছে। আমার এবারকার সঙ্গী আশিস সমাদ্দার।

—আশিসবাবু! বিশ্বজিৎদা হেসে উঠল। সঙ্গে আমরাও।

আশিসবাবু অনিলিখার পাশের বাড়িতে থাকেন। বয়স পঁয়ষট্টির মতো। রোগা ছিপছিপে চেহারা। সবকিছুতেই সবজান্তা ভাব। ধারণা, পৃথিবীর কোনও কিছুই ঠিক হচ্ছে না। সবেতেই সন্দেহ। আর যে কাজের যে নিয়ম, পারলেই সেই নিয়ম ভেঙে ফেলেন। পাড়ার মাঠে আমরা যখন ক্রিকেট খেলি, মাঝেমধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন আর নানান ধরনের মন্তব্য করেন। যেমন সেদিন, আমাদের ভোম্বল দিব্যি ভালো ব্যাট করে। তা একটা বল মিস করতে না করতেই পাশ থেকে আশিসবাবুর মন্তব্য ভেসে এল, 'ছ্যা, ছ্যা—এটা একটা ব্যাটিং হল? ঠিক এই মিসটেকটা গাভাসকার করত। আজীবন আর শিখে উঠতে পারল না। ব্যাটটা এই এইভাবে'—বলে ওনার হাতে ধরা ছাতা আর বাঁ পা-টাকে সামনে একটু এগিয়ে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওনার ধারণা ওনার থেকে ভালো কেউ কোনও ব্যাপারেই নেই।

—তা, ভালো সঙ্গী পেয়েছ তা হলে। ইন্ডিয়ান মাফিয়া মিটস ইতালিয়ান মাফিয়া। বিশ্বজিৎদা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, জীবনে বাংলার বাইরে যাননি। আমি যাচ্ছি শুনে লাফিয়ে উঠলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা। আমার সঙ্গে যাবেন। ওনার খরচ অবশ্য উনি নিজেই দেবেন।

—তা লুকা কোথায় থাকে?

—ও থাকে পোর্টোফেনি বলে একটা জায়গায়। কাছাকাছি বড় শহর জেনুয়া। পোর্টোফেনি শুনেছি খুব বড়লোকদের জায়গা। ইতালিয়ান রিভিয়েরার মধ্যে পড়ে। লুকা আমাকে মাসতিনেক আগে একটা ই-মেল করেছিল। তাতে লিখেছিল ও নাকি দুরন্ত একটা কিছু আবিষ্কার করতে চলেছে। আমি তার উত্তরে পরপর দুটো ই-মেল পাঠালাম, কী আবিষ্কার? উত্তর এল না, হয়তো গোপনীয়তার স্বার্থে ও রিপ্লাই করতে চায় না। তাই আর মেল করিনি।

—তুমি তো বললে যে উনি নিউরোসার্জেন। তা হলে ব্রেন কীভাবে কাজ করে তা নিয়েই কিছু একটা হবে নির্ঘাত। তন্ময় ওর পাণ্ডিত্য ফলায়।

—তা, সে যাই হোক। এর মাসখানেক পরে একটা মেল পেলাম। এবার ও লিখেছে একেবারে অন্য ব্যাপারে। ও নাকি কোনও কিছুতে ফোকাস করতে পারছে না। হয়তো একটা কিছু ভাবছে, পরক্ষণেই ভাবনাটা যেন অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। আর সেটার ওপরে ওর যেন কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই।

—হঠাৎ করে একজন নিউরোসার্জেন তার নিজের ব্যাপারে তোমাকে লিখবে কেন?

—আমারও সেটাই প্রশ্ন ছিল। তবু আমি ওকে কিছু যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে বললাম। ওগুলো করার পরে কীরকম থাকে তা জানার জন্য আরেকটা মেল করেছিলাম। তার কোনও উত্তর আসেনি। এবার যখন দেখা হবে তখন এ বিষয়ে কথা বলব।

—তা তুমি যে আশিসবাবুকে নিয়ে যাচ্ছ, উনি তো সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসবেন।

—হ্যাঁ, সেটাই তো চিন্তা, এই তো ভিসা আনতে গিয়ে উনি সেদিন কনসুলেটের লোকটাকে গাধা বললেন।

—সে কী! তা ওরা কিছু বলেনি?

—ভাগ্যিস বাংলায় বলেছিলেন! ওরা শুনেছে 'টাটা'। মিষ্টি হেসে তাই 'চাও' বলেছে। 'চাও' মানে ইতালিয়ানে 'হ্যালো'। তবে কাউকে বিদায় জানানোর জন্যও 'চাও' কথাটা ব্যবহার করা হয়।

—তা ওনার কী বক্তব্য ছিল?

—ওনার বক্তব্য ওনার মতো লোকেদের এমনিতেই সবদেশের ভিসা দেওয়া উচিত। তাতে সেই দেশেরই গৌরব বাড়বে।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ আড্ডা হল। তবে ঘুরে ফিরে বারবার ইতালির কথাই উঠে আসছিল। কখনও গ্যালিলিও, কখনও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, কখনও মার্কোপোলো-কলম্বাস-মাইকেলেঞ্জেলো। এটা ঘটনা যে সেই রোমান পিরিয়ড থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ—ইতালির প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে।

দুই

—আপনি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তার নাম জানেন?

আশিসবাবু মাথা নেড়ে 'না' বলাতে অনিলিখা বলে ওঠে,—ভিয়া ডে ফেরি ইমপেরিয়ালি। রোমের প্রধান রাস্তা। মুসোলিনি তৈরি করেছিলেন। তবে তৈরি করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিলেন রোমের অনেক পুরোনো বিল্ডিং-প্রাসাদ। কলোসিয়াম, রোমান ফোরাম, পিয়াজ্যা ভেনেজিয়া—সবই এই রাস্তার ধারে।

—শহর তো নয়, মিউজিয়াম। আকাশের তলায় বড় একটা মিউজিয়াম। সবই যেন মধ্যযুগের। আশিসবাবু বলে ওঠেন।

—ঠিকই বলেছেন। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সব থেকে বেশি আছে ইতালিতে। তার মধ্যে সব থেকে বেশি আছে রোমে।

ওরা ফুটপাথ ধরে কলোসিয়ামের দিকে হাঁটতে থাকে। রোমে ওরা পৌঁছেছে গতকাল। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে এয়ার ইতালিয়ার ফ্লাইটে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার-আর্কিটেক্ট লিওনার্দোর নামে এই এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে হোটেল। হোটেলটা থ্রিস্টার। রোমের প্রধান স্টেশন রোমা টার্মিনির কাছেই। পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল রুম বুক করা ছিল। রাতটা কাটিয়ে ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে অনিলিখারা।

প্রথমেই ওরা দুদিনের জন্য হপ-অন, হপ-অফ বাসের টিকিট কেটে ফেলেছে। খোলা ছাদের দোতলা বাস। শহরের চওড়া রাস্তা ধরে প্রধান প্রধান টুরিস্ট স্পটগুলো সব ঘুরে দেখায়। যতক্ষণ টিকিট ভ্যালিড থাকে, যতবার ইচ্ছে ওঠা-নামা যায়।

রোম মানে শুধু চওড়া রাস্তা অবশ্য নয়। মাঝেমধ্যেই সরু রাস্তা, গলি। মধ্যযুগের পাথর বসানো রাস্তা। বিশাল বিশাল প্রাসাদের পাশে ছোট ছোট চার্চ। বহু পুরোনো বাড়ি। অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে দেখছে, আর বাসের গাইডের কথা শুনে মাঝে মাঝে নোট করছে। আশিসবাবু অবশ্য তেমন ইমপ্রেসড নন। 'রোমান হলিডে' নামে একটা সিনেমা কোনওকালে দেখেছিলেন। ওই রাস্তা-ফোয়ারা এসব শুধু খুঁজে যাচ্ছেন। একবার বললেন,—কলকাতার ধর্মতলা পাড়াও এর থেকে ভালো। এখানে আরও বেশি পুরোনো বাড়ি এই যা।

টিবের নদীর অন্য পাড়ে ভ্যাটিকান সিটি। সম্পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্র। পোপের অধীনে। একটা সময় পুরো রোমই ছিল পোপের অধীনে। পরে শুধু ভ্যাটিকান সিটিকে, পোপের হাতে দেওয়া হয়। বাস থেকে নেমে বিশাল লাইন পেরিয়ে সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল দেখেছে ওরা। এত বিশাল চার্চ যে হতে পারে, তা কল্পনা করা যায় না। খ্রিস্টানদের সব থেকে বড় চার্চ। ভেতরে প্রচুর বহুমূল্য ছবি ও মূর্তি। মাইকেলেঞ্জেলো, বার্নিনি, এবং আরও অনেক বিখ্যাত আর্কিটেক্ট-

আর্টিস্টদের ছবি ভাস্কর্যে সাজানো এই ক্যাথিড্রাল। এসব দেখেও আশিসবাবু সাত-আটবার হাই তুলেছেন।

এরপর সিস্টার্ন চ্যাপেল দেখে অনিলিখারা চলে এসেছে পিয়াজ্জা ভেনেজিয়ায়। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ে বিশাল সাদা প্রাসাদ। ইতালির প্রথম রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল-2-এর স্মৃতিতে মনুমেন্ট। কাছেই প্যালাজো ভেনেজিয়া। একটা সময় পোপ এখানেই থাকতেন।

এসব দেখে ওরা সেখান থেকে চলেছে কলোসিয়ামের পথে। মেন রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তা ডানদিকে সামান্য উঁচুর দিকে উঠে গেছে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনিলিখা বলতে থাকে—আশিসবাবু, রোমকে বলা হয় 'সিটি অফ সেভেন হিলস'। সাতটা ছোট ছোট পাহাড় আছে এখানে। তার মধ্যে এটা একটা। প্যালাটাইন হিলস। রোমের বেশ কিছু অভিজাত পরিবার এখানে থাকত। চলুন ওদের বাড়িগুলো দেখে আসি।

প্যালাটাইন হিলসে উঠতে উঠতে অনিলিখা বলতে থাকে,—রোমান সভ্যতার সময়ে পৃথিবীর প্রতি চারজনের মধ্যে একজন রোমের অধীনে ছিল। ভাবতে পারেন এসব অভিজাত পরিবারের কীরকম ক্ষমতা ছিল?

এখন অবশ্য ওসব প্রাসাদ মানে কিছু পাথরের স্তূপ। কিছু পিলার। ভাঙা ছাদের কিছু অংশ পড়ে আছে। তবু সেই পাথরের নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন রোমান সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া দম্ভ।

প্যালাটাইন হিলস থেকে নেমে ওরা কলোসিয়ামের দিকে হাঁটতে থাকে। অনিলিখা আশিসবাবুকে দূরের কলোসিয়ামের দেওয়াল দেখিয়ে বলতে থাকে,—এর অন্য নাম ফ্ল্যাভিয়ান অ্যাম্ফিথিয়েটার। অষ্টম শতাব্দিতে তৈরি। পঞ্চাশ হাজার লোকে এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে জন্তুর সঙ্গে গ্ল্যাডিয়েটারের আমৃত্যু সংগ্রাম দেখত। কখনও এখানে সাজানো যুদ্ধ হত তো কখনও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত।

কলোসিয়ামের সামনে কয়েকজন গ্ল্যাডিয়েটারের পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশিসবাবু তাদের দেখে বলে বসলেন,—এখনও গ্ল্যাডিয়েটারদের মারপিট হয় না কি এখানে?

অনিলিখা মজা করে বলে ওঠে,—হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে ছবি তুলে টাকা না দিলে মারপিট করে বই কি। এদের সঙ্গে একদম ছবি তুলবেন না। এদের খুব দুর্নাম।

সামনের গেটটা বন্ধ দেখে অনিলিখা বলে ওঠে,—আপনি এখানে একটু ওয়েট করুন। আমি খোঁজ নিয়ে আসি এর টিকিট কোথায় পাওয়া যায়, আর ঢোকার গেট কোথায়।

বলে ও কলোসিয়ামের পাশ দিয়ে অন্য গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

মিনিট পনেরো বাদে অনিলিখা ফিরে আসে।

—নাহ, বিশাল লাইন। লাইনেই একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আগেই অনলাইনে টিকিট কাটা উচিত ছিল। ওই লাইনে এখন দাঁড়ালে কলোসিয়াম ছাড়া রোমের আর কিছুই দেখা যাবে না। বাইরে থেকেই দেখে নেওয়া যাক।

কলোসিয়ামের বাইরের দেওয়ালটা প্রায় দশ-বারোতলা বাড়ির সমান উঁচু। নানান জায়গায় দেওয়াল ভেঙে গেছে। আর তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আশিসবাবু এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে বলে ওঠেন,—এই দ্যাখো, কলোসিয়ামের মিনিয়েচার, তুমি যাওয়ার পর একটা লোক এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। ইংরেজিতে। মিলান থেকে এখানে বেড়াতে এসেছে। ইন্ডিয়া থেকে এসেছি শুনে এটা গিফট করল।

—আর আপনিও অম্লান বদনে নিয়ে নিলেন! রোমের লোকেদের খুব একটা সুনাম নেই। এর পর থেকে সাবধান হবেন। দেখি! বলে অনিলিখা জার্মান সিলভারের কলোসিয়ামের প্রতিমূর্তিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে।

—আশ্চর্য এরকম মিনিয়েচার তো এখানকার কোনও দোকানে দেখলাম না। এটা আমি আমার কাছে রাখলাম। হোটেলে ফিরে আপনাকে দিয়ে দেব। লোকটাকে দেখতে কীরকম ছিল? অনিলিখা জিগ্যেস করে।

—দেখে তো বেশ শিক্ষিত মনে হল। চোখে রিমলেস চশমা। কাঁচাপাকা দাড়ি। টাকমাথা, ডান চোখের পাশে আঁচিল। বুক পকেটে পেন।

—ঠিক আছে, ওই লোকটাতে দেখতে পেলে আমাকে জানাবেন।

কলোসিয়ামের পথে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে চলে সার্কাস ম্যাক্সিমাসের দিকে। রোমান সভ্যতার সব থেকে বড় স্টেডিয়াম। এখানে ঘোড়ায় টানা রথের রেস হত।

অনিলিখা বলে,—বুঝলেন, আমাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামের থেকেও বড় ছিল। দেড়লক্ষ লোক বসতে পারত। ঘোড়ার টানা রথের দৌড় তখনকার দিনে খুব ডেঞ্জারাস স্পোর্টস ছিল। প্রায়শই ধাক্কা লাগত আর প্রতিযোগীরা মারা যেত।

রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে এই জায়গাটা। এখনও অনেকে আশেপাশের ঢালু জায়গাতে বসে আছে। নীচে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে।

সার্কাস ম্যাক্সিমাসের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে অনিলিখা কলোসিয়ামের মিনিয়েচারটা নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। নীচের দিকে একটা ছোট বর্গাকার জায়গা। ব্যাটারি লাগানোর জায়গা যেরকম হয়। ওটা খুলতেই একটা ছোট কাগজ বেরিয়ে আসে। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'তোমাদের ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে। পরে হোটেলে ফিরে দেখো, এটার মধ্যে অন্য

খোপে একটা চিপ রাখা আছে। ওটা যত্ন করে রেখে দিও। পরে কাজে লাগবে। এ কাগজটা পড়ার পর নষ্ট করে দিও।'

তিন

পরদিন অনিলিখারা বেরোল প্যান্থেয়ন দেখতে। রোমান সভ্যতার সময়ে তৈরি মন্দির। এত পুরোনো মন্দির সারা বিশ্বে হাতে গোনা।

ন'টার মধ্যে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল। বেরোতে বেরোতে এগারোটা হয়ে গেল। রাতে আশিসবাবুর ঘুম হয়নি। চিঠির দৌলতে। ওনার ধারণা কিছু মাফিয়া ওনার পিছু নিয়েছে। রাজারহাটে যে নতুন জমিটা কিনেছেন তার খবর এখানেও এসে গেছে।

হোটেলে ফিরে কালকের চিঠিটাকে পুড়িয়ে ছাইটাকেও ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রহস্য হল লোকটা কে? হঠাৎ করে চিঠিটা দিতে গেল কেন? মাইক্রোচিপটাও অনিলিখা খুঁজে পেয়েছে। ছোট 2 মিলিমিটার বাই 2 মিলিমিটার সাইজ। ওটাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছে অনিলিখা। মাইক্রোচিপটা কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে কে জানে! কী আছে ওতে? নানান প্রশ্ন। তবে বেড়ানোর মজাটা নষ্ট করার কোনও উদ্দেশ্যই নেই অনিলিখার, তাই ওসব ভুলে বেরিয়ে পড়েছে।

প্যান্থেয়ন খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। একে তো সরু সরু রাস্তা দিয়ে যেতে হয় তারপর রোমানরা খুব একটা হেল্পফুল নয়, নিজেদের রোমান সম্রাট অগাস্টাস আর জুলিয়াস সিজারের বংশধর ভাবে। ভালোভাবে ডিরেকশন দেওয়া নেই। আসলে এত বেশি টুরিস্ট দেখে ওরাও বিরক্ত।

তবে প্যান্থেয়ন খুঁজে পাওয়ার পর মনে হল পরিশ্রম সার্থক। এত বড় সাপোর্টহীন কংক্রিটের ডোম এত বছর পরেও কোথাও তৈরি হয়নি। অথচ কী নিখুঁত শিল্পশৈলি। প্যান্থেয়নের ওপরের দিকে ডোমের মধ্যিখানে গোল করে সামান্য খোলা। ভিতরে তাই বাইরের আলো এসে পড়েছে।

প্যান্থেয়ন থেকে বেরিয়ে সরু গলির মধ্যে একটা ক্যাফেতে গিয়ে বসল অনিলিখা। পাথরের রাস্তা। দু-পাশের বাড়িগুলো অন্তত কয়েকশো বছরের পুরোনো। পাথরের দেওয়াল। কয়েকটা পায়রা হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাস্তার বেশ খানিকটা অংশ দু-পাশের বাড়িগুলোর ছায়া কেড়ে নিয়েছে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা লাগছে। হাজার বছরের পুরোনো এসব রাস্তা দেখলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়। এ রাস্তায় বন্দি হয়ে আছে হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস। রাস্তার পাথরগুলো যেন তারই সাক্ষী।

—গেল্যাটো খাবেন?

—সে আবার কী?

—রোমের সম্রাটরা খেত। ঠান্ডা করা এক ধরনের ডেজার্ট। ইতালিতে আসবেন আর গেল্যাটো খাবেন না, তাই হয় না কি?

—তা হলে তো গেল্যাটো খেতেই হয়। আমার জন্য একটা বড় গেল্যাটো।

—গেল্যাটোর এখনকার নাম কিন্তু আইসক্রিম।

—ও হরি! তা হলে গেল্যাটো অন্যসময় খাব। এখন ক্যাপুচিনো খাওয়া যাক।

—জানেন তো ক্যাপুচিনো এরা শুধু ব্রেকফাস্টের সময়ে খায়। অন্য সময়ে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। অন্যান্য সময়ে এরা কফির অন্য প্রিপারেশনগুলো খায়। এক্সপ্রেসো, ক্যাফে ম্যাকিয়াতো, ক্যাফে লাটে—নানান ধরনের কফি। দুধের মাত্রা অনুযায়ী নানান নাম।

বলতে বলতে অনিলিখা থেমে গেল। রাস্তার ওপরেই অন্য একটা টেবিলে ছাতার তলায় যে লোকটা বসে আছে তাকে ডিসকভারি চ্যানেলে অনিলিখা দেখেছে। লোক না বলে ছেলে বলাই ভালো। বয়স কুড়ির কাছাকাছি হবে। কী যেন বলেছিল চ্যানেলটাতে! অনিলিখা মনে করার চেষ্টা করে। ছেলেটা ছোটবেলায় অঙ্কে ফেল করত। একা একা থাকত। এমনকী কথাও উলটো বলত। 'আমি আম খাব'-র বদলে 'খাব আম আমি'—এ ধরনের।

ষোলোর কাছাকাছি বয়সে ও এক অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। বিশাল বিশাল গুণ, ভাগ ও মুখে মুখে করে ফেলতে শুরু করে। কম্পিউটারের থেকেও তাড়াতাড়ি জটিল গণনা করতে পারে।

ছেলেটার নাম মনে পড়ছে না। এইটুকু মনে পড়ছে জার্মান। সঙ্গে যে লোকটা তাকে দেখে ইতালিয়ান মনে হয়। সুট-টাই পরা। সাদা চুল। টিকোলো নাক। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে। জার্মান ছেলেটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চস্বরে কীসব বলছে। ডান কপালে সামান্য কাটা দাগ।

আশিসবাবু অনিলিখার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন,—কি, তোমার চেনা?

—না, ঠিক চেনা নয়। ওই যে সবুজ জামা পরা ছেলেটা—ওর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সেই সূত্রে টিভিতে দেখাচ্ছিল। ছেলেটার অসাধারণ গণনা শক্তি। 23 to the power 62 কত বলতে পারেন? এই ছেলেটা কিন্তু এরকম যে-কোনও কিছু মুহূর্তের মধ্যে ক্যালকুলেট করে ফেলে।

—হ্যাঁ, অনেকের ওরকম ক্ষমতা থাকে। এ আর বলার মতো কী? আমারই তো একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, একবার যার কথা শুনি, তাকে মনে রেখে দিই। এই তো ব্যাঙ্কে জাস্ট গলা শুনে সেদিন মেয়েটার নাম বলে দিলাম। ক'দিন আগে আমাকে একবার ফোন করেছিল

—মনে রেখে দিয়েছি। তা বলে কি নিজের নামে ঢ্যাঁড়া পেটাতে যাব! চলো পিৎজা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরোনো যাক। রোমে আজকে তো লাস্ট দিন, দেখি কতটা কভার করা যায়। স্প্যানিশ স্টেপ, টেভি ফাউন্টেন, ফাউন্টেন অফ ফোর রিভার্স—অনেক কিছু বাকি। তা ছাড়া এখানকার মেটোতেও তো একবার চড়তে হবে। আমার বড় শ্যালক শুধু প্যারিসের মেটোর কথা শোনায়। আমিও এবার রোমের মেটোর কথা শোনাব।

পিৎজার অর্ডার দিয়ে অনিলিখা আরেকবার ওই টেবিলটার দিকে তাকাল। দুজনের মাঝে টেবিলের নীচে একটা ব্রিফকেস। স্থান-কাল-পাত্র বিচারে ব্রিফকেসটা কেমন যেন বেমানান।

চার

রোম থেকে ভেনিস ছুটে চলেছে ট্রেন। ইন্টারসিটি ট্রেন। তাই স্টপেজ কম। মধ্য ইতালির রোম থেকে উত্তর-পূর্ব ইতালির ভেনিস। অনেকটা পথ। ছ'ঘণ্টার যাত্রা। কেবিনের মধ্যে অনিলিখা, আশিষবাবু ছাড়া আরেকজন মহিলা আছেন। দেখে ইতালিয়ান মনে হয়।

আশিসবাবু মাঝেমধ্যেই অধৈর্য হয়ে বাইরের প্যাসেজে হাঁটতে যাচ্ছেন। এবার একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ফিরলেন।

—কী—কিনলেন?

—আরে না, আমি ওভাবে পয়সা খরচ করি না। একজন এটা সিটে রেখে বাথরুমে গেল। আমি তুলে নিলাম।

—আপনি তো বিপদে ফেলবেন দেখছি। দিন, আমি ফেরত দিয়ে আসি। কাগজটা হাতে নিয়ে উঠতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে অনিলিখা। কালকের সেই সুট-টাই পরা ভদ্রলোকের ছবি। কাগজের নীচের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে খবরটা। কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায়, তাই কেবিনের অন্য যাত্রীর শরণাপন্ন হতে হল।

মহিলা ভাঙা ভাঙা ইতালিয়ান উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন,—ইনি হলেন ফ্রান্সেসকো। এখানকার নামকরা নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট। ওনাকে কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

—কোথায়?

—হোটেল মার্কোপোলোর লবিতে। ওটা স্প্যানিশ স্টেপসের কাছেই একটা নামকরা হোটেল। রাস্তা ভিয়া কনডোট্যির ওপরে।

—তা হলে তো অনেকেরই লক্ষ করা উচিত। ওটাই তো রোমের ফ্যাশন স্ট্রিট।

—আসলে ভিয়া কনভোট্যি হচ্ছে উইন্ডোশপিং—এর জায়গা। প্রচুর টুরিস্ট। তাই কেউ কাউকে লক্ষ করে না। রিপোর্টে লিখেছে যে হোটেলে স্টাফেরা নাকি ছিল। ওদের ওপর নজর

ছিল না। ঢুকতে দেখেছিল। একটা বড় টুরিস্ট গ্রুপ ওই সময়ে আসায় ওরা ব্যস্ত ছিল। তবে ওরা চেক-ইন করেনি। লবিতে বসে খানিকক্ষণ ফোনে ব্যস্ত ছিল। খানিকবাদে ওরা খেয়াল করে যে একজন লবির সোফায় বসে ঘুমোচ্ছে। ডেকে কথা বলতে গিয়ে দেখে মৃত। অন্য জনের কোনও পাত্তা নেই। এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট-এর মৃত্যু। পুলিশ তাই নড়েচড়ে বসেছে।

আশিসবাবু ফিসফিস করে বলে ওঠেন,—তোমার দেখা ওই লোকটা সঙ্গে ছিল না তো? পুলিশে জানাবে?

—হওয়া সম্ভব। তবে রোমের পুলিশের খুব একটা সুনাম নেই। ওদের জানানোর আগে একবার লুকার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার।

ওই ভদ্রমহিলা আশিসবাবু ও অনিলিখাকে কথা বলতে দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বলে ওঠে,—আপনারা কিছু জানেন এবিষয়ে?

আশিসবাবু সেটা শুনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে উঠলেন,—উই নো নাথিং। এমনকী এই ভদ্রলোককে আমরা কোনওদিন দেখিনি। আর নিউক্লিয়ার রিসার্চেও আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।

এতটা না বললেও হত। অনিলিখা সামলানোর চেষ্টা করে, কি কারণে এনাকে মারা হতে পারে কিছু লিখেছে?

—শোনা যাচ্ছে ওনার কাছে এখানকার নিউক্লিয়ার রিসার্চের, ইউরোপের নিউক্লিয়ার ফেসিলিটির সম্বন্ধে অনেক দরকারি তথ্য ছিল। সেরকম কিছু টপ সিক্রেট ইনফরমেশন হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই খুন করা হয়েছে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিছু টেররিস্ট গ্রুপ এর পিছনে থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

আরও কিছু কথার পরে অনিলিখা কাচের দরজা ঠেলে কেবিনের বাইরে চলে এল। লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজে প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে একটা করে সিট বসার জন্য। ও সেরকমই একটা ফাঁকা সিটে বসে লুকাকে ফোন করে।

খানিকবাদে ফোনের অন্যপ্রান্তে লুকার গলা পাওয়া যায়,—পরন্তো।

—আমি অনিলিখা বলছি।

এবার পরিষ্কার ইংরেজিতে লুকা বলে ওঠে,—আরে অনিলিখা! তোমার কথাই ভাবছিলাম, তুমি ইতালিতে এসে গেছ, অথচ ফোন করোনি। তাই চিন্তা করছিলাম। তা পোর্টোফিনো আসছ কবে?

—ওই তো, যেমন জানিয়েছিলাম দুদিন বাদে। 22 এপ্রিল। আমি তার আগে তোমাকে ফোন করে নেব। এখন অন্য কারণে ফোন করছি। তুমি নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট ড. ফ্রান্সেসকোর মৃত্যুর খবরটা পড়েছ?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখলাম। তুমি কি ওনাকে চিনতে? খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। ভেরি আনফরচুনেট। ওনার মতো লোকের যে কেউ শত্রু হতে পারে, ভাবা যায় না।

—না, আমি চিনতাম না, তবে কাল একটা ক্যাফেতে আমার থেকে একটু দূরে অন্য একটা টেবিলে বসেছিলেন। ওনার সঙ্গে যে বসেছিল, তাকে আমি চিনি। কয়েকমাস আগে ডিসকভারি চ্যানেলে দেখিয়েছিল। একধরনের ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস। নামটা মনে নেই। আমার মনে হয় ফ্রান্সেসকোর মৃত্যুতে ওই লোকটার হাত আছে। আমি ওদের একসঙ্গে দেখেছি দুটো নাগাদ। আর ছ'টা নাগাদ ফ্রান্সেসকোকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হয়তো...

অনিলিখাকে থামিয়ে লুকা শান্ত গলায় বলে ওঠে,—তুমি কি ওই লোকটাকে আইডেনটিফাই করতে পারবে?

—ডেফিনিটলি। লোকটার নাম মনে পড়ছে না। জার্মান। আমি শিওর যে আমার ডেসক্রিপশান শুনে পুলিশ ওকে খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারবে। তাই ভাবছিলাম এখানকার পুলিশ—পোলিজিয়া বা ক্যারাবিনিয়েরিতে যোগাযোগ করব কি না।

—খবরদার না। এসব ব্যাপারে একেবারে ইনভলভড হোয়ো না। তুমি কি মনে করো এরকম হাইপ্রোফাইল মার্ডারে পুলিশের যোগসাজশ থাকবে না। ওরা তোমাকে ফাঁসিয়ে প্রথমেই জেলে পুরে দেবে।

—তা, তুমি কোনও হেল্প করতে পারবে না? তোমার তো অনেক জানাশোনা।

—হ্যাঁ, আমি দেখছি, কী করতে পারি। তবে তুমি আর এটা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা কোরো না, ভেনিস ঘুরে এখানে এসো, তারপর যা কিছু একটা করা যাবে।

—আমি ভেনিস যাচ্ছি তুমি জানলে কী করে? তুমি মন পড়তে পারো না কি?

—রোম দেখে ফেলেছ, ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছি। ভেনিস-ও যে তোমার ইটিরিনারিতে আছে তা আর বলতে হবে? একে একে দুই করে ফেললাম।

আরও খানিকক্ষণ কথার পর ফোন কেটে দিল অনিলিখা। লুকার কথাই ঠিক। পুলিশে যোগযোগ করাটা এ মুহূর্তে একটু রিস্কি। কলোসিয়ামের মিনিয়েচারটার কথা লুকাকে বলা হয়নি। আবার ফোন করতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা। আশিসবাবুর হাবভাব দেখে কেউ মজা করেনি তো? লুকাকে সাক্ষাতেই বলা ভালো।

পাঁচ

—আরে, এ তো বৃষ্টির জলে ডুবে যাওয়া কলকাতা। আমাদের ঠনঠনিয়ার কথা মনে হচ্ছে। স্যান্টা লুসিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়েই আশিসবাবু বলে উঠলেন।

আশিসবাবুর ভেনিসের ডেসক্রিপশন অনিলিখার মনোমতো না হলেও স্বীকার করতেই হবে যে দুটোর মধ্যে অনেক মিল আছে।

ভেনিসের রেলস্টেশন স্যান্টালুসিয়া থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াতে হয়। সামনে শুধু জল আর জল। স্টেশনের সামনে থেকেই বাস ছাড়ছে। বাস মানে অবশ্য বড় স্টিমার। বলা হয় ভেপরেট। গ্র্যান্ড ক্যানেল ধরে ভেপরেট যাচ্ছে ভেনিসের নানান প্রান্তে। ভেনিস হল অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে এরকম ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। একশো সতেরোটা এরকম দ্বীপ আছে। আর চারশো ন'টা ব্রিজের মাধ্যমে এরা একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত। এগুলোর মধ্যে মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু সরু খাল।

ভেপরেটের খোলা জায়গায় সামনের দিকে দুটো চেয়ারে গিয়ে বসল অনিলিখা আর আশিসবাবু।

খালের জলের রং অদ্ভুত রকমের সবুজ। আর তা দিয়ে ভেপরেটের পাশ দিয়ে চলেছে সরু সরু কালো রঙের দাঁড়বাওয়া বোট। যারা দাঁড় বাইছে তাদের গায়ে সাদা জামা, কালো প্যান্ট, মাথায় টুপি।

—এগুলো হল ভেনিসের বিখ্যাত গন্ডোলা। চড়বেন না কি?

—ওরে বাবা, উলটোলে তো সলিল সমাধি। এখানে ডুবলে গঙ্গাপ্রাপ্তিও হবে না। আমি ওসবে নেই। আর লোকে এত ভেনিস ভেনিস করে—বাড়িগুলোর কী অবস্থা দেখেছ? পলেস্তারা খসে দেওয়ালের ইট বেরিয়ে গেছে। এবার ফিরে গিয়ে আমার বাড়িটারও একটা ভেনিসোচিত নাম দেব। 'স্যান্টা অ্যাশিসা।'

—হ্যাঁ, লেগুন এলাকা তো। সমুদ্রের নোনা জলই তো বইছে এসব খালে। বাড়িগুলো তাই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তাও এসব বাড়ির অনেক দাম। ভেনিস অনেকটাই মানুষের হাতে তৈরি। কয়েক শতক ধরে খাল থেকে মাটি তুলে দ্বীপগুলোকে এরা আরও উঁচু করেছে। বাড়িগুলোর ভিত শক্ত করতে গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করেছে। তাও ভেনিস আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাচ্ছে।

—পরশু অব্দি না ডুবলেই হল। তা, বোটে করেই শুধু ঘুরতে হবে না কি?

—না, হেঁটেও ঘোরা যায়। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে আমরা হেঁটে হেঁটেও ঘুরতে পারি। সব দ্বীপগুলোর মধ্যে ব্রিজ আছে। ছোট ছোট ব্রিজ। ওই দেখুন—।

বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা। গ্র্যান্ড ক্যানেল থেকে ডানদিকে একটা সরু খাল বেরিয়ে গেছে। বড়জোর বারো-তেরো ফুট চওড়া। তারই ওপর দিয়ে একদিক থেকে আরেকদিক যাওয়ার ছোট ব্রিজ। ব্রিজের একদিকে একটা বাড়ি। অন্যদিকে খানিকটা খোলা একটা জায়গা,—ভেনিসে যাকে বলে ক্যাম্পি। সেই ক্যাম্পিতে একটা গোল টেবিলে বসে আছে সেই জার্মান ছেলেটা। অন্যদিকের ভদ্রলোককে এক ঝলক দেখা গেল। চেনা মুখ নয়। ইতিমধ্যে ভেপরেট ওই জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে গেছে—তাই ভালো করে দেখা গেল না। ভেপরেটের স্পিড কমছে। সামনেই কোনও জেটি আছে। অনিলিখাদের হোটেল স্যান্টা ফরমোসা আরও বেশ কয়েকটা স্টপ পরে।

—আশিসবাবু, আপনি জিনিসপত্র নিয়ে সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে নেমে হোটেলে চলে যান। আমি একটু জেটিতে নেমে ঘুরে আসছি।

আশিসবাবু কিছু বলার আগেই অনিলিখা বোটের ভিড় ঠেলে রিয়াল্টো জেটিতে নেমে গেল।

মিনিট কুড়ি বাদে আশিসবাবু সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে এসে নামলেন। অনিলিখার হঠাৎ করে নেমে যাওয়া ওনার একদম পছন্দ হয়নি। বলা নেই, কওয়া নেই,—এখন এত লাগেজ নিয়ে একা নামা!

ভেপরেট একটা ভাসমান জেটিতে ধাক্কা মেরে থামল। দড়ি ফেলে বোটটাকে আরও কাছে টেনে আনা হল। তার পরও নামার সময়ে আশিসবাবু যেভাবে লাগেজ নিয়ে সবার প্রথম লাফ দিলেন তা দেখার মতো। নেমে সোজা হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বাঁদিকে প্যালাজো ডুকালে ফেলে গ্র্যান্ড ক্যানেলের পাশ দিয়ে দুমিনিটের হাঁটা। ডানদিকে সারি সারি গন্ডোলা দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-দিকে প্যালাজো ডুকালের পরপর আর্চগুলো। তাতে নানান ধরনের শিল্প কারুকার্য। একে ডজের প্রাসাদও বলে। ডজ ভেনিসের ইলেকটেড গভর্নমেন্টের হেড। ডজ অ্যানজেলো এখানে নাইনথ সেঞ্চুরিতে সরকারের মূল দপ্তর করেছিলেন। এখানেই ডজ থাকতেন। তারপর অবশ্য অনেকবার সংস্কার হয়েছে। তা হলেও এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

এটাই ভেনিসের কেন্দ্র। একজন গাইড বড় একটা চাইনিজ গ্রুপকে চিনাভাষায় রাস্তার স্থান মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে। পায়রাগুলো নির্ভীকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানগুলোতে ভেনিসের নামাঙ্কিত নানান জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আশেপাশে বেশ কয়েকজন ভিখিরি বসে আছে। এখানে ভিখিরিদের ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইলটা বেশ ক্ল্যাসিকাল। উবু হয়ে বসে মাথা নীচু করে সামনে একটা বাটি ধরে থাকে। এদেরকে এড়িয়ে আশিসবাবু তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলেন। হঠাৎ একজন ছাতা বিক্রেতা আশিসবাবুর দিকে এগিয়ে এল। 'এক ইউরো'—বড় সাদা রঙের

ছাতা। কাউকে গিফটের জন্য খুব ভালো। আশিসবাবু ছাতাটা কিনে লাগেজগুলো নিয়ে এগোতে লাগলেন।

হোটেলটা একেবারে গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারে, খুব সুন্দর। পুরোনো বিল্ডিং সংস্কার করে তৈরি। খড়খড়ির জানলা। খুললেই রাস্তা আর তারপর গ্র্যান্ড ক্যানেল। এখানে ক্যানেল এতটাই চওড়া যে অন্যপ্রান্তের প্রাসাদগুলোকে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না।

অনিলিখা ফিরল প্রায় দু-ঘণ্টা পরে। কাকভেজা। এর মাঝে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

—নাহ, লোকটাকে দেখতে পেলাম না। যাওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেছে। তবে সঙ্গের লোকটার পরিচয় পেয়েছি। ক্যাফের লোকটা চেনে। ইউনাইটেড নেশনস-এর ফুড ডিপার্টমেন্টের হেড কোয়ার্টার রোমে। ওই সংস্থারই হেড। আমি যাওয়ার দু-তিন মিনিট আগেই ওনারা উঠে গেছেন। চারদিকে খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না।

আশিসবাবুর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অনিলিখা বলে,—ছাতাটা কোথায় কিনলেন?

—এই আসার পথে। ওনলি ওয়ান ইউরো।

অনিলিখা ছাতাটা হাতে নিয়ে সুইচ টিপে খুলল। বড় সাদা দামি প্লাস্টিকের ছাতা। ট্রান্সপারেন্ট। ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়।

—এক ইউরো? এর দাম দশ ইউরোর কম কিছুতেই হতে পারে না। যে দিয়েছিল—তাকে খেয়াল আছে?

—আরে সব কিছুতে তোমার ডিটেকটিভগিরি। এক ইউরো মানে পঁয়ষট্টি টাকা। কম হল? আমার আর কাজ নেই ছাতাওয়ালার চেহারা মনে রাখব। তবে লোকটার চোখে কালো গগলস ছিল। ফরসা রং। অন্তত এটুকু বলতে পারি যে এই লোকটা আর কলোসিয়ামের সামনে লোকটা এক নয়।

ততক্ষণে অনিলিখা ছাতাটা ভালো করে দেখতে শুরু করেছে, ছাতার হ্যান্ডেলে ম্যানুফ্যাকচারিং লেবেলটা দেখে অনিলিখা বলে ওঠে,—মেড ইন ইতালি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে খুব ছোট করে তার নীচে কিছু লেখা আছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় ফেলতে হবে। খানিকক্ষণের জন্য আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

—তা যাও, কিন্তু ছাতাটাকে অক্ষত রেখো।

অনিলিখা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল। ক্যানেলের দিকে একটা ছোট ব্যালকনি আছে। ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে পরদা টেনে দিল। তারপর বিছানায় মাথার

কাছে রাখা আলোটা জ্বেলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগল। লেখা আছে 'স্যান্টা ক্রোসে, 24/1'—কোম্পানির ফ্যাক্টরির ঠিকানা? কেউ কি কিছু জানাতে চাইছে? তা না হলে এত ছোট করে লেখা কেন? আর সেরকম হলে কোম্পানির নামটাও থাকত। পিনকোড থাকত, আর শেষের 1-এরই বা অর্থ কী? এটা নয়তো যে কেউ কাল ওই ঠিকানায় দুপুর একটায় যেতে বলেছে। তারপর মনে হল 24 মানে চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে নয় তো! সেক্ষেত্রে হয় রাত একটা। একবার চান্স নেবে ওই অ্যাড্রেসে গিয়ে? তা হলে আর ঠিক তিন ঘণ্টা বাকি।

ছয়

ভেনিসের গন্ডোলায় চড়া সত্যি অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট খাল বা রি ধরে অনিলিখার গন্ডোলা এগিয়ে চলেছে। এই খালগুলো বড়জোর বারোফুট চওড়া। দু-ধারে ইট বেরিয়ে থাকা বাড়ি। দেখে মনে হয় জলে ডুবে আছে। অনেক বাড়ির চৌকাঠ থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে জলে। আর সেখানে তাদের ব্যক্তিগত নৌকো রাখা আছে। গন্ডোলায় ভেলভেটের সিট। পায়ের নীচে দামি কার্পেট। এত রাতে কোথাও যেতে গেলে গন্ডোলা ছাড়া উপায় নেই। রিও দ্য মেন্ডিক্যান্টি, রিও দ্য স্যান্টা গুস্তিয়া পেরিয়ে গন্ডোলা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। দু-ধারের বাড়িগুলোর দেওয়ালে লাগানো হলদেটে আলো জলে পিছলে পড়েছে। চারদিকের নৈশব্দ্য, আলোছায়া, ছোট জায়গার মধ্যে নৌকোর বাঁক নেওয়া, ছোট ছোট ব্রিজের তলা দিয়ে যাওয়া—সবমিলিয়ে সে এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। এ আলো-আঁধারিরও যেন ভাষা আছে। আর সেই ভাষাই ভেনিসকে এত রোমান্টিক করে তুলেছে।

আধঘণ্টা বাদে স্যান্টা ক্রোসে পৌঁছোল অনিলিখা। গন্ডোলাটাকে দাঁড়াতে বলে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। খানিকটা হেঁটে একটা বড় স্কোয়ারে এসে পৌঁছোল। তারপর স্কোয়ারের বাঁদিক দিয়ে চার্চের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা। আশপাশের সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। কোনও দিকে কোনও লোক নেই। ভেনিসের রাস্তার আলোগুলো কেমন টিমটিমে হলুদ। তাতে ভালো করে দেখাও যায় না, আলো-ছায়ায় মেশানো রহস্যই তৈরি হয় বেশি। কলকাতার মতো রাস্তায় দু-একটা কুকুর থাকলেও হত। তবু মনে হত সঙ্গী আছে কেউ।

খানিকবাদে 24/1 খুঁজে পেল অনিলিখা। একটা অত্যন্ত পুরোনো বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। এন্ট্রান্স একটা সরু গলি দিয়ে। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে গলিতে ঢুকেই পড়ল। নাহ এখানেও কেউ নেই। তাহলে কি পুরো ভাবনাটাই ভুল? দরজাটা ভেজানো। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। আর এগোনো কি উচিত হবে?

কিন্তু অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই চমকে উঠল অনিলিখা। একটা রক্তের ধারা নীচে বয়ে গেছে। খানিকদূরে মেঝেতে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে বডিটা পরে টেনে এনে কেউ ভেতরে ফেলেছে। আস্তে-আস্তে অনিলিখা এগিয়ে যায়, কাছে গিয়ে মুখটা দেখেই চমকে ওঠে। কলোসিয়ামের সামনে যাকে আশিসবাবু মিট করেছিলেন, তার বর্ণনা অনিলিখার ভালোই মনে আছে। ঠিক সেরকম। টাকমাথা, চাপদাড়ি, রিমলেস চশমা, চোখের পাশে আঁচিল। চারদিক খুঁটিয়ে দ্যাখে অনিলিখা, কোথাও কিছু পড়ে আছে কি না। পায়ের জুতোটা খুলতেই একটা ছোট কাগজের টুকরো বেরোল। তাতে লেখা কয়েকটা শব্দ—কিউরিনা, বার্তোলো, মরিজিও, দেমেত্রিয়া, মার্গারিটা, ফ্যাবিও, হোসে, পাওলো, রবার্তো, ফেডেরিকা।

কাগজের টুকরোটা চট করে লুকিয়ে ফেলে অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। এলোমেলো কিছু চিন্তা মনে জেগে ওঠে। বাড়িতে আর কেউ আছে কি? লোক ডাকবে? পুলিশে খবর দেবে? কীভাবে বোঝাবে এখানে আসার কারণ? আপাতত দ্রুত সরে যাওয়াটাই বোধহয় শ্রেয়। কাল লুকার সঙ্গে আলোচনা করে যাহোক কিছু করা যাবে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সে পথ দিয়েই চুপিসাড়ে বেরিয়ে গন্ডোলার কাছে চলে এল অনিলিখা। গন্ডোলায় উঠে বসতেই দাঁড় বাইতে শুরু করল লোকটা।

সাত

গ্র্যান্ড ক্যানেলের ওপর দিয়ে যে তিনটে ব্রিজ আছে তার মধ্যে সবথেকে পুরোনো আর বিখ্যাত হল দ্য রিয়াল্টো ব্রিজ। 1440 সালে এই ব্রিজ প্রথম তৈরি হয়। ব্রিজের মাঝের অংশ খোলা যেত যাতে বড় জাহাজ সেখান দিয়ে যেতে পারে। সে তো হল, কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই দেখা গেল ব্রিজ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, তাই আবার এই ব্রিজ তৈরি করা হল—যা শেষ হয় 1592-তে। মাইকেলেঞ্জেলো, প্যালাডিও, স্যানসোভিনোর মতো নামি আর্কিটেক্ট থাকতে ব্রিজের কাজ করতে দেওয়া হল এক অপেক্ষাকৃত অনামি আর্কিটেক্টকে—অ্যান্টনিও দ্য পন্টে। উনি যে খারাপ বানাননি তার প্রমাণ, আজ চারশো বছর পরেও ব্রিজ অক্ষত। সিঁড়ি দিয়ে ব্রিজে উঠতে হয়। ব্রিজের ওপরে দুদিকে সার দিয়ে দোকান। মাঝে খানিকটা খোলা অংশ, যেখানটায় দোকান নেই। সেখানেই দাঁড়িয়ে অনিলিখা। সঙ্গে আশিসবাবুও আছেন।

গতকালের ঘটনা অনিলিখা আশিসবাবুকে বলেনি। ছাতা আর কলোসিয়ামের মিনিয়েচার—দুটোই আশিসবাবুর প্রাপ্তি। তাই ঘটনাটা শুনে উনি ঠিক নার্ভাস হয়ে পড়বেন। হোটেল থেকেই আর বেরোবেন না।

সকালে স্থানীয় খবরের কাগজ দেখেছে অনিলিখা। তাতে ওই ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। কে ছিল ওই লোকটা? কেন বারবার অনিলিখা আর আশিসবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করছিল? কে-ই বা মারল লোকটাকে? জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখা কাগজটারই বা কী অর্থ? গতকাল ওকে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে দ্যাখেনি তো? একগাদা প্রশ্ন।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল অনিলিখা। আশিসবাবু একটা স্যুভেনির শপে পেপার ওয়েটের দাম নিয়ে বেজায় দরাদরি করছেন, আশেপাশের বেশিরভাগই টুরিস্ট—আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চই বেশি। কেউ সেরকমভাবে অনিলিখাদের লক্ষ করছে বলে মনে হল না।

ইতিমধ্যে আশিসবাবু ফিরে এসেছেন। গন্ডোলার ছবিওয়ালা পেপার ওয়েটটা দেখিয়ে বলে উঠলেন,—ওনলি ওয়ান ইউরো। প্রথমে পাঁচ ইউরো চেয়েছিল।

'ওয়ান ইউরো!' চমকে ওঠে অনিলিখা। কালকের ঘটনার পর থেকে 'ওয়ান ইউরো' কথাটাকে রীতিমতো ভয় পায় অনিলিখা। তবে দোকানির মুখ দেখেই সংশয় ভাঙল। সে দূর থেকে আশিসবাবুকে উত্তেজিত হয়ে কী সব বলে যাচ্ছে। সেটা যে রেগে গিয়ে তা ইতালিয়ান না জানলেও বোঝা যায়।

ব্রিজ থেকে নেমে লাঞ্চের জায়গা খুঁজতে লাগল অনিলিখা। বাঁদিকে প্যালাজো লরেডান আর প্যালাজো ফারসেট্যি পড়ল। দুটোই দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ভেনিসের বাইজানটাইন স্টাইলের স্থাপত্যের উদাহরণ। প্রাসাদের একতলায় আর দোতলায় বাড়ির পুরোটা জুড়ে পরপর লম্বা আর্চ। দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা। ক্যানেলের ধারে অনেক লোকের যাতায়াত। তাই একটা সরু গলির মধ্যে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে অনিলিখারা ঢুকল পিৎজা খেতে। এখানকার পিৎজা অবশ্য অন্যরকম খেতে। নীচের ক্রাস্টটা শক্ত রুটির মতো। পিৎজা হয়তো ভালোই লাগত কিন্তু হঠাৎ অনিলিখা দেখল রেস্টুরেন্টের দরজা দিয়ে জার্মান ছেলেটা ঢুকছে, ঢুকে অন্য একটা টেবিলে গিয়ে বসল। অনিলিখা আড়চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারল ছেলেটা একদৃষ্টে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে, এবং যাতে ওকে খেয়াল করা হয় সেরকমভাবেই তাকিয়ে আছে।

আশিসবাবুর অবশ্য সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দু-হাত আর দাঁতের সাহায্যে পিৎজা ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খানিকবাদে ছেলেটা একটা বিয়ার শেষ করে বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার সোজা অনিলিখাদের টেবিলের কাছে হেঁটে এসে বলে উঠল, 'টু ফোর টুয়েন্টি ফোর'—বলে একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওর বিশাল চেহারাটা দরজার বাইরে উধাও হয়ে যাওয়ার পরপরই আশিসবাবু কাঁপা গলায় বলে উঠলেন,—আরে ওই ছেলেটা! মার্ডারার ছেলেটা! কী বলে গেল বলো তো?

অনিলিখার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারমানে ওকে ওই বাড়িতে ও শিওরলি দেখেছে। ইচ্ছে করে ফাঁসায়নি তো? অনিলিখারা ওর সম্বন্ধে বেশি জেনে ফেলেছিল বলেই উলটো ফাঁদে ওদের ফেলা হয়েছে? পিৎজাটা আর তেমন জমল না।

লাঞ্চ করে ওরা ফিরে চলল সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে। ছোট-বড় গলি, স্কোয়ার, ছোট-ছোট ব্রিজ পেরিয়ে হেঁটে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগল। আসলে ভেনিসের প্রত্যেকটা জায়গাই অন্যরকম। যেতে যেতে মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। এমনই অবাক করা দৃশ্য। কোনও বাড়ির পাশে হেলে যাওয়া চার্চ। সামনের বড় চত্বরে মধ্যযুগীয় চার্চ। কোনও কোনও জায়গায় আবার খালগুলো যেন নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি খেলছে। আর সেই ছোট ছোট খোপে কোথাও স্যুভেনিরের দোকান, ক্যাফে তো কোথাও পরিত্যক্ত প্রাসাদ। বেশিরভাগ বাড়িতে জানালার বাইরে ছোট গ্রিলের খাঁচা। তাতে নানান ধরনের ফুল। রাস্তায় প্রচুর ট্যুরিস্ট। বাড়িগুলোর জানালা-দরজা সব বন্ধ। দেখে মনে হয় ভেনিসবাসী বলে কেউ নেই। এখানে সবাই বেড়াতে এসেছে।

সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে ঢোকার মুখে দুটো বড় বড় স্তম্ভ। একটায় ওপরে সেন্ট থিয়োডোরের স্ট্যাচু। অন্যটার ওপরে ভেনিসের সিম্বল—ডানাওয়ালা সিংহ। দুটোই 1125 সালে চিন থেকে আনা হয়। আগে অপরাধীদের এই দুই স্তম্ভের মাঝে ফাঁসি দেওয়া হত।

এই দুটো স্তম্ভ পেরোলে বিশাল স্কোয়ার। স্কোয়ারের শেষের দিকে বেল টাওয়ার। এটা ভেনিসের সব থেকে পুরোনো বেল টাওয়ার। প্রায় নশো সালে তৈরি এই বেলটাওয়ার অক্ষত ছিল 1902 সাল অবধি। 1902 সালে এই বেলটাওয়ার ভেঙে পড়ে। আবার ঠিক একইরকম বেল টাওয়ার তৈরি করা হয়। বেল টাওয়ারের পাশেই সেন্ট মার্ক ব্যাসিলিকায় ঢোকার বিশাল লাইন। অনিলিখারা ওই লাইনে দাঁড়ায়।

—বুঝলেন আশিসবাবু, এটাই ভেনিসের ধর্মীয়, সামাজিক আর রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল হাজার বছর ধরে। 829 সালে ডজেরা সেন্ট মার্কের সমাধিস্থল হিসেবে এই চার্চ তৈরি করে। বহুবার এখানে আগুন লেগেছে। বহুবার সংস্কার হয়েছে। এই চার্চের গুরুত্ব কখনওই কমেনি। এখানে প্রচুর বিখ্যাত ছবি আছে। ঢোকার দরজায় ওপরে যে ছবিটা দেখছেন ওটা হল এল কিউরেনার 'লাস্ট জাজমেন্ট'।

বলতে বলতে অনিলিখা দেখতে পেল লাইনের পাশে একটা লোক খবরের কাগজ বিক্রি করছে। এটা ভেনিসের নামকরা পত্রিকা 'কমেস্টাই'-এর আফটারনুন এডিসন। তিন ইউরো

দিয়ে কাগজটা কিনে এক ঝলক তাকাতেই যে খবরটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল অনিলিখা। কিন্তু এত বড় করে বেরোবে তা অনিলিখার ধারণা ছিল না। প্রায় অর্ধেক পাতা জুড়ে। ওপরে ওই ভদ্রলোকের ছবি। একটাই সমস্যা, লেখাটা ইতালিয়ানে।

আশিসবাবুকে নিয়ে লাইনের বাইরে বেরিয়ে আসে অনিলিখা। আশিসবাবু যথারীতি বিরক্ত।

—কী ব্যাপার বলো তো অনিলিখা। তোমাকে নিয়ে প্ল্যানমাফিক কিছু করার উপায় নেই। এই তো এতক্ষণ এই চার্চের ব্যাপারে এত ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছিলে। এখন না দেখে বেরিয়ে যাচ্ছ।

—আপনাকে পরে বুঝিয়ে বলছি। আমাদের মহাবিপদ। আপাতত আমাকে ফলো করুন।

আশিসবাবু একটু থতোমতো খেয়ে অনিলিখার পিছু নিলেন।

—চলুন একটু গেল্যাটো খাওয়া যাক।

—এই যে বললে মহাবিপদ। এরমধ্যে আবার আইসক্রিম খাওয়ার শখ এল কোথা থেকে। কিছু বুঝি না বাপু। এর থেকে পাড়ার ন্যাড়ার সঙ্গে এলে ভালো করতাম।

—এইরকম মেঘলা দিলে গেল্যাটো খাওয়ার লোক বেশি নেই। আমার দরকার একটা নিউজের ইংরেজি ট্রান্সলেশন। তাও এমন একজনকে দিয়ে যে আমাদেরকে চেনে না।

ঠিক এরকমই একটা গেল্যাটোর দোকান খুঁজে পেল অনিলিখা খানিকটা হাঁটার পর। একা একজন আইসক্রিমের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিল অনিলিখা। তারপর নিছক কৌতূহলের ভান করে কাগজের ওই খবরটার ব্যাপারে জিগ্যেস করল। লোকটাও খবরটাতে বেশ ইন্টারেস্টেড মনে হল। খবরের কাগজটা নিয়ে কিছুক্ষণ পড়ার পর বলল,—এনার নাম রবার্তো। একটা সময় হার্ভাড না কোথায় অঙ্ক করাতেন। মাঝে মাথার গণ্ডগোল দেখা দেয়। কম্পিউটার, রোবট এসবের ওপর খুব রাগ ছিল। অনেকবার অনেক জায়গায় পার্সেল বোমা ফাটিয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বেশ কিছু লোক হতাহতও হয়। বহুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের পুলিশ একে খুঁজছিল। তা, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই মার্ডার!—লোকটা থামল।

—আর কিছু লিখেছে?

—হ্যাঁ, লিখেছে পুলিশ নাকি একটা মেয়েকে খুঁজছে। ইতালিয়ান নয়। ওখানে মার্ডারের সময় ছিল।

আশিসবাবুর হাত থেকে আইসক্রিম পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলে উঠলেন,—কে তুমি নাকি?

নেহাতই বাংলায় বলেছিলেন। না হলে মুশকিলে পড়তে হত।

অনিলিখা আশিসবাবুর কথার প্রত্যুত্তরে সপ্রতিভভাবে ইংরেজিতে বলে উঠল,—কতরকম লোক থাকে। ভাবা যায় সায়েন্টিস্ট হয়ে সায়েন্সের বিরোধিতা করতেন?

লোকটার সঙ্গে আরও দু-একটা কথা বলার পরে 'গ্র্যাৎসি মিলে' বা অসংখ্য ধন্যবাদ বলে অনিলিখারা হোটেলের পথে পা বাড়াল।

আট

'জেনুয়া'-কে বলা হয় ইতালির সাংস্কৃতিক রাজধানী। এমনকী ইউরোপেরও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে স্বীকৃত। বহু পুরোনো শহর। কখনও স্পেনের অধীনে, কখনও অস্ট্রিয়ার অধীনে, কখনও বা ফ্রান্সের অধীনে। 1814 সালে ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা পায়। একদিকে ভূমধ্যসাগর, অন্যদিকে অ্যাপেননাইন পর্বতশ্রেণি। পুরো শহরটাই পাহাড়ি। নানান লেভেলে বাড়ি। কিছু বাড়ি সমুদ্রতলে, তো কিছু বাড়ি পাহাড়ের ওপরে।

লুকার পরামর্শমতো সেদিন রাতেই ভেনিস থেকে জেনুয়া চলে এসেছে অনিলিখারা। ওরা উঠেছে শহরের ভিয়া ভ্যালভি এলাকার একটা মাঝারি হোটেলে। এটা শহরের খুব পুরোনো এলাকা। শহরের অন্যতম প্রধান রেলস্টেশন প্রিন্সিপিয়া থেকে দু-মিনিটের হাঁটাপথ। পাথর বসানো ফুটপাথ, রাস্তা। রাস্তার দু-ধারে ওপরে-নীচে চড়াই রাস্তা চলে গেছে। বাড়ি আর মিউজিয়াম হাত ধরাধরি করে রাস্তার দু-ধারে।

সকালে হোটেলের ব্রেকফাস্ট রুমে বসে টিভির পরদায় অপ্রত্যাশিতভাবে লুকার দেখা পেল অনিলিখা। লুকা যে স্থানীয় টিভি চ্যানেলে একটা আই.কিউ টেস্ট-এর শো হোস্ট করে তা জানা ছিল না। প্রোগ্রামটা বেশ ইন্টারেস্টিং। পুরো ইউরোপ থেকে যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। নানান জটিল ধাঁধা, বিভিন্ন ধরনের নকশার মধ্যে মিল খুঁজে বার করা—এসব তো আছেই, সঙ্গে আরও মজার অনেক কিছু হয়। যেমন, নতুন ধরনের সমস্যায় পড়লে তার থেকে কত তাড়াতাড়ি কে বেরোতে পারে—তা দেখা হয়।

আজকের প্রোগ্রামে একজন লোককে একটা পুরো অন্ধকার অচেনা ঘরে ঢুকিয়ে একটা দেশলাই-এর বাক্স বার করে আনতে বলা হল। ঘরে ঢোকার আগে তাকে শুধু ওই ঘরের কোথায় কি আছে তার চাররকম সম্ভাবনা দেখানো হয়েছিল। লোকটার কাজ হল ওই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এবং ঘরের ছবি মনে রেখে তিন মিনিটের মধ্যে ওই দেশলাই বাক্স উদ্ধার করা।

লুকা অনুষ্ঠানটার পরিচালক। ওর নিজের আই.কিউ-ও সাংঘাতিক বেশি। 160-এর কাছাকাছি। সে কারণেই ওকে হয়তো হোস্ট সিলেক্ট করা হয়েছে।

উত্তর ইতালিতে ব্রেকফাস্টে সবাই নিরামিষই খায়। ক্রুঁয়স্যা, চিজ, পাঁউরুটি, ফোক্যাসিয়া, আর কফি খেয়ে ওরা বেরোল জেনুয়া ঘুরতে। রোজই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। আজকে আবার কিছু না হয়! কলম্বাস জেনুয়ার লোক ছিলেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর তাঁর রোজগারের এক দশমাংশ জেনুয়াবাসীর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে রেখে যান।

কলম্বাসের বাড়িটা ভিয়া ভ্যালভি থেকে হেঁটে পনেরো মিনিট। পথে ভিয়া গ্যারিব্যাল্ডি রাস্তা পড়ে। এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ষোলো শতাব্দিতে জেনুয়ার অভিজাত সব পরিবার এখানে থাকত। রাজা এলে এসব প্রাসাদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হত। ভিয়া গ্যারিব্যাল্ডির দু-ধারে প্যালাজো রসো, প্যালাজো রিয়াল। টাসকানি থেকে আনা মার্বেলের প্রাসাদ। চারশো বছরেও প্রাসাদের জৌলুস কমেনি!

প্রাসাদের মধ্যে বিশাল বিশাল ইতালিয়ান ফ্রেস্কো পেন্টিং—রুবেনস, ভ্যান ডিক, বেলিনি, বটিস্যেলি—এমন সব নামি আর্টিস্টদের আঁকা। এসব দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠে হঠাৎ আশিসবাবু কি খেয়ালে অনিলিখাকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা সেদিন ওই কলোসিয়ামের মূর্তিটার মধ্যে যে ছিপটা পেয়েছিলে, সেটার কী হল?

—ছিপ নয়, চিপ। মাইক্রোচিপ। আমি আপনাকে পরে বলব।

একটু থেমে অনিলিখা ফিসফিসিয়ে বলে,—আমাদের একজন ফলো করছে—তা কি টের পেয়েছেন?

—ফলো? সে কী? কোথায়? কীরকম দেখতে? আশিসবাবু এমন হইহই করে উঠলেন যে একজন লোক দ্রুত ওই ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল। অনিলিখাও নিশ্চিন্ত হল যে, লোকটা সত্যি ওদের ফলো করছিল। হোটেল থেকে ওই লোকটাকে পিছু নিতে দেখেছে। কী চায় কে জানে!

প্যালাজো রিয়াল থেকে বেরিয়ে আরও খানিকটা হেঁটে ওরা কলম্বাসের বাড়ি পৌঁছোল। বাড়িটা সংস্কার করে খানিকটা অংশ একই রকম ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাতে কলম্বাসের ব্যবহৃত নানান জিনিস আছে। এই প্রথম একজন লোক পাওয়া গেল যার সম্বন্ধে আশিসবাবু বেশ ভালো ধারণা পোষণ করেন। ঘরটা দেখার পর বলে উঠলেন,—ভাবা যায়! সেই হাজার হাজার বছর আগে নৌকো চেপে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গিয়েছিল। ইনি না আবিষ্কার করলে আমেরিকা হয়তো আমেরিকাই হয়ে উঠত না।

অনিলিখা সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল,—নৌকো মানে এমনি নৌকো নয়। স্প্যানিশ আর্মাডা—বড় জাহাজ। আর হাজার হাজার বছর নয়, মোটামুটি পাঁচশো বছর আগে, 1492-তে। তবে তখনকার দিনে সমুদ্রে চার হাজার মাইল যাওয়া—অনিশ্চিত পথ পেরিয়ে—এতে যে

বুকের পাটা লাগে, তা না বললেই নয়। যাঁরা পাঠিয়েছিলেন—স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড আর রানি ইসাবেলাও নিশ্চিত ছিলেন যে ওই জাহাজ আর ফিরবে না। সমুদ্রে ডুবে যাবে। তাই এমন কন্ট্রাক্ট সাইন করেছিলেন কলম্বাসের সঙ্গে যাতে কলম্বাসকে অনেক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। লাভের দশ শতাংশ, যে দ্বীপ আবিষ্কার করবে তার দশ শতাংশ—ইত্যাদি। তা একেই বলে ভাগ্য। কলম্বাস শুধু দ্বীপ নয়, একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে ফিরে এলেন।

কলম্বাসের বাড়ির পাশে পুরোনো শহরের প্রাচীর। এই একটা জায়গাতেই খানিকটা অংশ অক্ষত আছে। আগে ইতালির প্রত্যেকটা শহর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত। তারই সামান্য অবশেষ। জেনুয়ার সঙ্গে পিসা, পিসার সঙ্গে ভেনিস—সারাক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলত। জেনুয়া ছিল তখনকার বেশ নামকরা বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। তাই দেওয়াল দিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করা ছিল। কখন কারা আক্রমণ করে বসে!

ওরা পুরোনো দিনের সেই দেওয়াল দেখছে, হঠাৎ প্রশ্ন এল পাশ থেকে—'বাঙালি?'

যিনি প্রশ্ন করেছেন তাঁর কথার টান শুনেই বোঝা যায় বাংলাদেশি। গায়ে রংচঙে শার্ট। কালো ছোটখাটো চেহারা। ছাগুলে দাড়ি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল অনিলিখাদের। এখানে প্রায় কুড়িবছর আছেন। রাজশাহি থেকে এসে আফ্রিকাতে কয়েকবছর ছিলেন। তারপর ইতালিতে চলে আসেন। গাড়ি চালাতেন।

শেষ কয়েকবছর এখানকার বড় ব্যাঙ্ক 'ইনটেসা স্যানপাওলো'-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের গাড়ি চালাতেন। দু-মাস আগে ওই CEO হঠাৎ দিন সাতেকের জন্য উধাও হয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ হয় ওনার ওপর। জেল হাজতে সাতদিন অকথ্য মারধর করা হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ছাড়া পান। ওনার মনিব পাওলো নাকি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন।

ভদ্রলোক এখন আর গাড়ি চালান না। ছোট একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট খুলেছেন। তাতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন ওদের।

কলম্বাসের বাড়ির পাশেই ভিয়া সেত্তেম্বরে। জেনুয়ার বড় রাস্তা। দু-ধারে বড় বড় দোকান। তারমধ্যে বাটার জুতোর দোকান আছে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা ট্যাবাচ্চি থেকে কয়েকটা ম্যাগাজিন কিনে নিল অনিলিখা। কয়েকটা জিনিস জানা দরকার। পাওলোর মতো আরও কেউ ইদানীং কিছুদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছেন কিনা। তারা ফিরে এসে কী করছেন!

ভিয়া সেত্তেম্বরের ওপর ফ্যাশন ডিজাইনার জারার একটা বিশাল শো-রুম। ভিতরে ঢুকে জুতো কিনতে গিয়ে টিভির দিকে চোখ পড়ল। বিবিসি-তে নিউজ দেখানো হচ্ছে ইউনাইটেড

নেশনস FAO-এর ওপর। যার পুরো নাম হল ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন। এদের কাজ সারা পৃথিবীতে খাবার জোগান নিশ্চিত করা—লোকে যাতে অভুক্ত থেকে না মরে তা দেখা। এদেরকে রিসেন্টলি একটা বিশাল বাজেট দেওয়া হয়েছে আফ্রিকায় আর অনুন্নত কিছু দেশে কাজ করার জন্য। তাই নিয়ে এদের বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ব্রাজিলিয়ান। নাম হোসে গ্র্যাজিয়ানো। হ্যাঁ, এর সঙ্গেই সেদিন কথা বলছিল ওই জার্মান ছেলেটা। লোকটার চাউনি কেমন যেন অস্বাভাবিক। ইন্টারভিউয়ের সময়ে সব ডেটা কণ্ঠস্থ। একের পর এক বিশাল বিশাল অঙ্কের সংখ্যা যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে। কীভাবে কোথায় ইনভেস্ট করবে, কোন দেশে কত কর্মীসংখ্যা হবে, ক'টা অফিস থাকবে সব মুখস্থ। হয়তো খুবই মেধাবী লোক হবে।

নয়

হোটেলের ঘরে ফিরে পরদা সরিয়ে, খাটের নীচে ঢুকে, আলমারি খুলে সব ভালো করে চেক করতে শুরু করল অনিলিখা, ওর মন বলছে ওদের ওপর সমানে লক্ষ রাখা হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ খোঁজার পর যন্ত্রটা মিলল। যন্ত্র মানে যাকে বলে বাগ। পড়ার টেবিলের নীচে লাগানো ছিল। দেখে স্ক্রু-র মতো মনে হয়। অথচ, অন্যপ্রান্তে কেউ ঘরের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছিল। বাগটা খুলে ফেলল অনিলিখা।

পরদাটা টেনে ল্যাপটপটা ইন্টারনেটে কানেক্ট করল। ব্যাগ থেকে বের করে নিল সেদিনের পাওয়া সেই কাগজটা। নামগুলো টাইপ করে সার্চ শুরু করল ইন্টারনেটে। নামগুলোর অনেকগুলোই খুব কমন ইতালিয়ান নাম। পুরো নামও নেই। তবু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওই নামগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেল অনিলিখা।

এরা সবাই বিখ্যাত লোক। কেউ ফেডেরাল রিজার্ভের চেয়ারম্যান তো কেউ কোনও বড় গাড়ির কোম্পানির মালিক। কেউ ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট তো কেউ কোনও বড় মিডিয়া হাউসের অধিকর্তা। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই শুধু ইতালির নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে প্রভাবশালী লোক। আরেকটা মিল। এদের মধ্যে অন্তত চারজন কাউকে কিছু না বলে গত কয়েকমাসে একবার ছুটি নিয়েছিল। সে সময় এরা একাই গিয়েছিল আর কয়েকদিন বাদে ফিরেও এসেছিল। ঠিক যেভাবে পাওলো উধাও হয়ে গিয়েছিল। তবে এরা নিজেরা এটাকে ছুটি কাটাতে যাওয়া বলায় কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। সব থেকে বড় কথা হল, এদের প্রত্যেকে যে জায়গায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিল সেই জায়গার নামটা অনিলিখার পরিচিত। পোর্টোফেনি। আগামীকাল অনিলিখারাও সেখানে যেতে চলেছে।

দশ

জেনুয়া থেকে স্যান্টা মার্গারিটা লোকাল ট্রেনে দেড় ঘণ্টার পথ। স্যান্টা মার্গারিটা থেকে লঞ্চে যেতে হবে পোর্টোফেনি। লুকার পাঠানোর লঞ্চই অপেক্ষা করবে স্যান্টা মার্গারিটার জেটিতে।

জেনুয়া থেকে স্যান্টা মার্গারিটা পুরো পথটাই সমুদ্রের ধার দিয়ে। বেশিরভাগ সময়ে ট্রেন চলেছে টানেলের মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে। পাহাড় কেটে এই রেলরাস্তা তৈরি করা একশো পঞ্চাশ বছর আগে সোজা কাজ ছিল না।

—কী আশিসবাবু, কীরকম লাগছে? একদিকে ভূমধ্যসাগরের নীল জল, অন্যদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। এই পুরো এলাকাটা ইতালিয়ান রিভিয়েরার মধ্যে পড়ে। উত্তর দিকে এই সমুদ্রের ধার বরাবর গেলে ফ্রান্সে পৌঁছে যাবেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। পরপর পড়বে মোনাকো মন্টে কার্লো, নিস, কেনস। আগে ওই সব এলাকা জেনুয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই ছিল। পরে ফ্রান্সের মধ্যে চলে যায়। আমরা অবশ্য এখন উল্টোদিকে যাচ্ছি। যাচ্ছি দক্ষিণের পিসার দিকে।

—তা, পোর্টোফেনি-ও কি ওই রিভারের মধ্যে?

—রিভার নয়, রিভিয়েরা। ইতালিয়ানে যার অর্থ সমুদ্রের ধারের একফালি জায়গা। পোর্টোফেনি রিভিয়েরার মধ্যে। রোমান সভ্যতার সময়েও এই ছোট গ্রামে জনবসতি ছিল, জেলেদের গ্রাম ছিল। ওই সময় ওখানে প্রচুর ডলফিন পাওয়া যেত। তাই ওরা নাম দিয়েছিল পোর্টাস ডেলফিনি। তার থেকেই আজকের পোর্টোফেনি নামটা এসেছে। ওখানে মূলত ইতালিয়ান ধনকুবেরদের বাগানবাড়ি।

—তা, তোমার এই বন্ধুটিও কী বিশাল ধনী না কি?

—হ্যাঁ, ও নিজে খুব বড় নিউরোসার্জেন। তা ছাড়া ওর ঠাকুরদার টাসকানিতে বিশাল পাথরের ব্যবসা ছিল। তাই বংশানুক্রমেও অনেক সম্পত্তি পেয়েছে।

—তা, লোক কেমন?

—অসম্ভব ভালো। তবে...। একটু থেমে অনিলিখা কী ভেবে ফের বলে,—ওকে যা বলার আমিই বলব। আপনি কিছু বলবেন না।

অনিলিখা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। মেঘলা আকাশ। দূরে পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাড়িগুলো। তাদের ওপরে গাছগুলোকে ছাতার মতো দেখাচ্ছে। এখানে শীত, গরম দুটোই কম পড়ে। তাই বাড়িগুলোতে বড় বড় ব্যালকনি বা টেরেস। লাল টালির ছাদ। বেশিরভাগ বাড়িরই হলুদ বা কমলা রং। সবুজ খড়খড়ির জানলা। অনেক বাড়িতে

জানলা দরজা নকল—পেন্ট করা। কিন্তু এমন ভাবে আঁকা যে দূর থেকে আসলের মতো মনে হয়।

অনিলিখার মনে হচ্ছে একটা বড় রহস্যের মধ্যে ও অলরেডি জড়িয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা হচ্ছে। কিন্তু মেঘ কাটিয়ে নীল আকাশ না দেখা পর্যন্ত ও ছেড়ে দেবে না।

খানিকক্ষণের মধ্যে স্যান্টা মার্গারিটা স্টেশন এসে গেল। নীচু প্ল্যাটফর্ম। নীল বোর্ডের ওপরে সাদা রঙে স্টেশনের নাম লেখা। স্টেশনে আরও দু-তিনজন লোক আছে। স্টেশনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে টিকিট কাউন্টার পড়ল। সেখান থেকে বেরিয়েই সামনে রাস্তা। স্টেশনটা শহরের ওপরের দিকে। তাই দূরে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জল দেখা যাচ্ছে। এ জায়গার সমুদ্রকে লিগুয়ারিয়ান সি বলে। আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। উষ্ণতা 13-14 ডিগ্রির মতো। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। দূরে কমলা হলুদ লাল-নানারঙের বাড়িগুলোকে প্রকৃতি যেন নিজের হাতে পাম গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে।

—বুঝলে অনিলিখা, এসব জায়গায় থাকতে হয়। ব্যালকনিতে বসলে সারাদিন কেটে যাবে। কী সুন্দর নীল জল-আকাশ, কী চুপচাপ।

অবশ্য আশিসবাবুর মতো লোক থাকলে জায়গাটা যে আর চুপচাপ থাকবে না তা অনিলিখা জানে। এই তো আগের বছর কালীপুজোর পরের রাতের ঘটনা। রাত তিনটের সময়ে পাড়ার কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে দেদার চকলেট বোমা ফাটিয়েছিলেন। থানা থেকে পুলিশ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। ওসি নাকি থানাতে ঘুমোতে পারছিল না। কিছু বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেলেও আশিসবাবুকে ধরে নিয়ে যায়নি। আশিসবাবু নাকি ওদের বুঝিয়ে ছিলেন যে শব্দ বাজির নিষেধাজ্ঞাটা শুধুমাত্র কালীপুজোর দিন অ্যাপ্লিকেবল। অন্য দিনে নাকি কোনও অসুবিধে নেই। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে। চুপচাপ আর আশিসবাবু—দুটো যেন সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দ।

তবু সম্মতি জানিয়ে অনিলিখা ফোন করল লুকাকে,—লুকা, আমরা এসে গেছি, স্টেশনের সামনে। কোনদিকে যাব?

লুকার গলাতেও উত্তেজনা,—আমি ঠিক পাঁচমিনিটে পৌঁছোচ্ছি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তাটায় এগিয়ে যাও। তারপর বাঁদিকে টার্ন নিলেই বিচ দেখতে পাবে। ওখানেই জেটিতে আমার বোট থাকবে।

খুঁজে বের করতে অনিলিখাদের একদমই অসুবিধে হল না। রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। তিন-চার মিনিটের হাঁটা পথ। তার পরেই প্রসারিত বিচ। বিচে পরপর চেয়ার পাতা। মেঘলা বলেই হয়তো বিচে বেশি লোক শুয়ে নেই। ডানদিকে জেটি। সেখানে নানান ধরনের বোট,

প্রমোদতরী লাগানো। হঠাৎ খেয়াল হল একটা বিশাল প্রমোদতরী এগিয়ে আসছে। লুকা ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

পাশ থেকে আশিসবাবু ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন,—এ তো সিনেমাকেও হার মানায়। কী বিশাল! এটা ওর প্রাইভেট বোট?

—হ্যাঁ। এতটা বড় হবে তা অনিলিখাও আশা করেনি। বোট থেকে নেমে লুকা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

অনিলিখার হাত ধরে লুকা বলে উঠল,—ওয়েলকাম টু ইতালিয়ান রিভিয়েরা। এখানে ক'দিন থাকলে আর যেতে ইচ্ছে হবে না। চলো বাইরে ডেকে বসব।

ওরা বোটের সামনের দিকের খোলা জায়গায় চেয়ারে গিয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করতেই জলে দাগ কেটে তিরের মতো লুকার বোট এগিয়ে চলল। বাঁদিকে আফ্রিকা। তাই ওদিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। নীল জল আর আকাশ দূরে মিলে গেছে। ডানদিকে সবুজে ঢাকা পাহাড়। মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল প্রাসাদ উঁকি মারছে। একটাকে দেখিয়ে লুকা বলে ওঠে,—ওটা ইতালির প্রেসিডেন্টের বাড়ি। প্রেসিডেন্ট মাঝেমধ্যে এখানে এসে থাকেন।

অনিলিখা জিগ্যেস করল,—তোমারও ওরকম বাড়ি না কি?

—নাহ, আমারটা ক্যাসল। একটা পুরোনো ক্যাসল কিনে তাকে খানিকটা রেনোভেট করে নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো ঘর। তোমরা আমার বাড়িতেই থাকতে পারতে। অত করে বললাম!

—না, না, হোটেলে থাকব। গল্প করতে তোমার বাড়ি চলে আসব। তুমি বুকিং করে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে বেশি হোটেল নেই। তা একটা ভালো জায়গাতেই বুকিং করেছি। তোমার আর দাদুর জন্য।

দাদু কথাটা যে আশিসবাবুর পছন্দ হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তবে এই বোটে যাওয়ার আনন্দে উনি এতটাই মশগুল যে গায়ে লাগালেন না।

খানিকবাদে লুকার বোট একটা জেটিতে এসে লাগল। সমুদ্র থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে এসেছে। চারদিকে জেলেদের বোট। কিছু বড় বড় প্রমোদতরী। জেটির চারদিকে নানা রঙের ছবির মতো বাড়ি। এগুলো সব ছোটখাটো হোটেল। নীচে লাইন দিয়ে ক্যাফে, ট্যাবাচ্চি, স্যুভেনির শপ। ট্যাবাচ্চি হল ছোট ছোট স্টেশনারি দোকান যাতে সিগারেটও পাওয়া যায়।

একটা চড়াই রাস্তা ওখান থেকে সোজা পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠে গেছে। জেটিতে লুকার মহার্ঘ পোর্স গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ওরা সবাই মিলে ওটাতে উঠে বসল।

অনিলিখাদের হোটেলে পৌঁছোতে মিনিট দশেক লাগল। পাহাড়ের ওপর দিকে হোটেলের বিশাল সাদা বিল্ডিং। কথা হল, বিকেল চারটের সময়ে অনিলিখাদের নিয়ে যেতে গাড়ি আসবে।

এগারো

বহুদিন বাদে আজকে আশিসবাবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। পোর্টোফেনি ছোট জায়গা। সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাস। এখানকার পুলিশ কীরকম সক্রিয় গাড়িতে আসার সময়ে তারও প্রমাণ পেয়েছেন। রাস্তায় থুতু ফেলেছিলেন বলে ওনার হয়ে লুকাকে ফিফটি ইউরো ফাইন দিতে হয়েছে। হোটেলটাও বেশ জম্পেশ। পাম গাছে ঘেরা একটা সুন্দর পুলও আছে। দুপুরে স্প্যাগেটি খেয়ে বেশ খানিকটা দিবানিদ্রা দিলেন আশিসবাবু। অনিলিখা এর মধ্যে জেটি থেকে একটা চক্কর মেরে এসেছে। যেতে আধঘণ্টা লেগেছিল। উঠতে প্রায় একঘণ্টা। চড়াই পথ। ঘুরে ঘুরে আসতে হয়।

যত ট্যুরিস্টের ভিড় জেটির কাছে। রাস্তাটা ধরে খানিকটা ওপরে উঠে এলেই চারদিক শুনশান। তখন রীতিমতো গা ছমছম করে। দুদিকে ঘন বন। নানান রঙের, নানান টাইপের গাছ। মেডিটেরিয়ান ক্লাইমেট হলে যা হয়। আধমাইল হাঁটলে একটা বাড়ি চোখে পড়ে। যে জিনিসটার খোঁজে গিয়েছিল, তা অবশ্য ও পেয়ে গেছে। ওই কাগজে যে ন'জনের নাম লেখা ছিল তারা প্রত্যেকেই গত তিনমাসে এখানে এসেছে। এখানে তিনটে বড় হোটেল। তাদের সঙ্গে আর পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।

প্রশ্নটা হল, তাতে কী এসে যায়? তারা এখানে এসেছিল, তারপর আবার ফিরে গেছে—এখনও বহাল তবিয়তে আছে—এতে রহস্যের কিছুই নেই। এখানে তো এমনিতেই বড়লোকেরা ছুটি কাটাতে আসে। তবু, মনে কিছু একটা খচখচ করছে। এদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুব ভালো হত।

হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিল অনিলিখা। তারপর নিজের আর আশিসবাবুর জন্য দুটো ইংলিশ টি-এর অর্ডার দিতে না দিতেই ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। লুকার গাড়ি পৌঁছে গেছে। লুকা ওর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছে।

হোটেল থেকে লুকার বাড়ি পৌঁছোতে পৌনে ছ'টা হয়ে গেল। এখন বেলা বেশ বড়। তাই ছ'টাতেও বেশ আলো রয়েছে। লুকার বাড়িটা বিশাল। উঁচু পাথরের পাঁচিল। গেট থেকে পাথর বাঁধানো রাস্তা বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেছে। দু-ধারে বাগান। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির সিংহ দরজায়। দরজাটা রিমোট দিয়ে খুলে গাড়ি রেখে ওরা ভেতরে ঢুকল। এবার বাড়িটার মধ্যযুগীয় ক্যাসেলের চেহারাটা দেখতে পাওয়া গেল। বিশাল উঁচু সিলিং। বিশাল

ড্রয়িংরুমটা প্রায়ান্ধকার। ওপরের দিকে পরপর রঙিন কাচের জানালা। দুদিক দিয়ে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। ড্রয়িংরুমের দুদিকে পরপর আরও ঘর।

অনিলিখারা কাঠের কাজ করা সোফায় এসে বসল। সামনে বেশ কয়েকটা উলঙ্গ শিশুর পাথরের মূর্তি, তার মধ্যে ফোয়ারা।

মিনিটতিনেক বাদে লুকার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দটা নীচের দিকে নামার সময় ওর চেহারাটা দেখা গেল। ওর গায়ে দামি সিল্কের ড্রেসিংগাউন।

একটা চুরুট ধরিয়ে পাশের সোফায় বসে লুকা প্রথমেই যে প্রশ্ন করে বসল তার জন্য অনিলিখা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

—ওদের খোঁজ নেওয়ার জন্য কেন শুধু শুধু কষ্ট করে হোটেল আর পুলিশ স্টেশন গিয়েছিলে? আমাকে জিগ্যেস করলেই পারতে। এখানে কিছু হল, আর আমি জানব না! তা ওদের নাম হঠাৎ কোত্থেকে পেলে?

ভেনিসের ঘটনাটা অনিলিখা যেটুকু দরকার সেটুকু বলে গেল। ছাতা কেনা থেকে শুরু করে, রাত একটায় ওই বাড়িতে পৌঁছোনো আর ডেডবডি দেখতে পাওয়া। আগে ফোনে সংক্ষেপে বলেছিল, কাগজটা পাওয়ার কথা তখনও বলেনি।

গম্ভীর হয়ে সব শোনার পর লুকা বলে উঠল,—ওখানে অত রাতে তোমার যাওয়া অত্যন্ত বড় ভুল হয়েছিল অনিলিখা। তোমাকে তো আগেও বলেছি যে পুলিশও এতে যুক্ত আছে। ওই লোকটাকে খতম করেছে নির্ঘাত ইন্টারপোল। আর তারাই তোমাকে ওখানে দেখেছে। ওরা চাইলে যে কাউকে ধরতে পারে। প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার ওপর নজর রাখতে পারে। যাই হোক পুলিশের কাছে আর খবরদার যেও না। তা ছাড়া ইতালিতে মাফিয়াদের রাজত্ব চলে। কি দরকার এসব ঝামেলায় জড়ানোর!

—তা, এদের কেউ কি তোমার এখানেও এসেছিল?

—দ্যাখো, পোর্টোফেনি ছোট জায়গা। ইতালিতে কেন পুরো ইউরোপে আমাকে সবাই মোটামুটি চেনে। এখানে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে না! তা হয় নাকি! যাক, এসব কথা ছাড়ো। আমার তৈরি রোবট তোমাদের দেখাই।

—রোবট? আশিসবাবু প্রচণ্ড উত্তেজিত।

—হ্যাঁ, দাদু। আমার একটা রোবট আছে। আসলে একা একা থাকি। কথা বলার লোকও পাই না। তাই ভাবলাম রোবট তৈরি করি। দেখাচ্ছি।

অনিলিখারা উঠতে যাচ্ছিল। হাত তুলে বসতে বলল লুকা।

—আরে, জিওভানি এখানেই চলে আসবে। জিও বলে ডাকি। ওকে আমি অলরেডি ডেকে নিয়েছি। বলতে না বলতেই একজন সৌম্যদর্শন লোক পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। চট করে বোঝা না গেলেও একটু দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় সে যাতে মানুষের মতো দেখতে হয় তার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও খুঁত রয়ে গেছে। হাঁটা চলাতেও বেশ খানিকটা আড়ষ্টতা আছে। কলকবজা সেন্সরের সাহায্যে কি মানুষের হাঁটার স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায়।

'বুয়োনা সেরা'—বলে হাতটা আশিসবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল জিওভানি। আশিসবাবু জীবনে এই প্রথম কাউকে দাঁড়িয়ে উঠে জাপানি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে জিও ফের বলে উঠল,—শুভসন্ধ্যা আশিসবাবু, কেমন লাগছে ইতালি?

এরকম ঝরঝরে বাংলা ওরা আশা করেনি। ওদের হতবাক দেখে লুকাই বুঝিয়ে দিল,—ইতালিয়ান ছাড়াও জিও পৃথিবীতে সবথেকে বেশি প্রচলিত এরকম দশটা ভাষায় স্বচ্ছন্দ। এমনভাবে কথা বলবে বুঝতেই পারবেন না।

পাশের সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে লুকা বলল,—বস জিও।

তারপর বলল,—জিও কিন্তু যেমনতেমন রোবট নয়। ওর মান অভিমান আছে। রাগ-হিংসা আছে। যে-কোনও কিছু ও খুব দ্রুত শিখে নিতে পারে, খুব জটিল চিন্তা ভাবনাও করতে পারে। ওর ব্রেন ঠিক আমাদের মতো।

—মানে? অনিলিখা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম যে আমি একটা দুর্দান্ত আবিষ্কারের দোরগোড়ায়। আসলে আমি আর্টিফিসিয়াল ব্রেন তৈরির চেষ্টা করছিলাম। এই প্রোজেক্টটা স্টার্ট করেছিলাম পাঁচ বছর আগে। একা অবশ্যই নয়। আমার টিম ছিল। মানুষের ব্রেনের প্রত্যেকটা নিউরোনকে আমি মাইক্রোচিপের সাহায্যে কপি করতে থাকি।

আশিসবাবুর গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে লুকা বলে ওঠে,—জিও তুমিই ভালো করে বাংলায় বুঝিয়ে বলো। ইংরেজিতে বললে দাদু ভালো বুঝবেন না।

জিও আশিসবাবুর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠে,—ধরুন, আপনার সামনে কেউ মিষ্টি রাখল।

—মিষ্টি আমি খাই না। ডায়াবেটিক।

—ঠিক আছে পিৎজা দিল। আপনার ব্রেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতকে নির্দেশ দিল—আপনি কাঁটা চামচ তুলে নিলেন।

—আমি কাঁটা চামচে খাই না।

—আহ, আশিসবাবু ওকে বলতে দিন না। ও তো উদাহরণ দিচ্ছে।

—যখনই ব্রেন কাজ করে, প্রয়োজনমতো ব্রেনের কিছু অংশ উদ্দীপ্ত হয়। কিছু ইলেকট্রিকাল সিগন্যল তৈরি হয়। সেই একই ইলেকট্রিকাল সিগন্যাল এখানে তৈরি করে মাইক্রোচিপ। এভাবে প্রত্যেকটা নিউরোন একটা আরেকটার সঙ্গে কীভাবে সিগন্যাল বিনিময় করে তা দেখে কৃত্রিমভাবে ব্রেন তৈরি করা হয়েছে। তফাত একটাই। এই আর্টিফিশিয়াল ব্রেনে মানুষের ব্রেনের জায়গায় আছে পঞ্চাশ হাজারটা হাই পাওয়ার কম্পিউটার সার্ভার।

জিও থামতেই লুকা ইংরেজিতে বলে,—সার্ভার রাখতেই আমার ক্যাসেলের বেশিরভাগ জায়গা চলে গেছে। আর ওই সার্ভারগুলোই চালাচ্ছে জিওকে। জিও তাই ঠিক মানুষের মতোই ইনটেলিজেন্ট।

লুকা একটু থামল। কারণ বাড়ির তিনজন পরিচারক-পরিচারিকা সাত-আট রকমের খাবার টলিতে সাজিয়ে ঠেলে নিয়ে আসছে। স্প্যাগেটি, দু-তিন রকমের পিৎজা, স্যালাড। ভারতীয় খাবারও আছে। ভাত রুটি, দুরকম তরকারি, মাংস—নানানরকমের আয়োজন।

—এসব কী করেছ লুকা। এত কিছু খাওয়া সম্ভব? আমি শুধু পিৎজা খাব। অনিলিখা জানাল।

—সে কী! তোমাদের জন্যই তো ভারতীয় খাবার। ভাবলাম এ ক'দিন ধরে ঘুরছ। ভারতীয় খাবার পাওনি। তা, দাদুর কোনও অসুবিধে নেই তো?

আশিসবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—আমার কোনওটাতেই কোনও অসুবিধে নেই। তবে আজ দুপুরে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে বলে রাতে কিছু খাব না।

জিও মৃদু হেসে বলে উঠল,—ভয় নেই, খাবারে কোনও বিষ মেশানো নেই।

অনিলিখা আর লুকা তাই শুনে জোরে হেসে উঠল। লুকা বলল,—দেখলে এখানেই জিও স্বতন্ত্র। ও তোমাদের কথাবার্তা থেকে বুঝে যাচ্ছে যে তুমি অন্যরকম কিছু ভাবছ কি না। ঠিক যেমন আমরা ভাবি।

খাবার নিয়ে বাইরে চাঁদের আলোতে বসা হল। ড্রয়িংরুমের লাগোয়া বিশাল ঘাসের লন। লুকার বাড়িটা পাহাড়ের অনেক ওপর দিকে কিন্তু সমুদ্রের ধারে। তাই নীচে পোর্টোফেনির জেটিও দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর আবছা অবয়ব। চারদিক এতটাই নির্জন যে কথা থামলেই দূরে সমুদ্রের ঢেউ-এর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝিঁঝির আওয়াজ নির্জনতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

খেতে খেতে অনিলিখা বলে,—আচ্ছা লুকা, মাঝে তুমি যে লিখেছিলে তুমি নাকি কোনও কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারছ না, তা এখন কেমন আছ?

লুকা ওটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠল,—হ্যাঁ, কিছুদিন ওরকম একটা অসুবিধে হচ্ছিল। এখন নো প্রবলেম।

—তুমি যে টিভিশো হোস্ট করো তা তো জানা ছিল না। জেনুয়াতে দেখলাম।

—কোনটা? 'কে বেশি চালাক'—ওই অনুষ্ঠানের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, হঠাৎ জেনুয়াতে হোটেলে দেখলাম। তা তোমার ওতে ইন্টারেস্ট ছিল তা জানা ছিল না তো!

—আইকিউ-এর ব্যাপারটা চিরদিনই আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে। তাই আমাকে রিকোয়েস্ট করতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। জিও-র কিন্তু আইকিউ সাংঘাতিক হাই। করবে নাকি ওর সঙ্গে আইকিউ-এর প্রতিযোগিতা?

এই প্রোপোজালটা অনিলিখার এক্সপেকটেড ছিল না। উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল,—অবশ্যই। তবে শুধু আমি একা কেন, আমার সঙ্গে আশিসবাবুও আছেন। উনিও যোগ দেবেন। কিন্তু আজ থাক। আজ একটু ক্লান্ত। কাল সকালে হবে।

—নিশ্চয়ই, সেটাই ভালো হবে। বলে একটু থেমে জিও-র দিকে তাকিয়ে লুকা বলল,—বুঝলে জিও, অনিলিখা কিন্তু আমার দেখা সবথেকে বুদ্ধিমান মহিলা, দেখি তোমার আনবিটন রেকর্ড টিকে থাকে কি না!

জিও হেসে মাথা নাড়ল,—অবশ্যই, আমি অনিলিখার সঙ্গে পরীক্ষার অপেক্ষায় থাকব।

—তোমার শোতে যারা জেতে তাদের সবার সঙ্গেই তুমি জিও-র কম্পিটিশন করাও তাই না? অনিলিখা বলে ওঠে।

—কী করে জানলে?—একটু অবাক হয়ে লুকা জিগ্যেস করে।

—না, এমনিই আন্দাজ করলাম। তা ছাড়া তোমার সিঁড়ির বাঁ-সাইডে যে ছবিটা আছে তাতে ওই শো-এর লোগো আঁকা টি-শার্ট পরা কয়েকটা লোকের সঙ্গে তোমার ছবি দেখলাম। মনে হল এখানেই ছবিটা তোলা।

—হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত জিও হারেনি। এদের সঙ্গেও নয়।

—জিও নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে করতে নিজেকে আরও বুদ্ধিমান করে তুলেছে! ওর আইকিউ আরও বাড়ছে।

—ঠিক তাই। মানুষের ব্রেনের সঙ্গে এখানেই কম্পিউটারের ব্রেনের তফাত। ওরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ইমপ্রুভ করতে পারে। মানুষের ব্রেন কীভাবে কাজ করবে, কোন অংশ কীভাবে ব্যবহৃত হবে এসব ঠিক হয়ে যায় তিন-চার বছর বয়সের মধ্যে। যদি কোনও বাচ্চাকে তিন-চার বছর বয়স অবধি কারুর সঙ্গে মিশতে না দেওয়া হয়, কোনও কিছু শেখানো

না হয়—তাহলে সে আর তার পরে কিছুই শিখতে পারে না। আসলে ব্রেনের কোন কোন অংশ ব্যবহার করা হবে—কোনটা হবে না—তা এই বয়সেই স্থির হয়ে যায়। এরকম সাতটা কেস হয়েছে যেখানে বাচ্চাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে—কারুর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয়নি। যখন বাচ্চাটাকে উদ্ধার করা হয়েছে তারপরে আর কিছুই শেখানো যায়নি। আর্টিফিশিয়াল ব্রেন কিন্তু রাতারাতি সার্কিট চেঞ্জ করে নিতে পারে।

—তাহলে তো একদিন এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে। মাংসের ঝোল চাটতে চাটতে আশিসবাবু বলে ওঠেন।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল লুকার। কোনও উত্তর দিল না।

খানিক বাদে ওরা লন থেকে ফের ড্রয়িংরুমে ঢুকে এল। বাইরের লনের আলো নিভে গেল। ঘরে আলো জ্বলে উঠল। এসি চালু হল। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। অনিলিখা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,—ঘরের সবকিছুই কি জিও কন্ট্রোল করছে? আলো পাখা, এসি-সব! এমনকী দরজা খোলা-বন্ধও!

লুকা একটু অবাক হয়ে বলল,—কী করে বুঝলে?

—খুব স্বাভাবিক। কোনও সেনসর এত তাড়াতাড়ি এটাকে ধরতে পারত না। এই যে আমরা ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তেই এসি চলল, আলো জ্বলে উঠল—এসব নিশ্চয়ই কারও নির্দেশে হচ্ছে। তারমানে জিও বাড়ির নেটওয়ার্কে থাকা যে-কোনও জিনিস কন্ট্রোল করতে পারে, তাই না?

—একদম ঠিক। এবাড়ির মাইক্রোয়েভ, ফ্রিজ, জানলার পরদা ওঠানো-নামানো, দরজা খোলা বন্ধ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালানো, টেলিফোন রিসিভ—সবই জিও-র নির্দেশে চলে। জিও হল আসল গৃহকর্তা, ঠিক কি না জিও?

জিও ওর টেনিদা মার্কা লম্বা মুখটা ওপর নীচে নাড়িয়ে সায় দিল।

আশিসবাবু মুখটা অনিলিখার কানের কাছে নিয়ে এসে বললেন,—কলকাতায় চাকর-বাকরের যা সমস্যা, আমার এরকম একটি হলে আর কথা ছিল না। তোমার বন্ধুকে এর দাম জিজ্ঞাসা করো তো।

জিগ্যেস করতে হল। না। জিও নিজেই উত্তর দিল,—22 to the power 22 বিলিয়ান ডলার।

থতোমতো খেয়ে আশিসবাবু আর প্রশ্ন করেননি।

বারো

হোটেলে ঢুকেই আশিসবাবু জীবনে এই প্রথমবার কারুর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উঠলেন।

—লুকার মতো লোক হয় না। ইতালিতে এরকম জায়গাতেও কী আপ্যায়ন! আর রোবট চাকরটাও বেশ। আমার তো ইচ্ছে করছিল চুরি করে নিয়ে আসি।

—তা চুরি করতেনটা কীভাবে শুনি! ও তো ও বাড়ির দরজাও খুলবে না। বেরোবেন কী করে?

—হঃ, তাও ঠিক। আশিসবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উনি গুডনাইট বলে ওনার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কোনও কিছুতেই অবাক হন না। আজকে প্রথমবার রীতিমতো অবাক হয়ে গেছেন বলে মনে হল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। তবু অনিলিখার ঘুম আসছিল না। হোটেলের ঘরের বাইরে একটা বড় পার্সোনাল ব্যালকনি। ওখানে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল অনিলিখা। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। তাই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে দেখা তারামণ্ডলী নিরাবরণ রূপে চোখের সামনে। ওর মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন। হয়তো, ওর মনের অন্তরালে যে গভীর দুর্ভাবনাটা ঘুরছে, প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সেখান থেকেই।

এক, জিও বাংলায় বলছিল, লুকার তা বোঝার কথা নয়, কিন্তু জিও যেখানে কথা শেষ করল, ঠিক সেখানে লুকা স্টার্ট করল কীভাবে? তা হলে কি লুকাও বাংলা জানে?

দুই, লুকার কপালে দেড় ইঞ্চির কাটা দাগটা কীসের? ওই একই রকম দাগ আইকিউ টেস্টের ছেলেগুলোর ছবিতে—অন্তত দুজনের ছবিতে তো ছিলই। একইরকম দাগ ছিল ওই জার্মান ছেলেটার কপালেও।

তিন, লুকা হঠাৎ আইকিউ টেস্ট শো-এর হোস্ট কেন? শুধুই কি বিষয়টাতে আগ্রহ? আর যারা প্রতিযোগিতায় জেতে তাদের কেনই বা বাড়িতে নিয়ে আসে? শুধু জিও-কে আরও শক্তিশালী করে তোলা, না কি অন্য কোনও উদ্দেশ্য?

আরেকটা বিষয় একটু অন্যরকম লেগেছিল। সেটা আশিসবাবুর, 'তাহলে কোনও একদিন এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে।'—এই মন্তব্যে লুকার ঠোঁটের কোণের বাঁকা হাসিটা? নাহ, ঠিক খেয়াল হচ্ছে না।

কী যেন নাম ওই মৃত সায়েন্টিস্টের? রবার্তো। নিশ্চয়ই সার্চ করলে ওর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। যে মাইক্রোচিপটা দিয়েছিল তারও উদ্দেশ্য বোঝা দরকার।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ল্যাপটপ ইন্টারনেটে কানেক্ট করল অনিলিখা। রবার্তোর নামে সার্চ করতেই অনেকগুলো হিট। একটা একটা করে খুলে দেখতে লাগল অনিলিখা। রবাতো সত্যিই

বিপ্লবী সায়েন্টিস্ট। সাতবার নানান জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, বেশ কয়েকজন মারাও গেছে এ ধরনের বিস্ফোরণে। ওর প্রধান আক্রোশ ছিল কম্পিউটার, রোবট, মাইক্রোচিপ—এ ধরনের প্রযুক্তিতে। কে জানে কেন? আরও সার্চ করতে ওর লেখা কয়েকটা রিসার্চ পেপার খুঁজে পেল অনিলিখা।

একটা পেপারের নাম, 'সিঙ্গুলারিটি অ্যান্ড ডেঞ্জার অফ ইন্টারকানেক্টেড সিস্টেম'। প্রায় দশবছর আগে চিপস ম্যাগাজিনে লেখা। তাতে রবার্তো লিখেছেন যে অচিরে কম্পিউটার মানুষের থেকেও বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। আমরা যেমন ইঁদুর-বাঁদর-ষাঁড়—এসব নানান প্রাণীর মস্তিষ্কে মাইক্রোচিপ আর ট্রান্সমিটার ঢুকিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ করি, এরাও তেমনি একদিন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যতদিন যাবে তত আমরা কম্পিউটার-রোবট এসবের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠে আরও নিজেদের বিপদ ডেকে আনব।

অনিলিখার মনে পড়ে গেল হোসে ডেলগ্যাডোর এক্সপেরিমেন্টটা। একটা ষাঁড়ের ব্রেনে মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে সায়েন্টিস্ট হোসে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যখন ষাঁড় লাল কাপড় দেখে তেড়ে যাচ্ছিল তখন রিমোট দাবিয়ে ওই মাইক্রোচিপ সক্রিয় করে থামিয়ে দিচ্ছিল ষাঁড়কে। একবার নয়, বারবার। তা সে তো বহুবছর আগের কথা। এখন তো মানুষ তার ব্রেনে চিপ বসিয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তা লোকে করছেও। দুজন দু-মহাদেশে থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিজেদের কানেক্ট করছে। সেই একইভাবে। ব্রেনের মধ্যে চিপ বসিয়ে।

সব মিলে যাচ্ছে। কপালে কাটা দাগ! হাত ঠান্ডা হয়ে এল অনিলিখার। তাহলে কি লুকা চিপের মাধ্যমে জিও-র সঙ্গে কানেক্টেড? তাই জিও যা ভাবে লুকা তা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যায়, আর লুকা যা ভাবে জিও ঠিক তা-ই করে?

উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে অনিলিখা। টেনশনটা একটু কমানো দরকার। টিভি চালায়। বেশিরভাগ ইতালিয়ান চ্যানেল অত্যন্ত হালকা টাইপের, স্থূল রুচির। নাচ-গান-টক-শো ফ্যাশন শো। দেখতে দেখতে হঠাৎ লুকার সম্বন্ধে অস্বস্তির অন্য কারণটা খুঁজে পায় অনিলিখা। লুকার ইংরেজি উচ্চারণ এখন ঠিক ইংরেজদের মতো—ইতালিয়ানদের মতো নয়। ওরা ইতালিয়ান উচ্চারণে 'আই' কে 'ই' বলে 'ও' কে 'ইউ'-এর মতো উচ্চারণ করে। কিন্তু লুকার ইংরেজি উচ্চারণে এগুলো ছিল না। আগে তো লুকা এভাবে বলত না। তার মানে কি জিও-ই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে লুকাকে? তাই কম্পিউটারের মতো নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে কথা বলছে লুকা।

মনে পড়ে যায় লুকার পাঠানো দ্বিতীয় মেলটার কথা। লুকা লিখেছিল, কেউ যেন ওর ভাবনা চুরি করে নিচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ করে চিন্তার মোড় ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে লুকার প্রথম মেলের ইঙ্গিত যদি হয় নিজেকে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী রোবটের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারার ব্যাপারে—তা হলে দ্বিতীয় মেলটা পাঠিয়েছে যখন ওই রোবট বা জিও লুকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। কারণ, জিও তো রোজ আরও শক্তিশালী হচ্ছে, আরও ইমপ্রুভ করছে। আর নিজের অজান্তে লুকা আস্তে আস্তে হেরে গেছে ওরই তৈরি রোবটের কাছে! এখন লুকা হল রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটা মানুষমাত্র—বা বলা যায় আরেকটা রোবট।

তা হলে কি বাকিরাও তাই? ওই কাগজে যাদের নাম লেখা ছিল তারা প্রত্যেকে কি আজ একইভাবে জিও-র দ্বারা পরিচালিত! লুকার মাধ্যমে ওদেরকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে। বসানো হয়েছে জিও-র সঙ্গে আইকিউ টেস্টের প্রতিযোগিতায়। এখানে থাকার সময়ে কোনওভাবে অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয়েছে। ব্রেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মাইক্রোচিপ—যাতে জিও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অনিলিখার মনে পড়ল FAO-এর হেড হোসের কথা, কীরকমভাবে স্থির চোখে কথা বলছিল। আর বিশাল বিশাল নাম্বার একের পর এক বলে যাচ্ছিল। অত সঠিক পরিসংখ্যান একটা সাক্ষাৎকারের সময় কোনও মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব! কখনোই না।

কিন্তু একের পর এক মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে জিও-র লাভ কী! সমগ্র মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করা! তার জন্য বেছে বেছে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে অত্যন্ত প্রতিভাবান লোকেদের। নিয়ন্ত্রণের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তাবড় তাবড় লোকেদের ওপর। কেউ ব্যাঙ্কের কর্তা, তো কেউ নামকরা সফটওয়্যার কোম্পানির কর্তা। কেউ গভর্নমেন্টের বড় পোস্টে তো কেউ বড় সায়েনটিস্ট। এদের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করা হয়েছে অন্যান্যদের। যারাই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। যেমন মারা হয়েছে রোমের সেই নিউক্লিয়ার সায়েনটিস্ট ফ্রান্সেসকোকে। আর হয়তো বা কাল ওই লিস্টে অনিলিখার নামও জুড়তে চলেছে।

রবার্তোর কাছে কি এর কোনও সমাধান সূত্র ছিল? ওর দেওয়া চিপটা হাতে নিয়ে অনিলিখা আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। এই চিপটা যদি আগে ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা হয় তা হলে কি অন্য যে চিপটা জিও ব্রেনে বসানোর প্ল্যান করছে তার কোনও প্রভাব পড়বে না? ইন্টারনেট থেকে পাওয়া রবার্তোর রিসার্চ পেপার পুরোটা পড়া হয়নি। ওটা পড়ে যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

ল্যাপটপটা অন করে পেপারটা পড়তে থাকে অনিলিখা। কখন অন্যমনস্ক হয়ে বাঁহাতের তালুতে রাখা চিপটা কি বোর্ডের ওপর রেখেছে তা ও নিজেই খেয়াল করেনি। কিন্তু সেটার জন্য যা হল তা অভাবনীয়। খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে থাকার পর চিপটা আবার যত্ন করে তুলে নিল অনিলিখা। হাতের আঙুল আর আংটির ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে রাখল। ধন্য সায়েনটিস্ট রবার্তো।

তেরো

সারারাত ছটফট করে ভোর হতেই উঠে পড়ল অনিলিখা। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ওর আগেই আশিসবাবু উঠে পড়েছেন। নীচে সুইমিংপুলের ডেকে একটা বারমুডা, রংচঙে টি-শার্ট আর গগলস পরে যেভাবে শুয়ে আছেন তাতে ইতালিয়ানরাও লজ্জায় পড়ে যাবে। সূর্য ওঠার আগে গগলস পরার কি দরকার কে জানে! হোটেলের চারধারে প্রচুর লেমন গাছ। থরে থরে লেমন ঝুলছে। চারদিকে বেগুনিরঙা বৌগেনভেলিয়া গাছ, রুপোলি অলিভ গাছ—আরও নাম না জানা কতরকমের গাছ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস গাছের পাতায় খেলা করে যাচ্ছে। হাওয়ার স্রোত সামলে সি গ্যালগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের পুবের পামগাছগুলোর ওপর কেউ যেন সোনালি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্য উঠছে।

ব্যালকনিতে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল অনিলিখা। তারপর চা-ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেলফোন থেকে একটা ফোন করল। ফ্যাবিওকে। ফ্যাবিওর নাম্বারটা ইন্টারনেটে কাল রাতে পাওয়া গেছে। ফ্যাবিও ইতালির শক্তি দপ্তরের সচিব। ওই কাগজে লেখা নামগুলোর মধ্যে একজন।

উলটোদিকে কেউ একজন ফোনটা ধরেছে। ভারী গলা।

—হ্যালো! হ্যালো!...স্যরি, লাইন ইজ নট ক্লিয়ার, আই কানট হিয়ার ইউ। অনিলিখা শুনেও না শোনার ভান করে।

—আই ক্যান ক্লিয়ারলি হিয়ার ইউ অনিলিখা।

ব্যস, এটুকুই দরকার ছিল। ফোনটা কেটে দিল অনিলিখা। ফ্যাবিওর কোনওভাবেই অনিলিখাকে চেনার কথা নয়। ওর নাম্বারটাও জানার কথা নয়। অনিলিখার অনুমানই ঠিক। এরা সব জিও-র সঙ্গে কানেক্টেড। জিও যা জানে—এরাও তা সঙ্গে সঙ্গে জানছে। ওরাও যা দেখছে বা জানছে, জিও তা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাচ্ছে।

অর্থাৎ, লুকা বা জিও এও হয়তো জানে যে রবার্তো অনিলিখাকে কিছু একটা দিয়ে গেছে। হয়তো সেটার জন্যই ওরা রবার্তোকে খুঁজছিল এবং পরে হত্যা করে।

কিন্তু সবাই তো আর জিও-র কন্ট্রোলে নেই। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে যার ওপর জিওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এরকমই কাউকে খুঁজে বের করা দরকার। এরকম মিলিত শক্তির

সঙ্গে একা কিছু করা অসম্ভব। আর যদি সম্ভব হয় তা হলে এখান থেকে পালাতে হবে। বাইরে গিয়ে সাহায্য জোগাড় করতে হবে।

ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে যোগাযোগ করতে পারলে ভালো হত। রোমের ইন্ডিয়ান এমব্যাসির একজনকে খুব ভালো করে চেনে অনিলিখা। তার নাম্বার ডায়াল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো খানিক আগেই ফোন করল অনিলিখা।

হোটেল রুমের ফোন থেকে ফোন করার চেষ্টা করে অনিলিখা। একটা অদ্ভুত টোন আসছে। বাইরের নাম্বার ডায়াল করা যাচ্ছে না। লুকা আর জিও যে এর পিছনে তা বুঝতে দেরি হল না। যাতে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করা না যায় তার সব ব্যবস্থা ওরা নিয়ে নিয়েছে ক্যাবিওকে ফোন করার পরপরই। কোনওভাবে যদি বাইরের কাউকে মেসেজ পাঠানো যেত।

কথামতো ঠিক দশটায় লুকার পাঠানো গাড়ি এসে গেল। সকাল থেকেই আশিসবাবু যাওয়ার জন্য ছটফট করছিলেন। একবার বললেন,—ব্রেকফাস্টটা তোমার বন্ধুর বাড়িতে সারা যেত।

গাড়িতে যেতে যেতে বললেন,—আমি কিন্তু জিও-র সঙ্গে ওসব আই.কিউ টেস্টে বসছি না। জীবনে করিনি।

—তা, কাল তখন আপত্তি করলেন না কেন?

—আহা, অমন পাঁঠার মাংস। আপত্তি করার কোনও জায়গা ছিল!

খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা লুকার বাড়ি পৌঁছে গেল। আজ ড্রয়িংরুম থেকে একটা প্যাসেজ ধরে ওদের সোজা নিয়ে আসা হল অন্য একটা ঘরে। বিশাল ঘর। হালকা সবুজ একটা আলো জ্বলছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই লুকা আর জিও একই সঙ্গে ঘুরে ঢুকল। ইতালিয়ান লোকটা—যে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল—সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—কেমন আছ অনিলিখা? ভালো ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে?

কথার মধ্যেকার ইঙ্গিতটা অগ্রাহ্য করে অনিলিখা বলল,—তা একটু উত্তেজনা হবে না। রোবটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা!

—রোবট, রোবট কোরো না, বলো জিও। তোমাদের মধ্যে কে আগে যাবে—তুমি না দাদু?

—আমিই আগে। অনিলিখা বলে,—তবে আমাকে আগে বলো কী কী থাকবে টেস্টে?

—প্রথমেই থাকবে জেনারেল আইকিউ টেস্ট। কিছু পাজল, অঙ্ক, লজিক্যাল রিজনিং, মেমারি টেস্ট, কিছু স্পেশাল এবিলিটি টেস্ট,—যেরকম সাধারণত হয়। তারপর শুরু হবে প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির পরীক্ষা। ধরো একটা বোতলের মধ্যে ছিপি ঢোকানো আছে। এমন সাইজের ছিপি যে বোতলের মুখটা আর ছিপিটা এক সাইজের। বুদ্ধি করে বোতল না ভেঙে

কোনও কিছুর সাহায্যে ছিপিটা বের করে আনতে হবে। এর পরে হবে মাইন্ড-বডি ইনটেলিজেন্সের টেস্ট। যাকে বলে কাইনেসথেটিক ইনটেলিজেন্স।

—সেটা আবার কী? আশিসবাবু একটু উৎসাহী।

জিও সহজভাবে বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা করে,—ধরুন আপনার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। এবার আপনাকে একটা বল দেওয়া হল। বলা হল বলটাকে মাটিতে ড্রপ করে ক্যাচ ধরতে হবে। দু-তিনবার আপনার মিস হবেই। কিন্তু তারপরে যার এই ইন্টেলিজেন্স যত বেশি, সে তত তাড়াতাড়ি শিখে নেবে।

—ওই টেস্টটাও কি এ ঘরেই হবে? অনিলিখা বলে।

—না, ওই টেস্টটার জন্য অন্য একটা রুম আছে। এটা তো শুধু একটা উদাহরণ।

অনিলিখা বুঝল যে এই টেস্টের সময়েই কোনওভাবে প্রতিযোগীকে অজ্ঞান করে ব্রেনে চিপ ঢোকানো হয়।

—তা, আজকের টেস্ট কে ডিজাইন করেছে, তুমি নাকি? লুকাকে জিগ্যেস করে অনিলিখা।

—না, না আজকের টেস্টে কী থাকবে তা আমি নিজেই জানি না। এর পুরোটাই বোলের করা।

ঘরে ইতিমধ্যেই আরেকজন এসে গেছে। ছোটখাটো চেহারা, টাকমাথা, চওড়া কপাল। মুখচোখে বুদ্ধির দীপ্তি। গোল ফ্রেমের চশমা। সব থেকে বড় কথা এর কপালে কোনও কাটা দাগ নেই। অর্থাৎ এ লুকা-বা জিও-র দ্বারা পরিচালিত নয়। নিরপেক্ষভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ওর অন্তত একজনকে দরকার যার মনে কী আছে তা জিও যেন আগে থেকে না জানে, অর্থাৎ জিও এই খেলাটা টু-স্পিরিটে খেলে যাতে সত্যিই ওর বুদ্ধির ধার বাড়ে।

বোলে বলল,—আমি কি তাহলে, প্রতিযোগিতা চালু করতে পারি?

—জেনারেল আইকিউ টেস্ট কীরকম হবে আগে একটু দেখাও। অনিলিখা একটু দেরিতে শুরু করার উপায় খোঁজে। ইতিমধ্যে এখান থেকে পালাবার যদি কোনও উপায় বার করা যায়।

—আমি শুরু করব মেমারি টেস্ট দিয়ে। বোলে আশিসবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,— আমি কয়েকটা নাম্বার বলছি। আপনি উলটো দিক থেকে পরপর বলুন তো, 5, 9, 10, 3, 6, 7।

আশিসবাবু সোফায় হেলান দিয়ে বসে আরাম করে অ্যাপেল জুস খাচ্ছিলেন। হঠাৎ এরকম প্রশ্নে একটু বিষম খেয়ে বললেন, আমি রেডি নই। আরেকবার বলো তো।

—5, 9, 10, 3, 6, 7 উলটো করে বলুন।

—7, 6 তারপর...বাকিটা ঠিক শুনিনি।

পাশ থেকে জিও খুক খুক করে হাসছে। আশিসবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকালেন।

—তা, এটা জাস্ট উদাহরণ ছিল। অ্যাকচুয়াল টেস্টে এরকম হয়তো একশোটা সংখ্যা বলা হবে। এরপর হবে স্পেশাল এবিলিটি টেস্ট। হয়তো কয়েকটা কাঠের ব্লক দিয়ে কোনও একটা নির্দিষ্ট ডিজাইন করতে বলা হল। কে আগে পারে দেখা হবে।

বলে কয়েকটা ব্লক আর একটা ডিজাইন আবার আশিসবাবুর দিকে এগিয়ে দিল বোলে।—এটা একটা অত্যন্ত সোজা ডিজাইন। ক্লাস টু-এর ছেলেরাও পারে। টেস্টের সময় ডিজাইন অনেক বেশি শক্ত হবে। তা আপনি এটা করুন তো!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশিসবাবু না করে উপায় নেই। বাধ্য হয়ে মিনিটপাঁচেক চেষ্টা করে গেলেন। অনিলিখা বেশ বুঝতে পারছে যে ডিজাইনের কাছাকাছিও কিছু করতে না পেরে উনি রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আসলে ওদের উদ্দেশ্যই বোধ হয় তাই। আশিসবাবুকে উত্তেজিত করে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া, যাতে অনিলিখা একা থাকে।

হলও তাই। মিনিটপাঁচেক বাদে হঠাৎ ব্লকগুলোকে ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন,—নিকুচি করেছে। এটা কোনও আইকিউ টেস্ট হল!

বলে আশিসবাবু আচমকা লুকার মল্লা পেনটা টেবিল থেকে তুলে জিও-কে বলে ওঠেন,—এই পেনটা কি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে বলো!

স্বাভাবিক ভাবেই লুকা, জিও, বোলে একটু হতচকিত। লুকা বলে, 'মানে? এটা আবার কী টেস্ট?'

অনিলিখা বলে ওঠে,—অ্যাকচুয়ালি আশিসবাবু একটা ভালো কথা বলেছেন। এটাও আইকিউ টেস্টের পার্ট হওয়া উচিত। একটা লোক যত বেশি ক্রিয়েটিভ হয় সে তত নতুনভাবে কোনও কিছু ভাবতে পারে।

একটু থেমে অনিলিখা আবার বলে,—এখানেই মানুষ রোবটদের থেকে আলাদা। একজন আবিষ্কারক একটা জিনিসকে নতুনভাবে বারবার করার চেষ্টা করে এবং চেনা জিনিসকে নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারে বলেই আবিষ্কার করতে পারে। একজন ভালো লেখক নতুন কিছু ভাবতে পারে বলেই ভালো লেখক হয়।

অনিলিখার কথাটা লুকার মনে ধরেছে। বলে,—এক্সেলেন্ট আইডিয়া অনিলিখা। জিও চেষ্টা করো তো!

জিও মাথা চুলকে বলে,—পেন। কালির পেন। কী ইউস হতে পারে? কাগজে লেখা। আর কি? ছবি আঁকা—হ্যাঁ, ছবি আঁকাও যাবে। আর...আর? জিও বোধহয় প্রথমবার এত মুশকিলে পড়েছে।

—আপনার কি মনে হয় আশিসবাবু?

আশিসবাবু সপ্রতিভাবে বলে ওঠেন,—এক, কারুর গায়ে কালি ছেটানো যেতে পারে। দুই, নিব দিয়ে কাউকে আহত করা যেতে পারে।

—দু-একটা ভালো কথাও ভাবুন। অনিলিখা পাশ থেকে বলে।

আশিসবাবু ফের বলে ওঠেন—তিন, পেনের পিছন দিকটা দিয়ে কান চুলকোনো যেতে পারে। চার-পেনের নীচের অংশটা খুলে বা ঢাকাটা খুলে ফুঁ দিয়ে বাঁশির মতো অওয়াজ করা যায়, পাঁচ, ঢাকাটা দিয়ে কোনও তরল ঢালা হয়।

—ব্যস, ব্যস। অনিলিখা আশিসবাবুকে থামিয়ে লুকাকে বলে,—কী দেখলে? এটাই মানুষের স্পেশালিটি। এটা যদি জিও শিখতে পারে তা হলেই জিও পৃথিবীর সবথেকে ইনটেলিজেন্ট প্রাণী হয়ে উঠবে।

জয়ের আনন্দে আশিসবাবু এক চুমুকে বাকি আপেল জুস খেয়ে বলে উঠলেন,—জিও বাড়ি যা!

অনিলিখা ফিসফিস করে আশিসবাবুকে বলে,—জিও কিন্তু মানুষের মতো খেপেও যেতে পারে। ঘুরিয়ে একটা ঘুষি মারলে আমাকে একাই দেশে ফিরতে হবে।

কথাটা শুনে আশিসবাবু থতোমতো খেয়ে একদম চুপ করে গেলেন।

জিও নতুন এই টেস্টটাতে খুব উৎসাহিত। অনিলিখাকে লক্ষ করে বলে,—আরেকটা এরকম দাও তো। চেষ্টা করে দেখি।

অনিলিখা আগেই বাঁ হাতে রবার্তোর দেওয়া মাইক্রোচিপটা রেডি করে রেখেছিল। উঠে জিওর হাতের তালুতে রেখে বলে ওঠে,—বলো তো এটার কী কী ইউস হতে পারে?

—কম্পিউটার তৈরি, কম্পিউটার তৈরি, কম-পিউ-টা...র তৈ-কম—। জিওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। খানিকবাদে থেমে গেল। যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেভাবেই দুবার কেঁপে উঠে পুরো স্থির হয়ে গেল। চোখের পাতা স্থির-বিস্ফারিত। হাতটা সামনের দিকে একইভাবে বাড়ানো।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোলে অবাক।

লুকা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল জিওর দিকে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল জিওকে। জিওর স্থির শরীরটা আওয়াজ করে ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর। তারপর লুকা ছুটে গিয়ে অনিলিখার হাত দুটো ধরে ইতালিয়ান

উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল,—অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিলিখা। তুমি আমাকে নতুন জীবন দিলে। গত দু-মাস ওই রোবটটা আমার জীবনের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আমার শুধু ভুল হয়েছিল মাইক্রোচিপ বসিয়ে ওর ব্রেনের সঙ্গে কানেক্ট করা। প্রথমদিকে ঠিক ছিল। বড় বড় গুণ ভাগ ওর সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে করতে পারতাম। যা পড়তাম-শুনতাম সব মনে রাখতে পারতাম। কিন্তু তারপর একদিন—।

লুকা এবার সোফায় বসে পড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতো, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে আমার মতো ভাবতে দিচ্ছে না, আমার মতো করে কোনও কিছু করতে দিচ্ছে না। ভাবছি খেতে যাব, হঠাৎ মনের মধ্যে কে যেন আমাকে বলছে ভিডিয়ো গেমস খেলতে, আর আমাকে রীতিমতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। প্রথমদিকে কিছুদিন তাও মনের জোরে ওই রকম নির্দেশকে কাটানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারপর আর সে ক্ষমতাও রইল না। যা নির্দেশ আসে, তাই করি। ব্যবসার সূত্রে ও কর্মসূত্রে আমার নাম সবার কাছেই পরিচিত। পুরো ইউরোপের শীর্ষমহলে আমার মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে শুরু করল জিও।

—বাকিটা আমার জানা লুকা। কীভাবে একটা রোবট একের পর এক ক্ষমতাশালী লোককে নিজের কবজায় এনে আরেকটা রোমান সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিল তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। তবে রবার্তো সাহায্য না করলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না। গত পনেরো বছর ধরে ওই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে যন্ত্র কখনওই মানুষের ওপর রাজত্ব না করতে পারে। ও নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল যে আমি এখানে আসছি। তাই পুলিশ, জিও এবং জিও-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজের চোখ এড়িয়ে কোনওভাবে মাইক্রোচিপটা আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল।

—কী ছিল ওতে?

—ভাইরাস, এক ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস, যা মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে খারাপ করে দেয়। কীভাবে ও ওটা প্রোগ্রাম করেছে তা অবশ্য অনেক খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের এখন কয়েকটা ফোন করতে হবে। দেখতে হবে বাকিরাও রোবটের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে—

'মা-মা-মার্ডারার'—হঠাৎ আশিসবাবুকে তোতলাতে দেখে অনিলিখা কথা থামিয়ে ওনার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকায়। তাকিয়েই চমকে ওঠে।

দরজার কাছে সেই বিশালদেহী জার্মান ছেলেটা। ডান হাতে একটা বন্দুক। এই ছেলেটাকেই রোমে-ভেনিসে

দেখেছিল অনিলিখারা। খুব সম্ভবত রবার্তোকে এই ছেলেটাই মেরেছে।

'বস, বস-ম্যারিও।'—বলে লুকা ছেলেটাকে সোফায় বসতে বলে। তারপর উঠে গিয়ে ছেলেটার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে বলে ওঠে, 'ম্যারিওর কোনও দোষ নেই। ওর মতো নিরীহ ছেলে খুব কম হয়। ওকে জিও নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসে। তারপর ভাড়াটে খুনির মতো ব্যবহার করে। ওকে দিয়ে জিও-ই রবার্তোকে মারে। ফ্রান্সেসকোকে হত্যা করে। তোমাদেরকেও আজ ওরই হাতে মরতে হত।'

বলে একটু থেমে ফের প্রশ্ন করে, 'ম্যারিও, এখন স্বাভাবিক বোধ করছ তো?'

ম্যারিও সোফায় বসে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ডান হাতটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরে বলতে থাকে, 'এই-এই হাতে আমি রবার্তোকে গুলি করেছি, হা ঈশ্বর! রবার্তোর মতো মহান সায়েন্টিস্টকে!

মিহি গলায় আশিসবাবু বাংলায় সান্ত্বনা দেন, 'বাবা, দু-একটা ভালো কাজও করেছ। এক ইউরোতে আমাকে অমন ভালো ছাতা গিফট!'

চোদ্দো

জেনুয়া এয়ারপোর্ট। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট এয়ারপোর্ট। অনিলিখাদের এয়ারপোর্টে ছাড়তে এসেছে লুকা, বিখ্যাত ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক 'ইনটেসা স্যানপাওলো'-র হেড পাওলো ও আরও কয়েকজন। গাড়ি থেকে নেমে এয়ারপোর্টের টার্মিনালের ভেতরে ঢুকেই আশিসবাবু ফ্লাইট নাম্বার, চেক ইন গেট দেখতে চলে গেছেন। দু-তিন মিনিট বাদে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। বললেন,—চাও লুকা। চাও পাওলো। এবার আমাদের চেকইনের লাইনে যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে এতদিন দারুণ কেটেছে।

অনিলিখারা পোর্টোফেনিতে তিনদিন এক্সট্রা ছিল। হোটেল ভাড়া—অন্যান্য যাবতীয় খরচ লুকা জোর করে দিয়ে দিয়েছে। এমনকী ফেরার ইকনমি ক্লাস টিকিট ক্যানসেল করে দুটো ফার্স্টক্লাস টিকিটও কিনে দিয়েছে। অনিলিখার কোনওরকম প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি। এ ছাড়া জোর করে দিয়েছে হাজারো গিফট—দামি দামি ব্রান্ডের পোশাক, ঘড়ি। তার একটা প্রমাণ আশিসবাবুর পায়ে, যিনি ফুটপাথের কেনা চটি ছাড়া পরেন না, তিনি আজ পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের প্রাদার বুট পরে কায়দা করে ঘুরছেন।

বিদায় বেলায় লুকা হঠাৎ বলে উঠল,—আশিসবাবুকে লাস্ট একটা গিফট দেওয়া আমার বাকি আছে।—

বোলে—!

বোলে আর ওর সঙ্গে আরও দুজন গাড়ির ডিকি থেকে একটা বড় বাক্স ধরাধরি করে নামাতে শুরু করল।—কী ওটা? অনিলিখা বলে,—এত গিফট। না, না আর কিছু নয় প্লিজ।

আশিসবাবু ফিসফিস করে অনিলিখাকে বলে ওঠেন,—ফ্রি-তে যা পাবে সব নিতে হয়, বুঝেছ?

বলে পরম উৎসাহের সঙ্গে জোরে বলে ওঠেন,—গ্র্যাৎসি মিলে, তা ওটাতে কী আছে?

ভদ্রলোক এখন রাতারাতি ইতালিয়ান বেশি বলছেন।

—'জিও।' আপনি চেয়েছিলেন না? তাই ভাবলাম, বাড়িতে সাজিয়ে রাখবেন। আমার আর কী দরকার? উলটে দেখলেই ভয় লাগবে।

—না! নো!—নেহি!—নে! চারটে ভাষায় 'না' টা এত জোরে আশিসবাবু বললেন যে এয়ারপোর্টের ভেতর থেকে নীল পোশাক পরা একটা পুলিশ ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

একটু সামলে আশিসবাবু বললেন,—চলো অনিলিখা। এবার এগোতে হবে। ফ্লাইট ছাড়তে আর ঠিক একঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট বাকি আছে। আমাদের ফ্লাইটটা গেট নাম্বার 7-এ। তার আগে বারোটা ফ্লাইট আছে। জ্যুরিখ যাচ্ছে ফ্লাইট A1907—4 : 05-এ গেট 31। নিস যাচ্ছে ফ্লাইট A2233—4 : 09-এ গেট 8। ফ্রাঙ্কফুর্ট যাচ্ছে ফ্লাইট বি 2109—4 : 22-এ গেট 4...।

আশিসবাবু লুকা আর অনিলিখার বিস্ফারিত চোখের সামনে বারোটা ফ্লাইটের ডিটেলস বলে গেলেন। তারপরে সবাইকে চুপ দেখে ইতালিয়ান কায়দায় মাথার টুপিটাকে ডান হাতে মাথা থেকে আধফুট তুলে বললেন,—অ্যারেবিদার্চি অ্যা প্রেস্টো। অর্থাৎ 'বিদায়! আবার দেখা হবে।'

রহস্য যখন মাইক্রোস্কোপিক



—ই-ই-ই!

সর্বনাশ! কী করছিস?

বিশ্বজিৎদার চিৎকারে আমরা সবাই চমকে তাকালাম। বিশ্বজিৎদার দৃষ্টি মিলনের হাতে ধরা শেষ মাংসের শিঙাড়াটার দিকে।

এই কয়েক সেকেন্ড আগেও বিশ্বজিৎদা গুনগুন করে ভারিক্কি চালে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজছিল। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—' হঠাৎ করে মিলন কী অপরাধ করল বুঝলাম না। এক ওই শেষ শিঙাড়াটা খাওয়া ছাড়া।

খুব গম্ভীরভাবে মিলনের দিকে আরও দেড় মিনিট তাকিয়ে থাকল বিশ্বজিৎদা। তারপর বলে উঠল,—এই না দু-মিনিট আগে বাইরে থেকে ঢুকলি! হাত না ধুয়ে সোজা শিঙাড়া! তোর ওই পাঁচটা আঙুলে কী আছে জানিস?

মিলন একটু হতবাক হয়ে শিঙাড়াটা প্লেটের ওপর রেখে আঙুলগুলো উলটেপালটে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল। আমারও কিন্তু সামান্য কিছু শিঙাড়ার গুঁড়ো ছাড়া তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

বিশ্বজিৎদা ঘৃণার চোখে মিলনের হাতের দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল,—পঞ্চাশ হাজারটা ভাইরাস। বিভিন্ন ধরনের। কোনওটা ফ্লু কোনওটা ই-বোলা! জানিস প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত লোক মারা গিয়েছিল, তার থেকে বেশি লোক মারা গিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জায়। জাস্ট একটা ভাইরাস অ্যাটাকে। একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে।

পরের পাঁচ মিনিট ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ওপর বিশ্বজিৎদার জ্বালাময়ী বক্তৃতা চলল। বক্তৃতার প্রভাব এতটাই যে তন্ময় রান্নাঘর থেকে একটা ন্যাপকিন নিয়ে এল। তারপর শিঙাড়াটাকে এমন সতর্কভাবে ধরে ডাস্টবিনে ফেলল, মনে হল যে বম্ব ডিসপোসাল স্কোয়াড বোমা সরাচ্ছে।

আমরা সবাই বিশ্বজিৎদার কথায় এতটাই মগ্ন হয়ে ছিলাম যে খেয়ালই করিনি কখন এরমধ্যে অনিলিখা ঘরে ঢুকেছে। ঘরের কোণে রাখা জরাজীর্ণ সোফাটায় বসে মন দিয়ে বিশ্বজিৎদার কথা শুনছে।

অনিলিখার পরনে হালকা নীল রঙের জিনস, একটা কালো টপ।

খোলা চুলটা একটু এলোমেলো। ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুলটা ঠিক করতে করতে অনিলিখা বলে উঠল,—এক গ্লাস সমুদ্রের জলে যত ভাইরাস থাকে তার সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার থেকে বেশি। আর ভাইরাসদের আমরা যতটা বোকা ভাবি ততটা কিন্তু নয়।

একটু থেমে অনিলিখা রুজুর দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখ তো চা হবে কিনা।

রুজু সোৎসাহে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল মাসিমাকে চা-এর কথা বলতে। আসলে বেশিরভাগ শনিবারের আসরেই আজকাল অনিলিখা থাকে না। কলকাতায় থাকেই কম। আর এলেও কয়েকটা দরকারি কথার পরেই বেরিয়ে যায়। বেশ কয়েকটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গেও বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ছুটির দিন মানেই—পথশিশু, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আমাদের এই শনিবারের আসরে আসে নেহাতই সময় থাকলে। চা-এ আগ্রহ মানে অনিলিখা খানিকক্ষণ অন্তত থাকতে চলেছে।

অনিলিখা ফের শুরু করল,—তবে খুব কম ভাইরাসই কিন্তু ক্ষতিকর। ক্ষতিকর ভাইরাসগুলোর মধ্যেও বেশিরভাগ ভাইরাসের আক্রমণে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু মারা যায় না। আসলে যে আক্রান্ত হয় সে হল ভাইরাসের বাড়ির মতো। কে আর নিজের বাড়ি নষ্ট করতে চায়? তাই সেই হোস্টকে মারা ভাইরাসের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কীভাবে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া যায়। এই যেমন 'সোয়াইন ফ্লু' ভাইরাস। 2010-এর কথা। মেক্সিকো থেকে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাত্র দু-মাসে গ্লোবাল প্যান্ডেমিক। সবাই ভেবেছিল যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে। শেষে মারা গেল সামান্য কিছু লোক।

—কেন, HIV ভাইরাস! কত লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে,—সেক্ষেত্রে? বিশ্বজিৎদা চ্যালেঞ্জের সুরে বলে উঠল।

—হ্যাঁ, সেরকম সামান্য কিছু হাতে গোনা ভাইরাস আছে, যাদের জন্য অনেক লোক মারা যায়। আসলে ভাইরাসের মিউটেশানের মাধ্যমে পরিবর্তন ক্ষমতা সাংঘাতিক। এত তাড়াতাড়ি ভাইরাসের জিনের গঠন পালটে যায় যে ভ্যাকসিন আর তৈরি করা যায় না। এটাই হল HIV-র ভ্যাকসিন তৈরির সমস্যা। অনেক খেটেখুটে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হল, কিন্তু যাকে মারার জন্য তৈরি হল, সে-ই বদলে গেছে ইতিমধ্যে। তাই ভ্যাকসিন আর কাজ করল না। পৃথিবীর প্রথম প্রাণ ছিল ভাইরাস। আর হয়তো পৃথিবীর শেষ প্রাণ—সেটাও হবে ভাইরাস। ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে টিকে থাকার ক্ষমতা ওদের অসাধারণ।

—অনিলিখাদি, ফোনের থেকে চোখ তুলে প্রতীক বলে উঠল,—আবার কি কোনও নতুন ডেডলি ভাইরাস আসতে পারে? ওই সোয়াইন ফ্লু-র মতো? HIV-র মতো?

—হ্যাঁ, তা আসতেই পারে, তবে যে ভাইরাস যত ডেঞ্জারাস তার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তত কম। আসলে আক্রান্ত লোকটাই যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তো আর সে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারবে না, ফলে সেই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। তবে এমন হতেই পারে যে নতুন কোনও ভাইরাস এল যা খুব ডেঞ্জারাস, আবার একইসঙ্গে একজনের থেকে আরেক জনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাও যার খুব বেশি। নতুন নতুন

ভাইরাস তো সমানেই তৈরি হচ্ছে। এই যে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের কথা বললি। সেটা কীভাবে এসেছে জানিস?

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে ফের অনিলিখা বলে উঠল,—মাল্টিপল রি অ্যাসর্টমেন্ট বলে একটা পদ্ধতির মাধ্যমে। পাঁচ ধরনের ভাইরাস। তার মধ্যে দুটো এসেছে পাখির থেকে, দুটো এসেছে পৃথিবীর দু-প্রান্তের দুটো শুয়োর থেকে, আর একটা মানুষের থেকে। সবক'টা ভাইরাস একইসঙ্গে একটাই কোষের উপর আক্রমণ করেছে। তারপর নিজেদের মধ্যে জিন আদানপ্রদান করে সোয়াইন ফ্লু-র মতো নতুন ভাইরাস তৈরি করেছে। তারপর খুব দ্রুত বংশবিস্তার করে ওই কোষের বাইরে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সহজে ছড়িয়ে পড়েছে একজনের থেকে আরেকজনে।

সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে পরম শক্তিশালী একটা নতুন ভাইরাস।

অনিলিখা থামল।

—বুঝলি? আমার কথায় তো বিশেষ পাত্তা দিস না। এখন অনিলিখা বললে তোদের বিশ্বাস হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিতদা বলে উঠল,—এই আমি লিখে দিয়ে গেলাম—অ্যাটমবোমা নয়, সুনামি নয়, রোবট নয়—পৃথিবীর মানুষ যদি সত্যিই কোনওদিন বিপন্ন হয়, তা হবে ভাইরাসের জন্য।

আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোডশেডিং হয়ে গেল। ঘটনার সমাপতন এতটাই আকস্মিক যে বিশ্বজিৎদা একদম চুপ। আমরাও চুপ।

রুজু উঠল মোমবাতি আনতে। চা-ও এসে গেল। দুধ চা, লেবু চা—দু-রকমই।

খানিকবাদে মোমবাতির আলোয় চা খেতে খেতে অনিলিখা ফের শুরু করল,—ভাইরাস থাক। অন্য একটা টপিকে আসি। কালকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে। তোরা তো জানিসই আমার অজানা-অচেনা পুরোনো বই কেনার একটা শখ আছে। কাল কলেজ স্ট্রিটে রাস্তার ধারে একটা দোকান থেকে একটা বই কিনলাম। বইটার নাম 'এই পৃথিবী একশো বছর পরে।' লেখকের নাম—পাই। নাম দেখেই প্রথম আগ্রহ হয়েছিল। তারপর বইটার প্রথম কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়ে আমি সত্যিই হতবাক। এত নির্ভুল সায়েন্টিফিক প্রেডিকশান সত্যিই আমি কম দেখেছি। 1995-এ প্রকাশিত বই। তা তখনই কোয়ান্টাম কম্পিউটার, ইন্টারনেট-ফেসবুকের মতো নেটওয়ার্কিং সাইট আর আরও নানান প্রযুক্তির প্রায় নির্ভুল কল্পনা করে গিয়েছেন।

—নস্ট্রডামুসের মতো?

—ধুর, নস্ট্রডামুসের ভবিষ্যৎবাণীগুলো তো যে যার মতো ভেবে নিতে পারে। এমনিতেই আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি। তা এক্ষেত্রে সেরকম নয়। একদম নিখুঁত বিবরণ। খুব বড়মাপের সায়েন্টিস্ট না হলে, আর সেরকম দূরদর্শিতা না থাকলে এত ডিটেলসে লেখা সম্ভবও নয়। যত পড়ছি, ততই অবাক হচ্ছি। এমনকী ক্লোনিং—হিউম্যান ক্লোনিং নিয়েও নিখুঁত কল্পনা। এত বছর আগে, ভাবা যায়! অথচ এরকম একজন অসাধারণ লোকের কথা আমরা কেউ জানি না।

—তারপর? কে এই মিঃ পাই? কিছু খোঁজ পেলে?

—না, ইচ্ছে আছে পাবলিশার্সের কাছে যাব। অনামি এক পাবলিশার। অ্যাড্রেস আছে। পরশু অফিস ফেরত গিয়ে খোঁজ নেব ভাবছি।

—তুমি ব্যস্ত থাকো, তোমাকে খোঁজ নিতে হবে না। পাবলিশার্সের নাম আর অ্যাড্রেস আমাকে দিয়ে দিও। তা ছাড়া ওখানকার বেশ কয়েকটা পাবলিশার্সের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। ঠিক মিঃ পাই-এর খোঁজ পেয়ে যাব। প্রতীক বলল।

—এক্সেলেন্ট। তোকে আমি এখনই অ্যাড্রেসটা এসএমএস করে দিচ্ছি। আমি আমার বিজ্ঞানী বন্ধুদের কাছে মিঃ পাই-এর কথা জিগ্যেস করেছিলাম। কেউ-ই বলতে পারল না। ভাবা যায়—1995-এ লিখে গেছেন যে ভবিষ্যতে মানুষকে ট্র্যাক করা হবে শুধু তার জেনেটিক কোড— A, T, C, ও সিকোয়েন্সের ওপর নির্ভর করে। যত পড়ছি তত অবাক হচ্ছি।

আরও ঘণ্টা দেড়েক পর আমাদের শনিবারের আসর থেকে অনিলিখা বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে আমাদের সবার মুখেই মিঃ পাই।

২

বেশ কয়েকদিন বাদে ফেসবুকে ঢুকল অনিলিখা। অজস্র মেসেজে নানান ধরনের ছবি, কবিতাতে পরিচিত-অপরিচিত বন্ধুরা ট্যাগ করেছে।

শনিবার বা রবিবার ছাড়া সাধারণত অনিলিখা ফেসবুকে ঢোকে না। তাই পুরো সপ্তাহের জমে থাকা এই অজস্র মেসেজ, কবিতা আর ছবির ভিড় সরাতেই অনেক সময় কেটে যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে কাটানোর দরুন অনেকের সঙ্গেই অনিলিখার পরিচয় হয়েছে। ফোন বা ই-মেলের মাধ্যমে এতজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। ফেসবুকের পেজে একবার চোখ বোলালে কে কোথায় আছে, কেমন আছে, কী করছে তা চট করে জানা যায়। সেজন্যই ফেসবুক। তা না হলে এভাবে সময় নষ্ট করতে অনিলিখার ইচ্ছে করে না।

একটা মেসেজ এসেছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছ থেকে। কোনও ছবি নেই। নাম স্টিভ স্মিথ। এরকম নামের কাউকে চেনে না অনিলিখা। কিন্তু মেসেজটা খুলে অবাক হল। মেসেজটা এসেছে মনসুরের কাছ থেকে। মনসুর। বেশ কয়েকবছর আগে আমেরিকাতে চাকরি করার সময়ে মনসুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনসুর তখন ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে স্ট্যানফোর্ডে রিসার্চ করছিল। আফগানিস্থানের ছেলে। বাবা-মা বহুদিন আমেরিকায় আছেন। আমেরিকাতেই ও বড় হয়েছে। কিন্তু মনসুর হঠাৎ কেন অন্য নামে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলল, তার কোনও কারণ খুঁজে পেল না অনিলিখা।

মেসেজটা ইন্টারেস্টিং।

—অনিলিখা, তোমাকে ফেসবুকে পেয়ে খুব ভালো লাগল। তোমার ই-মেল আই. ডি আর ফোন নাম্বারটা জানিও। জরুরি দরকার আছে। অত্যন্ত জরুরি।

অনিলিখা ওর নাম্বার আর ই-মেল আই-ডি মেসেজ বক্সে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উলটোদিক থেকে রিপ্লাই এসে গেল।

—ভাগ্যিস এখন ফেসবুকে ঢুকেছিলাম। যাক, তোমাকে পেয়ে গেলাম। খুব ভালো লাগল। তা কেমন আছ? কোথায় এখন?

—ভারতে, কলকাতায়। খুব ভালো আছি। তুমি?

—ভারতে আবার কেউ ভালো থাকে না কি? হাসালে। আমি আমেরিকায় আছি। তবে প্রচুর ট্রাভেল করতে হয়। প্রায় প্রতি মাসে ইউরোপ বা ইংল্যান্ডে যেতে হয়।

—কী করছ?

—যা করতাম। ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে রিসার্চ। তবে লাস্ট কয়েকমাস একটা বিশেষ প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত আছি। নাসার।

—কী প্রোজেক্ট?

—হুম, ডিটেলস বলা যাবে না। অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল প্রোজেক্ট।

—একটু তো বলো।

—দেখা হলে বলব।

—দেখা হলে মানে? তুমি কি ভারতে আসছ?

—হ্যাঁ, সে জন্যই তো তোমার সঙ্গে এত দরকার। তোমার দিক থেকে একটা ইনভিটেশন লেটার চাই। তাহলে আসতে পারি। আসলে কলকাতায় যাওয়ার আগ্রহ আমার বহুদিনের। তারমধ্যে আবার যুব বিশ্বকাপ হচ্ছে কলকাতায়। কোনওভাবে মিস করব না। আমার দেশ আফগানিস্থানও আছে। মুশকিলটা হল অন্য জায়গায়।

—কী মুশকিল?

—এত বছর আমেরিকায় থাকলে কী হবে, ওই যে আমার মধ্যে আফগানিস্থানের ছাপ রয়ে গেছে! আমার বাবা আবার পাকিস্তানের। মোদ্দা কথা হল, ভিসা পাওয়া অত সহজ না। তাই তোমার দিক থেকে ইনভিটেশন লেটার পেলে ভিসা পাওয়াটা অসুবিধে হবে না। তোমার তো এখন ভারতে ভালোই নামডাক হয়েছে। তোমার বন্ধু হিসেবে ভিসা পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। কী বলো? তা, তোমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে আছে কি?

—আরে না, না। তোমার পাসপোর্ট ডিটেলস, কবে আসবে, এসব জানিয়ে মেল করে দিও। আমার দিক থেকে যা যা দরকার আমি পাঠিয়ে দেব।

—এক্সেলেন্ট! খুব ভালো হল। আসলে ভারতীয় বেশি লোককে আমি চিনি না। কলকাতায় গিয়ে আমার প্রোজেক্ট নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। খুব ইন্টারেস্টিং।

আরও খানিকক্ষণ চ্যাট হল। কলকাতায় ফুটবলের যুব বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে দেড়মাস পরে। মনসুর তখনই আসতে চায়। ওর চিরকালই ফুটবলে খুব আগ্রহ।

মনসুর আমেরিকাতেই বড় হয়েছে। ওকে দেখে মোটেও আফগানিস্থানের কাবুলিওয়ালাদের কথা মনে পড়ে না। ফরসা রং, খুব আস্তে আস্তে কথা বলত। মনসুরের পাঠানো পাসপোর্টের কপিতে ছবিটা দেখল অনিলিখা। নাহ, দশ বছরে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি, একটা শৌখিন দাড়ি শুধু যুক্ত হয়েছে। চোখ-মুখ শার্প। কিন্তু একটা ভারি সুন্দর স্নিগ্ধতা মুখে ছড়িয়ে আছে। যেটা ওই দেশের লোকেদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

৩

সকাল থেকেই রূপার মনটা খুব খারাপ। স্কুলেও যায়নি। অথচ আজকে ওদের স্কুলে স্পোর্টস ডে। স্পোর্টসে ও খুব ভালো। গেলে দু-তিনটে প্রাইজ তো পেতই। দৌড়ে, লং-জাম্পে। কিন্তু ওর আর কোনও প্রাইজ পেয়েই বা কী হবে! এ জীবনেরই বা কী অর্থ আছে আর!

এতদিন ধরে রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে এসেছে। কিন্তু ঠাকুর ওর কথা শোনেনি। অনেকে অনেক কিছু চায়, কই রূপা তো সেরকম কিছু চায়নি। শুধু একটা জিনিসই চেয়েছিল গত বেশ কয়েকবছর ধরে। তা সেকথাটা তো ঠাকুর শুনলই না। সত্যিই ঠাকুর আছে তো? না কি শুভম যেমন বলে, ঠাকুর দেবতা বলে কিছু নেই—সেটাই ঠিক? তবু খানিকক্ষণ চুপ করে ঠাকুরের সামনে বসল রূপা। অভিমানে নানা কথা বলে চলল কাঁদতে কাঁদতে।

রূপারা দুই ভাইবোন। ও আর ওর ভাই রাজু। রাজু ওর থেকে দু-বছরের ছোট। রূপা তেরো, রাজু এগারো। ছোট থেকে রাজুকে একইরকম দেখে এসেছে রূপা, দু-বছর আগেও

যেমন ছিল, চার বছর আগেও সেরকম ছিল, আট বছর আগেও তাই। একই রকম। দু-বছর বয়সের পর থেকে রাজুর কোনও গ্রোথ হয়নি। হাঁটাচলা করতেও শেখেনি। সারাক্ষণ রাজু ওর রকিং চেয়ারটাতে বসে থাকে। শোওয়ার সময় ও, বাবা বা মা রাজুকে ধরে কোনওরকমে বিছানায় শুইয়ে দেয়। রাজুকে দেখে যে কেউ মনে করবে ঠিক দু-বছরের বাচ্চা। তারপর যেন আর বয়স বাড়েনি। এটাই রাজুর অসুখ। খুব দুরারোগ্য কোনও অসুখ। সাধ্যমতো অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে বাবা। বড় শহরে অনেকবার কষ্ট করে রাজুকে নিয়ে গেছে। কিন্তু অসুখটা যে আসলে কী, আর কীভাবে এর চিকিৎসা সম্ভব তা বোঝা যায়নি।

পাশের গ্রামের নরেন ডাক্তারকে সবাই বলে ধন্বন্তরী। সব অসুখের চিকিৎসা নাকি নরেন ডাক্তারের জানা আছে। সেই নরেন ডাক্তারের কাছেই শেষমেশ ভাইকে নিয়ে গেছে বাবা। গত তিন মাস ওনার চিকিৎসাতেই আছে রাজু। কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি।

অনেক রাতে স্বপ্ন দেখে উঠে বসেছে রূপা। স্বপ্নে দেখেছে রাজু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বপ্ন জেনেও রূপা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। যদি সত্যি হয়ে যায়। এসে দেখেছে রাজু সেই একইরকম ভাবে ঘুমোচ্ছে খাটে শুয়ে।

গত কয়েকদিন ধরে রাজু খুব অসুস্থ। এমনিতে সারাদিন ও জানলার সামনে রাখা রকিং চেয়ারটাতে বসে দোল খায়। মাঝে-মাঝে খিদে পেলে বা কোনও কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়লে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে চেঁচায়। গত কয়েকদিন মুখে সেই আওয়াজটুকুও নেই। কিছু খাচ্ছেও না। মা-ও প্রায় খাওয়াদাওয়া ছেড়ে ওর পাশেই বেশিরভাগ সময় বসে আছে।

অন্যসময় রাজু হাসে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। চোখে আলো পড়লে বিরক্ত হয়। এই ক'দিন কিছুই করছে না। আজকে নরেন ডাক্তার এসেছিল। অনেকক্ষণ দেখে বলে গেল,—আর আশা নেই। এবারে ঘুমিয়ে পড়লে আর হয়তো ঘুম ভাঙবে না।

—কিছু কি করার নেই? বাবা উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

নরেন ডাক্তার দুদিকে মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাবাও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল পিছন পিছন।

রূপা শুনছিল, বাবা চিৎকার করে বলছে,—আপনি কীরকম ডাক্তার? আপনার নাকি এত নাম! কই আমার ছেলেকে তো এত বছর ধরে ঠিক করতে পারলেন না!

তারপর বাইরের সিঁড়িতে বসে পড়েছিল কাঁদতে কাঁদতে। বাবাকে কখনও এভাবে চেঁচাতে আর কাঁদতে দেখেনি রূপা।

ছোটবেলায় রাজুকে খুব হিংসে করত রূপা। বাবা-মা'র মুখে সবসময় 'রাজু', 'রাজু'! রূপার দিকে যেন লক্ষ্যই ছিল না। উলটে রাজুর সব কাজের দায়িত্ব তার ওপর। আর ভাই-এর জন্য

ছোটবেলা থেকে কতবার যে রক্ত দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে মনে হত এ-বাড়িতে বুঝি রাজু ছাড়া আর কেউ নেই।

সবাই কত দূরে দূরে বেড়াতে যায়—কত মজা করে! চিড়িয়াখানায় যায়, সার্কাস দেখতে যায়। আর রূপা? ভাইয়ের জন্য কোনওদিন এরকম কোনও জায়গাতে যেতে পারেনি। কিন্তু আস্তে আস্তে সব পালটে গেল। রূপার মনটাও। ওর অসহায় হাসিতে যে কী আকর্ষণ আছে কে জানে! রূপা এখন ভাইয়ের কথা ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না।

নরেন ডাক্তার বেরিয়ে গেছে দু-ঘণ্টা হল। বাবা-মা নিজেদের মধ্যে এখনও কীসব কথা বলছে—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। যদি শেষ কিছু করা যায়। রূপা জানে হাসপাতালে গেলে আর রাজুকে দেখতে পাবে না। এর কোনও চিকিৎসা নেই। নরেন ডাক্তারও তাই বলে গেছে।

রাজুর একটা হুইল চেয়ার আছে। সেটাতে করে সপ্তাহে একদিন ওরা রাজুকে বাইরের বাগানে বেড়াতে নিয়ে যায়। হঠাৎ রূপার কী খেয়াল হল, কোনও শব্দ না করে রাজুকে কোলে করে ও হুইল চেয়ারে বসাল। তারপর হুইল চেয়ারটা ঠেলে রাজুকে নিয়ে বাগানে চলে এল। যেটা কোনওদিন করেনি তারপর সেটাই করল। বাগানটা পেরিয়ে বাইরের গেট খুলে রাস্তায় চলে এল। হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে হাঁটতে শুরু করল।

বাড়ি থেকে স্টেশন কুড়ি মিনিট হাঁটা পথ। দুপুরের দিক বলে স্টেশন বেশ ফাঁকা। পৌঁছে ও খানিকক্ষণ ভাইকে নিয়ে স্টেশনে বসে রইল। একটা ট্রেন এসে ঢুকেছে। কলকাতায় যাচ্ছে। উঠে পড়বে ট্রেনটাতে? চলে যাবে বহু বহু দূরে? ভাইয়ের দিকে তাকাল। এত জটিলতা রাজু বোঝে না। আধ ঘুমন্ত চোখে তাকিয়ে আছে প্লাটফর্মের দিকে। মুখে হালকা হাসি। যেন কিছুই হয়নি।

রাজু যখন খুব বিরক্ত হয় বা কিছু বলতে চায় তখন রকিং চেয়ারটা বার বার সামনে পিছনে দোলায়। এখন ওর সে উপায় নেই। চুপচাপ হুইল চেয়ারটাতে বসে আছে। হয়তো ওর মনে হচ্ছে যে আজ হঠাৎ ও এক নতুন জগতে পৌঁছে গেছে। বাড়ির বাইরে বেরোনোর অভিজ্ঞতা ওর খুবই কম। বাইরে বেরোনো মানে ডাক্তার আর হাসপাতাল। আজ মুখে কোনও হাসি নেই। দুঃখও নেই। আছে একটা উদাসীনতা।

আলো কমে আসছে। পাখির ঝাঁক ঘরে ফেরা শুরু করেছে। তাদের চিৎকার—ডানা ঝাপটানোর আওয়াজে মানুষের গলার আওয়াজও হারিয়ে গেছে। এই গতিময়-শব্দময় পৃথিবীতে ওর ভাইটাই শুধু গতিহীন—শব্দহীন।

ঠাকুমা বলেন,—ঈশ্বরে যা কিছু করেন, তার সবের পিছনেই কিছু কারণ থাকে। কিন্তু ওর ভাইয়ের ক্ষেত্রেই কেন এত বড় ভুল করে ফেলল ঠাকুর? ওর জীবনটা কেন এতটাই অর্থহীন? ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাতটা জড়িয়ে ধরল রূপা। আঙুলগুলোতেও কোনও সাড় নেই।

পাশ থেকে হঠাৎ কে যেন বলে উঠল,—খুকু, কী করছ এখানে এত রাতে? ও কি তোমার ভাই?

রূপা মুখ তুলে তাকাল ঝাপসা চোখে। একজন ছোটখাটো টাকমাথা লোক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে হাফ হাতা রংচঙে শার্ট। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট।

৪

কল্যাণগড় পুরোনো এলাকা। কলকাতা থেকে গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। অনিলিখা গাড়িটা নিয়েই বেরিয়েছিল। সঙ্গে প্রতীক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিঃ পাই-এর অ্যাড্রেস পাওয়া গেছে। যদিও পাবলিশার্সের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে মিঃ পাই ওই অ্যাড্রেসে থাকতেন বছর দশেক আগে। তখনই শেষ যোগাযোগ। এমনিতেও বইয়ের যা বিক্রি তাতে পাবলিশার্সের দিক থেকে মিঃ পাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার পড়েনি। ওনার প্রাপ্য রয়্যালটির টাকায় ডাকটিকিটও কেনা যায় না।

অনিলিখার মুখে বইটার প্রশংসা শুনে অবাক হয়ে পাবলিশার্সের মালিক মিঃ মাইতি বলেছিলেন,—দেখুন, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ বলে আমার আগেই সন্দেহ ছিল। তা না হলে কেউ ওরকম বই লেখে! আচ্ছা আপনিই বলুন—আগামীকাল কী করবেন তারই কোনও ঠিক আছে কলকাতায়? কী দরকার আপনার একশো বছর পরের কথা জেনে? একশোটা কপি প্রিন্ট করেছিলাম, তার মধ্যে পঞ্চাশটা ইঁদুরেই খেয়েছে। আর আমার অবস্থা তো দেখছেনই।

বলে মাথার ওপর ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বেশি কথা বাড়ায়নি অনিলিখা। এমনিতেও সুরুচি পাবলিশার্স-এর বাড়িটার যা অবস্থা—তাতে বাড়ির ছাদটাই কবে ভেঙে পড়ে কে জানে!

পরের শনিবারেই প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে মিঃ পাই-এর খোঁজে কল্যাণগড়। মফসসল এলাকা। লোকেরা বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বাড়ি চেনে না—চেনে বাড়ির লোককে দিয়ে। আর সেখানেই মিঃ পাইকে খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। এবং খুঁজে পাওয়া গেল মিঃ পাই-এর জন্য নয়, ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট গণেশের জন্য, তাকে তবু আশপাশের লোকজন খানিকটা চেনে।

বাড়িটা একটা বড় জলের ট্যাঙ্কের উলটোদিকে। বাড়িটা ঘিরে বাঁশের ঝাড়, আম, কাঁঠাল, নিম নানা গাছের ভিড়। যেন চোখের আড়ালে রাখার জন্যই বাড়িটাকে চারদিক থেকে গাছে ঘিরে রাখা হয়েছে।

গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ। তারপর তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে দরজায় বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর দরজাটা খুলল।

যিনি খুলেছেন, তিনি মাঝবয়সি। বছর চল্লিশেক। কালো প্যান্ট, ফুলহাতা সাদা শার্ট। বলতে গেলে অফিসের পোশাক। চোখে দীপ্ত চাহনি। রিমলেস চশমা।

—আপনি কি মিঃ পাই?

—না, আমি গণেশ। ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট। স্যার তো কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনারা?

গণেশের কথা শুনে অবাকই হল অনিলিখা। নামের সঙ্গে পোশাক একেবারেই মানানসই নয়।

অনিলিখা আর প্রতীককে নিয়ে গণেশ একটা ঘরে বসাল। ঘরটার চারদিকে বই-এর তাক। বাংলা, ইংরেজি দুই-ই আছে। নানান বিষয়ের। গল্পের বই যেমন আছে, তেমনই আছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাইকোলোজির বই। মিনিট দশেক বাদে চা এল। সঙ্গে কচুরি আর জিলিপি। তার ঠিক মিনিট দুয়েক বাদে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল গণেশ।

—আমি খুব দুঃখিত। স্যার আজকে দেখা করতে পারবেন না। আমি আগে বলিনি কারণ কোনও অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাবেন সেটা স্যার একদমই পছন্দ করেন না। উনি আজকে প্রচণ্ড ব্যস্ত।

আপনি মিঃ পাইকে গিয়ে আর একবার অনুরোধ করুন। বলবেন যে আমরা অনেকদূর থেকে এসেছি। কলকাতা থেকে। দরকার হলে আবার আসব, কিন্তু ওনার সঙ্গে বিশেষ দরকার। বলবেন, ওনার লেখা একটা বই 'এই পৃথিবী একশো বছর পরে' পড়ে আমরা এসেছি।

—আচ্ছা, বলছি গিয়ে। কিন্তু স্যার ব্যস্ত থাকলে কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না। তাছাড়া ওনার একটা এক্সপেরিমেন্ট কাজ করছে না বলে এখন মন অত্যন্ত খারাপ। পোষা বেড়ালটা ফের ইঁদুরকে তাড়া করছে।

—তা, সে তো করবেই। অনিলিখা অবাক হয়ে বলে।

—আরে, সেটাই তো এক্সপেরিমেন্ট ছিল। উনি চাইছিলেন বেড়ালের স্বভাবে কিছু পরিবর্তন আনতে। ভালো কাজ করলে পুরস্কার, খারাপ কাজ করলে শাস্তি। ইঁদুর তাড়া না করে সোলার সেলের বিছানার উপর লাফালাফি করলে পুরস্কার। এভাবে সোলার এনার্জি তৈরি

করা যাবে। ভাবুন তো হাজার হাজার বেড়ালকে যদি একাজে লাগানো যায়, কতটা সৌরশক্তি পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা বাড়িতেই তো একটা দুটো বেড়াল কুকুর থাকে। তাই না! ওরাও খুশি—একইসঙ্গে জিরো পরিবেশ দূষণ।

ভাবুন তো! গত কয়েকদিন বেড়ালটার স্বভাবে ভালোই পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু আজকে আবার—। তবু বলে দেখছি একবার, যদি আসেন।

গণেশ চলে যাওয়ার ঠিক তিন মিনিট বাদে গণেশের সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলেন এক বছর পঞ্চাশেকের ভদ্রলোক। চোখে চশমা। দেখার মতো বড় বড় চোখ। মাঝারি হাইট। এক মাথা ভরতি কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল।

এসেই সরাসরি প্রশ্ন,—আপনাদের মধ্যে কে পড়েছেন বইটা?

—আমি পড়েছি। আমাকে তুমি বললে খুশি হব! বইটা আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে একসপ্তাহ আগে সংগ্রহ করি। ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছিলাম।

—কী বলবে? এটাই বলবে তো যে আমি যা লিখেছি তার অনেকটাই আজকে সত্য বলে প্রমাণিত, তাই তো? মিঃ পাই সোফাতে বসে বলে উঠলেন।

—হ্যাঁ, সেটাই বলতে এসেছিলাম। পড়ে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আজ থেকে এত বছর আগে কেউ লিখে গেছে ইন্টারনেটের সোশাল নেটওয়ার্কিং-এর মতো প্রযুক্তির কথা। লিখে গেছে হিউম্যান ক্লোনিং-এর কথা। এমনকী নির্ভুলভাবে রোবোটিক্স প্রযুক্তি আর ব্রেন সায়েন্সের কথাও। অবশ্য আপনি এমন অনেক কিছুও লিখেছেন, ভবিষ্যতে 2100 সাল নাগাদ হবে যা এখনও বিশ্বাস করা যায় না। তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনার প্রত্যেকটা অনুমান এত নির্ভুলভাবে মিলে গেছে যে আমি এককথায় স্তম্ভিত।

—থ্যাঙ্ক ইউ অনিলিখা।

—আপনি আমার নাম জানেন?—অবাক হয়ে বলে ওঠে অনিলিখা।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিঃ পাই। এখনো একটু আধটু রিসার্চ পেপার পড়ার অভ্যেস আছে। বিশেষ করে মৌলিক চিন্তাভাবনা হলে। তোমার ছবিও দেখেছি। তা যা বলছিলাম, আসলে কী জানো—পৃথিবীর প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে। বিজ্ঞান, তথ্য আর যুক্তিকে পাশাপাশি দাঁড় করালে অনেক ছবিই পরিষ্কার ধরা দেয়।

—তা, আপনি কি এখানেই বরাবর থাকেন?

—হ্যাঁ, তা বেশ কিছু বছর হল। প্রায় পনেরো বছর।

পাশ থেকে গণেশ বলে ওঠে,—স্যারেরা নরসিংহপুরের খুব বড় জমিদার ছিলেন। সেসব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে আসেন বছর পনেরো আগে নিভৃতে কাজ করার জন্য।

মিঃ পাই আবার বলতে শুরু করেন,—বিজ্ঞান হল আমার নেশা। ওখানকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে এখানে চলে আসি। এখানে আমার একটা বড় ল্যাবরেটরি আছে। বড় লাইব্রেরি আছে। পড়াশোনা আর নিজের কাজ নিয়ে থাকি।

—স্যারের কাছে বিজ্ঞানের যা বই আছে তা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও আছে কিনা সন্দেহ। ভেতরের বাড়িটা পুরোটাই লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরি।

অনিলিখা মিঃ পাইকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে,—আমি আপনার সম্পর্কে অনেক খোঁজ করেছিলাম আমার বিজ্ঞানী বন্ধুদের কাছে। কেউই খোঁজ দিতে পারল না।

হেসে উঠলেন, মিঃ পাই,—আমার আসল নাম কিন্তু 'পাই' নয়। আসল নাম সমুদ্র বসু। পাই সংখ্যাটা আমার এত প্রিয় যে ছোটবেলা থেকে সবাই আমাকে 'পাই'-'পাই' বলে ডাকত। ওই নামেই চিনত। বই লেখার সময়েও ওই নাম ব্যবহার করেছি। ফিজিক্সে এম.এসসি করার পর কিছুদিন অধ্যাপনা করি। ব্যাপারটা এত গতানুগতিক লাগতে শুরু করে যে দু-বছর পরে ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান চর্চায় লেগে পড়ি। টাকা-পয়সার প্রয়োজন কোনওদিনই ছিল না। আমার যা ছোটখাটো গবেষণা সবই এখানকার ল্যাবে। তবে হ্যাঁ, কোথায় কে কী নিয়ে রিসার্চ করছে সেগুলোতে অবশ্যই চোখ রাখতে হয়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পাই। সামনের আলমারিতে রাখা একটা বই বের করে বলে উঠলেন—ডাঃ পেনফিল্ডের রিসার্চ। অপটো-জেনেটিক্সের ওপর। আলোর সাহায্যে কীভাবে মাছির স্বভাবে পরিবর্তন আনা যায়—যাতে মাছি মিষ্টি খাবারের কাছাকাছি না যায়। আমিও আমার ল্যাবে বেশ কিছুদিন আগে মাছির উপরে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। মজা হল বিজ্ঞানের গবেষণা কিন্তু পি.এইচ.ডি বা নিজের ডিগ্রির জন্য নয়। আমার গবেষণার অনেক তথ্য আমি ডাঃ পেনফিল্ডের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম।

পাশ থেকে গণেশ বলে উঠল,—ইনফ্যাক্ট স্যারের দেখানো পথেই ডাঃ পেনফিল্ডও গবেষণা চালিয়ে সাফল্য পান। কিন্তু স্যার ওরকমই। সবসময় আড়ালে থাকতে চান। প্রচার থেকে দূরে।

মিঃ পাই একটু যেন লজ্জা পেয়েই বলে উঠলেন,—তা, যে জন্য বলছিলাম। অপটিক্স বা আলো, জেনেটিক্স, সাইকোলজি—আরও নানা সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু আজ আর দূরত্ব নেই। নানান বিষয়কে একসঙ্গে করেই আজকের বিজ্ঞানের পথ চলা। আমাদের বৃহত্তর জীবনেও কিন্তু সব বিষয়কে একসঙ্গে ভাবতে পারলে তবেই ভবিষ্যৎকে ঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রতীক এতক্ষণ একমনে কচুরি আর জিলিপি খাচ্ছিল। হঠাৎ বলে উঠল,—মিঃ পাই, এখনকার দিনে মানুষের কাছে সবথেকে বড় বিপদ কী মনে হয়? গ্লোবাল ওয়ার্মিং?

—না, আমার মনে হয় না গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে এই মুহূর্তে ভয়ের কিছু আছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং অবশ্যই একটা বড় চিন্তার বিষয়। তবে আমাদের হাতে আরও কুড়ি বছর সময় আছে। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে সব থেকে বড় বিপদ আসতে পারে ভাইরাস-এর মতো জৈব অস্ত্র থেকে। টেররিস্টদের হাতে এরকম কোনও শক্তিশালী জৈব অস্ত্র থাকলে তার ধাক্কা সামলানো সত্যিই শক্ত হবে। দাঁড়াও একটা আর্টিকল দেখাই। কয়েকদিন আগেই পড়ছিলাম।

মিঃ পাই উঠে গিয়ে ঘরের একপাশে সার দিয়ে রাখা 'নেচার' ম্যাগাজিনের একটা সংখ্যা বেছে নিলেন। তারপর বললেন,—আলকায়দা গত তিনবছর ধরে মাইক্রোবায়োলজি আর কেমিস্ট্রিতে ভালো ডিগ্রিধারীদের তাদের কাজে লাগিয়েছে। এই সংখ্যাটাতে তার ওপরেই প্রতিবেদন আছে। ভাবো তো, কী হবে যদি এরা ইবোলা বা অ্যানথ্রাক্সের মতো ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে এমন কোনও ভাইরাস যার কোনও ভ্যাক্সিন নেই।

খানিকক্ষণ থেমে মিঃ পাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন,—অনেক সময় বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে করলে আসল ছবিটা ধরা পড়ে। দু-বছর আগে ম্যালেশিয়া থেকে চিনের পথে একটা প্লেন উধাও হয়েছিল। আজও তার হদিশ পাওয়া যায়নি। একটা মজার কথা জানো। এ কথাটা কেউ কোথাও বলেনি যে ওই প্লেনে পাঁচজন বিশ্ববিখ্যাত ভাইরোলোজিস্ট বা ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ছিল। কী কো-ইনসিডেন্স তাই না? একসঙ্গে অতজন একই সাবজেক্টের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু কোথাও কি সে সম্বন্ধে কিছু দেখেছ?

অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে বলল,—না, আপনি কী বলতে চান? প্লেনটা টেররিস্টরা হাইজ্যাক করেছিল?

মিঃ পাই হেসে বলে উঠলেন,—না, আমি কিছুই বলছি না। তবে একটা সম্ভাবনা তো বটেই।

আরও ঘণ্টা দুয়েক বাদে অনিলিখা মিঃ পাই-এর বাড়ি থেকে বেরোল। বেরোনোর আগে মিঃ পাই ল্যাবরেটরিটাও ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন।

গাড়িতে উঠে অনিলিখা প্রতীককে বলল,—পিওর জিনিয়াস। এ ধরনের জিনিয়াসরা প্রথাগত ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলেন। মিঃ পাই-ও তার ব্যতিক্রম নন। ওনার ল্যাবে যে ধরনের গবেষণা হয় দেখলাম, আমি হলফ করে বলতে পারি তা বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমতুল্য।

৫

—তুই! সম্পায়ন না? এখানে? দরজা খুলে অবাক হয়ে অনিলিখা বলে ওঠে।

—তোমার গাড়ি চালাতে। ড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাঠাল।

অনিলিখা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল,—মা, কে এসেছে দেখো! আয় ভেতরে আয়।

সম্পায়ন কিছুতেই ভেতরে আসবে না।

—আমি গাড়িতেই বসছি। চাবিটা দিয়ে দাও।

—তাই হয় নাকি? আয়, ভেতরে এসে বস।

সম্পায়ন এবার অনিলিখার জেদের কাছে হার মানল। ভেতরে এসে সোফার ওপর বসে বলে উঠল,—বহুদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল অনিলিখাদি। লাস্ট দেখা হয়েছিল, 1992-এর 13 অক্টোবর। দুর্গাপুজোর সময়। তা তোমরা এখানে এসেছ কবে?

—নাহ, তোর মেমারিটা তো একইরকম আছে। সব কিছু মনে রেখে দিস।

—তবে বেশিরভাগই অদরকারি। আর এটাকে আমার রোগও বলতে পারো। তুমি সেদিন কী পরেছিলে, কারা সঙ্গে ছিল সবই আমার মনে আছে।

—বল তো কী পরেছিলাম সেদিন?

—সবুজ সালোয়ার কামিজ। মাসিমা সঙ্গে ছিলেন। লাল পাড় শাড়ি। ঠিক কিনা!

—ধুর, এতদিন আগের কথা কি আমার মনে থাকে! তবে আমার ওই রঙের একটা সালোয়ার ছিল বটে।

—মাসিমা কেমন আছেন?

কথাটা বলতে না বলতেই অনিলিখার মা পুজো সেরে ঘরে ঢুকলেন। সম্পায়ন উঠে গিয়ে প্রণাম করে বলল,—একইরকম আছেন মাসিমা। এমনকী চশমার ফ্রেমটাও একই আছে।

অনিলিখার মা একটু অবাক হয়ে সম্পায়নের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনিলিখা বলে,—মা, তুমি চিনতে পারছ? সম্পায়ন! আমাদের পাড়াতে 14 নং বাড়িতে থাকত। বিশুকাকুর ছেলে।

এতক্ষণে অনিলিখার মা খেয়াল করতে পেরে বলে উঠলেন,—ও বিশুর ছেলে? কত বড় হয়ে গেছ! ছোট দেখেছি বলে চিনতে পারিনি। তা, তুমি এখন কী করো?

একটুও দ্বিধা না করে সম্পায়ন বলে, গাড়ি চালাই মাসিমা।

—তা, বাবা-মা কেমন আছেন? তোমাদের সেই স্টেশনারি দোকানটা এখনো আছে?

অনিলিখার মা সম্পায়নের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনিলিখা এই ফাঁকে সম্পায়নের জন্য খাবার আর চা-এর ব্যবস্থা করতে গেল।

সম্পায়ন! শেষে ও গাড়ি চালাচ্ছে! অনিলিখারা আগে ব্যারাকপুরে থাকত। সম্পায়নরা ছিল প্রতিবেশী। অনিলিখার থেকে বছর দুয়েকের ছোট। ছোটবেলা থেকেই সম্পায়ন বিস্ময়কর

স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল। কিন্তু পড়াশোনাতে কখনওই ভালো ছিল না। আসলে খুব বেশি স্মৃতিশক্তি মানুষকে সাহায্য করে না। আমাদের ব্রেন সেটাই মনে রাখার চেষ্টা করে যা কাজে লাগে। আমরা সেটাই দেখি যা আমাদের দেখার দরকার।

অনিলিখা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। ওদের পাড়ায় এক বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ানের শো ছিল। সেখানে সম্পায়ন একটা মজার কাণ্ড করে বসল। দর্শকদের মধ্যে থেকে ওকে ডাকা হয়েছিল। তাসের ম্যাজিক দেখানোর জন্য। সেটাই ছিল ম্যাজিশিয়ানের বড় ভুল। সেই ম্যাজিশিয়ান যাই করে না কেন, সম্পায়ন ঠিক কারসাজিটা ধরে ফেলে। স্টেজের ওপর ভুল করে এরকম একজনকে ধরে এনে ম্যাজিশিয়ান তো মহা বিপদে। কোনওরকমে শো শেষ করে পালাতে পারলে বাঁচে।

অনিলিখা পরে সম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেছিল কী করে ও বারবার ম্যাজিশিয়ানের হাতের কারসাজি ধরে ফেলছিল। উত্তরে সম্পায়ন মুচকি হেসে বলেছিল,—তোমরা শুধু সেটাই দেখো, যেটা তোমাদের দেখানো হয়। বাকি সবকিছু খেয়াল করো না।

অনিলিখা পরে জেনেছে যে একে বলে 'এ মটো পারসেপশন'। আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা ডিটেলে দেখতে চাই বলে তার বাইরের অনেক কিছু খেয়াল করি না। ম্যাজিশিয়ানরা সেটা কাজে লাগায়। কিন্তু সম্পায়নের ক্ষেত্রে সবই অন্যরকম। সম্পায়নের এই বিরল ক্ষমতার পরিচয় অনিলিখা পরেও অনেক পেয়েছে। কিন্তু এই বিরল ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কি সম্ভব ছিল না? ওর মতো একজনকে শেষে গাড়ি চালাতে হচ্ছে?

চা খেতে খেতে আরও খানিকক্ষণ গল্প হল। তারপর ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পড়াশোনা বিশেষ ভালো না লাগায় আর একই সঙ্গে বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না হওয়ায় বি.এস-সি পড়তে গিয়ে আর শেষ করা হয়নি সম্পায়নের। প্রথমে একটা বাসের কন্ডাক্টারি করত। তারপর আস্তে আস্তে ড্রাইভিং শিখে নেয়। এখন একটা অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে গাড়ি চালায়। যেদিন ইচ্ছে হল চালাল, যেদিন ইচ্ছে হল না চালাল না। পুরো স্বাধীনতা থাকে।

গাড়ি চালাতে চালাতে সম্পায়ন বলতে থাকল,—জানো তো, খুব বেশি মনে রাখা আদৌ ভালো না। আমি বাসের কন্ডাক্টারি কেন ছেড়ে দিলাম জানো?

—কেন?

—একটা অ্যাক্সিডেন্ট। শ্যামবাজারের কাছে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। পাড়ার এক মাঝারি মানের নেতা বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তারপর যা হয় আর কী—বাস ভাঙচুর, আগুন। কোনওরকমে বেঁচে যাই। আমি তারপর আর কন্ডাক্টরি করিনি।

—হ্যাঁ, কলকাতার লোকজন কার দোষ তা আর দেখবে না। যাকে হাতের সামনে পাবে, —। বলে উঠল অনিলিখা।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল সম্পায়নের!

—আমার যে একেবারে দোষ ছিল না, তা নয়। বাস ছেড়ে দিচ্ছিল। লোকটা ছুটে আসছিল, আমি হাত ধরে তুলতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ—

—সে তো হতেই পারে। হাত ফসকে—

—না, ঠিক তা নয়। কাছে আসতেই তাকালাম। তখনই হঠাৎ মুখটা মনে পড়ে গেল। বেশ কয়েকবছর আগে দমদমের একটা কলেজে ইলেকশান নিয়ে একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল হয়েছিল। দুজন ছাত্র আর প্রিন্সিপাল খুন হয়। তার পিছনে যে ছিল তার ছবি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু তাকে ধরা আর যায়নি। পালিয়েছিল। সেদিন সেই লোকটার মুখটা নজরে পড়তেই আপনা থেকে হাতের মুঠি আলগা হয়ে গিয়েছিল।

—মানে? তুই চিনতে পেরেছিলি? ইচ্ছে করে হাত ছেড়ে দিয়েছিলি? অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে।

তার কোনও উত্তর না দিয়ে সম্পায়ন বলল,—তুমি যদি চাও অনিলিখাদি, তোমার গাড়ি আমি রোজ চালিয়ে দেব। অ্যাসোসিয়েশনেও তাই জানিয়ে দেব। এক হাতে গাড়ি থাকবে। এসব দামি গাড়ি পাঁচজনের হাতে পড়লে কিছুদিনেই দফারফা।

অনিলিখা চুপ করে রইল। গাড়ি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে চলল।

৬

ডাঃ মিলার গাড়ি থেকে গলফ কিটটা বের করে গলফ কোর্সের দিকে এগোচ্ছিলেন। উনি আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিসিস-এর হেড। হঠাৎ ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। ডাঃ ম্যাক্স ফোন করেছেন। এই সময়? ছুটির দিনে? একটু বিরক্ত হয়েই ফোনটা ধরলেন মিলার। ফোনের উলটোদিকে ডাঃ ম্যাক্স বলে উঠলেন—

—মিলার, একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের ল্যাবরেটরি থেকে X1-এর ভায়াল কাল রাতে চুরি গেছে।

—মানে? ওটা সাবধানে বায়ো হ্যাজার্ড ফ্রিজারে রাখা ছিল না?

—ছিল তো বটেই। সব রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল। বায়োমেটিক স্ক্যানিং-এ যা কিছু হতে পারে। রেটিনা স্ক্যান, জেনেটিক স্ক্যান, তা সেসব পেরিয়ে—

—সিকিউরিটি ক্যামেরায় কিছু ধরা পড়েনি?

—না, সেটা কেউ একঘণ্টার জন্য অচল করে দিয়েছিল।

—তা হলে নিশ্চয়ই কোনও ভেতরের লোক।

—হ্যাঁ, সে আর বলতে? আট জনের অ্যাকসেস ছিল। আট জনই এখানকার সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট।

—বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয়?

—বিশেষ একজনকে সন্দেহ হয়। তবে এখনই আমি তার নাম বলতে চাই না। উপযুক্ত তদন্ত হোক।

—কিন্তু তার জন্য তো সময় লাগবে!

—আমাদের হাতে একমাস সময় আছে। চুরি যাওয়া ভাইরাস X1 দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। ওটা অকেজো করা আছে। তবে X1-এর মতো ভাইরাস নতুন করে তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য অন্তত একমাস সময় লাগবে। কেমিক্যাল কম্বিনেশনগুলো ব্যবহার করে নতুন ভাইরাস তৈরি করতে উন্নত প্রযুক্তিও লাগবে। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে টেররিস্টদের হাতে গেলে খুব বড় বিপদ।

—যদ্দূর মনে পড়ছে X1 তো সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের ডেঞ্জারাস স্ট্রেনটা—তাই তো! এর থেকে কতটা বিপদ হতে পারে?

—মোটামুটি 90% ক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যু। আর এই ভাইরাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে খুব দ্রুত।

—এই ভাইরাস তোমরা তৈরি করেছিলে কীভাবে?

—মনে আছে 2010-এ সারা পৃথিবী জুড়ে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল! মেক্সিকো থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা দেশে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভাইরাসটা তেমন ডেঞ্জারাস ছিল না। খুব কম লোকই মারা গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসব তো সবাই জানে। তারপর?

—আমরা টেক্সাস ইউনিভার্সিটির ল্যাবে এরপরে ওই ভাইরাসের উপর বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। অ্যানথ্রাক্স-ইবোলা আর ওই বার্ড ফ্লু ভাইরাস একই সঙ্গে শিম্পাঞ্জির দেহে প্রয়োগ করি। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে হঠাৎ এই নতুন X1 ভাইরাস তৈরি হয়, যা শুধু মারাত্মক রকম সংক্রামক তা-ই না, যার মধ্যে যায় 90% ক্ষেত্রে তাকে মেরে ফেলে। এই হল X1-এর ইতিহাস।

—তা, তোমাদেরই তৈরি ভাইরাস যখন, ভ্যাকসিনও নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আছে?

—না, সেটাই সমস্যা ডক্টর মিলার, আমরা এখনও অব্দি এর কোনও ভ্যাকসিন বের করতে পারিনি। আর তাই এই বিশেষ ভাইরাস স্ট্রেনটাকে অকেজো করে অত্যন্ত সুরক্ষিত

অবস্থায় রাখা ছিল। সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—এতটাই সুরক্ষিত যে, কাল রাতে তা চুরি গেল আর তার বারো ঘণ্টা পরে তুমি বলছ যে একজনকে সন্দেহ করছ। ননসেন্স। শোনো ডক্টর ম্যাক্স, ইমিডিয়েটলি তোমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যেকের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করো। আমি ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাডভাইসারি বোর্ড ফর বায়োসিকিউরিটি আর ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের সঙ্গে আলোচনা করছি। প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট চাই। ওকে?

ডক্টর ম্যাক্সের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ওকে।

৭

আগামী 24 জুন ওয়েলস-এর নিউপোর্ট-এ ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্স হচ্ছে। আমরা আপনাকে এই সায়েন্স কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করার অনুরোধও জানাচ্ছি...'

ক্যুরিয়ার পাওয়া চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল অনিলিখার। ভারতে থাকা সত্ত্বেও তাহলে ওর রিসার্চ দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের চোখে পড়েছে। এ ধরনের কনফারেন্সে যাওয়ার প্রধান সুবিধে হল দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা কোথায় কী নিয়ে গবেষণা করছেন তা জানা যায়। প্রথম সারির বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় একই গবেষণা একই পথে এগোচ্ছে। সেখানে আলাদা আলাদা টিমের মধ্যে তথ্য বিনিময়—কোলাবরেশানের সুযোগ থাকে।

কনফারেন্সের তরফ থেকে থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করছে। অনিলিখাকে শুধু যাতায়াতের টিকিটের খরচ দিতে হবে।

চট করে ক্যালেন্ডার চেক করে নিল অনিলিখা। নাহ, তেমন কোনও অসুবিধে হবে না। তিনদিনের কনফারেন্স। যাতায়াত নিয়ে আরও দুদিন। মনসুর তার দিন দশেক বাদে আসবে। তাই ওই সপ্তাহে বিশেষ কোনও অসুবিধে নেই।

অনিলিখার হঠাৎ মনে হল মিঃ পাই যদি যান কনফারেন্সটায় তাহলে খুব ভালো হয়। উনি যে মানের কাজ করছেন তা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্যই পৌঁছোনো দরকার। সবার জানা দরকার। কিন্তু উনি কি যাবেন? মিঃ পাই-কে বাড়ির নাম্বারে ফোন করল অনিলিখা। ওনার কোনও মোবাইল ফোন নেই। মোবাইল নেই কেন—অনিলিখা জিগ্যেস করতে বলেছিলেন,—সারাদিন তো ল্যাবেই কাটাই। আমার আবার মোবাইল ফোনের কী দরকার?

বাড়ির নাম্বারে কয়েকবার রিং হওয়ার পর উলটোদিক থেকে গণেশের গলা পাওয়া গেল।

—সায়েন্স কনফারেন্স? স্যার ওসব একদমই পছন্দ করেন না। বলেন কনফারেন্সে যা আলোচনা হয় তা সব ছ'মাস আগের পুরোনো বিষয়। রিসেন্ট রিসার্চ নিয়ে কেউ আলোচনা করতে চায় না। তাও বলে দেখব স্যারকে।

—তা, স্যার এখন কী করছেন?

—উনি খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত। আজকের কাগজটা দেখেছেন? আনন্দবাজার?

—কেন? কোন খবরটা?

—একটা বাচ্চা মেয়ে আর তার ভাই একটা কিডন্যাপিং গ্যাং-এর খপ্পরে পড়েছিল। ট্রেনে করে কোথাও পাচারের চেষ্টা চলছিল। রেল পুলিশ উদ্ধার করে। স্যার সেই খবরটা দেখে খুব উত্তেজিত।

—তাই? কিন্তু এ ধরনের খবর তো হামেশাই থাকে।

—এ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মেয়েটা ওর ভাইকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। স্টেশনে কিডন্যাপড হয়। মেয়েটার বয়স বছর তেরো। ভাই-এর বয়স না কি বছর এগারো। কিন্তু ভাইটাকে দেখে মনে হয় বছর দুয়েকের। খুব রেয়ার কোনও অসুখে ভুগছে। তাই কোনও গ্রোথ হয়নি। কোনও এজিং-ও হয়নি। মানে, বয়সই বাড়েনি যেন। ছেলেটার ছবি দেখে স্যার খুব উত্তেজিত। আজ সারাদিনে কতজনের সঙ্গে যে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে তা কী বলব। উনি ওদের বাবার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ছেলেটাকে উনি এখানে নিয়ে আসতে চান। একটা ফার্মা কোম্পানির সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন স্যার। ওনার ধারণা ছেলেটার জিনে এমন কিছু আছে যা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

খুবই অসুস্থ ছেলেটা। কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। বুঝতেই পারছেন, তাদের সীমিত ক্ষমতায় দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। স্যার এ ছেলেটার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করতে চান। কী কাণ্ড বলুন তো! তা এসবের মধ্যে স্যার কি আর কনফারেন্সে যেতে চাইবেন?

—ঠিক আছে। যদি দরকার হয় আমিও ছেলেটার চিকিৎসার জন্য সাধ্যমতো সাহায্য করব। মিঃ পাইকে সেরকম বলে দিও।

ফোনটা ছেড়ে খানিকক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকল অনিলিখা। অনেক সময় নিজের আনন্দের মুহূর্তে অন্যের দুঃখ যেন আরও বেশি করে ছুঁয়ে যায় অনিলিখাকে। এত কম বয়সে একজনকে হেরে যেতে হবে মৃত্যুর কাছে! কিছু কি করা যায় না? দেশবিদেশে অনেক বন্ধু ছড়িয়ে আছে অনিলিখার। কার-কার সঙ্গে এ ব্যাপারে চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করা যায়, একটা খাতায় লিখে রাখল অনিলিখা। আজকেই সময়মতো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও।

তারপর ফেসবুকে মনসুরের জন্য একটা মেসেজ রাখল অনিলিখা। ও 25 জুন থেকে জুলাই-এর 3 তারিখ অব্দি ভারতের বাইরে থাকবে সেটাই জানিয়ে রাখল। নিউপোর্টে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্সে যাবে তাও জানাল। মনসুর ঠিক কবে ভারতে আসবে তা যেন জানায়।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল অনিলিখা। মনসুরকে অফলাইন দেখাচ্ছে। তবু যদি মেসেজটা দেখে। নাহ, কোনও উত্তর এল না। অনিলিখা একটু অপেক্ষা করে ফেসবুক থেকে বেরিয়ে গেল। প্লেনের টিকিট বুক করতে হবে। কয়েকদিন ছুটির জন্য অফিসে অ্যাপ্লাই করতেও হবে। মাঝে বেশিদিন নেই।

৮

কলকাতা থেকে দুবাই। দুবাই থেকে লন্ডন। এমিরেটসের ফ্লাইট। বিজনেস ক্লাসেই আজকাল বেশি যাতায়াত করে অনিলিখা। প্লেনে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। যাত্রার ক্লান্তি থাকে না। দুবাইয়ে দু-ঘণ্টার গ্যাপ। লাউঞ্জে মেল, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চেক করতে গিয়ে দেখল মনসুরের কাছ থেকে মেসেজ এসেছে।

আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স। আমিও ওয়েলসে এসেছি। কার্ডিফে আছি। নিউপোর্টের কাছেই। তোমার কনফারেন্স কোথায় হচ্ছে পৌঁছে জানিও। গিয়ে দেখা করব।

মনসুরের কমন সেন্স কম। এতটা মেসেজ রাখতে পেরেছে, আর ফোন নাম্বারটা রাখতে পারেনি! তাহলে লন্ডন পৌঁছেই ফোন করা যেত। অ্যাড্রেসটাও দিতে পারত। মোটে তিনদিন থাকবে অনিলিখা। এর মধ্যে ওখানে যাওয়ার জন্য অতটা সময় বের করা সম্ভব হবে কিনা কে জানে!

প্লেন লন্ডন পৌঁছোল ভোরবেলা—সাড়ে ছ'টার নির্দ্ধারিত সময়ের মিনিট কুড়ি আগে। ইমিগ্রেশন করে ব্যাগ নিয়ে বেরোতে বেরোতে আরও একঘণ্টা। জুনের লন্ডন। ভারি মনোরম। বাইশ ডিগ্রি উষ্ণতা। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। একুশে জুন উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন। সবে গেছে, তাই এখনও দিন বেশ প্রশস্ত। লন্ডনের পরিচিত মেঘলা আকাশ আজ নেই। অবশ্য হঠাৎ কখন মুখ ভার করবে আর মেঘে ছেয়ে যাবে কে জানে! এখানে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা একটু বেশি। এই রোদ, এই বৃষ্টি। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে অনিলিখা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

ট্যাক্সিতে নিউপোর্ট আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। পৌঁছোতে পৌঁছোতে সকাল দশটা। গিয়েই সোজা কনফারেন্স। আজকের কনফারেন্সের অ্যাজেন্ডাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অনিলিখা। বেশ কয়েকটা ইন্টারেস্টিং সেশন। সাধারণের জন্যও বেশ কয়েকটা ইভেন্ট আছে। যেমন সায়েন্স ফর থ্রি মিনিটস। তিন মিনিটের মধ্যে বিজ্ঞানের যে-কোনও টপিকের ওপর বলতে হবে। এই

ইভেন্টে যে কেউই অংশগ্রহণ করতে পারে। বিচারকদের বিচারের উপর নির্ভর করে যে তিনজন প্রথম হবে তাদের বিনা খরচে নাসাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

তা ছাড়া কনফারেন্সে সাধারণের জন্য নানা বিজ্ঞান নির্ভর খেলার ব্যবস্থা আছে। মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর বিজ্ঞানীদের সাধারণের কাছাকাছি নিয়ে আসা। যারা ল্যাবরেটরিতে সারা জীবন কাটান—তাদের দাঁড় করানো হয় স্কুল ছাত্রদের সামনে। যাতে স্কুল পড়ুয়ারা বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়। অনিলিখার মনে হয় ভারতেও কি এরকম কনফারেন্স করা যায় না? সৎ উদ্দেশ্যের সত্যিই অভাব।

এসব ভাবতে ভাবতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অনিলিখা। মোটরওয়ে M4 দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। নীল আকাশের তলায় ঝলমল করছে মাইলের পর মাইল জোড়া হলুদ সর্ষের খেত। সবুজ আর হলুদ চাদরে মোড়া ছোট ছোট টিলা-উপত্যকা পাশে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর এই প্রান্তে বছরের এই সময়টাতে গাছে রঙের বাহার বেশি।

এসব দেখতে দেখতে গাড়ি মোটরওয়ে ছেড়ে নিউপোর্টে ঢুকল। আকাশ মেঘলা করে এসেছে। অনিলিখাকে যেতে হবে কার্লিয়নে। কার্লিয়ন নিউপোর্টের মধ্যেই। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ওয়েলসের কার্লিয়ন ক্যাম্পাসে কনফারেন্স। ওর কাছেই কেলটিক ম্যানর বলে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা।

নিউপোর্টে ঢুকেই মনে হয় অনেক পুরোনো শহর। রাস্তার দু-ধারের ভিক্টোরিয়ান হাউসগুলোর বয়স একশো বছর পেরিয়েছে। পোর্ট সিটি। রাস্তায় অনেক পাকিস্তানি ও মিডল ইস্ট-এর লোকেদের মুখ নজরে পড়ল। শহরের প্রান্তের দিকে কার্লিয়ন। পাহাড়ি জায়গা উচ্চবিত্তের বসতি। আসার আগে অনিলিখা কার্লিয়ন নিয়ে একটু পড়াশোনা করেছিল।

কার্লিয়নের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো। অগাস্টাসের সময় বিশ্বজুড়ে থাকা তিরিশটা রোমান লিজিয়নের একটা লিজিয়ন কার্লিয়নে থাকত। এক লিজিয়ন মানে পাঁচ হাজার সেনা, তাদের পরিবার-পরিজন। তাই এখানে রোমান ব্যারাক, অ্যাম্ফিথিয়েটার, রোমান বাথ—রোমান স্থাপত্যের অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। গাড়িতে যেতে যেতে অনিলিখা দেখছিল যে ছোট ছোট সাইনবোর্ডে তির চিহ্ন দিয়ে এসব জায়গায় ডিরেকশান দেওয়া আছে। সরু পাহাড়ি পথ। পাক খেয়ে খেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠেছে। কার্লিয়ন সিটি সেন্টার পেরোনোর পরেই ডানদিকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস।

রাস্তায় গাড়ির সার। এত ছোট শহর এত বড় কনফারেন্সের বোঝা সামলাতে যে হিমশিম খাচ্ছে তা স্পষ্ট। ট্রাফিক শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে। পৌঁছোতে পৌঁছোতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

ইউনিভার্সিটির ভেতরের রাস্তায় প্রচুর লোকের ভিড়। সারা বিশ্বের সায়েন্টিস্টরা এসেছেন। চোদ্দোজন নোবেলবিজয়ীও আছেন নিমন্ত্রিতের লিস্টে। কনফারেন্সের কোথায় কী সেশন হচ্ছে তা বোঝানোর জন্য জায়গায় জায়গায় ম্যাপ দেওয়া আছে। হেল্পডেস্ক আছে। সেরকই একটা হেল্পডেস্ক-এর দিকে অনিলিখা এগোতে যাচ্ছিল—হঠাৎ টাকমাথা, প্রায় সাড়ে দু-ফুট লম্বা একজন এগিয়ে এল। ঠিক প্রফেসার সুলভ চেহারা।

—আর ইউ অনিলিখা? আই অ্যাম প্রফেসর ম্যাক্স। বেশ কয়েকটা টপিকে আপনার নাম ডিসকাশন প্যানেলে দেখলাম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনি সাইবার সিকিউরিটিতে বিশেষজ্ঞ। আমার বিষয় ন্যানোটেকনোলজি। নাসার সঙ্গে যুক্ত আছি। আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে। চলুন কফি খাওয়া যাক।

৯

সকাল আটটা। জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ছ'টা-তেও রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল। হঠাৎ মেঘ আর বৃষ্টি। কাচের দরজার বাইরে তাকিয়ে ডাঃ ম্যাক্স ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। খানিকবাদেই কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য বেরোতে হবে। তাই রেডি হয়েই আছেন।

পাঁচ মিনিটের পথ। সাড়ে আটটায় পৌঁছোতে হবে। অধৈর্য হয়ে ফোন করতে যাবেন, ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। ফোনটা ধরেই চেনা কণ্ঠস্বর-এর জন্য অপেক্ষা করলেন।

উলটোদিক থেকে শোনা গেল,—ডক্টর ম্যাক্স?

—হ্যাঁ, বলছি। বলো।

—মনসুর খুব সম্ভবত ওয়েলসেই আছে।

—তা, এত কাছে?

—হ্যাঁ, আমরা ওর সব মুভমেন্ট ট্রান্স্যাকশান ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি। পুলিশ সঙ্গে আছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও সতর্ক করে দিয়েছি। আমাদের ধারণা ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে মনসুরের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। কীভাবে তা জানি না। পারলে আপনি একবার ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলুন।

—কাল কথা বলেছি। আজকেও বলব। তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। আজকের মধ্যেই ওকে ধরা চাই। জীবিত বা মৃত। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে।

—ওকে, স্যার।

ফোনটা ছেড়ে এবার ডাঃ মিলারকে ফোন করলেন ডাঃ ম্যাক্স।

—ডাঃ মিলার, যা সন্দেহ করেছিলেন সেটাই সত্যি। ওই ভাইরাস চুরির সঙ্গে আমাদের ওখানকার এক সায়েন্টিস্ট যুক্ত আছেন। কাল রাতে ল্যাবে অনুপ্রবেশকারীর রেটিনা স্ক্যান আর

জেনেটিক স্ক্যানের রিপোর্ট ওই সায়েন্টিস্টের সঙ্গে মিলে গেছে।

তা, সে সায়েন্টিস্ট কাস্টোডিতে তো? ভাইরাসের ভায়ালটা পাওয়া গেছে?

—না, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। ঘটনার পরপরই সে নিখোঁজ। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে উধাও। খবর পেলাম এখন ওয়েলসে আছে।

—তা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড—ইন্টারপোলকে জানিয়েছে?

—হ্যাঁ সবাই এখন একসঙ্গে কাজ করছে CIA-এর সঙ্গে। আশা করছি কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ভালো খবর দিতে পারব।

—গুড। খুব সাবধানে কাজ করো। তা তুমি এখন কোথায়?

—ওই যে বলছিলাম, নিউপোর্টে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্সে। তবে পুলিশ পুলিশের কাজ করে যাচ্ছে। আমার তো ওদের কাজে সরাসরি সাহায্য করার কিছু নেই। বরং এখানে আমার একটা সুবিধে হয়েছে। এই কনফারেন্সে একজন মহিলা সায়েন্টিস্ট এসেছে। ইন্টেলিজেন্সের খবর সে-ও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে। খবর পেয়েছি তার সঙ্গে আমাদের এই সায়েন্টিস্ট-এর যোগাযোগ ছিল।

—ওই সায়েন্টিস্ট, ওই সায়েন্টিস্ট না বলে নামটাই বলো না।

—মনসুর। মনসুর মোহাম্মেদ।

ফোনটা ছেড়ে ব্লেজারটা পরে নিলেন ডঃ ম্যাক্স। এবার বেরোতে হবে। বৃষ্টি থেমে আবার রোদ উঠেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে দূরের উপত্যকা আর অন্য পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। দু-দিকের সবুজ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আস্ক নদীর জলধারা ধীর স্রোতে বয়ে চলেছে। ডঃ ম্যাক্সের অবশ্য এই মুহূর্তে ধীরেসুস্থে কিছু করার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। যা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে।

১০

গতকাল সারাদিন অনিলিখার খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। পুরোদিন কনফারেন্স। অসাধারণ সব সেশন। দুটো সেশনে ডিসকাশন প্যানেলে অনিলিখা নিজে বক্তা হিসেবে ছিল। বাকিগুলোতে শ্রোতা হিসেবে। সবথেকে ভালো লেগেছে ব্রেন সায়েন্সের উপর সেশনগুলো। আমাদের ব্রেন কীভাবে কাজ করে সত্যিই তার অনেকটাই এখনও অজানা।

ফাংশানাল ব্রেন ম্যাপিং টেকনিকের সাহায্যে ব্রেনের কোন অংশ কীভাবে কাজ করে বিজ্ঞানীরা তা এখন বোঝার চেষ্টা করছেন। রাগলে ব্রেনের কোন অংশ উদ্দীপ্ত হয়, হাসলে কোন অংশ উদ্দীপ্ত হয়, অঙ্ক করার সময় কোন অংশ কাজ করে, গভীরভাবে চিন্তা করার সময় কোন অংশ উদ্দীপ্ত হয়—এই সবের ওপরে অনেক রিসার্চ হচ্ছে। অনেক কিছুই যেমন

জানা গেছে, অনেক কিছু এখনও অজানা। মানুষই একমাত্র জীব যার ক্ষেত্রে কনসাশনেস বা নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি বোঝাতে ব্রেনের প্রত্যেকটা অংশই একসঙ্গে কাজ করে। দুরূহ বিষয়।

মাইন্ড কন্ট্রোলের ওপরেও একটা খুব আকর্ষণীয় সেশন ছিল। 1950 সালে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্কিনার বলেন সে সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য মানুষের ব্যবহার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকা দরকার। সেখানে উনি নিজেই মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনিক ব্যবহার করেন। অপরাধীদের ওপর এই টেকনিক প্রয়োগ করেন যাতে তারা আর অপরাধ না করে। ওনার গবেষণার উপরে পরে অনেক বিধিনিষেধ এলেও CIA কিন্তু এই একই টেকনিক তাদের প্রোজেক্ট এম. কে আল্ট্রা-তে প্রয়োগ করে, যাতে মানুষের মনকে ইচ্ছে মতো কন্ট্রোল করা যায়। এই টেকনিককে সহজ কথায় বলা যায় ব্রেন ওয়াশিং। বর্তমানে পার্কিনসনস অসুখের প্রতিরোধেও ব্রেনকে সক্রিয় করার জন্য এই একই টেকনিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে ব্রেনকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

যে-কোনও রিসার্চের ভালো-খারাপ দু-দিকই আছে। যদি এ ধরনের টেকনিক টেররিস্টদের হাতে চলে যায় তাহলে কি ওরা এর সাহায্যে ওদের চরমপন্থী ধারণা অনেকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে না? হয়তো ভবিষ্যতে এরকমই হবে।

কাল রাতে মনসুর ওর কার্ডিফের অ্যাড্রেস অনিলিখাকে জানিয়েছে। কার্ডিফ বে-এর কাছে। কার্লিয়ন থেকে একঘণ্টার পথ। অনিলিখার ইচ্ছে আছে সন্ধেতে ট্যাক্সি নিয়ে কার্ডিফে যাওয়ার। মনসুরের সঙ্গে দেখাও হবে আর কার্ডিফটাও একটু ঘুরে দেখা যাবে।

ভোরবেলা উঠে বেরিয়েছিল কার্লিয়ন সিটি সেন্টার দেখতে। হাঁটা পথ। মাথার উপরে নীল আকাশ। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কিছু কালো মেঘের টুকরো আছে। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতেও পারে। সেরকম ভাবে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিল অনিলিখা। রেন কোট আর টুপি নিয়ে। এখানে বৃষ্টি আর হাওয়ায় ছাতা বিশেষ কাজ দেয় না। রাস্তায় বেরিয়েই বুঝেছে যে ওর মতো কনফারেন্সে আসা অনেকেই ভোর ভোর কার্লিয়ন দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। সিটি সেন্টারটা খুব ছোট। একটা ছোট মাঠ ঘিরে কিছু দোকান। একটা 'সেনসবেরি' সুপার মার্কেট, হেয়ার কাটিং পার্লার, একটা রেস্টুরেন্ট-কাম-পাব, হাসপাতাল, একটা ফিশ-অ্যান্ড-চিপস-এর দোকান, একটা ডাক্তারখানা, একটা পুরোনো জিনিসের দোকান, একটা হাইস্কুল—ব্যস, এই সব মিলিয়ে একটা ভারি সুন্দর ছিমছাম সিটি সেন্টার। সিটি সেন্টারের চারধারে পুরোনো কার্লিয়ন। দু-হাজার বছর পিছনে ফেলে আসা রোমানদের কার্লিয়ন। পাথরের ফুটপাথ, দেওয়াল।

সিটি সেন্টার বাঁদিকে ফেলে রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা। ভারি সুন্দর জায়গাটা। পাহাড় সবুজ উপত্যকার মধ্যে দু-হাজার বছরের পুরোনো অ্যাম্ফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। পাথরের ওপর ধাপ ধাপ করে বসার জায়গা। মাঝখানে গোলাকার নীচু জায়গা। ওখানেই আগে নানা অনুষ্ঠান, গ্ল্যাডিয়েটার ফাইট, সৈন্যদের ট্রেনিং এসব হত। আর চারদিকে বসা রোমান জনতা উল্লাসে লড়াই আর মৃত্যুর আনন্দ দেখত। গা শিরশিরিয়ে উঠল অনিলিখার। চারদিকের প্রকৃতির নিভৃত প্রশান্তি—সবুজে ঢাকা পাহাড় —দূরে আস্ক নদীর ক্ষীণ জলধারা অতীতের এই হিংস্রতাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অনিলিখা। হঠাৎ খেয়াল করল দুজন পুলিশ অফিসার ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

একজন অফিসার এগিয়ে এসে কোনও ভণিতা না করেই বলতে শুরু করল,—আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—কেন?

গাড়িতে উঠুন বলছি। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেব। কথায় আদেশের সুর।

পকেট থেকে একটা ফটো বের করে পুলিশ অফিসারটা বলে উঠল,—আপনি একে চেনেন?

—হ্যাঁ, এ তো মনসুর। আমার বন্ধু।

—হি ইজ আ সাসপেকটেড টেররিস্ট। আমাদের ধারণা আপনি জানেন ও কোথায় আছে। অ্যাড্রেসটা বলুন।

কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল অনিলিখা। তারপর আস্তে আস্তে বলে উঠল,—আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। ও নাসার সঙ্গে যুক্ত আছে। নামকরা সায়েন্টিস্ট।

পুলিশ অফিসার রূঢ়ভাবে বলল,—দেখুন আমরা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া আপনার কাছে আসতাম না। ইমিডিয়েটলি আমাদের ওর অ্যাড্রেসটা জানান। সবথেকে বড় বিপদ কাদের জানেন? ভারতীয়দের। ও আপনাদের দেশের ওপর টেররিস্ট অ্যাটাক করতে চলেছে। আমরা কিছু মেসেজ ইনটারসেপ্ট করে জেনেছি, ও এক মিলিট্যান্ট গ্রুপের সদস্য। ওর সঙ্গে একটা মারাত্মক ভাইরাস আছে। আমেরিকার একটা ল্যাব থেকে ও চুরি করেছে। সেটা দিয়েই অ্যাটাক করতে চায়। তাড়াতাড়ি না ধরতে পারলে এদেশেও ওই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে।

এর পরে আর অ্যাড্রেস না দিয়ে পারা যায় না। কালকে ফেসবুকে পাওয়া অ্যাড্রেসটা দিয়ে অনিলিখা পুলিশের গাড়িতে উঠে বসল। থানায় গিয়ে মনসুর সম্বন্ধে ওর জানা যাবতীয় ডিটেলস দিতে হবে।

১১

মনসুর পলাতক। অনিলিখার দেওয়া অ্যাড্রেসে গিয়ে পুলিশ মনসুরকে খুঁজে পায়নি। অনিলিখার আগেই বোঝা উচিত ছিল, যে এত বছরে কোনও যোগাযোগ করেনি, সে হঠাৎ করে কেন ফেসবুকে যোগাযোগ করবে। তাও আবার ভারতে আসার জন্য। তা ছাড়া একটা ভুল নামের আশ্রয় নিয়ে।

অনেকটা সময় পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদে কেটেছে। এমনকী অনিলিখার পাসপোর্ট-ও ওরা আটকে রেখেছে। যাতে অনুমতি ছাড়া দেশ ছেড়ে অনিলিখা বেরোতে না পারে। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্সের অধিকর্তা ডেভিড ব্রাইট কথা দিয়েছেন ওনার পারসোনাল বন্ডে আগামীকাল পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ঘটনা হল এই মুহূর্তে অনিলিখা এই দেশ ছেড়ে বেরোতে পারবে না।

সারাদিন এসব ঝামেলা ও চিন্তার মধ্যে আজ কনফারেন্সও অ্যাটেন্ড করতে পারেনি অনিলিখা। সন্ধেতে কনফারেন্সের ডিনার টেবিলে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হতে সবাই জানতে চাইছিল যে অনিলিখা সারাদিন কোথায় ছিল। অনিলিখা কিছুই বলেনি। ডিনার টেবিলে সব খাবারই কেমন বিস্বাদ লাগছিল। লোক চেনায় এত বড় ভুল! সত্যিই যদি এরকম কিছু হয়। মনসুর যদি এরমধ্যেই ভারতে চলে গিয়ে থাকে!

হোটেলে ফিরে প্রথমেই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চেক করল অনিলিখা। আর দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল। মনসুরের মেসেজ—'এজন্যই তোমাকে আসল অ্যাড্রেস দিইনি। জানতাম পুলিশের রেড হতে পারে। মনে রেখো আমি তোমার থেকে খুব একটা দূরে নেই। তোমার ওপর আমার রাগ নেই। শত্রুতাও নেই। কিন্তু তোমার দেশকে আমি ধ্বংস করে দেব। দেখব কী করে তুমি আমার ভারত যাওয়া আটকাও। কীভাবে ভারতকে বাঁচাও। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেই আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছে। তাই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কেউই ভারতকে বাঁচাতে পারবে না।'

পুলিশ থেকে অনিলিখাকে বলেছিল কোনও ধরনের ফেসবুক মেসেজ এলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে। অনিলিখা পুলিশ অফিসার সাইমনকে ফোন করে ওর ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সব ডিটেলস জানিয়ে দিল। ওদের পক্ষে আই পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করা শক্ত হবে না। অনিলিখা নিজেও জানে এটা কী করে করা সম্ভব। কিন্তু এখানে ও নিজে সন্দেহের তালিকায়। দূরত্ব রাখাটাই ভালো।

হঠাৎ অনিলিখার ফোনটা বেজে উঠল। ভারত থেকে ফোন। ধরতেই মিঃ পাই-এর গলা। অনিলিখার ভারতের নাম্বারটা ইন্টারন্যাশনাল রোমিং-এ আছে।

মিঃ পাই-এর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর,—অনিলিখা গণেশের কাছ থেকে শুনলাম মনসুরকে নাকি পুলিশ টেররিস্ট হিসেবে সন্দেহ করছে। কয়েকটা জিনিস বলে রাখি। হয়তো তোমার কাজে লাগবে। টেক্সাস ইউনিভার্সিটির যে ল্যাবের সঙ্গে মনসুর যুক্ত ছিল সেখানে কিন্তু ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে এ ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ধরেই রিসার্চ হচ্ছিল। আমি বেশ কিছু রিসার্চ পেপার দেখেছি। বুঝতেই পারছ, তার ওপর নির্ভর করে আমি আমার মতো কিছু সম্ভাবনা দেখছি।

এক, কীভাবে ওই একই ভাইরাস কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায়, তার উপরে মনসুর কিন্তু অনেকদিন ধরেই রিসার্চ করছে। অর্থাৎ ওকে ধরলেই শুধু হবে না, ওই ভাইরাসের ভ্যাকসিনও তৈরি করতে হবে। বিপদ কার মাধ্যমে আসবে বলা মুশকিল।

দুই, এই ভাইরাসটা বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, অন্য ফ্লু ভাইরাসের মতোই। তাই বন্ধ জায়গায় প্রয়োগ করলে তার ফল হবে মারাত্মক। ধরো কলকাতার মেট্রো। এয়ারবর্ন ভাইরাস। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে মেট্রোর মধ্যে থাকা একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। পাঁচ-ছ'মিনিটের মধ্যে মেট্রোর মধ্যে থাকা সবাইকে সংক্রামিত করবে। জলসরবরাহে মিশিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে।

চুপ করে মিঃ পাই-এর কথা শুনছিল অনিলিখা। এবার বলল,—মিঃ পাই, আমাকে কী করতে বলছেন? আমার কী করার আছে?

—যে করেই হোক এই ভাইরাসের ভারতে আসা তোমাকে আটকাতে হবে। ভাবতে পারছ এ ভাইরাস এলে কয়েকদিনের মধ্যে কোটি কোটি লোক মারা যাবে। আর এরা কিন্তু ভারতকেই টার্গেট করছে। এরকম কিছু লোক ভাইরাস নিয়ে ভারতে এলেই হল!

ফোনটা ছেড়ে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল অনিলিখা। তারপর নিজেই দেখতে শুরু করল মেসেজটার আই পি অ্যাড্রেস। কয়েকটা ফোনও করল। বের করতে বেশি সময় লাগল না। চেপস্টাও কার্লিয়ন থেকে কুড়ি মাইল। রাত এখন আটটা। এখনই যাবে কি? পুলিশ অফিসার সাইমনকে ফোন করল অনিলিখা।

ফোনে সাইমনের গলা,—আপনি নিশ্চিত? আমাদের এক্সপার্টরা কিন্তু এখনও ঠিকমতো ট্রেস করতে পারেনি।

—হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। আপনি আমার প্রোফাইলটা দেখলেই জানতে পারবেন যে আমি যা বলছি তা আপনার চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত।

অনিলিখার কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে সাইমন বলল,—ঠিক আছে। আমরা এক্ষুনি টিম পাঠাচ্ছি ওই অ্যাড্রেসে।

—শুধু আপনারা নন। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। আমি মনসুরের সঙ্গে ফেসবুকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। আমার ধারণা ও ফের অনলাইন হবে। আর তখনই পিন পয়েন্ট করতে সুবিধে হবে।

—এতে যে আপনার লাইফ রিস্ক আছে, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

—হ্যাঁ, জানি। কিন্তু যেখানে আমার দেশের একশো কোটির লাইফের রিস্ক আছে, সেখানে আমাকে এইটুকু রিস্ক নিতেই হবে।

১২

উলটোদিক থেকে ছুটে আসা গাড়ির আলোগুলোই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে গাড়িটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। কার্লিয়ন থেকে চেপস্টাও-এর রাস্তা পুরোটাই পাহাড়ি। সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা এতটাই সরু যে একটা গাড়ির পক্ষেই যাওয়া মুশকিল। দু-ধারে কাঁটাঝোপ। আর তার মধ্যে দিয়েই মাঝেমধ্যে উঁকি মারছে বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর।

গাড়ি চালাতে চালাতে সাইমন বলছিল,—রাত বলেই এত জোরে চালাচ্ছি। উলটোদিক থেকে গাড়ি এলে হেডলাইট দেখে বোঝা যাবে। তবে এসব রাস্তায় একটাই বিপদ। কখন যে ছাড়া ঘোড়া বা অন্য কোনও জন্তু সামনে এসে পড়বে, কে জানে!

গাড়ির সামনের সিটে সাইমনের পাশে অনিলিখা বসেছে।

সকালের থমথমে পরিবেশ, সতর্ক কথাবার্তা আর ওদের মধ্যে নেই। ওদের গাড়িই প্রথমে। পিছনে আরও তিনটে পুলিশের গাড়ি আছে। কোনও গাড়িকেই বাইরে থেকে দেখে পুলিশের গাড়ি বলে বোঝার উপায় নেই।

অনিলিখা ফেসবুকে কানেক্টেড আছে। যদি মনসুর কোনও মেসেজ পাঠায়। কিন্তু মনসুর অর্থাৎ ফেসবুকের প্রোফাইল অনুযায়ী স্টিভ স্মিথকে এখনও অফলাইন দেখাচ্ছে।

পূর্ণিমা দু-এক দিনের মধ্যে। তাই চাঁদের আলোয় দু-ধারের উপত্যকা-পাহাড়গুলো যেন মায়াবী হয়ে উঠেছে। ছায়ামাখা খেত, সবুজ ঘাসজমি, ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু উপত্যকা—চাঁদের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠা গাছপালা, হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় চমকে উঠে পালিয়ে যাওয়া খরগোশ—প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি যেন নতুন নতুন সাজে চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে। পৃথিবীটা এত সুন্দর। তবু কেন যে সময়ে সময়ে টেররিস্টরা ধর্মের নামে মারণলীলায় মেতে ওঠে কে জানে!

চেপস্টাও ঢোকার কিছু আগে থেকেই দু-ধারে দু-হাত উঁচু পাথরের দেওয়াল শুরু হয়ে গেল। সাইমন ফের বলে উঠল, চেপস্টাও-তেও রোমান বসতি ছিল। মধ্যযুগেও এখানে ঘন

জনবসতি ছিল। এটা ছিল অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু� এলাকা। এখানকার ক্যাসেলটাও খুব বিখ্যাত। পরে একদিন এসে দেখে নেবেন।

খানিকক্ষণের মধ্যে ওরা চেপস্টাও পৌঁছে গেল। সরু রাস্তার দু-ধারে সার সার ভিক্টোরিয়ান বাড়ি। গাড়িটা পার্ক করে ওরা নেমে পড়ল। এই বাড়িগুলোর মধ্যেই কোনও একটা হবে। ঘুমিয়ে পড়া শহরে শুধু জেগে আছে রাস্তার হলদেটে ল্যাম্পের আলো। সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। রাত এগারোটা এখানকার লোকের কাছে মধ্যরাত্রি। কোনও আওয়াজ না করে পাথর বাঁধানো সরু ফুটপাথ ধরে ঢালু পথে ওরা এগিয়ে গেল। অ্যারো দেখাচ্ছে চেপস্টাও ক্যাসেলের দিকে। অর্থাৎ ক্যাসেল খুব একটা দূরে নয়।

পিছন থেকে একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বেশ পুরোনো একটা ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, ওই—ওই যে নাম্বার 18, ওই বাড়িটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলা হল। নীচু সবুজ দরজার পাশে কলিংবেল। সেটা দুবার টিপে সাড়া না পেয়ে সাইমন দরজা ভাঙার নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ সামনের দরজার লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

অনিলিখা বাইরেই অপেক্ষা করল বাকিদের সঙ্গে। খানিকবাদে সাইমন বেরিয়ে এল।

—অনিলিখা, ভেতরে আসুন। আই থিঙ্ক হি ইজ ডেড।

একতলার লিভিংরুমে মনসুর সোফার উপর শুয়ে আছে। একগাল দাড়ি, পরনে হলুদ স্লিপিং স্যুট। যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। চেক করে দেখা গেল, পালস নেই।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে একটা হলুদ টেপ এনে জায়গাটা সিল করে দিল। দরজা ভেতর থেকে লকড ছিল। বাড়িতে মনসুর একাই ছিল। বাইরের কেউ আসেনি। ঘরের সব কিছুই পরিপাটি আছে। একটা শিশি পাশেই পড়ে আছে। শিশিটা অর্ধেক ভর্তি কালো রঙের তরলে।

সব দেখে সাইমন বলল,—সুইসাইড বলেই মনে হচ্ছে। ফরেনসিকের পরে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ও বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে আমাদের জালে ও আটকে গেছে। আমার ধারণা ভাইরাসের ভায়ালটা এখানেই পাওয়া যাবে।

অনিলিখা হঠাৎ খেয়াল করল মনসুরের কপালে এক ইঞ্চির কাটা দাগ।

কপালের কাটা দাগটা দেখিয়ে ও সাইমনকে বলল,—ওই দাগটা কিন্তু আগে ছিল না। অন্তত আমি যখন দেখেছি।

—দাগটা রিসেন্ট নয়। পুরোনো। কোনও অপারেশনের।

—হুম। মনে হচ্ছে কী কারণে দাগটা তা আন্দাজ করতে পারছি।

—কী? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট।

—না, ব্রেন ইমপ্ল্যান্ট। আমি শিওর যে ওর ব্রেনে কোনও চিপ ইমপ্ল্যান্টেড আছে। ওর মনের উপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল। আজ হয়তো সেই ওকে সুইসাইডে বাধ্য করেছে। আপনারা তদন্ত করলেই বুঝতে পারবেন। আমি এরকম ইমপ্ল্যান্ট আগেও দেখেছি।

টেবিলের উপর বাটিতে কয়েকটা স্ট্রবেরি পড়ে আছে। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিলিখা বলে উঠল,—আমি শিওর সুইসাইড ওর প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ করে ডিসিশনটা নিতে হয়েছে। বা কেউ ওকে ওই বিষ নিতে বাধ্য করেছে।

সাইমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

১৩

শেষ পর্যন্ত অনিলিখাকে দু-সপ্তাহ এক্সটেন্ড করতেই হল। এসেছিল এক সপ্তাহের জন্য। সেখানে তিন সপ্তাহ হয়ে গেল। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে অনিলিখার অনুমান নির্ভুল। মনসুরের ব্রেনে ইলেকট্রনিক চিপ-ই ইমপ্ল্যান্টেড ছিল। এই চিপের সাহায্যে হঠাৎ করে মনের মধ্যে চরম ডিপ্রেশান তৈরি করে মনসুরকে সুইসাইড করতে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রশ্নটা হল নিয়ন্ত্রণ ছিল কার হাতে? কে মনসুরকে নিয়ন্ত্রণ করত?

মিঃ পাই শুনে বলেছিলেন,—ভবিষ্যতে এই টেকনিক সব টেররিস্ট গ্রুপই ব্যবহার করবে অনিলিখা। আগেও বহুবার এ চেষ্টা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট শাসনে বন্দিদের উপরে এ ধরনের মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনিক ব্যবহার করা হত। রাশিয়ার বিজ্ঞানী পাভলভ প্রথম এই টেকনিক ব্যবহার করেন। পরে ইংল্যান্ডে ডাঃ সার্জেন্টও এই টেকনিক বিভিন্ন পেশেন্টের ওপর প্রয়োগ করেন। আগে ড্রাগ, ইলেকট্রিক শক এসব দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হত। ভবিষ্যতে চিপ ইমপ্ল্যান্ট করে এভাবে অন্যের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এক্ষেত্রে সুবিধে হল দূর থেকে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

হয়তো দেখো মনসুরের এই পরিবর্তনের পিছনে আছে আফগানিস্তানের কোনও টেররিস্ট গ্রুপ যারা মনসুরের প্রত্যেকটা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করত। হাসি-কান্না-মৃত্যু-সব।

তবে আশার কথা হল মনসুরের বাড়ি থেকেই টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে চুরি যাওয়া ভাইরাসের ভায়াল পাওয়া গেছে। কোনওরকমে ওই ভাইরাস টেররিস্টদের হাতে গিয়ে পড়লে যে কী হত!

মিঃ পাই অবশ্য ওই কথাটা মন দিয়ে শুনে বলেছিলেন,—অনিলিখা, মনসুর ওই ভাইরাসের ভায়াল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল কেন আমার মাথায় ঢুকছে না। ওটা তো অকেজো ভাইরাস। মৃত ভাইরাস দিয়ে তো কাউকে সংক্রামিত করা সম্ভব ছিল না। তার মানে কি ওর থেকে কেমিক্যাল কম্পোজিশান কপি করে আসল ভাইরাস ওরা এখনও তৈরি করেনি? তাই

ওই ভাইরাসটা কাউকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। নাকি ওই ভাইরাস থেকে কপি করে যে ভাইরাসটা তৈরি করা হয়েছে সেটাকে চোখের আড়ালে রাখা হয়েছে যে-কোনও সময়ে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে।

অনিলিখা বলেছিল,—পুলিশ জানিয়েছে যে-কোনওভাবেই কপি করে ভাইরাস তৈরি করার জন্য যে সময় লাগে, সেই সময়টা ওদের হাতে ছিল না। চুরি করার কয়েকদিন পরে ও মারা যায়। এ ধরনের ভাইরাস তৈরি করতে কমপক্ষে একমাস লাগবে। তা ছাড়া উন্নততম টেকনোলজিও দরকার। তা আপনার কি কোনওরকম সন্দেহ হচ্ছে?

মিঃ পাই হেসে বলেছিলেন,—বার্টান্ড রাসেল কি বলেছেন জানো? যারা কম জানে, তারা ভাবে তারা যা জানে সেটাই ঠিক। আর যারা জানে, তারা সবসময় সব সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখে। কখনও অন্য সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে নেই।

তবে পুলিশের পক্ষে আর অনিলিখার পক্ষে একটা বড় সুবিধে হয়েছে ডঃ ম্যাক্সের ওয়েলসে উপস্থিতি। উনিও নেহাতই কনফারেন্সের জন্য এসেছিলেন। ডক্টর ম্যাক্সের নাম ন্যানো-টেকনোলজিতে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। টেক্সাস ইউনিভার্সিটির মতো একাধিক হাই সিকিউরিটি ল্যাব ওনারই সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলে। উনি মনসুরকে ভালোভাবেই চিনতেন। ওনার জন্যই প্রথম জানা গিয়েছিল যে এই ভাইরাস টেক্সাসের হাই সিকিউরিটি ল্যাব থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। তা না হলে কেউ জানতেও পারত না যে টেররিস্টদের হাতে এরকম একটা সাংঘাতিক ভাইরাস পৌঁছোতে চলেছে। ভারত সরকার ডাঃ ম্যাক্সের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাই ডঃ ম্যাক্সও ভারতে যাবেন অনিলিখার সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য। মিঃ পাই-এর সঙ্গে আলাপ করার ওনার খুব আগ্রহ।

এরমধ্যে একদিন ডঃ ম্যাক্স ও মিঃ পাই-এর মধ্যে একঘণ্টা ফোনে কথা হয়েছে। ফোন ছাড়ার পর ডঃ ম্যাক্স বলে ওঠেন,—অ্যামেজিং পার্সন। উনি তো আমার সাবজেক্ট আমার থেকেও বেশি জানেন, দেখলাম। রিয়্যালি গ্রেট মাইন্ড। এরকম লোক শুধু ভারতেই দেখতে পাওয়া সম্ভব।

অনিলিখার একটা প্রশ্ন ছিল যে হঠাৎ করে মনসুর X1 ভাইরাসের রিসার্চ-এর সঙ্গে যুক্ত হল কী করে! ওর তো সাবজেক্ট ছিল ন্যানো-টেকনোলজি। প্রশ্নটা করেছিল ডঃ ম্যাক্সকে। ওরা তখন কার্লিয়ন সিটিসেন্টারের একটা ক্যাফের সামনে টেবিলে বসে ক্যাপুচিনো খাচ্ছিল। ডঃ ম্যাক্স কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন,—ভাইরাস মানেই হল ন্যানোর জগৎ। আমরা মেডিক্যাল রিসার্চে—চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ন্যানো-টেকনোলজি ব্যবহার করছি। ধরো একটা ম্যাগনেটাইজড ন্যানো-পার্টিকল তৈরি করা হল যা কোনও মারাত্মক ভাইরাসকে চিহ্নিত

করতে পারে। এবার ওই ন্যানো-পার্টিকল শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ওই ন্যানো-পার্টিকল ভাইরাসকে চিহ্নিত করতে পারবে অ্যান্টিবডির মাধ্যমে। তারপর হেড টু হেড ফাইট। —বলে হাত দুটোকে ঘুষি পাকিয়ে দুবার যেভাবে ওপরের দিকে ছুঁড়লেন তাতে পাশের টেবিলে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কফি কাপ থেকে ছলকে টেবিলে পড়ল।

ম্যাক্স বলতে লাগলেন, এজন্যই আমরা X1 ভাইরাসের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলাম। যাতে ন্যানো-টেকনোলজির সাহায্যে ভ্যাকসিন তৈরি করা যায়। তবে আবার একই টেকনোলজি খারাপভাবে ব্যবহার করে ভাইরাসও তৈরি করা যেতে পারে।

—কিন্তু ভাইরাসের তো প্রাণ আছে। প্রাণ তৈরি করা যায়?

—কেন যাবে না? ভাইরাসের RNA যেসব কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি, তা ঠিক পরপর সাজিয়ে—তারপর জীবিত কোষের সাইটোপ্লাজমে ঢুকিয়ে—থাক, সেসব কথা থাক। তবে কাজটা সোজা নয়। আর আমি তাই নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সঙ্গে কফি খেতে পারছি।

একটু থেমে ডঃ ম্যাক্স আবার বলতে থাকলেন,—তোমাদের কলকাতায় কী কী দেখার আছে বলো তো? যাচ্ছি যখন, কলকাতাটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে। দিল্লিতে যাওয়ার আগে দুদিন কলকাতায় থাকব। কোন হোটেলে থাকা যায়?

—ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি সব প্ল্যান করে দেব। আপনার পাসপোর্ট ডিটেলস আমাকে পাঠিয়ে দিলে আমি আমার বন্ধুকে বলে দেব ভালো হোটেল আপনার জন্য বুক করে রাখতে। একটাই সমস্যা। কিছুদিন পরে কলকাতায় যুব বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে। আমাদের পৌঁছোনোর দুদিন পরেই। তাই হোটেলে বুকিং পাওয়া একটু অসুবিধে হতে পারে।

—তা হলে একটু তাড়াতাড়ি দেখো। ভারতে যাব আর কলকাতা যাব না তাই হয়? টেগোরের শহর বলে কথা।

তারপর গীতাঞ্জলির লাইন ইংলিশে বলে উঠলেন,—'হোয়্যার দ্য মাইন্ড ইজ উইথআউট ফিয়ার, অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই, হোয়ার নলেজ ইজ ফ্রি, হোয়্যার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ ইনটু ফ্র্যাগমেন্টস বাই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস।'

১৪

সকালে সাইমনের ফোন পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল অনিলিখা। জানা গেছে মনসুর পাকিস্তানের একটা টেররিস্ট গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিল।

ইংল্যান্ড-আমেরিকা-ইউরোপ থেকে আরও যারা সেই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের প্রায় সবাই এখন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। 'প্রায়' কথাটার আরেকটু ডিটেলস চেয়েছিল অনিলিখা। তাতে জেনেছে যে এই গ্রুপের যে মূল পাণ্ডা তার নাম তারিক। বিভিন্ন কথাবার্তা,

গ্রুপের মধ্যে একজনের থেকে আরেকজনকে পাঠানো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে পুলিশ অনেক জায়গাতেই তারিকের নাম পেয়েছে। তবে এর বাইরে তারিকের কোনও বর্ণনা নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই টেররিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত কেউ-ই নাকি তারিককে স্বচক্ষে দেখেনি। তবে এই গ্রুপটার পিছনে প্রধান মস্তিষ্ক যে সেই ছিল, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। দলে তার পরেই ছিল মনসুরের জায়গা।

—তাহলে? ভারতে কি এরকম হামলা হওয়ার মানে ভাইরাস অ্যাটাকের চান্স এখনও আছে?

সাইমন বলেছিল,—হ্যাঁ সে চান্স তো আছেই। তবে আমরা এই গ্রুপের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছি। ওরা হামাগুড়িও দিতে পারবে না পরবর্তী কয়েক বছর। ওদের সব তথ্য আমাদের হাতে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অনিলিখা, এই তারিকও কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জালে ধরা পড়বে। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। এদের একটা অংশ কিন্তু জানে যে আপনার জন্যই এরা ধরা পড়েছে।

কথাটায় ভয় পায়নি অনিলিখা। এমনিতেই জীবনে নানান অনিশ্চয়তা থাকে। ভয় পেয়ে বাঁচার থেকে মৃত্যুও ভালো।

সমস্যা একটাই। এখনও দেশে ফেরার ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি। পুলিশও নানা কারণে অনিলিখার সাহায্য চাইছে। ডঃ ম্যাক্স-কেও ওরা ইংল্যান্ড থেকে বেরোতে দেয়নি। ডঃ ম্যাক্সের অগাধ পাণ্ডিত্য ভাইরাস ও ন্যানোটেকনোলজির উপর। দুটোই এ তদন্তে অত্যন্ত দরকারি। একই সঙ্গে, ডঃ ম্যাক্স মনসুরকে খুব ভালো করে চিনতেন বলে ডঃ ম্যাক্সের মাধ্যমে অনেক দরকারি তথ্য, প্রয়োজনীয় লিড পাওয়া গেছে। তারই সূত্র ধরে ওই গ্রুপের অনেককে ধরা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু কতদিন আর কার্লিয়নের হোটেলের ঘরে বসে থাকা যায়! তাই ডঃ ম্যাক্সের সঙ্গে অনিলিখা প্ল্যান বানিয়েছে এই সময়টার সদ্ব্যবহার করে ইংল্যান্ডটা ঘুরে দেখার। একদিন এর মধ্যে লন্ডন গিয়েছিল, একদিন কেমব্রিজ, আজকের প্ল্যান লংলিট যাওয়ার।

ট্রেনে নিউপোর্ট থেকে ওয়ারমিনস্টার দেড় ঘণ্টার পথ। ওয়ারমিনস্টার স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে লংলিট যেতে হবে। এটা ইংল্যান্ডের সবথেকে বড় সাফারি পার্ক। চিতা-সিংহ-নেকড়ে-গরিলা এমনকী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—সবই এই সাফারিতে মুক্তবনের পরিবেশে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। অনেকটা ভুবনেশ্বরের নন্দনকাননের মতো, যদিও অনেকগুণ বড়, আর বাঘ-সিংহ- ভালুক-হরিণের সংখ্যাও অনেকগুণ বেশি। লংলিট হাউসও খুব নামকরা। মধ্যযুগের বিশাল প্রাসাদ।

সকাল দশটা নাগাদ ট্রেনে রওনা হয়ে সাড়ে এগারোটায় ওয়ারমিনস্টার পৌঁছোল অনিলিখারা, ছোট্ট স্টেশন। দুটো ছোট প্ল্যাটফর্ম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অনিলিখারা ভেবেছিল সামনেই সারি দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে। আর তাতে করেই লংলিট চলে যাবে। কিন্তু কোথায় কী? একটাও ট্যাক্সি নেই। যারা লংলিট যায় তারা বোধহয় আরও অনেক সকাল সকাল আসে যাতে সারাদিন ধরে লংলিট ঘোরা যায়। জন্তু-জানোয়ার দেখা তো আছেই, তা ছাড়া এখানে এমন অনেক শো হয় যা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ ভিড় করে আসে। এসব শো দেখার জন্য অনেক সময়ের দরকার।

ট্যাক্সির দেখা না পেয়ে একটা ট্যাক্সি কোম্পানির নাম্বারে ফোন করল ওরা। ট্যাক্সি আসবে, কিন্তু তিরিশ মিনিট পর। অনিলিখাকে স্টেশনের সামনে দাঁড়াতে বলে ম্যাক্স ফের স্টেশন চত্বরে ঢুকে গেলেন ভেন্ডিং মেশিন থেকে কোল্ড ড্রিংকস নিতে।

ঝকমকে মেঘমুক্ত আকাশ। রোদ আস্তে আস্তে চড়ছে। টেম্পারেচার 20-22 ডিগ্রির মতো। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু এত চড়া রোদ যে তাকানো যায় না।

হঠাৎ অনিলিখার মনে হল পিছনে একটা ছুটে আসা পায়ের শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চমকে উঠলে। দশ-বারো ফুট দূর থেকে একটা লোক হাতে একটা বড় ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। ছ'ফুটের মতো হাইট। তাগড়াই চেহারা। মাঝারি রং। দেখেই মনে হয় মিডল ইস্টের। মুখে স্পষ্ট হিংস্রতার ছাপ।

কী করবে বুঝে ওঠার আগেই যেটা হল, সেটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না অনিলিখা। দুটো গুলির শব্দ। একটা সোজা এসে লোকটার ডান বাহুতে লেগেছে। লোকটা হাতটা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে। অনিলিখা যে বন্ধ দোকানটার সামনে দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে থেকে দুজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এসে লোকটাকে জাপটে ধরেছে।

লোকটার গায়ে এতটাই জোর যে আরেকজন পুলিশ অফিসারকে এগিয়ে আসতে হল সাহায্যে। হ্যান্ডকাফ পরানোর পরেও বারবার তেড়ে এগিয়ে আসছে অনিলিখার দিকে আর অকথ্য ভাষায় কীসব গালগাল দিচ্ছে। লোকটার খুনির চোখ। কপালে কাটা দাগ। কে এ?

এতক্ষণে স্টেশন চত্বর থেকে ম্যাক্সও ফিরে এসেছে। ম্যাক্সকে দেখে লোকটা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে কী সব বলছিল। পুলিশ ওকে গাড়িতে তুলল। একজন পুলিশ এগিয়ে এসে ম্যাক্সকে ধন্যবাদ জানাল। কথাবার্তা থেকে অনিলিখা বুঝল এই লোকটাই তারিক। ম্যাক্সের বিবরণ থেকেই এরা তারিককে আইডেনটিফাই করতে পেরেছে। এর খোঁজেই ছিল পুলিশ।

তার মানে অনিলিখা যেখানেই যাচ্ছে, পুলিশ সতর্ক নজরদারি বজায় রাখছে। অনিলিখার মনে হল এতক্ষণ যখন লুকিয়ে পাহারাই দিচ্ছে, এখন লংলিটে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেই পারত! তা না করে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে, চাইছে অপরাধীরা হামলা করুক। যাক অবশেষে তারিক তো ধরা পড়েছে!

এরপর আর লংলিট যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি ওদের। ফেরার পথে ডঃ ম্যাক্স বলছিলেন তারিকের কথা। মনসুরের সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই টেক্সাসের ডালাসে যেত তারিক। মনসুরের স্কুলের বন্ধু ছিল ও। ম্যাক্স যতদূর জানে কোনও একটা ব্যাঙ্কে কাজ করত তারিক। মোটামুটি শিক্ষিত। তবে ওর ব্যবহারের মধ্যে সবসময়ই কেমন যেন রূঢ়তা ছিল।

—কেন যে এরা টেররিস্ট হয় কে জানে? অনিলিখা বলল।

তার উত্তরে ডঃ ম্যাক্স বলেছিলেন,—তারিকের জন্ম ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে। ওর ছোটবেলায় টেররিজমের চার্জে ওর বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। আর কোনওদিন বাড়ি ফেরেনি তারিকের বাবা।

ডঃ ম্যাক্স বলছিলেন,—মানুষ স্বভাবতই হিংস্র। হিংসা রক্তেই থাকে। একটা জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে ছড়িয়ে পড়ে, খুব সহজেই।

কথাটা খুবই সত্যি। অন্য কোনও প্রাণী তো এত সহজে একজন আরেকজনকে মারে না!

১৫

রাত ন'টায় ফ্লাইট। হাতে সময় রেখেই বেরিয়েছিল অনিলিখারা। অনেকসময় মোটরওয়েতে সাংঘাতিক জ্যাম হয়। একঘণ্টার পথে দু-ঘণ্টা লেগে যায়। অনিলিখার সঙ্গে ডক্টর ম্যাক্সও আছেন। রাস্তা ফাঁকাই ছিল। সাড়ে ছ'টায় হিথরো এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেল। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট। দু-জনেরই বিজনেস ক্লাস। চেকইন করতে বেশি সময় লাগল না। বিজনেস ক্লাসের জন্য সিকিউরিটি চেকের আলাদা লাইন আছে। ফাস্ট লেন।

সিকিউরিটি চেকের পরে হাতে তখনও দেড়ঘণ্টা সময়। বাইরে থেকে ফেরা মানেই সবার জন্যে চকলেট নিয়ে যাওয়া। অনাথ আশ্রমের বাচ্চাগুলো আগেই বলে রেখেছে,—অনিলিখাদি, আগের বারের চকলেট খুব ভালো ছিল। এবার কিন্তু আরও অনেক বেশি করে আনবে।

বিশ্বজিৎও বলে রেখেছে,—টবলরন চকলেটটা খারাপ নয়। পারলে এই বাচ্চাগুলোর জন্য খানদশেক প্যাকেট এনো।

তা ওদের জন্য অনিলিখা চকলেট কিনতে এগোল। ডক্টর ম্যাক্স বিজনেস ক্লাস লাউঞ্জে ঢুকলেন। হিথরো অত্যন্ত ব্যস্ত এয়ারপোর্ট। সবসময় প্যাসেঞ্জারের ভিড়। এক-দু-ঘণ্টা এয়ারপোর্টে থাকলেই প্রায় পৃথিবীর সব দেশের লোকেদের দেখা পাওয়া যাবে। কেনাকাটার

মাঝে অনিলিখার পাড়ার এক কাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি আমেরিকায় ছেলের কাছে যাচ্ছেন। খানিকক্ষণ কথা বলতে বলতে অনিলিখা খেয়াল করল প্লেন বোর্ডিং-এর গেটে দিয়ে দিয়েছে। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাই অনিলিখা আস্তে আস্তে বিজনেস ক্লাস লাউঞ্জের দিকে এগোল। খানিকক্ষণ লাউঞ্জে কাটিয়ে তারপর ফ্লাইটে ওঠা যাবে।

এয়ার ইন্ডিয়ার লাউঞ্জটা ছোট। লাউঞ্জে ডক্টর ম্যাক্স আর নেই। নির্ঘাত প্লেনে উঠে গেছেন। ভদ্রলোক একটু ব্যস্তবাগীশ আছেন। লাউঞ্জে একটা সোফায় বসে 'ডেইলি মিরর'-এ চোখ বোলালো অনিলিখা। তেমন নতুন কোনও খবর নেই। মনসুরের মৃত্যু ভাইরাস চুরির ঘটনাটা ইচ্ছে করেই ব্রিটিশ মিডিয়া ফলাও করে বার করেনি। একে তো সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করবে, তার থেকেও বড় কথা ইংল্যান্ডের মাটিতে অন্য দেশের বিরুদ্ধে টেররিজমের চক্রান্ত হচ্ছিল—এই খবরটা অনেকেই ভালো চোখে নেবে না।

এর মধ্যে হঠাৎ অনিলিখার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। প্রাইভেট নাম্বার। দেখাচ্ছে না। ফোনটা ধরল অনিলিখা। উলটোদিকে সম্পায়নের গলা। খানিকটা উত্তেজিত।

—তুমি এখন কোথায়? এয়ারপোর্টে?

—হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠব। ছেড়ে দে। আমি তোকে ফোন করছি।

—না—! একটু উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সম্পায়ন,—খুব দরকারি কথা! ছেড়ো না। তারপর গলাটা একটু আস্তে করে বলে উঠল,—ডক্টর ম্যাক্স কি সঙ্গে আছেন?

—না, উনি বোধহয় ফ্লাইটে উঠে গেছেন।

—তুমি ফ্লাইটে উঠো না অনিলিখাদি। কোনওভাবেই না!

—মানে!

—বুঝিয়ে বলছি। তুমি ওনার হোটেল বুকিং-এর জন্য পাসপোর্ট ডিটেলস পাঠিয়েছিলে দুদিন আগে। আগে ই-মেলটা খুলিনি। মেলটা খুলে ওনার ছবিটা দেখতেই মুখটা মনে পড়ে গেল। দু-বছর আগে ম্যালেশিয়া থেকে চিনে যাওয়ার পথে একটা প্লেন নিখোঁজ হয়েছিল। তারপর ওই প্লেন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্যাসেঞ্জারদেরও না। মনে আছে নিশ্চয়ই। আনন্দবাজারে ওর কয়েকজন প্যাসেঞ্জারের ছবি বেরিয়েছিল। তার মধ্যে ওনার ছবিও ছিল। নামটা যদিও অন্য ছিল। যদ্দূর মনে পরে তারিক মোহম্মেদ।

—এতদিন আগের ছবি। তোর ঠিক খেয়াল আছে? তুই শিওর?

—তুমি তো আমাকে চেন অনিলিখাদি। আমি নিশ্চিত। সেই একই চোখ। চওড়া ভুরু। বাঁ-চোখের পাশে তিল। শুধু ছবিটাতে একগাল দাঁড়ি ছিল। এই পাসপোর্ট ছবিটাতে দাঁড়ি নেই।

—তা তোর কাছে সেদিনের আনন্দবাজারটা আছে?

—তা কখনও থাকে? দু-বছর আগের 15 জুলাই-এর কাগজ।

খানিক থেমে ফের বলে ওঠে সম্পায়ন,—আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে মিঃ পাই-এর সঙ্গে কথা বললাম। মিঃ পাই লোকটা কিন্তু একটু পাগলাটে। খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর কোথায় ভয় পেয়ে যাবেন। বলবেন তোমায় কী করতে হবে—তা না! সব শুনে বলে উঠলেন,—সব মিলে যাচ্ছে। ন্যানোটেকনোলজি—টেক্সাস ইউনিভার্সিটির ল্যাব থেকে ভাইরাস চুরি, মনসুরের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে সব সন্দেহের বাইরে রাখা—এক-এক করে নিজের দলের লোকেদের সরিয়ে দেওয়া—কলকাতায় ঠিক যুব বিশ্বকাপের সময় আসা। সব মিলে যাচ্ছে।

আমি বলে উঠলাম,—মিঃ পাই—সময় খুব কম—আপনার কী মনে হয়? অনিলিখাদির কী করা উচিত?

তাতে পাগলটা আবার কী বলে জানো? কারও মতামতের ওপর ওনার নাকি কোনও অধিকার নেই। তুমি নাকি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। নিজেই ঠিক ডিসিশন নিতে পারবে। তবে ডক্টর ম্যাক্সের টেররিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাকি গ্রেটার দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট। বোঝো।

সম্পায়নের সঙ্গে ফোনে কথার মধ্যেই একজন এয়ার ইন্ডিয়ার মহিলাকর্মী ছুটে এল। এনি প্যাসেঞ্জার ফর AI111—লাস্ট কল। সামনের ডিসপ্লে মনিটরে AI111-এর পাশের লেখাটা দপদপ করছে গেট ক্লোজিং।

—ঠিক আছে সম্পায়ন। ভালো থাকিস। আমাকে যেতেই হবে। প্লেনে উঠে ঠিক করছি—কী করব।

—কিন্তু অনিলিখাদি—কথা শেষ করতে না দিয়েই ফোনটা ছেড়ে দেয় অনিলিখা। হাতের ট্রলিব্যাগ নিয়ে দ্রুত বিজনেস ক্লাস লাউঞ্জের বেরোনোর দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বেরিয়ে জোর পায়ে গেটের দিকে হাঁটতে থাকে। ফোনটা আবার বাজছে। আবার সেই প্রাইভেট নাম্বার। নির্ঘাত সম্পায়নই ফোন করছে। ফোনটা সুইচ অফ করে বোর্ডিং গেটের দিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা।

বিজনেস ক্লাসও প্রায় ভরতি। চেকইন করার সময় একইসঙ্গে পাশাপাশি সিট নিয়েছে অনিলিখা আর ডক্টর ম্যাক্স। অনিলিখার সিটটা জানলার ধারে। ম্যাক্সেরটা তার পাশে। ওরা বসেছে প্লেনের একদম সামনের দিকে। দ্বিতীয় সারিতে।

ম্যাক্স সিটটা শোওয়ার মতো পজিশন করে পা তুলে বসেছিলেন। অনিলিখাকে দেখে পা-টা নামিয়ে ধারে যেতে দিয়ে হেসে বলে উঠলেন,—কী ব্যাপার? এত দেরি?

অনিলিখা হেসে বলে উঠল,—কাগজ পড়তে পড়তে একটু দেরি হয়ে গেল। পাড়ার একজন কাকুর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

কোনওরকম সন্দেহ হতে না দেওয়াই ভালো। নিজের ব্যাগটা রেখে একবার মাথা ঘুরিয়ে ম্যাক্সের ব্যাগটাও দেখে নিল অনিলিখা। ম্যাক্স শুধু একটা বই আর ওর আইপ্যাডটা সিটের পাশের জায়গায় রেখেছে।

বিমান সেবিকারা শ্যাম্পেন-ওয়াইন-সফট ড্রিংক্স দিয়ে যাচ্ছে। ফ্লাইট টাইমেই আছে। খানিকবাদে গরম ও ঠান্ডা মুখ মোছার তোয়ালেও দিয়ে গেল। দশমিনিট বাদে ইনস্ট্রাকশন অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হল। বিমান চলতে শুরু করেছে। সামনে খানিকদূরে একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা আকাশ।

ক্যাপ্টেনকে কিছু জানাবে কি? পাশে ম্যাক্সের দিকে আড়চোখে তাকাল অনিলিখা। চোখ বন্ধ করে বসে আছে। বাঁ-চোখের পাশে তিলটা স্পষ্ট কিন্তু মিডল ইস্টের লোকেদের যেরকম দেখতে হয়, সেরকম মোটেও দেখতে নয়। অবশ্য টার্কি বা সিরিয়া থেকে যারা আমেরিকায় এসেছে তাদের সেকেন্ড জেনারেশনকে দেখে অনেকসময় আলাদা করা যায় না। ম্যাক্সের মুখের ফিচারগুলো বেশ শার্প। মুখে একটা সৌম্য ভাব, সেটা আদৌ কোনও টেররিস্টের সঙ্গে খাপ খায় না।

প্লেনের ভেতরের আলো নিভে গেছে। প্রয়োজনমতো যে যার নিজের সিটের আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে। প্লেন এবার রানওয়েতে ছুটতে শুরু করল। খানিকবাদেই মাটি ছেড়ে আকাশে। কালো মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। সামনের মাঝের সিটে একজন পরিচিত পলিটিকাল লিডারকে দেখতে পেল অনিলিখা। পাশে অন্যপ্রান্তে একজন নামকরা ক্রিকেটার বসে আছে। মাথা ঘোরাতে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের আরও কয়েকজনকে চোখে পড়ল। ইংল্যান্ডে ভারতের ওয়ান ডে সিরিজ হচ্ছিল। ফ্লাইটটা দিল্লি হয়ে কলকাতা যাচ্ছে। এরা দিল্লি অব্দি যাবে হয়তো।

মিনিট পনেরো পরে প্লেন নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে গেল। ভেতরের আলো জ্বলে উঠেছে। ম্যাক্সের চোখ এখনও বন্ধ। 'তারিক' বলে ইচ্ছে করে খানিকটা জোরে ডেকে উঠল অনিলিখা।

ম্যাক্স চোখ খুলে বলল,—কিছু বললে আমাকে?

কোনও চমকে ওঠার ভাব ধরা পড়ল না।

—না, না! অনিলিখা মুখে তবু ভয়ের ভাবটা লুকোতে পারল না। চুপ করে গেল।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এ অবস্থায় আর কিছু করার নেই অনিলিখার। কেউ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ম্যাক্সের মুখেও কোনও অভিব্যক্তি নেই, টেনশন নেই। আধশোয়া হয়ে

সামনের মনিটরে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখতে শুরু করেছে। অনিলিখা ইচ্ছে করে ওর নিজের স্ক্রিনে একটা হিন্দি সিনেমা চালাল। ম্যাক্সের মুখের ভাবটা বোঝার জন্য। মিডল ইস্টের লোক হলে হিন্দি সিনেমার সঙ্গে পরিচিত থাকা উচিত। কিন্তু নাহ, ম্যাক্স আড়চোখে দেখারও কোনও আগ্রহ দেখাল না। কেন জানি না—ম্যাক্সকে সন্দেহ করার এখনও কোনও কারণ খুঁজে পেল না অনিলিখা। যদি ভাইরাস সংক্রমণের উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তাহলে আগে থেকে সবাইকে সতর্ক করে দেয় কেউ? নাকি পুরোটাই আসল ভাইরাসকে সকলের দৃষ্টির বাইরে রাখার জন্য।

১৬

ঘুমটা ভেঙে গেল অনিলিখার। জোরে কথাবার্তা কানে এল। শরীরটা যেন কেমন একটু লাগছে। মাথাটা খুব হালকা। এখনও দিল্লিতে ল্যান্ড করতে দু-ঘণ্টা বাকি। পাশের সিটে ম্যাক্স নেই। টয়লেটে গেছে হয়তো।

জানলার শাটারটা খুলে বাইরের দিকে তাকাল অনিলিখা। খুব উজ্জ্বল আলো। তাকানো যাচ্ছে না। শাটারটা আবার নামিয়ে দিল অনিলিখা। হঠাৎ মনে হল চারদিকের লোকজন সবাইকে কেমন যেন উত্তেজিত লাগছে। সত্যিই কি? নাকি ও এ ব্যাপারে বেশি ভাবছে। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য সিটগুলোর দিকে তাকাতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল অনিলিখা। প্রায় কেউই সিটে নেই। বেশিরভাগই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ প্যাসেজে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজন আবার এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়েছে। অথচ খানিক আগেও সবাই ঘুমোচ্ছিল। এটা কি স্বাভাবিক? প্লেনে সাধারণত সহযাত্রীদের সঙ্গে কেউ এত কথা বলে না, বিশেষ করে বিজনেস ক্লাসে।

হঠাৎ চোখ পড়ল ম্যাক্সের সিটের পায়ের কাছে। এক ইঞ্চি লম্বা প্রায় এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা ছোট শিশি পড়ে আছে। কিন্তু ঢাকা লাগানো নেই। শিশিটা ফাঁকা। ওতে কি কোনও ভাইরাস ছিল? ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

তাহলে কি ভাইরাস এখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে? মোবাইল ফোনের মিরর মোড অন করে নিজের মুখটা দেখল। কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি? মুখে লাল কয়েকটা বিন্দু বিন্দু দাগ ফুটে উঠেছে। এগুলো তো ছিল না! তাহলে কি ও নিজে সংক্রামিত? সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনিলিখা।

সামনেই একজন এয়ার হোস্টেস। ড্রিঙ্কস সার্ভ করছে। কাছ থেকে লক্ষ করলে বোঝা যাচ্ছে তার মুখেও লাল লাল দাগ। প্লেনের যে ক'জনের মুখ চোখে পড়ল সবারই মুখে লাল লাল দাগ। স্পষ্ট না হলেও খেয়াল করলেই বোঝা যাচ্ছে। প্লেনের আলোয় পরিষ্কার করে দেখা

যাচ্ছে না। সবাই এত উত্তেজিত কেন? সাধারণত প্লেনে কেউ এভাবে হইচই করে না। কয়েকজন কেশে যাচ্ছে।

একজন প্যাসেঞ্জার—বছর পঁয়ষট্টির সুঠাম চেহারার বৃদ্ধ—সুট-টাই পরা, সিট ছেড়ে অনিলিখার দিকে এগিয়ে এলেন। সিটে হেলান দিয়ে গল্প জুড়লেন,—আপনি কি লন্ডনেই থাকেন? আপনার নাম?

—অনিলিখা, কিছুদিনের জন্য এসেছিলাম। একটা কাজে। ফিরছি।

—খুব ভালো। আমরা গুজরাটের লোক। লেদারের ব্যবসা আমার। লেদার ওয়ার্ল্ডের নাম শুনেছেন তো? মেনলি ইউরোপে লাক্সারি লেদার জ্যাকেট এক্সপোর্ট করি। একাহাতে পুরো ব্যবসাটা দাঁড় করিয়েছি। ভদ্রলোক বলতেই থাকেন।

কথার ফাঁকে অনিলিখা লক্ষ্য করল এনার কপালেও লাল লাল বিন্দু বিন্দু দাগ।

তাহলে কি ভাইরাসটা সবাইকে প্রথম দিকে বেশি সক্রিয় করে তোলে যাতে একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর তারপরে আস্তে আস্তে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়? ম্যাক্স কোথায়? আবার ওর সিটের নীচে পড়ে থাকা ছোট্ট শিশিটা আড়চোখে দেখল অনিলিখা। নিশ্চিত ওতেই কিছু ছিল।

আর সময় নেই। কোনওভাবেই এ ফ্লাইট ভারতে ল্যান্ড করতে দেওয়া যাবে না। প্লেনের সবাই অলরেডি আক্রান্ত। ল্যান্ড করলেই বাতাসে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে।

হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি মানুষে পৌঁছোতে দেরি হবে না। তা-ও আবার দিল্লি। ভারতের রাজধানী দিয়েই শুরু।

পাইলটের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা। একজন বিমানসেবক এগিয়ে এল অনিলিখার দিকে।

—কিছু লাগবে ম্যাডাম? সিট বেল্ট সাইন এখনি দেওয়া হবে। একঘণ্টার মধ্যে আমরা দিল্লিতে ল্যান্ড করতে চলেছি।

—আপনারা এ প্লেন দিল্লিতে ল্যান্ড করাবেন না।

—মানে? এবার আরও একজন এয়ার হোস্টেস অনিলিখার দিকে এগিয়ে এসেছে।

অনিলিখা একবার আশেপাশে দেখে নিল। কাছাকাছি কেউ নেই। তারপর বলল,—আমাদের হাতে সময় নেই। প্লেনের প্রত্যেকে একটা মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের ওপর টেররিস্ট অ্যাটাক হয়েছে।

নিজের মুখের লাল দাগগুলো দেখিয়ে অনিলিখা বলে চলল,—আমি নিশ্চিত যে আমরা সবাই সংক্রামিত। আমি-আপনি প্রত্যেকে। ভারতে ল্যান্ড করলে আমাদের থেকে লক্ষ লক্ষ

লোকের মধ্যে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। এই ফ্লাইট কতটা কোয়ারান্টাইন করা যাবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এ ভাইরাসের কোনও ভ্যাকসিনও নেই।

—আর ইউ ম্যাড? আর কিছুক্ষণ বাদেই ল্যান্ডিং সিকোয়েন্স চালু হতে চলেছে। আর আপনি বলছেন ভাইরাস? কী প্রমাণ? পাশের এয়ারহোস্টেস কিছু না বুঝেই হেসে চলেছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যাক্স টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখটা উত্তেজনায় লাল। জোর করে হেসে অনিলিখার মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর এয়ারহোস্টেসের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আই নো হার। শি গোজ ক্রেজি অ্যাট টাইমস। ডোন্ট ওরি। আমি সামলে নিচ্ছি।

—খবরদার ম্যাক্স! আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করবেন না।

ম্যাক্সের দিকে আঙুল তুলে অনিলিখা এয়ারহোস্টেসদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—এই সেই টেররিস্ট। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ মি। আমরা আমাদের দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারি না। এক্ষুনি পাইলটের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সব রকম সাবধানতা নেওয়ার পরই প্লেন ল্যান্ড করানো উচিত। না হলে ল্যান্ড করতে দেওয়া উচিত নয়।

অনিলিখা দেখল ওরা দুজনই মুচকি মুচকি হাসছে। ছেলেটা অনিলিখাকে বলল, কুল ডাউন ম্যাডাম। আপনি আপনার সিটে গিয়ে বসুন। আমরা দেখছি ভাইরাসের ব্যাপারটা। বলে যেভাবে হাসল, তাতে পরিষ্কার যে ওরা অনিলিখার কথা বিশ্বাস করছে না।

মেয়েটা বলল,—ইউ মাস্ট গো টু ইওর সিট ম্যাডাম। আপনার ব্যবহার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা ল্যান্ডিং শুরু করছি। এরপর আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব আমরা।

ম্যাক্স পাশে টয়লেটের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে যাচ্ছেন। হাসিটা পালটে গেছে। একদম শয়তানের হাসি। খুব সহানুভূতির সঙ্গে যেন অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছেন।

পুরো বিজনেস ক্লাসের প্যাসেঞ্জার এখন এই নাটক দেখছে। অনেকের মুখেই হাসি। একজন পাগল মহিলার কীর্তি দেখে।

—চলো অনিলিখা, তোমার রেস্ট দরকার। বলে ম্যাক্স অনিলিখার হাত শক্ত করে ধরে টান দিলেন, অন্য হাতটা মাথার উপর তুলে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,—আই অ্যাম সরি। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।

কী সুন্দর নাটক। সবাই ভাবছে অনিলিখার মাথা খারাপ। পাগল।

জ্যাকেটের পকেট থেকে পেনটা বের করে মুহূর্তের মধ্যে ম্যাক্সকে সেটা দিয়ে টাচ করল অনিলিখা। মিঃ পাই-এর দেওয়া পেন কাম ইলেকট্রিক শকগান। 50 মিলিঅ্যাম্পসের শক। ছিটকে ফ্লোরে গিয়ে পড়লেন ম্যাক্স।

এয়ারহোস্টেসরা অবাক হয়ে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন জলজ্যান্ত মহিলা-টেররিস্ট ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

অনিলিখা চেঁচিয়ে বলল,—ভয় নেই, আমি খুব দরকারি একটা কথা শুধু বলতে চাই। শুধু ফার্স্ট অফিসারকে ডাকুন।

বাইরে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে পাইলটের কেবিন থেকে ফার্স্ট অফিসার এমনিতেই বেরিয়ে এসেছিল। অনিলিখা ব্যাগ থেকে ওর বিজনেস কার্ডটা বের করে ফার্স্ট অফিসারকে দিয়ে বলল,—আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে। সময় খুব কম। আমরা মারাত্মক বিপদে পড়েছি।

১৭

কন্ট্রোল, AI111 ডিসেন্ড অ্যান্ড মেনটেন, ফ্লাইট লেভেল 36000।

ক্যাপ্টেন টু কন্ট্রোলঃ ফ্লাইট লেভেল থ্রি-সিক্স-জিরো, AI111, নামার পথে কোনও অসুবিধে নেই তো?

কন্ট্রোলঃ না, মেজর কিছু না। কুড়ি হাজার ফুটের নীচে একটু টার্বুলেন্স আছে।

ক্যাপ্টেনঃ ও.কে। থ্যাংক্স।

ফার্স্ট অফিসার ভেতরে এসে ঢোকে। তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, এনি প্রবলেম? বাইরে এত আওয়াজ হচ্ছিল!

—হ্যাঁ, একজন মহিলা বলছেন আমরা যেন দিল্লিতে ল্যান্ড না করি। প্লেনে সবার মধ্যে নাকি কোনও ডেডলি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। একজন লোককে অজ্ঞানও করে ফেলেছে।

—হোয়াট? ইজ শি আ টেররিস্ট? ইজ শি আর্মড?

—না, না। দেখে তো বেশ শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মনে হয়। বলছেন যে লোকটাকে উনি অজ্ঞান করেছেন—সেই টেররিস্ট। এই আমার আপনার গায়ে মুখে যে লাল লাল দাগ বেরিয়েছে তা নাকি ওই ভাইরাস সংক্রমণের ফল।

ফার্স্ট অফিসারের মুখটা ভালো করে দেখে ক্যাপ্টেন বলে,—মাই গড! এখন কী করা যাবে?

কন্ট্রোল থেকে মেসেজ আসে, AI111, টার্ন রাইট, হেডিং থ্রি ফাইভ জিরো ফর সিকোয়েন্স। মেনটেন টু হানড্রেড অ্যান্ড ফিফটি নটস। এখন ঠিক কত নটস আছে স্পিড?

কাপ্টেন বলল, টু টেন। কিন্তু ল্যান্ডিং সিকোয়েন্স চালু করা যাবে না। ফ্লাইটে একটা প্রবলেম হয়েছে। একজন মহিলা প্যাসেঞ্জার বলছে যে আমরা সবাই নাকি একটা ডেডলি

ভাইরাস ক্যারি করছি। ফ্লাইটের প্রত্যেকে ইনফেকটেড। ল্যান্ড করলে এই ভাইরাস সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।

কন্ট্রোল থেকে শোনা গেল, সে কী? তাহলে একটু ওয়েট করুন, আমি কথা বলছি। ইন দ্য মিন টাইম AI111 একই স্পিড মেনটেন করুক। নাউ টার্ন লেফট—হেডিং থ্রি ফাইভ জিরো।

খানিকবাদে কন্ট্রোল থেকে ফের মেসেজ আসে, আমরা ভেরিফাই করলাম, আমাদের কাছেও একটা একইরকম ইনটেলিজেন্স ইনফরমেশন এসেছে। আমরা এই ফ্লাইট চণ্ডীগড়ের মিলিটারি বেসের দিকে ডাইভার্ট করাব। ওখানে ফ্লাইটকে ঠিকমতো কোয়ারান্টাইন করার ব্যবস্থা আছে। ফ্লাইটে যথেষ্ট ফুয়েল আছে তো? ক্লাইম্ব অ্যান্ড মেনটেন থ্রি এইট জিরো।

পাইলট সম্মতি জানাল।

AI111 দিল্লিতে অবতরণ না করে উড়ে চলল চণ্ডীগড়ের দিকে।

১৮

ছেঁড়া ছেঁড়া ছবিগুলো যেন আস্তে আস্তে চোখের সামনে জুড়তে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা প্রতিবিম্বগুলো যেন আস্তে আস্তে স্থির হতে শুরু করল। কণ্ঠস্বর গুলো যেন অনেক অনেক দূর থেকে আসছে।—অনিলিখা—অনিলিখা।

প্রথমেই চোখের সামনে ধরা পড়ল মিঃ পাই-এর মুখ। সেই সাবেকি চশমার আড়ালে বড় বড় চোখ। ঘাড় অব্দি ঝাঁকড়া চুল। পাশে বিশ্বজিৎদা—চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। তার পাশে ডাক্তার। ঘরে আরও কয়েকজন। সম্পায়ন, তন্ময়, প্রতীক। কিন্তু অনিলিখার ক্লান্ত দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের চিনতে পারল না।

কে যেন বলল,—সেন্সটা আবার ফিরে আসছে। এখন মাঝেমধ্যে এরকম আসবে-যাবে। ও একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে এখনও কয়েকমাস।

অনিলিখা কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু চেনা শব্দগুলো যেন হঠাৎ সব অপরিচিত হয়ে গেছে। কোনও কথাই খুঁজে পেল না।

ডাক্তারবাবু বললেন,—ডাইরেক্টলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে ভাইরাসটা আক্রমণ করে। আর সে জন্যই এই ভাইরাস শরীরে আসা মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

—ওর সুস্থ হয়ে উঠতে আর কত মাস লাগবে? বিশ্বজিৎ জিগ্যেস করল।

—মাস দুয়েক তো বটেই।

—ও কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে?

—হ্যাঁ, অনেকটাই। তবে কতটা বুঝতে পারছে জানি না।

পাশ থেকে মিঃ পাই বলে উঠলেন,—ব্রেনের বেশ কিছু অংশ বিশেষ করে টেম্পোরাল লোব মারাত্মক রকম ড্যামেজ করে ভাইরাসটা। নেহাতই ভ্যাকসিনটা সময়মতো বের করা গিয়েছিল! তা না হলে ওকে আর বাঁচানো যেত না। আরও কত লক্ষ লোকের যে মৃত্যু হত কে জানে!

মিঃ পাই ফের বললেন,—অনিলিখা এই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছ? এর নাম রূপা। আয় মা, কাছে আয়! বলে একটা বছর তেরোর মেয়েকে কাছে টেনে নিলেন।

মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে বললেন,—এর ভাই-এর জন্যই আজ তুমি প্রাণ ফিরে পেয়েছ। শুধু তুমি কেন, তোমার মতো আরও কতজনকে যে ও প্রাণ দিয়ে গেছে কে জানে! খবরের কাগজে ছেলেটার কথা পড়ে প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম। তারপর যখন ওর রক্তকণিকা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে চোখ রাখলাম, মনে হল অমৃতের সন্ধান পেয়েছি। অদ্ভুত এক শ্বেতকণিকার সন্ধান পেলাম ওর রক্তে, যা খুব তাড়াতাড়ি যে-কোনও ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি করে, ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে। ওর ওই শ্বেতকণিকা যেভাবে কাজ করে, তার ওপর নির্ভর করেই আমরা আজকে ওই ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করতে পেরেছি।

মিঃ পাই-এর গলা অবরুদ্ধ হয়ে এল।

—ওর ভাই মারা গেছে কাল রাতে। আমি সবরকম চেষ্টা করেছিলাম। তুমি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলে, তারাও সবাই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুই করা গেল না। ও চলে গেল। মেয়েটা বড্ড কাঁদছে। আমি ওকে বোঝালাম। 'দেখ, আমরা সবাই বোকা। আমরা ভেবেছি যে তোর ভাই বুঝি একটা জড় পদার্থ। অপদার্থ, কোনও কাজের নয়। কেউ বুঝিনি যে ও ঈশ্বরপ্রেরিত। ওর মধ্যে যা আছে তা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নেই। কারুর মধ্যেই নেই। তাই তো ওকে এখানে দেখাতে নিয়ে এলাম।'

পাশে দাঁড়ানো রূপা হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছে।

মিঃ পাই বলেন, আরে বোকা, ফের কাঁদে! দেখলি তো, কেউ আর বলছে না যে তোর ভাই অপদার্থ। চোখের সামনে দেখ, অনিলিখার মতো একজনকে জীবন দিয়ে গেছে ও। আমাদের সবাইকে জীবন দিয়ে গেছে। এ আবার মৃত্যু নাকি? এই ভ্যাকসিনের মধ্যেই ও অমর হয়ে থাকবে।

মিঃ পাই-এর চোখের জল চশমার ফাঁক দিয়ে নেমে আসে। কাছে টেনে নেন বাচ্চা মেয়েটাকে। বলে ওঠেন,—প্রত্যেকেই একটা সময় চলে যায় কিন্তু কেউ কেউ এমন দাগ রেখে যায় যে কখনও তা মুছতে পারে না কেউ। হয়তো প্রত্যেকবার যখন থেমে যাওয়া পথ

শুরু হবে নতুন জীবনে, ফিরে তাকালেই দেখা যাবে এক ছোট্ট শিশুকে, যে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে গেছে, জীবনটুকু তোমার জন্য রেখে।

'ক' এবং কয়েকজন



12 জুন, সন্ধে আটটা, হোয়াইট ক্যাসল, ওয়েলস

ক্যাসলের নীচু পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেই ডেভ বুঝতে পারল লুকোনোর জায়গা এর থেকে ভালো আর আশা করা যেত না। পাহাড়ের একদম ওপরে ক্যাসলটা। চারদিকে নীচু উপত্যকা। ক্যাসলের বাইরে মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু আঙুরের খেত। এ জায়গাটার খবর ও আগেই শুনেছিল। কিন্তু এখানে লুকোনোর কথা আগে কখনও মাথায় আসেনি। শেষ মুহূর্তে এক বন্ধুর কাছ থেকে আইডিয়াটা পেয়েছিল।

হোয়াইট ক্যাসল। কাছাকাছি কোনও জনবসতি নেই। তার পরে এই ক্যাসলের যা দুর্নাম, তাতে এখানে রাতে কেউ আসে না। রাতে এসে অনেকে এখানে উধাও হয়ে গেছে। আর কোনওদিন তাদের দেখতে পাওয়া যায়নি। অনেকে এখানে ছায়ার মতো কাউকে রাতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এগিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেছে হঠাৎ করে কর্পূরের মতো সে লোক উবে গেছে। আর যারাই এখানে থাকতে এসেছে, কিছুদিনের মধ্যে ছেড়ে চলে গেছে।

দুশো বছর আগে এখানে থাকত মরগান পরিবার। কয়লা আর তামার খনি ছিল তাদের। আর তাদের সঙ্গে থাকত শ-খানেক কাজের লোক। রহস্য শুরু তখনই। হিউ মরগানের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, শেষের দিকে ওই ক্যাসলে ভূতের মারাত্মক উৎপাত শুরু হয়। ব্যাপারটা এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে গত দেড়শো বছরে এই ক্যাসলে আর কেউ থাকতে আসেনি। আপন মনে এসব ভেবে হেসে উঠল ডেভ—যতসব ভীতুর দল। আজকের দিনেও কেউ ভূতে বিশ্বাস করে!

ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ওসব ভয় থাকলে চলে না। প্রতি মুহূর্তই সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা। সবসময় মৃত্যুকে ছুঁয়ে মুহূর্তের আনন্দে বেঁচে থাকা। তবে আজকের দিনটা অবশ্যই অন্যরকম। আজকের গুলি চালানোর ঘটনাটা ওর প্ল্যানের মধ্যে ঠিক ছিল না। কী করে যে পুলিশ আগে থেকে ওর এবারের ব্রিস্টলের 'হংকং ব্যাঙ্ক' ডাকাতির প্ল্যানটার খবর পেয়েছিল, আর ফাঁদ পেতেছিল, তাও এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। এতবার পাকা হাতে একাজ ও করেছে। কখনও কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি।

এবারেও গত কয়েক মাস ধরে নিখুঁতভাবে প্ল্যান করেছিল। কিন্তু আজকে ও যখন মুখোশে মুখ লুকিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে রিভলভারটা বার করে কাউন্টারের মেয়েটাকে হুমকি দিচ্ছিল, হঠাৎ ওর অভ্যস্ত চোখ বলে দিল, চারদিক অন্যদিনের মতো নয়। সবাই যেন একটা নাটক দেখছে! এ ঘটনার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত আছে! ব্যাঙ্কের মধ্যে নিশ্চয়ই পুলিশের লোক কাস্টমার সেজে লুকিয়ে আছে। বাধ্য হয়ে ওকে তখন পালানোর জন্যে কয়েকটা গুলি চালাতে হয়েছে। কয়েকজনের পা লক্ষ্য করে, যাতে ও পালাতে পারে। শুধু একজনেরই বুকে গুলিটা লেগেছে।

এসবের মধ্যেও কাজ শেষ না করে ও বেরোয়নি। যথেষ্ট টাকা নিয়ে তবেই বেরিয়েছে। তারপরে কোনওরকমে বেরিয়ে তিনটে গাড়ি বদল করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে পৌঁছেছে। খানিক দূর অব্দি পুলিশের গাড়ি তাড়া করে এসেছিল। কিন্তু তারপরে আর ওর হদিশ পায়নি। এজন্যই সবাই বলে ডেভের নাকি স্টিলের মতো নার্ভ।

ওয়েলসের পাহাড়ি এলাকা অ্যাবারগাভেনির কাছে এই হোয়াইট ক্যাসল। 1000 বছর পুরোনো। এই ক্যাসল একসময় ওয়েলসের রাজাদের ইংল্যান্ডের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আর এখন সেই একই ক্যাসল ডেভকে বাঁচাবে ইংল্যান্ডের পুলিশের হাত থেকে। বাইরের পাঁচিল পেরোনোর পরে ভেতরে একটা বড় মাঠ। পাথরের দেওয়াল নানান জায়গায় ভেঙে গেছে। আর তারই ভেতর দিয়ে ক্যাসলের পিছনের দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়, উপত্যকা, বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার সবুজ খেত।

মাঠের মধ্যে দিয়ে খানিকটা এগোতেই কাঠের ব্রিজটা পড়ল। ক্যাসলের ভিতরের অংশকে বাইরের অংশের থেকে আলাদা করে রেখেছে এটা। মাঝখানে গভীর পরিখা। কেউ আক্রমণ করলে এই কাঠের ব্রিজটা তুলে নেওয়া হত। আর ক্যাসলের ভিতরের দেওয়ালের অজস্র ফোকর থেকে তিরধনুক দিয়ে আক্রমণ করা হত শত্রুসেনার ওপরে। ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মাঝের গভীর পরিখাটা দেখে ভেতরের নির্জনতা বেশ উপভোগ করল ডেভ। ব্রিজটা পেরিয়ে প্রধান টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে ক্যাসলের ভিতরের অংশে ঢুকে পড়ল।

এখন জুন মাস। রাত দশটা অব্দি আলো থাকে। ওর পিঠের ব্যাগে রাত কাটানোর সব সরঞ্জাম আছে। কার্বলিক অ্যাসিড, টর্চ, মোমবাতি, ছোট স্লিপিং ব্যাগ, আর হ্যাঁ, ওই ধাতব জিনিসটাও আছে। আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কালকে স্নোডোনিয়ার পাহাড় পেরিয়ে নিউগেল। সেখান থেকে সমুদ্র পেরিয়ে জলপথে আয়ারল্যান্ডে চলে যাবে ডেভ। আয়ারল্যান্ডে ওর খোঁজ পেতে-পেতে আবার আরেক দেশে পাড়ি দেবে ডেভ। এদিকটা একটু শান্ত হওয়ার পরে আবার কোনও একদিন ফিরে আসা যাবে।

আরেকবার তাকিয়ে নিল। সত্যিই এত নিরিবিলি জায়গা হয় না। মাঝের অংশটা খোলা। চারদিকে চারটে টাওয়ার। এই টাওয়ারের ওপর থেকেই লক্ষ রাখা হত চারদিকে। ভেতরের চারটে টাওয়ারের মধ্যে আজ একটাও অক্ষত নেই। শুধু পাথরের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হল তিনটে টাওয়ারে ওঠা অসম্ভব হলেও একটা টাওয়ার এখনও ব্যবহার করা হয়। যারা ক্যাসল দেখতে আসে তারা ওই টাওয়ারটাই দেখে।

সরু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ডেভ ওপরে উঠে গেল। সরু অন্ধকার সিঁড়ি। ওপর থেকে জল পড়ে পড়ে ভেতরের ঘরগুলো শ্যাওলায় ভরে গেছে। কালেভদ্রে এখানে লোক আসে। আর

তাই ক্যাসলের রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব আছে। বেশ কিছু জায়গায় সিঁড়ির যা অবস্থা, পড়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

তবু তা দিয়ে ওপরে উঠে দূরের দিকে তাকাতেই ডেভ বুঝল কেন এখানে এ ক্যাসলটা বানানো হয়েছিল। পাহাড়ের ওপরে হওয়ায় চারদিকে দশ মাইল অব্দি অনায়াসে দেখা যায়। আর তাই অনেক দূর থেকেই শত্রু সেনাকে দেখা সম্ভব হত।

ডেভ বেশ খানিকক্ষণ দূরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। পাখির ঝাঁক বাড়ি ফিরছে। পড়ন্ত আলোয় চারদিক ভারি সুন্দর লাগছে। জীবনে কম অপরাধ করেনি ডেভ। কিন্তু ভাগ্য সবসময় ওর ওপরে সুপ্রসন্ন থাকায় কখনও ওকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়নি। তবু এই ছুটে-চলা জীবনে চাঁদের আলোয় ভাসা এই উপত্যকার খোঁজ আগে কখনও পায়নি। বেশ খানিকক্ষণ বসার পরে ও টাওয়ারটার ওপর থেকে নেমে এল।

আজকের রাত কাটানোর জন্যে অন্য কোনও টাওয়ারই ভালো হবে। কেউ এখানে এলে সবার আগে এ টাওয়ারেই খোঁজ করবে।

উত্তর দিকের টাওয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে ঢুকতে গিয়েই দেখল মাটির নীচেও একটা ঘর আছে। আরও সরু ও খাড়া এর সিঁড়ি। ও তাই দিয়ে কোনওরকমে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। টর্চের আলোয় ঘরের চারদিকটা ভালো করে একবার দেখে নিল। যতটা নোংরা হবে ভেবেছিল সেরকম নয়। মাঝেমধ্যে কেউ এসে ঘরগুলো পরিষ্কার করে। একটা স্যান্ডউইচ বার করে খেয়ে চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে খানিক বাদে শুয়ে পড়ল। সকাল থেকে কম প্ররিশ্রম আর টেনশন হয়নি। খানিকক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কীসের শব্দ? কেউ খুঁজতে আসেনি তো? অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই ঘরের ভিতরটা ক্ষীণ চাঁদের আলোতেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বাইরের সিঁড়ির দিকে প্রথমে ও তাকাল। নাহ, কেউ নেই। এবার ঘরের মধ্যে অন্যদিকে তাকাতেই হঠাৎ ওর হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল।

ওর থেকে চার ফুট দূরে ওর দিকে তাকিয়ে কে একজন বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো জ্বলছে। ডেভের মতো ক্রিমিনালের অবশ্য ভয় বলে কিছু নেই।

মুহূর্তের মধ্যে পাশে রাখা রিভলভারটাতে হাত রেখে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠল—কে! কে তুই! মরার ইচ্ছে হয়েছে, তাই না? আমার হাতের জিনিসটা দেখেছিস? আমার নাম কী জানিস?

কোনও উত্তর এল না। জ্বলজ্বলে চোখটা যেন আরও কাছে এগিয়ে এল।

রিভলভারটা তাক করে উঠে বসল ডেভ। ফের বলে উঠল—কে?

লোকটা কোনও কথা না বলে হামাগুড়ি দিয়ে ডেভের দিকে আরও এক ফুট এগিয়ে এল। বাইরে থেকে সামান্য আলো এসে পড়েছে। তাতেই লোকটার মুখের খানিকটা আভাস পেল ডেভ। ন্যাড়া মাথা। দাঁড়ি-গোঁফহীন রক্তহীন মুখটায় যেন পাথরের কাঠিন্য।

লোকটা আরও এগিয়ে আসছে।

ডেভ গুলি চালাল। কিন্তু তাতেও লোকটার কিছু হল না। আরেক ফুট এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভের ওপরে। ডেভের মতো শক্তিশালী লোকও কিছুই করার সুযোগ পেল না। জ্ঞান হারানোর আগে ও টের পেল—ওর ঘাড়ে কে যেন দাঁত বসিয়েছে।

3 মে, 1821, সেন্ট হেলেনা আইল্যান্ড

—সম্রাট, আপনি বলেছিলেন আজকে বলবেন পুরো ব্যাপারটা। কুফুর পিরামিডে ঢোকার পরে কী হল?

—আজ থাক। কালকে না হয় বলব। আজকে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। চোখ বন্ধ করলেন নেপোলিয়ন।

আজ নেপোলিয়নের গায়ে রাজকীয় কোনও পোশাক নেই। বিবর্ণ ছেঁড়া পোশাকে ঘরের কোণে শুয়ে ছিলেন। কথা বলতে কষ্ট হয়। এখন খিদেও পায় না। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। আজ সারাদিন জলও খেতে ইচ্ছে করছে না। শুধু খুব ইচ্ছে হচ্ছে মৃত্যুশয্যায় প্রিয়জনদের দেখতে। ইচ্ছে করছে প্রিয় ফ্রান্সের মাটি-আকাশ-বাতাসের স্পর্শ পেতে। কী রোগ হয়েছে, জানা নেই। তবে মৃত্যু যে আসন্ন, তা নিয়ে কারুরই কোনও সংশয় নেই।

রোজ খেতে দিতে আসা এই লোকটাই নেপোলিয়নের একমাত্র আপনজন। একমাত্র কথা বলার লোক।

ফ্রান্সের থেকে অনেক দূরে 'সম্রাট' বলে এই ডাকটা এখনও কেমন যেন উত্তেজিত করে তোলে নেপোলিয়নকে। হ্যাঁ, রোমান সাম্রাজ্য ছাড়া আর কেউ পুরো ইউরোপ জুড়ে ওনার মতো শাসন করতে পারেনি। আর হয়তো ভবিষ্যতেও পারবে না। শুধু কি শাসন? এই সামান্য কয়েক বছরে কী না করেছেন! ফ্রান্স আর ইউরোপের ভবিষ্যৎ-ও বদলে দিয়েছেন।

সেই সম্রাটসুলভ অভিমানটাই কণ্ঠরোধ করা কষ্টকে শেষ মুহূর্তে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, —ঠিক আছে, বলছি। আজই বলছি। এও হতে পারে যে কাল হয়তো আমার আর এল না। আমার সঙ্গেই হয়তো হারিয়ে যাবে এ রহস্য। হয়তো সেটাই ঠিক। তোমাকে বলা যায়। তুমি

বিশ্বাসও করবে না। আর বিশ্বাস করলেও যাদের বলবে, তারা কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না।

একটু থেমে জোরে নিশ্বাস ফেলে ফের শুরু করলেন নেপোলিয়ান—আমি কুফুর পিরামিডে আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হল এরকম ফ্যারাও-এর সমাধি আমার একাই দেখা উচিত। হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেলাম। তারিখটা ছিল বোধহয় 14 জুলাই। উদ্দেশ্য কিংস চেম্বার। অনেক কথা শুনেছি। সেখানেই কুফুর সারকাফাগাসটা বা ওর মমি রাখার বাক্সটা আছে। অবশ্য শুনেছি কুফুর মমিটাকে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার কাছে পথটার একটা আন্দাজ ছিল। মাথা নীচু করে বেশ খানিকটা পথ ভেতরে ঢুকে গেলাম। পথটা কিছু দূরে গিয়ে মিশল একটা চওড়া প্যাসেজে। তারপর পথটা ওপরের দিকে উঠে গেছে। প্যাসেজটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ছোট গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা এগোলাম। তারপরে আরেকটা ঘর এল। তার মধ্যে দিয়ে আরেকটা ঘর। এভাবে বেশ কয়েকটা চেম্বার পেরিয়ে শেষে একটা দশ ফুট বাই কুড়ি ফুট ঘরে ঢুকলাম। লাল পাথরের মেঝে। ঘরের ধারের দিকে একটা লাল গ্রানাইটের সারকাফাগাস। সারকাফাগাসের ডালা ভাঙা। মোমবাতি জ্বেলে খানিকক্ষণ মাটিতে বসলাম। চারদিকে কোনও শব্দ নেই। দমবন্ধ করা পরিবেশ। ঘরের ছাদ বেশ উঁচু।

মনে হল সারকাফাগাসের ভেতরে গিয়ে শুই। ঠিক যেখানে কুফু শুয়েছিলেন, সেখানে। ঢুকে পড়লাম। ওর ভেতরে শুয়ে ঘরের ছাদটা দেখছি, হঠাৎ একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। মনে হল যেন ওপর থেকে নীচে খুব জোরে পড়ে যাচ্ছি। একটা উজ্জ্বল আলো যেন এসে চোখে পড়ল।

কোনওরকমে কফিনে উঠে বসলাম। মোমবাতি নিভে গেছে। কিন্তু ঘন অন্ধকারের মধ্যেই কার যেন একটা উপস্থিতি টের পেলাম।

আমি চিৎকার করে উঠলাম। সে কিন্তু আমার কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু অন্ধকারে তার চোখ জ্বলতে লাগল। সে কথা বলল না, কিন্তু কে যেন আমার মনের মধ্যে কথা বলে উঠল,—ওপরে তাকাও।

উপরে তাকালাম। মাথার ওপরে আর ঘরের ছাদ নেই। তারা খচিত আকাশ। শুধু আকাশটা যেন অনেক কাছে চলে এসেছে।

আবার যেন সে কথা বলে উঠল উপরের দিকে দেখিয়ে—আমরা অনেক দূর থেকে আসি। ওই—ওই দূর থেকে। আমরা তোমাদের জানার চেষ্টা করি। এ গ্রহটাকে জানার চেষ্টা করি। আর এই ঘরটা, এই পিরামিড, আমাদেরই থাকার জায়গা। আমাদের যাওয়া-আসা শুধু

আজকের নয়, বহুদিনের। আর তাই তো আমরাই তৈরি করেছিলাম এ পিরামিড।—চুপ করে গেলেন নেপোলিয়ান।

—এরকম কি সম্ভব সম্রাট? তারপরে?

—বন্ধু, আজকে আর আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবে ওই দিনেই আমি বুঝেছিলাম যে নিজেকে যত বড়ই ভাবি না কেন, অনেক বড় শক্তি আমাদের এই পৃথিবীতেই লুকিয়ে আছে আর আমাদের প্রত্যেকটা গতিবিধি লক্ষ করছে। আর আমার আগে কি আর কেউ তা টের পায়নি?

আমি তো তাই আগেই বলেছি—ইতিহাস হল শুধু সুন্দরভাবে সাজানো কিছু মিথ্যে, যা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি।

জ্বর আসছে। আবার শুয়ে পড়লেন নেপোলিয়ান। ঘরের কোণে।

12 জুন, রাত একটা, হোয়াইট ক্যাসল, ওয়েলস

ডেভকে বেশ কিছুটা রাস্তা ফলো করেছিল ইনস্পেক্টর ইয়ান কিং। কিন্তু তার পরে যে কোথায় গেল, বুঝে উঠতে পারল না ইয়ান। এমন বেপরোয়া ব্যাঙ্ক ডাকাত খুব কমই হয়। প্রায় পনেরো বছর ধরে সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডেভ। পনেরো বছরে 21 বার ব্যাঙ্ক ডাকাতি। কিন্তু প্রত্যেকবার এমন ভাবে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আর ডাকাতির সময় ঠিক করত ডেভ, যে তাকে ধরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল পুলিশ। অবশেষে এবারে পুলিশের ফাঁদে পা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখে ধুলো দিয়ে ও যদি পালাতে পারে, তাহলে আর ইয়ানের চাকরি করার দরকার নেই।

যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই সময় খবর এল ডেভকে দেখা গেছে। ওয়েলসের হোয়াইট ক্যাসলের কাছে। উলটো দিক দিয়ে একটা গাড়ি ডেভকে যেতে দেখে। পরে টিভির খবরে দেখে শনাক্ত করে। সরু রাস্তা। তাই ডেভের গাড়িকে জায়গা দিতে ওই গাড়িটাকে খানিকটা পথ পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। এমনিতে হয়তো খেয়াল করত না। কিন্তু খেয়াল করেছিল এই কারণেই যে ওই সময়ে ওই দিকে কেউ যায় না। হোয়াইট ক্যাসল ছাড়া ওদিকে আর কিছু নেই।

খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে পুলিশগাড়ি আর দুটো পুলিশের কুকুর নিয়ে ওদিকে রওনা হল ইয়ান। পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত একটা। যতই দুর্নাম থাকুক ক্যাসলের, ভেতরে যেতে তো হবেই। ক্যাসলের ভেতরের অংশে ঢোকার পরপরই কুকুরদুটো ছুট লাগাল একটা ভাঙাচোরা টাওয়ারের দিকে।

সেদিকে ওদের পেছন-পেছন যেতে গিয়ে হঠাৎই থেমে গেল ইয়ান। কুকুরদুটোর আর্তনাদ। কী ভয়ানক সেই চিৎকার! তার প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে কুকুরদুটোর দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল। কেউ যেন কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি ইয়ান। ওর সঙ্গে যে দুজন সার্জেন্ট ছিল, তারাও এরকম দৃশ্য কখনও দেখেনি।

আর কিছুটা দূরে ডেভের বিশাল শরীরের কিছু অংশ পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন কামড়ে টুকরো করে দিয়েছে। পুরো ঘরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

যেই থাকুক, সে যে পুরো অজানা অসম্ভব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইয়ান ফোন করে সঙ্গে সঙ্গে আরও পুলিশফোর্স চেয়ে পাঠাল।

সকালে ক্যাসলের ওই টাওয়ারের মধ্যেই একটা গুপ্তঘর পাওয়া গেল। মাটির অনেক নীচে একটা লুকোনো ঘর। বোধহয় অনেক আগে অপরাধীদের ওই ঘরে ফেলে দেওয়া হত। কাউকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও ওই ঘর জুড়ে পাওয়া গেল অনেক কঙ্কাল। ইয়ানের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল, সম্প্রতি এ-ঘরে কেউ থাকত। আর সে খুব সম্ভবত ওই রাতেও ওখানেই ছিল। নির্ঘাত পালিয়েছে। এই কি ক্যাসলের ভূতের কুখ্যাতির মূলে?

18 জুন, বনেরঘাটা জঙ্গল, বিকেল পাঁচটা

তন্ময়ের খুব মন খারাপ। এতটাই খারাপ যে ফুটবল খেলতে না গিয়ে আজকে স্কুলের ছুটির পরে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে অনেকটা দূরে হেঁটে চলে এসেছিল। বাদুরপাড়া, শিমুলতলা, শীতলার থান পেরিয়ে বনেরঘাটা জঙ্গলের দিকে। বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় আধঘণ্টার পথ। ইছামতী নদীর ধারে এ জায়গাটা বিশেষ পছন্দ তন্ময়ের। সুযোগ পেলেই চলে আসে। নিরিবিলি। নদীর জলে পা ডুবিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। নানান ধরনের মন খারাপের চিন্তা নদীর জলে হারিয়ে যায়।

গত কয়েক মাস ধরেই ওর মনে হচ্ছিল বাবা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ করে খুব দরকারি কথা ভুলে যায়। কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। প্রথম প্রথম ওরা মজা করত এটা নিয়ে। বাবা এমনিতেই আপনভোলা ভালো মানুষ। এমনকী রাস্তাও হারিয়ে ফেলে মাঝেমধ্যে। মাঝে মাঝে খুব চেনা লোকের নামও ভুল বলে। প্রতীককে বলে পথিক। এই টাইপের।

পরশুদিন ওদের একসঙ্গে ট্রেনে কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে খেয়ালই করেনি যে বাবা আর কাছে নেই। যখন টেন এল, কিছুতেই ও আর বাবাকে খুঁজে পেল না। ওর সঙ্গে ছিল ওর মা আর বোন। সবাই মিলে অনেক খুঁজেও বাবাকে আর পেল না। ট্রেন ছেড়েই দিল। ট্রেন চলে যাওয়ার খানিক বাদে দেখা গেল বাবা

প্ল্যাটফর্মের একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর বাবার সম্বিৎ ফিরল। আরও খানিকক্ষণ বাদে যেন তন্ময়কে চিনতে পারল।

বলে উঠল—তোকে কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী একটা যেন কাজ ছিল আজ? তোকে স্কুলে যেতে হবে, তাই না?

তখনকার মতো বাড়ি ফিরে এসেছিল বাবাকে নিয়ে।

গতকাল ডাক্তার দেখাতে গিয়ে অসুখটার নাম জেনেছে তন্ময়—অ্যালজাইমার। আরও জেনেছে যে বাবার অবস্থা এখন এমনই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে আর কোনও চিকিৎসাই সম্ভব নয়। খুব শিগগিরি বাবা নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধেও সচেতনতা হারিয়ে ফেলবে। আর কাউকে চিনতে পারবে না। তন্ময়কেও না।

তন্ময় আগে যখন বাবার সঙ্গে স্কুলে যেত, কোনও দরকারি জায়গায় যেত, তন্ময়কে বাবা সমানে বলতে বলতে যেত—বাবাই, যেখানেই যাবি, রাস্তাটা চেনার চেষ্টা করবি। চিরকাল তো আর আমি থাকব না। তোকে অনেক কাজ করতে হবে। সব জায়গা একা একা চিনে যেতে হবে।

তন্ময়ের আজকে মনে হল খুব তাড়াতাড়ি ওকে যেন অনেক বড় হয়ে যেতে হবে। চেনা সেই হাতের মুঠোটা যেন আর হাতের কাছে খুঁজে পেল না। যার হাত ধরে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে এগোনো যেত, সেই থাকবে না যে আর। বাবা নিজেই তো আর চিনতে পারবে না।

আর ওদের চলবেই বা কী করে! বাবা লেখালেখি করে যা সামান্য রোজগার করত, তাও তো কালকে থাকবে না। সকালেই স্কুলে যাওয়ার আগে ও নিজের চোখে দেখে এসেছে। বাবা শূন্য দৃষ্টিতে লেখার টেবিলের সামনে বসে আছে। সামনে লেখার খাতা। তাতে কোনও লেখা শব্দ নেই। শুধু কিছু অর্থহীন আঁকিবুকি আঁকা।

সন্ধে যেন আজ হঠাৎ করে আরও তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে। বিকেলের আলো ওর কৈশোরের মতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরল তন্ময়। একটু অচেনা পথে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। ওকে চেনা-অচেনা সব পথ এখন আস্তে আস্তে চিনতে হবে। যেতে গিয়ে ওর মনে হল খানিক দূরে শিরীষ গাছের কাছ থেকে অনেক পাখির ডাক যেন শোনা যাচ্ছে। ও আর একটু কাছে এগিয়ে গেল। গাছের নীচে মাটির ওপরে একটা সবুজ রঙের বল পড়ে আছে। আর তাকে ঘিরেই যেন পাখিরা ডাকছে। দেখে প্লাস্টিকের মতো মনে হলেও হাতে নিয়ে ওর মনে হল এটা অন্যরকম। স্পঞ্জের মতো। ওপরটা ঠিক মসৃণ নয়। ঢেউ খেলানো। সামান্য গরম। এটা নিয়ে বোনকে দিলে ভারী খুশি হবে। নিশ্চয়ই কেউ এখানে খেলতে এসে বলটা ফেলে গেছে। বলটা হাতে নিয়ে ও বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

19 জুন, কল্যাণগড়

আর কোনওদিন ভবিষ্যৎ জানার ভুল করবেন না অবিনাশবাবু। কী কুক্ষণেই যে তামিলনাড়ু বেড়াতে গিয়ে ভৈথিস্বারা মন্দিরে গিয়েছিলেন! নাদি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী অগস্ত্য মুনি সবার জন্যে একটা তালপাতার ওপরে তাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ লিখে গেছেন। তবে সেসব পাতার মধ্যে অনেকগুলো হারিয়ে যাওয়ায় সবার ক্ষেত্রে তাদের জীবনের সেই ভূত আর ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব হয় না। বুড়ো আঙুলের ছাপ আর জন্ম তারিখের ওপরে নির্ভর করে কার জন্যে কোন তালপাতা খুঁজে বার করা হয়।

তা অবিনাশবাবুর ধারণা হয়েছিল ওনারটা হয়তো পাওয়া যাবে না। হাজার বছর আগে ওনার মতো একজনের ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা যে অগস্ত্য মুনির ছিল, এটাই ওনার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু নাহ। বুড়ো আঙুলের ছাপ আর জন্মদিন জানানোর এক ঘণ্টা পরে খবর পেলেন ওনার জন্য নির্দিষ্ট তালপাতা পাওয়া গেছে।

আর তার থেকে ওনার অতীতের কয়েকটা ঘটনাও নির্ভুলভাবে লোকটা বলে দিল। এমনকী উনি যে ওকালতি করেন, এবং বর্তমানে জমিসংক্রান্ত মামলা করে যে ওনার বেশ ভালো অবস্থা হয়েছে তাও লোকটা বলে দিল। তবে অতীতে থেমে থাকলেই ভালো হত।

লোভ করে ভবিষ্যতের কথা জিগ্যেস করতে লোকটা বেশ খানিকক্ষণ থেমে বলে উঠল—আপনার তো সামনে ভারী বিপদ দেখছি।

—সে কী? কীরকম? কিছু করার আছে?

অবিনাশবাবু ভেবেছিলেন, লোকটা হয় টাকা চাইবে, না হলে নানান ধরনের দুর্মূল্য পাথর, মাদুলি ইত্যাদি দেবে। কিন্তু না। লোকটা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল যে কিছুই করার নেই।

অর্থাৎ এটা বলার মধ্যে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্যও নেই।

কলকাতায় ফিরে অনেক ভেবেছেন এ নিয়ে। বেশ কয়েকদিন মন খারাপ করে বাড়িতেই বসেছিলেন। কীসের বিপদ? কী থেকে আসতে পারে? কবে? সবই প্রশ্ন। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ইচ্ছেমতো গত ক'দিন নানান খাবার খেয়ে ওজনও বাড়িয়ে ফেলেছেন কিছুটা।

অনেক ভেবে উনি দেখলেন একটাই সম্ভাবনা। ওনার প্রতিবেশী মিস্টার পাই। যদি বিপদ আসে তো ওনার কাছ থেকেই আসবে। ওরকম একজন পাগলাটে বিজ্ঞানীর থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয়। যে বিজ্ঞানী বেড়াল আর কুকুরের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়ানোর জন্য আজব সব এক্সপেরিমেন্ট করেন, তার ওপরে কি আর ভরসা রাখা যায়? আর সারাক্ষণ নানান ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন, যার বেশির ভাগেরই ওনার মতে কোনও দরকার নেই।

দু-দুবার তো অবিনাশবাবুরই অজান্তে তাঁর ওপরই পরীক্ষা করেছিলেন। নেহাতই ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছেন।

তাই ঠিক করেছিলেন মিস্টার পাই-এর ধারে-কাছে আর যাবেন না। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।

বাজারে আলু-পটল কিনছেন, হঠাৎই পাশ থেকে গণেশের গলা—স্যার আপনার খোঁজ করছিলেন। আমাকে হয়তো আজকেই পাঠাতেন আপনাকে ডাকতে।

গণেশ হল বিজ্ঞানী মিস্টার পাইয়ের সহকারী। বাইরের সব কাজ গণেশই করে।

গণেশ এমনভাবে কথাটা বলল যেন যেতে না চাইলে জোর করেই ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

তবু হেসে উঠে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন—তা এবার কী ব্যাপার? নতুন কোনও যন্ত্র?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গণেশ।

—গিয়েই দেখবেন। যা কাণ্ডকারখানা হচ্ছে বাড়িতে। এর বেশি তো এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যাবে না। তবে যা হচ্ছে দেখছি, কিছুদিন বাদে আমারই কোনও দরকার থাকবে না।

এটুকু বলে যথারীতি তড়বড়িয়ে গণেশ অন্য দিকে এগিয়ে গেল।

22 জুন, সকাল আটটা, কল্যাণগড়,

নাহ, কৌতূহল এমন একটা জিনিস, যে একবার হলে কিছুতেই সেটাকে জোর করে মুখ বন্ধ করে রাখা যায় না। অবিনাশবাবু যতই মিস্টার পাইয়ের কথা ভোলার চেষ্টা করেন, ততই যেন আরও বেশি করে ওনার কথা মনে পড়ে। আর পেটটা কীরকম গুড়গুড় করে ওঠে। আবার কী নতুন জিনিস আবিষ্কার করলেন মিস্টার পাই! অবশ্য ওনার বেশিরভাগ আবিষ্কারই এমন যে তাতে কারুর কোনও লাভ হবে কি না বলা মুশকিল।

শেষ পর্যন্ত অবিনাশবাবু না গিয়ে আর থাকতে পারলেন না। রোববার সকালে চা খেয়ে মিস্টার পাইয়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন আটটার সময়। বাইরের গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট খুলে গেল। বাগান পেরিয়ে ভেতরের বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, গণেশ আজকে অন্যবারের মতো দরজা খোলেনি। গণেশ ধারেকাছেও নেই। শুধু দেখলেন, সামনের ঘরের দেওয়ালে একটা বড় এলসিডি প্যানেলে একটা তিরচিহ্ন আর তাতে লেখা ফুটে উঠেছে,—ওয়েলকাম অবিনাশবাবু। ড্রয়িং রুমে সোফায় বসুন।

খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও অবিনাশবাবু এই বাড়িতে আসার সময় আজকাল আর অবাক হন না। কোনওদিন ডাইনোসরের বাচ্চা এসে সামনে দাঁড়ালেও বোধহয় অবাক হবেন না। পাই-এর দুনিয়ায় সবই সম্ভব।

সোফায় গিয়ে বসার ঠিক দু-মিনিট বাদে গণেশ উদয় হল। যথারীতি সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, লাল টাই। সুসজ্জিত। মনে হচ্ছে কোনও নামকরা কোম্পানির সি ই ও। এই সবে বোর্ড মিটিং থেকে বেরিয়েছে।

—স্যার এক্ষুনি আসছেন—কথাটাও শেষ করতে পারল না ঠিকভাবে।

কারণ তার পেছন-পেছনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে মিস্টার পাই উপস্থিত। সাদা পায়জামা, কাজ করা কালো পাঞ্জাবি। বড় বড় চোখগুলো কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে ঢাকা। সামনের দিকে চুল একটু কমে এসেছে। পিছনে এখনও ঘাড় অব্দি ঝাকড়া চুল। এসেই বলে উঠলেন,—অনেক দিন বাদে এদিকে যে?

—হ্যাঁ, আসলে একদম সময় পাচ্ছিলাম না। তা সেদিন গণেশের সঙ্গে দেখা হল। ও-ই বলল আপনি নাকি নতুন কিছু—

—হ্যাঁ, টের পাননি?—মিস্টার পাই বলে উঠলেন—আপনার লক্ষ্য নেহাতই কম। এই যে আপনি এলেন, তার খানিকবাদে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। ঘরের ফ্যান চালু হল। আপনি যেখানে বসলেন, সেখানকার সোফাটা আপনার পছন্দমতো নরম হয়ে গেল। এ সবই কিন্তু আবিষ্কারের ফল।

—তাই তো! আগে খেয়াল করিনি।—বলতে গিয়ে থামতে হল অবিনাশবাবুকে। দরজা দিয়ে বাবুর্চি লস্যি নিয়ে ঢুকছে।

—কী করে জানলেন আজকে লস্যি খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল?—অবাক হয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন।

মিস্টার পাইয়ের মুখে গালভরা হাসি।

—যাক, যন্ত্রটা ঠিকঠাক কাজ করছে। আপনার ব্রেন ওয়েভটা তো অত শক্তিশালী নয়, তাই চিন্তায় ছিলাম।—বলে একটু থেমে মিস্টার পাই ফের বলে উঠলেন—এই বইটা দেখেছেন? বলে একটা পুরোনো বই এগিয়ে দিলেন—The Expression of the Emotions in man and Animals.

অবিনাশবাবু একটু ভয়ে ভয়ে বইটা হাতে তুলে নিলেন। সবুজ কাপড়ে বাঁধানো, সোনার জলে লেখা বইয়ের নাম। প্রকাশক John Murray & Co.

—আপনার লেখা?

—আপনি পারেন বটে অবিনাশবাবু। 1872 সালে আমি কোথায়? এটা চার্লস ডারউইনের লেখা বইটার প্রথম এডিশন। দুষ্প্রাপ্য। অনেক দাম। ভেতরের ছবিগুলো দেখুন। মানুষ ভয় পেলে কীরকম মুখ হয়, অবাক হলে কীরকম, গর্বের মুখভঙ্গি কীরকম, হিংসাতে কীরকম, ঘৃণা

করলে কীরকম—নানান অভিব্যক্তির ছবি। ডারউইনের বক্তব্য ছিল এগুলো সব ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে।

—হঠাৎ করে এটা?—বলে অবিনাশবাবু যে মুখটা করলেন সেটাকে কী বলা চলে, সেটা মিস্টার পাইও বুঝতে পারলেন না।

বলে উঠলেন,—ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি। আপনি যেখানে আছেন তার কাছেই কয়েকটা সেন্সর আছে। বেশ কয়েকটা লুকোনো ক্যামেরাও আছে। তারা আপনার ব্রেনওয়েভ স্টাডি করে কম্পিউটারকে জানাচ্ছে। আর সেই অনুযায়ী আমার রোবট রুজু বাকি সব যন্ত্রগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছে। এ বাড়িতে যত যন্ত্র আছে, মাইক্রোওয়েভ, ফ্রিজ, ওভেন, দরজার লক, টিভি, সিকিউরিটি ক্যামেরা, আলো, এসি সবেরই নিয়ন্ত্রণ এখন ওর হাতে।

—মানে! আমার লস্যি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা ও বুঝে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ। শুধু বুঝছেই না। সরাসরি দরকার মতো নির্দেশ দিচ্ছে। তবে কোনটা ও করতে পারে আর পারে না, সেটা অবশ্য আমি নিয়ন্ত্রণ করছি। তবে এর মধ্যেই গণেশকে ও অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। কী বলো গণেশ? আমাকেও সব বলে দিতে হচ্ছে না।

গণেশ একটু ক্ষুণ্ণ হল। বলে উঠল—তবে যাই বলুন স্যার, এখনও রুজুর কিন্তু অনেক ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। ওই তো সকালে আপনার চা তে বেশি চিনি দিতে বলে দিয়েছে। আর কালকে তো ফ্রিজ খুলতেই দিল না। এসব যন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই ভালো।

—তোমাকে কেন ফ্রিজ খুলতে দিল না, সেটা বুঝেছ তো? তোমার ডায়াবেটিস আছে, সেটা ওর জানা। আর এটাও ওর জানা ছিল যে তুমি মিষ্টি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলতে চাইছিলে। ঠিক কিনা!

ফের হেসে উঠলেন পাই,—তবে হ্যাঁ, অনেক ব্যাপারে ও এখনও ভুল করবে। আর সেটাই দেখার। যত দিন যাবে ও তত অভিজ্ঞ হবে। আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এটাই নিয়ম। সমানে শিখে চলেছে। যেটা দরকার সেটা হল অনেক ডেটা পয়েন্ট। অনেক বেশি তথ্য।

গল্প করতে করতে বাইরে দরজার বেল বেজে উঠল। গণেশ উঠে গেল। খানিকবাদে ফিরে এসে বলে উঠল,—একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ও বাচ্চা ছেলে এসেছে। বলছে আপনার সাহায্যের বিশেষ দরকার। আসতে বলব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভেতরে আসতে বলো।

খানিক বাদে ঘরে যারা ঢুকল তাদের মধ্যে ভদ্রলোককে অবিনাশবাবু ভালো করেই চেনেন। ওনার ঘরের অন্য একটা সোফায় বসার পরপরই উত্তেজিত হয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন,

—কৃশানু না? কেমন আছিস? কতদিন বাদে দেখা।

ভদ্রলোক কোনও উত্তর না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মহিলা পাশ থেকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলে উঠলেন—ওর শরীরটা বিশেষ ভালো নয়। সেজন্যই এসেছি। আমরা খুব বিপদে পড়ে এসেছি।

মহিলা হলুদ-কালো একটা তাঁতের শাড়ি পরে আছেন। খুবই রোগা। দেখেই মনে হয় অভাবী।

ছেলেটার দিকে দেখিয়ে বলে উঠলেন,—আমাদের ছেলে তন্ময়। ক্লাস এইটে পড়ে। ওই আপনার কথা শুনেছিল। আমাকে বলল আপনি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারেন।

মিস্টার পাই অবাক হয়ে বলে উঠলেন,—আমি কিন্তু ডাক্তার নই। কী ব্যাপার?

—ওর অ্যালজাইমার হয়েছে। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ভরসা পেলাম না। যে স্টেজে চলে গেছে, তাতে নাকি কিছুই আশা নেই। কিছুই মনে রাখতে পারছে না। আর আমাদের সেরকম অবস্থাও নেই যে আরও বড় ডাক্তারের কাছে যাব। আপনার কথা আগে আমিও শুনেছি। যদি কিছু বলতে পারেন এ ব্যাপারে।

একটু থেমে মহিলা ফের বলে উঠলেন,—দেখতেই তো পাচ্ছেন। এক ছেলে, এক মেয়ে। ওই ছেলেই বড়। ও আগে স্কুলে পড়াত। গত কয়েক বছর স্কুল ছেড়ে লেখালেখি করত। বাংলায়, মূলত কিশোরসাহিত্য। নাম শুনে থাকবেন হয়তো। কৃশানু বোস।

মিস্টার পাই বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, শুনেছি। ওনার লেখা অনেকই পড়েছি। ভালো লেখেন। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছুদিন ওনার লেখা পাই না।

—হ্যাঁ, গত কয়েক মাস ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল যেন ও কিছু মনে রাখতে পারছিল না। আমাদেরই ভুল। ওকে আগে ডাক্তার দেখানো হয়নি। এখন যে কী করা যায়! আমার মনে হল আপনি অনেককে চেনেন। যদি কিছু করতে পারেন।

মিস্টার পাই খানিকক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করলেন কৃশানুবাবুর সঙ্গে। কথা প্রায় ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে এসেছে। আর যা বলছেন তার মধ্যেও কোনও অর্থ নেই। কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলছেন।

পাই একজন চেনা ডাক্তারের নাম-ঠিকানা দিয়ে বলে উঠলেন,—এনাকে দেখাবেন। উনি আমার রেফারেন্সে গেলে টাকা নেবেন না। এ ফিল্ডে তো এখনও তেমন ভালো চিকিৎসা কিছু বেরোয়নি। আর আমি একটা ট্যাবলেট দেব। ওটা রোজ খাওয়াবেন। এটা আমারই আবিষ্কার। তবে এখনও অত ভালো কাজ করছে না। ইঁদুরের ওপরে পরীক্ষা করে ভালো ফল পেয়েছি। বাড়ির বেড়ালটা ভুল করে অন্য বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছিল। তা তার ওপরেও প্রয়োগ করে ভালো

ফল পেয়েছি। তবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। আশা করি তাড়াতাড়ি আরও খারাপ হওয়াটা এটা খেলে একটু কমবে।

কথাটা শুনে মহিলা খুব একটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হয় না।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ করে পাই ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ছেলেটার হাতে একটা সবুজ বল। ওটা দেখিয়ে জিগ্যেস করে উঠলেন—বাহ! বলটা তো ভারি সুন্দর।

—এ বলটা আমি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছি। গত শুক্রবার।

—দেখি।—বলে বলটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন মিস্টার পাই। তারপরে শুধু অস্ফুট বলে উঠলেন—অদ্ভুত। খুব সাবধানে রেখো। আমি হয়তো পরে তোমার কাছ থেকে এটা নেব।

ওরা চলে যাওয়ার পরে পাই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপরে বলে উঠলেন, —অবিনাশবাবু, আপনি বইয়ের ধারেকাছে একেবারেই যান না বুঝি। আপনার বন্ধু কিন্তু বেশ ভালো লেখেন। নেহাত বাংলায় লিখছেন বলে, অন্য ভাষায় লিখলে এত দিনে অনেক বড় বড় পুরস্কার পেয়ে যেতেন। আর আপনারাও ওকে নিয়ে তখন অনেক বেশি মাতামাতি করতেন। আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছে যে উনি হয়তো আর লিখতে পারবেন না। আমাদের বিশাল ক্ষতি। আর ওদের যা অবস্থা দেখলাম। তার মানে এখন কিছুই রোজগার নেই। কিছু একটা করতেই হবে। দেখি আমার ওষুধটা কেমন কাজ দেয়। কিন্তু তার আগে, যার জন্য বলছিলাম—আপনারা অন্য কিছু লক্ষ করেছেন কি?

গণেশ, অবিনাশবাবু দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে "না" জানাল।

—নাহ! কিছুই খেয়াল করছে না গণেশ। যতক্ষণ ওরা ছিল, রুজু কাজ করছিল না। কেউ যেন ওকে থামিয়ে দিয়েছিল। এটা লক্ষ্য করোনি?

—এতজন একসঙ্গে ছিলাম বলে কি?

—না-না, অন্য কিছু।—ভুরু কুঁচকে পাই বলে উঠলেন।—একটা সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব!

23 জুন, বসিরগঞ্জ, রাত এগারোটা

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল তন্ময়ের। দরজার নীচ দিয়ে বাবার লেখার ঘর থেকে আলো আসছে। তাহলে কি বাবা আবার রাত জেগে লেখার চেষ্টা করছে?

আজকে সকাল থেকে অনেকটা সময় বাবা লেখার টেবিলে চুপচাপ বসেছিল। শূন্য দৃষ্টিতে হাতে কালির পেনটা নিয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ। কিন্তু একটা দাগও পড়েনি। বাবা কি আর

কখনও লিখতে পারবে? যে তার ছেলেমেয়েকে চিনতে পারছে না, নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে বসেছে, সে কি আর কখনও পেনের দাগ ফেলতে পারবে?

অবশ্য, এটা বলতেই হবে তন্ময়ের প্রিয় লেখক ওর বাবা। অত সুন্দর করে আর কি কেউ লিখতে পারে? কেউ কি এত টানাটানির সংসারের মধ্যে থেকেও সবাইকে এত সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে পারে? কেউ কি এত সুন্দর করে ভোরের আলো গাছের পাতায় ছড়িয়ে দিতে পারে বাবার মতো? না, পারে না। এ শুধু ওর বাবাই পারে।

আশায় আশায় ও উঠে পড়ল। কোনও শব্দ না করে লেখার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা আলতো করে খুলে পাশের ঘরে ঢুকে ভারি অবাক হল। কম্পিউটার চলছে। এটাতেই বাবা অনেক সময় বসে পড়াশোনা করত। আর ফাঁক পেলে তন্ময় এটাতে বসে গেম খেলত। কিন্তু গত ছ'মাস ধরে কম্পিউটারটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। নতুন কম্পিউটার কিনতে বা এটা সারাতে অনেক টাকা লাগবে। তাই খুব ইচ্ছে হলেও কখনওই সারানোর কথা বলেনি তন্ময়। আর এখন তো আর সেরকম কোনও সম্ভাবনাই ছিল না বললে চলে। তা কে এটা ঠিক করল?

অবাক হয়ে দেখল, শুধু যে কম্পিউটার চলছে তাই না! তাতে কেউ যেন কিছু সার্চ করে দেখছিল। একটা জায়গার ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবি দেখে যদ্দূর মনে হয় বিদেশের কোনও জায়গা। কী সুন্দর পাহাড়, সবুজে ঢাকা উপত্যকা। জায়গাটা কোথায় দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু যেই না মুখটা কাছে এনে দেখতে গেছে, অমনি কেউ যেন তার আগেই স্ক্রিনের ছবিটা পালটে দিল। এখন স্ক্রিনে একটা মরুভূমির ছবি। যেই সেটা ভালো করে দেখতে গেছে, অমনি কে যেন আবার স্ক্রিনের ছবিটা পালটে দিল। এবার পিরামিডের ছবি। মিশরের। ভয়ে বিস্ময়ে কিছুই ভাবতে পারল না তন্ময়।

রাত এখন একটা। মাথার ওপরে ঘড়িটা টিকটিক করে আওয়াজ করে এগিয়ে চলেছে। দূরে জানলার বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল তন্ময়। কেউ নেই।

তাহলে কে করছে? জানলার বাইরে তাকাল তন্ময়। বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ও কি তাহলে স্বপ্ন দেখছে?

নাহ, ঘরের মধ্যে কেউ নেই। আবার কম্পিউটারের সামনে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। কি বোর্ডের দিকে হাত বাড়াতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। হঠাৎ সামনের স্ক্রিনটাতে ঝড়ের বেগে একটার পরে একটা ছবি ফুটে উঠতে লাগল। এত দ্রুত বদলাতে লাগল যে, কোনও ছবিই ভালো করে দেখার উপায় নেই।

হঠাৎ কে যেন কানের কাছে বলে উঠল, আমি কিন্তু তোমার সামনেই আছি। মাথা ঘোরালেই দেখতে পাবে।

চমকে ঘাড় ঘোরালো তন্ময়। নাহ, কেউ তো নেই।

স্ক্রিনটা থেমে গেছে।

ওর চোখ এবার গিয়ে থামল পাশে পড়ে থাকা আধভাঙা ইজিচেয়ারটার ওপরে। ওর ওপরে সবুজ বলটা পড়ে আছে।

আচ্ছা, এটা তো আগে এখানে ছিল না! কোথা থেকে এল! ওর স্পষ্ট মনে আছে শুতে যাওয়ার আগে ওটা খাটের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

হাত দিয়ে বলটা চেয়ার থেকে তুলে নিল তন্ময়। আর তখনই ওর মনে হল বলটা যেন কাঁপছে। কই, আগে তো এটা কখনও মনে হয়নি। কানের কাছে তুলে ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে কি না শোনার চেষ্টা করল তন্ময়। কিচ্ছু না।

অবাক হয়ে ওটাকে নামিয়ে রাখতে যাবে, হঠাৎ ওকে যেন কে বলে উঠল,—ঠিকই ভাবছ। আমিই এসব করছি। আমার নাম ক্র্যাসচিক-ক্রুশনিক। অত শক্ত নাম তুমি বলতে পারবে না। তুমি 'ক' বলেই ডেকো।

ভয়ে বলটাকে দূরে চেয়ারটার ওপরে ছুড়ে ফেলে ফের দূর থেকে দেখতে থাকে তন্ময়। আবার যেন সেই একই গলা।

দূর থেকে কানের কাছে ভেসে আসছে—আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। অনেক দূর। এখন কিছুই বলব না। শুধু জেনে রেখো, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না, আমি এখানে একটা খুব দরকারি কাজে এসেছি। সেটা না করতে পারলে তোমাদেরই বিপদ।

25 জুন, সকাল দশটা, বসিরগঞ্জ হাই স্কুল

তন্ময় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আজকে ওদের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এবার কোনও প্রতিযোগিতাতেই ও নাম দেয়নি। ও খেলাধূলায় তেমন ভালো নয়। বলা যায়, ভালো কি না তাও জানে না। ক'দিনই বা উলটো-পালটা চিন্তাগুলোকে পেছনে ফেলে খোলা মাঠে হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটার সুযোগ পেয়েছে! আর তা ছাড়া ও হেরে যেতে খুব ভয় পায়। শমিত, সুজিত, পার্থ এমন অনেকে আছে ওর ক্লাসে, যাদের সঙ্গে ও কোনওভাবেই পেরে উঠবে না। তা ছাড়া ওদের তো আর বাড়ির কথা ভাবতে হয় না। এ-ও ভাবতে হয় না যে কালকে স্কুলে আসতে পারবে কি না। তন্ময়কে সেটা ভাবতে হয়।

মন খারাপ নিয়ে ও দূর থেকে দেখছিল। আর খানিক বাদেই 200 মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। 4টে হিট, তারপর তাতে যারা উঠবে তাদের নিয়ে ফাইনাল।

—কী, তুমি যাবে না? কেন?

কে যেন কথাটা বলে উঠল পাশ থেকে।

প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই তন্ময় বুঝল এটা ক বলছে। পিঠের ব্যাগের ভিতর থেকে। বলছে মানে অবশ্য কথা বলছে, তা নয়। শুধু ও নিজেই টের পাচ্ছে। ক-এর কথাগুলো শুধু তখনই বোঝা যায়, যখন ও কিছু বলতে চায়। যেন কেউ মনের মধ্যে ঢুকে সরাসরি কথা বলছে। আর তখন কথা না বলে ভাবলেই হল। উত্তরও এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

—আমি তো একেবারেই ছুটতে পারি না। হিটেই বাদ হয়ে যাব।

—আরে, তা বললে হয়! আমি তো আছি তোমার সঙ্গে। কখনও আগেই হাল ছাড়তে নেই। হার-জিত যাই হোক না কেন, সবার আগে নিজের সেরাটাকেই দিতে হয়। তারপরে যা হয় হোক! আমারই তো দেখে ছুটতে ইচ্ছে করছে। নেহাতই আমি ছুটলে মুশকিল হয়ে যাবে বলে ছুটতে পারছি না।

—কিন্তু আমি যদি সবার শেষে শেষ করি?

—তাতে কী এসে-যায়? একজন না একজন তো শেষে থাকবেই।

একটু দ্বিধা নিয়ে ও এগিয়ে গেল 200 মিটার দৌঁড়ে নাম লেখাতে। আর দৌড় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেল যে ও হিটে প্রথম হয়েছে।

ফাইনালে অবশ্য সেরকম কিছু হল না। দশ জনের মধ্যে চারে শেষ করল ও। মনটা আবার একটু খারাপ লাগছিল। ইসস, যদি শুরুটা একটু ঠিক হত, তাহলে হয়তো প্রথম তিনজনের মধ্যেই থাকত। ওর ভাগ্যটাই খারাপ। পরের দিকে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন দু-তিন জনকে পেরোতে পারলেও ও প্রথম তিনে থাকতে পারেনি।

ফিরে এসে পিঠের ব্যাগটা নিতেই ও আবার ক-এর কথা শুনতে পেল।

—খুব ভালো দৌড়েছ। খেয়াল করেছ, তুমি পার্থ আর শমিত দুজনের আগেই শেষ করেছ। যাদের কাছে হারলে তারা সব ক্লাস টেনের। তোমার থেকে অনেক বড়।

—কিন্তু প্রাইজ তো পেলাম না! ভাবো তো, প্রাইজ পেলে বাড়ির সবাই কীরকম খুশি হত! আমার ভাগ্যটাই খারাপ। শুরুটা করতেই কীরকম দেরি হয়ে গেল। ওদের মতো ভালো জুতো থাকলে আরও জোরে দৌড়োতে পারতাম। খালি পায় কি আর সেরকম দৌড়োনো যায়!

—না পারলে সবাই ওরকম অজুহাত দেয়।

একটু রেগে গেল তন্ময়—একে তো তুমি কিছু সাহায্য করলে না, তারপরে আবার আমাকে কথা শোনাচ্ছ। আমি ভাবছিলাম সিনেমায় যেমন দেখা যায়, সেরকম তুমি বুঝি আমাকে জিততে সাহায্য করবে। কোথায় কী?

যেন হাসির আওয়াজ পেল তন্ময়।

—তাই! তোমাদের সিনেমায় সেরকম দেখায় বুঝি! হ্যাঁ, তা অবশ্য পারতাম। কিন্তু আমি কখনোই তা করতাম না। ওটাকে চুরি করা বলে। নিজের চেষ্টায় যা হয়, যতটুকু হয়, সেটাই হল জেতা। যাকগে, মন খারাপ কোরো না। পরের বারে ঠিক জিতবে। তবে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সারা বছর ছোটা অভ্যেস করতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে যেটা ভাবছিল তন্ময়, এবারে বলেই ফেলল—আচ্ছা ক, তুমি কি আমাকে একটা সাহায্য করতে পারবে? আমার খুব দরকার।

—বুঝেছি। তুমি বলবে তোমার বাবাকে ভালো করে দিতে, তাই তো?

—হ্যাঁ, ঠিক। আমার বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি পারবে না, যাতে আবার বাবা একদম স্বাভাবিক হয়ে যায়? আবার লিখতে পারে?

—না, পারব না। ওটা করা উচিত-ও হবে না। সমস্যা থাকা ভালো। সমস্যা না থাকলে আমরা নিজেরাই সমস্যা তৈরি করি। ওই যে তোমাদের নদীগুলো, পাথর ফেললে কি ওরা সেখানেই থেমে যায়? ঠিক আরেকটা পথ বার করে নেয়। আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে তো ওটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে কোনওরকম সমস্যা ছিল না। যা যা জিনিস জানার, আমরা প্রায় সবই জেনে ফেলেছিলাম। অসুখ-বিসুখ কিছুই ছিল না। শরীর খারাপ হওয়ার অনেক আগেই আমরা বুঝে যেতাম কোনও অসুবিধে হতে পারে কি না, আর তার চিকিৎসাও করে ফেলতাম। তাছাড়া শরীরের সব যন্ত্রই মেরামতিও করে নেওয়া যেত ইচ্ছেমতো। কেউ মারা যেত না। সমস্যা যখন থাকে না, তখন আমরা নিজেরাই ইচ্ছে করে অন্য সমস্যা তৈরি করি। আমাদেরও তাই হয়েছিল।

—ক, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—পরে জানাব। এখন জানলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে। তবে যেটা বলছিলাম, আমরা মৃত্যুকেও জয় করে ফেলেছিলাম। সব রকম আনন্দের উপায়ও ছিল আমাদের জানা। যা চাইতাম তাই করতে পারতাম। শুধু যেটাকে জয় করতে পারিনি, সেটা ছিল আমাদের মন। আর তাই আমরা শেষ হয়ে গেলাম।

আবার আগের কথায় ফিরে এল তন্ময়।

—কিন্তু তুমি দ্যাখো না, যদি বাবার জন্য সামান্য কিছুও করা যায়। তুমি যা চাইবে, তাই করব। তোমার কী সব দরকারি কাজ বলছিলে, তাতেও সবরকম সাহায্য করব। শুধু আমার বাবাকে ঠিক করে দাও।

কোনও উত্তর এল না। ক চুপ করে থাকল।

—কীরে তন্ময়? খুব ভালো দৌড়েছিস আজ। আরেকটু হলেই তুই কিন্তু জিতে যেতিস। —দীপ কথা বলতে বলতে ওর দিকে এগিয়ে এল। অগত্যা তন্ময়কেও তখনকার মতো ক-এর সঙ্গে কথা বলাটা বন্ধ করতে হল।

30 জুন, বসিরগঞ্জ

কয়েকদিনের মধ্যেই বাবার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। যে লোকটা সবসময় এত হাসিখুশি থাকত, আজ তার মুখে কোনও হাসি নেই। আর চোখে অচেনা এক দৃষ্টি। যেন কিছুই চিনতে পারছে না। নিজে থেকে হাঁটতেও পারছে না। তাই কখনও তন্ময়, কখনও তন্ময়ের মা ধরে ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। বাকি সময়টা খাটেই শুয়ে থাকছে। কথা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে অস্ফুটে কী সব কথা বলে উঠছে। তন্ময় মন দিয়ে শুনেও কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

আজ সকালেও তন্ময় বাবাকে ধরে পড়ার ঘরে নিয়ে এল। জানলার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছটা উঁকি মারছে। লাল ফুলে ছেয়ে গেছে। এটাই বাবার সবথেকে প্রিয় জায়গা। এখানে বসেই বাবা বেশিরভাগ সময় লেখালেখি করত। এখনও বাবা টেবিলের ওপরে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত রেখে বসল। তারপরে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের গাছটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। চেনা সব শব্দও যেন হঠাৎ করে অচেনা হয়ে গেছে। আর তাই তন্ময়ের মনে হয়, বাবা এখানে খানিকক্ষণ বসলে হয়তো আবার সব মনে পড়ে যাবে। পাশে বসে বাবার লেখা একটা বই পড়তে শুরু করল তন্ময়। আগে এটা দেখলে খুশি হত। এখন যেন বাবা দেখতেও পেল না। যেন চারদিকের সবকিছুই হঠাৎ করে বাবার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে।

লেখা শেষের পরে সবার আগে তন্ময়কেই গল্প পড়ে শোনাত বাবা। তার পরে উদ্বিগ্ন মুখে বসে থাকত। যেন তন্ময়ই গল্পের আসল বিচারক। আর কোনও উত্তর খানিকক্ষণ না পেলে বলে উঠত—ভালো হয়নি, তাই না?

আর তারপর যখন জানতে পারত ভালো হয়েছে, তখন আবার ছেলেমানুষের মতো আনন্দে হেসে উঠত।

আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিন। তন্ময়ের জন্মদিন। তবে এবারের জন্মদিনটা তন্ময় ছাড়া আর কেউ মনে রাখেনি।

বাড়ির এই পরিবেশে মা'র পক্ষেও মনে রাখাটা সম্ভব হয়নি। তাই এবারে কিছুই পাওয়ার আশা নেই। অবশ্য কথাটা খেয়াল হতে নিজে থেকেই লজ্জা পেল তন্ময়। ও শুধু একটা জিনিসই চায়। বাবা যেন আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। ক-কে আবার বলবে যদি ও কিছু করতে পারে।

এ-কথাটা ভাবছে, ঠিক সেসময় হঠাৎ ও যেন পাশ থেকে ক-এর কথা শুনতে পেল।—বাইরে যাবে?

মাথা ঘুরিয়ে দেখল ক নীচে পায়ের কাছে পড়ে আছে।

বাড়িতে সত্যিই খানিকটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। তাই ক-কে সঙ্গে নিয়ে ও রাস্তায় বেরিয়ে এল।

সামনের মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল।

—তা, তুমি যেখান থেকে এসেছ, সে জায়গাটা কেমন?

—ভালো। ভারি সুন্দর সবুজ রঙের আকাশ। সব সময় ঝড় বইছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গরম হাওয়া। আহা, সে যে কী দারুণ ছিল কী বলব?

এগুলো ভালোর পরিচয়! মনে মনে হাসল তন্ময়।

—ছিল মানে? আর নেই?

—না, নেই। তাই তো আমি এখানে। বিশেষ দরকারে।

—তা তোমাদের ওখানে সমস্যা কী ছিল?

—সেটাই তো! কোনও সমস্যা না থাকাটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই না! আর তাই তো আমরা একটা সময় কথা বলাই ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম অন্য আরেকজনের সঙ্গে মেশা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের যোগাযোগের দরকারটাই যেন কমে এল। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

—তা তোমরা কথা বলতে না?

—না, দরকার হত না। ঠিক যেভাবে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সেরকম ভাবেই আমরা আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। আর আমাদের প্রযুক্তি এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে মৃত্যুও আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারত না সহজে। বুঝতেই পারছ, তাতে কী হয়?

—কী হয়?

—আমরা জীবনকে ভালোবাসতে শিখি না। সব থাকলেও আনন্দ পাই না। আর অনেক বাড়তি সময় পড়ে থাকে। তখন একজন আরেকজনের সঙ্গে যুদ্ধ-মারামারিতে মেতে ওঠে। আমাদেরও তাই হল। অন্য একটা গ্রহের সঙ্গে শেষে যুদ্ধ। এক সময়ে আমাদেরই কিছু লোক গিয়ে ওখানে কলোনি তৈরি করেছিল।

—তারপর?

—যা হয় আর কী। দুটো গ্রহই পরমাণু যুদ্ধে ভ্যানিশ। আর কোনও প্রাণ রইল না।

—তাহলে তুমি?

—আমাদের কথা আলাদা। আমি ওখানকার মানুষের কথা বলছি। একটু থামল ক। তারপরে আবার বলে উঠল,—আমার তো আজ কোনও বাড়িই নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আজকে তো তোমার জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে একটু ভালো কাজ কিছু করা যাক। কী ধরনের ভালো কাজ তোমাদের গ্রামে করা যায় বলো তো?

খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল তন্ময়। তারপর বলে উঠল,—আমার মনে হয় তুমিই পারবে। চলো তো আমার সঙ্গে। ওদের আজকে মিটিং আছে ঘোষ পুকুরের কাছে। ওখানে যাওয়া যাক।

—কাদের? কীসের মিটিং?

—ওসব তুমি বুঝবে না। এখানে কে নেতা হবে তা ঠিক করতে ভোট হয়। তা আর কয়েকদিন বাদেই সেই ভোট। তাই সবাই মিটিং করছে।

—কে নেতা হবে তার লড়াই?

—হ্যাঁ। আগের বারে যে জিতেছে, এবারেও সে জিতবে। কারণ সে যাই করুক না কেন, সবথেকে বেশি লোকের ভোট সেই পাবে।

—নিশ্চয়ই সে খুব ভালো কাজ করছে। তাই না?

—মোটেও না। আসলে এখানে সবাই তাকে খুব ভয় পায়। তাকে ভোট না দিলে জানে, এখানে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

—হুম। তাহলে তো বড় সমস্যার কথা। তুমি কী করতে বলছ?

—আমরা আগে তো ওখানে যাই। তারপরে যা করার সব ঠিক করা যাবে।

খানিকবাদে ওরা স্কুলের মাঠে গিয়ে হাজির হল। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে।

বিশু এখানে পরপর তিন বার জিতেছে। এবার হলে চতুর্থ বার। একসময় জমি-বাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করত। এখনও সে ব্যবসা আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছে। বড় গুন্ডার দলও আছে ওর। তারাই নিশ্চিত করে যাতে বিশু বারবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

এবার ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন দীপনবাবু। স্কুলের টিচার। খুব আদর্শবাদী লোক। আশেপাশের লোকেদের অবস্থা, স্কুলের অবস্থা—এসব দেখেই দাঁড়িয়েছেন।

বিশু দীপনবাবুকে উদ্দেশ্য করেই মাইকে বলছিল,—আমি ওকে বলি, যা বাবা অঙ্ক কর। ছাত্র পড়ানো, বোর্ডে যোগ-বিয়োগ করা আর নেতা হওয়া তো আর এক কথা নয়! তোকে কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে? না, বিশু সর্দার। অপরাজিত। সবার সেরা। তা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি বিদ্যাসাগর-সুভাষচন্দ্রর মতো কেউ হত, তাও না হয় বুঝতাম। ঠিক কি না?

হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

বিশুর পাশ থেকে বিশুর বিশ্বস্ত চ্যালা হাতকাটা কালু মুখটা কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বলে উঠল—একবার বলে দেখো গুরু, বিদ্যাসাগরকেও সরিয়ে তোমার পথ ফাঁকা করে দেব।

বিশু কালুর কানের কাছে মুখ এনে বলে উঠল,—না, না, তোকে ভাবতে হবে না। শুনেছি সে অলরেডি আউট হয়ে গেছে।

তারপরে আবার বলতে শুরু করল মাইকে—শুধু শুধু কেনই-বা আর নিজের মানটুকু খোয়াবি। নিজের বউ-ছেলেও ভোট দেবে কি না সন্দেহ। বসিরগঞ্জের সব মানুষ, এমনকী গরু-ছাগলও জানে আমি এ ক'বছরে এখানে কী কাজ করেছি! জেলায় দুশোটা নতুন স্কুল, দেড়শোটা মতো খেলার মাঠ, পঞ্চাশটার মতো নতুন হাসপাতাল। আগে লোকে অসুস্থ হলে রাস্তায় বিনা চিকিৎসায় মরত। এখন সকালে হাসপাতালে হার্ট অপারেশন করে বিকেলে ফিরে ফুটবল খেলছে। কী, ঠিক কি না!

আবার হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

কালু আবার এগিয়ে এসে জল দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল। সংখ্যাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে গুরু! টোটাল 3 টে হাসপাতাল আছে। আর নতুন স্কুল তো হয়ইনি, উলটে বেশ কয়েকটা স্কুল আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

—ধুর, সংখ্যায় কী আসে-যায়! যারা এখানে এসেছে তারা কি আর খাতা নিয়ে মিলিয়ে দেখবে। যারা দেখে প্রশ্ন করার চেষ্টা করবে, তাদের জন্য তুই আছিসই!

এক চুমুক জল খেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বিশু বলতে শুরু করল।—আর আমার অবস্থা তো দেখছেনই।—সাদা পাঞ্জাবির হাতের কাছে ছেঁড়া অংশটা দেখিয়ে বলে উঠল—আমার নতুন পাঞ্জাবির জায়গায় যাতে একটা বাচ্চা ছেলের এক মুঠো ভাত জোটে, তার জন্যই তো আমরা। আমি ছেঁড়া জামা পরেই কাটাব, যতদিন না বসিরগঞ্জে প্রত্যেকে—রহিম ভাই, কানু কাকারাও নতুন জামা কেনার ক্ষমতা রাখছে। কী, ঠিক কি না!

আবার হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

একটু থেমে গলা নীচু করে কালুর দিকে একটু সরে এসে বলে উঠল,—জামাটা আরেকটু ভালো করে ছিঁড়তে বলেছিলাম না!

দূর থেকে এসব দেখে ক বলে উঠল,—লোকটা খুব জনপ্রিয় দেখছি।

—সবই যে মিথ্যে, সেটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

—তাই! দাঁড়াও, ওর মনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। খানিকক্ষণ সত্যি কথা বলুক।

মাইকে ফের শোনা গেল,—বসিরগঞ্জে কী কী করেছি সেকথা কি কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে? জানি, দিতে হবে না। তবু দিচ্ছি। গত বারে কালু বলল, স্কুল-টুল করে কী হবে? শুধু শুধু অত দামি দামি জায়গা অহেতুক নষ্ট করা। অতগুলো বাচ্চার ছেলেবেলা নষ্ট। বড় বড় কবি-লেখকেরা তাই লিখে গেছেন, বদ্ধ জায়গায় শিক্ষা ভালো হয় না। ব্যস, কয়েকটা ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি তুলে দিলাম।

পাশ থেকে কালু নীচু গলায় বলে উঠল,—এসব কী বলছ গুরু!

—থাম, সত্যি বলতে আজ বড় ইচ্ছে করছে। এই যে হিসেব মতো সরকারের এত টাকা খরচ হয়েছে পাবলিক টয়লেট তৈরি করতে, তার জন্য আমরা এত টাকা পেয়েছি, আসলে যে একটাও হয়নি, সেকথাও বলি। টাকা তো গেছে শুধু আমার আর আমার চেনা-জানা লোকেদের পকেটে। কোনও নতুন পাবলিক টয়লেট কি দেখা গেছে? ঠিক কিনা?

হাততালি শোনা গেল। যদিও আগের তুলনায় অনেক কম।

আবার শুরু করল বিশু। ছেঁড়া পাঞ্জাবির তলায় হাত ঘড়িটা দেখিয়ে বলে উঠল,—এটার দাম কত জানা আছে? দশ লাখ। এরকম আরও তেরোটা আছে। বলে কালুকে জিগ্যেস করল, —দেখেছিস সব হিসেবও ঠিক আছে আমার।

আবার সবার দিকে তাকিয়ে মাইকে বলে উঠল,—ওই তোমাদের হাসপাতাল তৈরির টাকা দিয়ে। আচ্ছা, বেঁচে থেকে কী লাভ, যদি ভালো করে না বাঁচা যায়। তার থেকে বিনা চিকিৎসায় মরা ভালো। ওরা বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল ওই কীসব এক্স-রে মেশিন আর নানান সব হাবিজাবি কীসব যন্ত্র কেনার জন্য। অত বড় যন্ত্রর থেকে এটা ভালো। কী, ঠিক কি না?

হাততালি আরও কম শোনা গেল। দূরে কিছু লোক চিৎকার করতে শুরু করেছে।

—আরেকটা কথা, ভোট শুধু আমাকেই দেবেন। না দিলে খুঁজে খুঁজে ঘর থেকে বার করব। অনেক দিন নিজের হাতে মার্ডার করার টাইম পাইনি। শ্মশানে গেলে মনটা আগের সব কথা ভেবে এখনও হু-হু করে। বেঁচেও যেমন তোমাদের কোনও লাভ নেই। মরেও তাই। ভেড়ার চামড়া দিয়েও ভালো পাপোশ হয়। তোমাদের চামড়া দিয়ে তাও হয় না। আর ওই যে দীপন স্যারের কথা ভাবছ, সে আজ আছে, কালকে থাকবে না। একটা ছোট বোমা। দুম। ব্যস, সব শেষ। ঠিক কি না? হাঃ হাঃ হাঃ!

এবারে হাততালি আর শোনা গেল না। প্রচুর হইচই শুরু হয়েছে। কালু-ভুলুরা বিশুকে মাইক থেকে সরানোর চেষ্টা করছে। আর বিশু এখনও মাইক হাতে আঁকড়ে ধরে কথা বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। শেষে মাইকের পাওয়ার কেটে দেওয়া হল।

অবস্থা বেগতিক দেখে তন্ময় ক-কে বলে উঠল,—অনেক হয়েছে। এবার ফেরা যাক।

তারপরে ধানখেতের মাঝের আল পেরিয়ে ছুট দিল তন্ময়। এমন আনন্দ ও আগে কোনওদিন পায়নি। এখনও মনে আছে, ওর বাবা স্কুলে রাজনীতির প্রতিবাদ করায় বিশুর দলের কাছে ছাত্রদের সামনে বেধড়ক মার খেয়েছিল। আর তার পরেই স্কুলের চাকরি অপমানে ছেড়ে দেয় বাবা।

5 জুলাই, রাত একটা, কলকাতা

রাত একটা। এসময়ে ফোন বেজে ওঠা খুব বিরক্তিকর। একবার বেশ খানিকক্ষণ রিং হয়ে থেমে যাওয়ার দু-মিনিট বাদেই আবার ফোন বেজে উঠল। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল অনিলিখা। যদি কারুর জরুরি ফোন হয়।

অনিলিখা এক অনাথ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে। অনেক সময়ে অনাথ আশ্রম থেকে উলটোপালটা সময়ে এরকম দরকারি ফোন আসে। আশ্রমে অনিলিখার বলাই আছে যে-কোনও সময়ে দরকার হলেই যেন ওকে ফোন করে। ওদের নিজস্ব কোনও গাড়ি নেই। আর যেখানে অতজন বাচ্চা থাকে, সেখানে শরীর খারাপ তো আর বলে-কয়ে হয় না। এরকম মাঝরাতে দু-দুবার অনিলিখাকে গাড়ি চালিয়ে অনাথ আশ্রমের আবাসিককে নিয়ে নার্সিং হোমে যেতে হয়েছে।

কিন্তু উঠে ফোনের নাম্বারটা দেখে একটু অবাক হল অনিলিখা। অচেনা নাম্বার। 0044 দিয়ে শুরু। ইংল্যান্ডের। এখন অবশ্য ওখানে সন্ধে সাড়ে আটটার কাছাকাছি। তাই ফোন করাটা তেমন অস্বাভাবিক নয়।

ফোন করতে যাবে, তার মধ্যেই আবার ওই অচেনা নাম্বার থেকে ফোন। ফোন ধরতেই উলটোদিক থেকে স্কটিশ অ্যাক্সেন্টে গলা ভেসে এল।

—হ্যালো, হ্যালো। মে আই টক টু অনিলিখা?

—ইয়েস, স্পিকিং।

—ফিল। ফিল উইস্কি। ডু ইউ রিমেম্বার মি অনি?

ফিল উইস্কি! মানে যার সঙ্গে অনিলিখা একই ইউনিভার্সিটিতে বহু বছর আগে পড়েছে? সেই ফিল! এতদিন কোনও যোগাযোগ হয়নি। এত রাতে হঠাৎ করে!

পরের দশ মিনিট বেশির ভাগটাই অনিলিখাকে ফিলের কথাই শুনতে হল। ওর কোনও কথা শোনারও ধৈর্য নেই। যথেষ্ট উত্তেজিত।

যা কথা হল, সংক্ষেপে তা বলতে গেলে বলতে হয়, ফিল বেশ কয়েক মাস ধরে একটা গোপন প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই রিসার্চ প্রোজেক্টটা মূলত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কয়েকজন প্রফেসর মিলে শুরু করেছিলেন।

কয়েক মাস আগে ওয়েলসের বিখ্যাত টিনটার্ন অ্যাবের কাছাকাছি ওয়াই নদীর ধারে একটা কবরখানা থেকে বেশ কয়েকটা কঙ্কাল পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা আলাদা ভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল। অ্যাবেতে যেসব সন্ন্যাসী থাকত তাদেরই এখানে করব দেওয়া হত, এরকম ধারণা করা হয়েছিল। কার্বন-14 বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ওই কঙ্কাল-এর বয়স প্রায় 1000 বছর। ওই এলাকায় বহু আগে থেকেই জনবসতি ছিল। ওয়েলসের বর্ধিষ্ণু� এলাকা চেপসটাওর মধ্যে এটা পড়ে। তাই ওই সময়ের কঙ্কাল পাওয়াটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জানা যায় তার কঙ্কাল মানুষের মতো মনে হলেও, তার ডিএনএ-এর সঙ্গে মানুষের ডিএনএ-এর কোনওই মিল নেই। সম্পূর্ণ অন্য প্রাণীর। তার পরেই এই প্রোজেক্টের কথা ভাবা হয়।

ইতিমধ্যে প্রায় একই ডিএনএ পাওয়া গেছে নিউ গিনির জঙ্গলে আবিষ্কৃত এক কঙ্কাল থেকে। কিন্তু সে কঙ্কাল আরও অনেক পুরোনো। খুব সম্ভবত দু-হাজার বছর আগের। সেটাও যেভাবে পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়েছে স্থানীয় উপজাতিরা ওই ব্যক্তির পুজো করত। তা নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে আরও অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল। এও জানা গেছে যে অ্যালেকজান্দার দ্য গ্রেট আর নেপোলিয়ানও এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন। মৃত্যুর আগে নেপোলিয়ান একজনকে বলেওছিলেন।

এর মধ্যে কয়েক সপ্তাহের জন্য ফিল ছুটিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে শোনে ওর সতীর্থ তিন বিজ্ঞানী যাঁরা এই রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাঁরা রাতারাতি উধাও। বাড়ির লোকেরাও কিছু জানে না। পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা নিয়মমাফিক অনুসন্ধানও শুরু করেছে। কিন্তু ফিলের ধারণা এ উধাও হওয়ার সঙ্গে রিসার্চের সরাসরি যোগাযোগ আছে। আর তাই হঠাৎ করে অনিলিখার খোঁজ।

অনিলিখার এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আছে। সংকেত রহস্যে অনিলিখার পেরু অভিযানের কথা অনেকেই জানে। একই ভাবে ডারউইনের হারানো ডায়েরির পাতার সূত্র ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের এক অনাবিষ্কৃত দ্বীপে অনিলিখার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথাও ওর কানে গেছে।

ওর বক্তব্য এটা সাধারণ পুলিশের কাজ নয়। এ রহস্যের সন্ধানে অনিলিখার মতো কাউকে খুব দরকার, যার বিজ্ঞানধারণা ও বুদ্ধি বিবেচনা অনেক বেশি।

অনিলিখা প্রথম দিকে যাওয়ার কথা ভাবছিল না। কিন্তু ফিলের মন্তব্যটা ওকে বেশ আগ্রহী করে তুলেছে। ফিল একটু যেন দ্বিধা নিয়ে শেষে বলেছে—কী জানো, আমরা গিনিপিগের ওপরে যেরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, ঠিক সেরকমই আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা

কোনও সভ্যতা হয়তো আমাদের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এখনই এর বেশি আর কিছু বলব না।

তাহলে কি আরও বড় কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়েছে ফিল?

জুলাই মাসে লন্ডন? মন্দ নয়। অনেক দিন অফিসে ছুটিও নেওয়া হয়নি। তবে সঙ্গে কাউকে পেলে ভালো হত।

শুতে গিয়েও ঘুম এল না অনিলিখার। উত্তেজনার রেশ ওর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বারান্দায় বসে আলো জ্বালিয়ে ও বই পড়তে শুরু করল। ন্যাশের নীতির ওপরে ভিত্তি করে এ বই। 'প্রিজনার্স ডাইলেমা'র ওপরে সুবিস্তৃত আলোচনা।

দুজন একই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকা কয়েদিকে জেলের মধ্যে দুটো আলাদা ঘরে রেখে জেরা করা হচ্ছে। দুজনকেই বলা হচ্ছে যে অন্যজনের অপরাধটা পুরোপুরি জানালে আর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করলে যে সাহায্য করবে, তার শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দুজনই অন্যজন কী বলছে তা আগে থেকে টের পাচ্ছে না। দুজনেই যদি অন্যজনের অপরাধ জানিয়ে দেয়, তাহলে দুজনেই বেশি শাস্তি পাবে। আর ওরা দুজনেই অন্যজনের অপরাধের কথা না বললে দুজনেই কম শাস্তি পাবে। কারণ কোনও প্রমাণ থাকবে না। কিন্তু একজন যদি বলে আর অন্যজন না বলে, তা হলে যে পুলিশের সঙ্গে বেশি সহযোগিতা করবে তার শাস্তি কমে যাবে, অন্যজন বেশি শাস্তি পাবে। এটাই হল 'প্রিজনারস ডাইলেমা'র মূল কথা।

একইভাবে দুটো বাজপাখি এক জায়গায় থাকলে, তারা খাবারের জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দুজনেরই জীবন বিপন্ন করে তুলবে। কিন্তু দুটো পায়রার ক্ষেত্রে তা হবে না। সীমিত খাবারের জন্য প্রতিযোগিতা থাকলেও একজন শুরুতে অন্যজনের থেকে খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষে কখনওই একে অন্যকে মারবে না। খাবার ভাগ করে নেবে। তাই তারা বাজপাখিদের থেকে দুর্বল হয়েও একসঙ্গে টিকে থাকতে পারবে। এক জায়গায় খুব বেশি বাজপাখি একসঙ্গে থাকতে না পারলেও, একসঙ্গে অনেক পায়রা এক জায়গায় থাকতে পারবে। আর তারা অন্যদের সঙ্গেও মানিয়ে নিতে পারবে।

মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও কি ন্যাশের এই ভারসাম্য নীতি প্রযোজ্য নয়?

ধরা যাক, দূর গ্রহে গড়ে ওঠা খুব উন্নত কোনও সভ্যতা পৃথিবীর এই মানবসভ্যতার কথা জানতে পেরেছে। সে সভ্যতা কি মানব সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের আগে সম্পর্কের এই ভারসাম্যের কথা ভাববে? না হলে হয়তো দুই সভ্যতাই একইসঙ্গে বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এখন বাইরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাতের আকাশ এখন কালো মেঘের আড়ালে। অনিলিখা উঠে পড়ল বারান্দা থেকে। মহাবিশ্ব এখন মেঘের আড়ালেই থাক।

6 জুলাই, সন্ধে 6টা

—অনিলিখা, আমি মিস্টার পাই বলছি।

—বলুন। অনেক দিন বাদে আপনার ফোন। খুব ভালো লাগল আপনার গলা শুনে।

—শুনতে পাচ্ছ? ফোনে একটু আওয়াজ হচ্ছে। খুব দরকারি কথা আছে।

—দাঁড়ান। দু-মিনিট সময় দিন। বাইরে যা বৃষ্টি হচ্ছে। আমি একটু হেড ফোনটা পরে নিই। এক মিনিট বাদে হেড ফোনটা পরে অনিলিখা বলে ওঠে—হ্যাঁ, বলুন।

—সামনাসামনি কথা হলেই ভালো হত। কিন্তু সময় বিশেষ নেই। তাই ফোনেই বলছি। একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আমাদের লন্ডনে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। পারলে আজকালের মধ্যেই।

—সে কী? কী ব্যাপার বলুন তো? জানি না কাকতালীয় ভাবে যোগাযোগ কি না। তবে অন্য একটা কারণে আমিও ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

—তাই? বাঃ! খুব ভালো কথা!

—কিন্তু কী ঘটনা বলছিলেন?

—বলছি। কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলে, তার মা-বাবার সঙ্গে আসে। বাবার অসুস্থতার জন্য এসেছিল। অ্যালজাইমার। আমার পরামর্শ নিতে। ছেলেটার সঙ্গে একটা সবুজ রঙের বল ছিল। বলটা নিয়ে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল তখনই। কিন্তু তখন নিশ্চিত ছিলাম না।

—কীরকম?

—আমার রোবট রুজুর কথা তো জানো? ওটা এখন আরও অনেক উন্নত। কৃত্রিম বুদ্ধির সাহায্যে ও আজকাল নিজে থেকেই ভেবে নিয়ে অনেক কাজ করতে পারে। তা রুজুকেও খানিকক্ষণের জন্য বলটা যেন অকেজো করে ফেলেছিল।

—সে কী? বলটা ওকে অকেজো করে ফেলেছিল, কী করে বুঝলেন?

—যেরকম কাজ করার কথা ছিল ওদের উপস্থিতিতে, সেভাবে কাজ করছিল না। তবে সন্দেহটা আজকে সত্যি প্রমাণিত হল। ছেলেটা আজকে ওর মা'র সঙ্গে আবার এসেছিল বলটা নিয়ে। বলটা কোনও স্বাভাবিক বল নয়। কী, এখনও জানি না। তবে ওর মধ্যে যেন প্রাণ আছে। ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারে। কারুর সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করতে পারে। কী বলতে চায় তা ইচ্ছে মতো ঠিক বুঝিয়ে বলে দেয়।

—মানে? বল? কথা বলছে?

—ঠিক কথা নয়। এক আশ্চর্যরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা। যখন যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন ও যা বলতে চাইছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, আর ইচ্ছে মতো ওকে জানানোও যায়। আমাকে আজ যেমন বলল ওকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে। অবিলম্বে। না হলে আমাদের সবার নাকি মারাত্মক বিপদ। এতটুকু ও শুধু জানিয়েছে। আর কিছু না। আমাকে এ-ও বলল যেন এ বিষয়ে আর কাউকে কিছু না জানাই। তোমার কথা মনে মনে ভাবতেই ওই ফের জানিয়ে দিল যে তোমাকে একমাত্র একথা জানাতে পারি। এমনকী তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেও ওই বলল। ভাবছিলাম 20 দিন বাদে আমার দরকারি রিসার্চের কাজগুলো শেষ করে তার পরেই যাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেকথা বুঝে ও ফের বলে উঠল,—কাল-পরশুই যেতে হবে। যে করে হোক।

—অদ্ভুত! বলটা কোথা থেকে এসেছে জেনেছেন?

—সেটাই রহস্য। ওর পরিচয় ও জানাতে চাইল না।

—কিন্তু যদি কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে?

—যদি সেরকম কিছু উদ্দেশ্য থাকত তো এমনিতেই অন্য অনেক কিছু করতে পারত। এখানে বলে রাখি আমি নিজে এখন মেশিন টু মেশিন কমিউনিকেশন, হিউম্যান টু মেশিন ইন্টারফেস এসবের ওপরে বেশ কিছু রিসার্চ করছি। আমার গবেষণাও অনেক এগিয়েছে। এমনকী আমার রুজু এখন শুধু বাড়ির সব যন্ত্রের সঙ্গেই যে যোগাযোগ রাখতে পারে তাই নয়, ও আরও অনেক দূর এগিয়েছে। কে কী চায়, মনে মনে কী ভাবছে, সে নিয়েও অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। গণেশের সঙ্গে তো তাই রীতিমতো রেষারেষিও শুরু হয়ে গেছে। তবে ওই বলটার সঙ্গে ওর কোনও তুলনা হবে না। ওটা অনেক আগে এগিয়ে আছে। যতক্ষণ বাড়িতে ছিল রুজুকে কিছুই করতে দিল না।

—বলটা আছে কোথায়?

—আমার কাছেই। ছেলেটার থেকে চেয়ে নিয়েছি। ইতিমধ্যে রুজুর সঙ্গে রীতিমতো ভাব করে ফেলেছে। সকাল থেকে ওদের দুজনের রাজত্বই শুরু হয়ে গেছে এখন আমার বাড়িতে।

—আচ্ছা আপনি কবে যাওয়ার কথা ভাবছেন?

—দু-এক দিনের মধ্যে। তবে আমার তো ভিসা আছে। আগেই পরের মাসের একটা সায়েন্স কনফারেন্সের জন্য ভিসা করে রেখেছিলাম। তা তোমার কী অবস্থা?

—আমারও ভিসা আছে। সেদিক দিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমাকে এক বন্ধুর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হবে। তার এক বিশেষ সমস্যা। সে আমার সাহায্য চায়। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। আমি আপনাকে পরে সে ঘটনা জানাচ্ছি।

আরও মিনিট খানেক কথা হল। কয়েক দিনের মধ্যেই যাওয়া হবে ঠিক হল। তবে একসঙ্গে যাবে কিনা সেটাই সন্দেহ। যাই হোক, ওখানে গিয়ে তারপরে মিস্টার পাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেওয়া যাবে। সবার আগে ওখানে পৌঁছে ফিলের সঙ্গে অক্সফোর্ডে দেখা করতে হবে। ফিল কীসের জন্য এতটা চিন্তিত, সেটা জানতে হবে। তারপরে দেখা যাবে ওই বলের না বলা বৃত্তান্ত। তবে এরকম অদ্ভুতুড়ে জিনিস থাকতে পারে সেটা ভাবাই যায় না!

9 জুলাই, সকাল 7 টা, অক্সফোর্ড

অক্সফোর্ডে পৌঁছোনো মাত্র এরকম খবরের জন্য অনিলিখা প্রস্তুত ছিল না।

এক নতুন অসুখের প্রাদুর্ভাব। গতকাল ওয়েলসে আর ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের বেশ কিছু শহরে এক নতুন অসুখ দেখা গেছে। ব্রিস্টল, কারডিক, নিউপোর্ট, চেপস্টাও শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় একশো জন ভর্তি। এদের সবার উপসর্গগুলোও একই রকম। হঠাৎ করে ভোর বেলা উঠে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তারপরে খুব দ্রুত মেমারি লস। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টিশক্তি হারানো। এরকম কোনও অসুখের কথা কেউ আগে কোনওদিন শোনেনি।

উপসর্গের দিক দিয়ে ক্রুশফেল্ট জ্যাকব ডিসিসের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও এত তাড়াতাড়ি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই অসুখে কিছু হয় না। সেখানে ব্রেনের সক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে। বছর খানেক সময় ধরে। এখানে সেটাই যেন ঘটে যাচ্ছে কয়েক ঘণ্টায়।

কাল সন্ধেবেলা লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে অনিলিখা। সেখান থেকে বাসে অক্সফোর্ড পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই রাতে ফিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। শুধু পৌঁছেছে সেটা ফোনে মেসেজ করে জানিয়ে দিয়েছিল।

ঘুম থেকে উঠে হোটেলের ঘরে 'দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ'-এর প্রথম পাতায় চোখ রাখতেই খবরটা পেল অনিলিখা। হোটেলের ঘরের টিভিতে বিবিসি চালাতেও একই খবর। বেশ কয়েক জায়গা থেকে এখনও খবর আসছে। ইতিমধ্যেই আক্রান্তদের মধ্যে 5 জন মারাও গেছে। কী ভাবে হচ্ছে, সংক্রমণ কী থেকে, সে নিয়ে টিভি চ্যানেলে বেশ কয়েকজন এক্সপার্টকে ডেকে আনা হয়েছে। অবশ্য এখনই কেউ কিছু বলতে নারাজ। 10 ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার এ-ও জানালেন যে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও ঘটনার আকস্মিকতা থেকে তারা টেররিস্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

মিস্টার পাইরা আজকে রাতের ফ্ল্যাইটে আসবেন। ওনার সঙ্গে ওনার প্রতিবেশী অবিনাশবাবুও আসছেন। সঙ্গে বলটাও।

অনিলিখার প্ল্যান, আজকে ফিলের সঙ্গে দেখা করে ফিলের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা শোনা। তারপরে কালকে মিস্টার পাইদের সঙ্গে অভিযানে যোগ দেওয়া। অবশ্য কোথায় যাবে,

কী করবে সবই নির্ভর করবে বলটা কী চায় তার ওপরে। সমস্যা না জেনে রহস্য উদ্ধারের অভিজ্ঞতা এর আগে অনিলিখার হয়নি।

9 জুলাই, দুপুর 1 টা, অক্সফোর্ড বোডলিয়ন লাইব্রেরি

অক্সফোর্ডের এই সুপ্রাচীন লাইব্রেরির মাটির নীচের একটা ঘরে ফিলের সঙ্গে ঢুকল অনিলিখা। 1602 সালে অক্সফোর্ডের এক ছাত্র থমাস বোডলে এই লাইব্রেরি স্থাপন করেন। তখনকার সময় লন্ডনের স্টেশনার্স কোম্পানির সঙ্গে একটা খুব আকর্ষণীয় চুক্তি করে বসে থমাস বোডলে। স্টেশনার্স কোম্পানি তখন ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত যে-কোনও বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব ঠিক করত। ঠিক হয়, স্টেশনার্স কোম্পানির যে-কোনও বইয়ের একটা কপি লাইব্রেরিতে থাকবে।

তা সেই শর্ত আজও বহাল আছে। তারপর থেকে যেখানে যে বই-ই প্রকাশিত হোক না কেন, তার এক কপি ঠিক লাইব্রেরিতে চলে আসে। একটা বড় সময় ধরে এটাই ছিল ইংল্যান্ডের ন্যাশানাল লাইব্রেরি।

সারি সারি আলমারি। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু সিলিং-এর নীচে যে দিকেই তাকানো যায়, শুধু বই আর বই। বিশাল বিশাল কারুকাজ করা কাচের জানলা। খুব সুন্দরভাবে সাজানো বসে পড়ার টেবিল-ডেস্ক। একটা ছোট টেবিলে অনিলিখাকে বসতে বলে খানিক বাদে ফিল একটা বিশাল বই নিয়ে এল। প্রায় দু-ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া, ওপরে চামড়ার কভার। পাতাগুলো পাশ থেকে দেখেই বোঝা যায় প্রচুর পুরোনো।

—উইলিয়াম গিলবার্টের লেখা। উইলিয়াম গিলবার্ট কে জানো তো?—ফিল বলে উঠল।

—হ্যাঁ, উনিই তো প্রথম ইলেকট্রিসিটি কথাটা ব্যবহার করেন। একাধারে ডাক্তার ও বিজ্ঞানী। রানি প্রথম এলিজাবেথের ডাক্তারও ছিলেন বোধহয়। ওনার একটা বইও আছে—ডি ম্যাগনেটে। তাই না?

—একদম ঠিক। উনিই প্রথম বলেন যে পৃথিবী আসলে একটা চুম্বক বা ম্যাগনেট। বিদ্যুতের সঙ্গে চৌম্বকত্বের সম্পর্কও উনিই প্রথম বলেন।

—তা উনি তো আর কোনও বই লিখেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

—এ বইটা 1600 সালে ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল। কী কারণে জানো?

—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলায়?

—ভালোই অনুমান করেছ। কারণ উনি নিজেও হয়তো সেটাই আন্দাজ করেছিলেন যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে থাকতে পারে না। আর সূর্য কখনওই পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে

পারে না। পরে গ্যালিলিও একই কথা এর ওপরে নির্ভর করেই বলেন। কিন্তু বইটা ব্যান হওয়ার পেছনে আসল কারণটা ছিল অন্য।

বইটা ওলটাতে ওলটাতে অনিলিখা বলে উঠল,—এ তো ল্যাটিনে লেখা।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি পড়েছি। প্রত্যেকটা পাতা, প্রত্যেকটা শব্দ পড়েছি। বইটার নাম 'পেরেন্ট্যাম' বা অভিভাবক। খুব আকর্ষণীয় লেখা। সংক্ষেপে মূল বক্তব্যটা বলছি। উনি লিখেছেন এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই উপস্থিত এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার কথা। যারা মহাবিশ্বের রীতি রেওয়াজ ঠিক করে দেয়। অন্য গ্রহতে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাদের অভিভাবকের কাজ করে। লিখেছেন আমরাও তাদেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অঙ্গ। এও লিখেছেন যে তাদের মধ্যে একজন-দুজন মাঝেমধ্যে আমাদের গ্রহে আসে। আমাদের সঙ্গে থাকে। তবে ওরা মানুষের ক্ষতি করতে কখনওই চায় না। যদি ভবিষ্যতে ওদের গ্রহে কোনও জায়গা না থাকে, সেক্ষেত্রে ওরা যাতে পৃথিবী বা পৃথিবীর মতো কোনও গ্রহে থাকতে পারে, তার জন্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এমনকী এ-ও লেখা যে কুফুর পিরামিড ওদের হাতে তৈরি।

—তাই?—হেসে উঠল অনিলিখা।

—দেখেছ। 400 বছর পরেও তুমি হাসছ। তখন এ বই পড়ে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভাবো!—আরেকটা খুব দরকারি কথা আছে এতে। তাতে লেখা, ওরা মনে করে, কোনও জাতি টিকে থাকবে কি টিকে থাকবে না তা নির্ভর করে সে নিজেদের মধ্যে ও অন্য উন্নত প্রাণীদের সঙ্গে একইসঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য কী নীতি বা স্ট্র্যাটেজি নেয়। অর্থাৎ ডারউইনের 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' নয়, 'সারভাইভাল বেসড অন স্ট্র্যাটেজি অফ কো-একজিস্টেন্স'। একসঙ্গে কীভাবে বেঁচে থাকা যায় সেটাই টিকে থাকার সব থেকে বড় কথা।

—আশ্চর্য। এ তো ডক্টর ন্যাশের ভারসাম্য নীতির মতোই হয়ে গেল। আরও বড় স্কেলে।

—ঠিক। কিন্তু এ বই শুধু ব্যান করাই হয়নি, ওনাকে খুনও করা হয়েছিল। এই লাইব্রেরির ভেতরে। বেশিরভাগ লোক অবশ্য জানে উনি প্লেগে মারা গিয়েছিলেন।

—তা, তোমার এখনকার সমস্যাটা কি এর সঙ্গে যুক্ত?

—তাই তো মনে হয়। তোমাকে বলেছিলাম টিনটার্ন অ্যাবের কঙ্কালের কথা। নিউগিনির কঙ্কালের কথা। আমার ধারণা এদের কথাই গিলবার্ট বলেছিলেন। এরা ওই গ্রহের বাসিন্দা যারা কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে এসেছিল।

—কিন্তু তার সঙ্গে তোমার তিন সতীর্থ বিজ্ঞানীর উধাও হওয়াও কি জড়িত?

—হ্যাঁ। প্রায় এক মাস আগে এখানে ওয়েলসের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে এক কুখ্যাত ক্যাসলে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতের মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ কাউকে খুঁজে না পেলেও আমরা খবরটা পড়ে

বুঝি, যে ওই হত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয়। তারপরে আমি ছুটিতে ছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা ওরা তিনজন ওর খোঁজে ওদিকেই গিয়েছিল।

—তুমি সকালের খবরটা দেখেছ? এত লোক একসঙ্গে অসুস্থ?

—হ্যাঁ, সে কথাতেই আসছিলাম। কেন জানি না, মন বলছে, এর পিছনে কিছু একটা বড় রহস্য আছে।

—সন্ত্রাসমূলক কিছু?

—হয়তো নয়। একটা খুব দরকারি তথ্য ওরা খবরে বলছে না। এদের প্রত্যেকেরই ঘাড়ে কিছু একটার কামড়ের দাগ পাওয়া গেছে। আসলে সেটা কী তা না জানা পর্যন্ত যাতে প্যানিক শুরু হয়ে না যায়, তাই ওরা এই তথ্য দিচ্ছে না। প্রশ্নটা হল কীসের কামড়? আর কীভাবে হঠাৎ করে একসঙ্গে এতজনকে কামড়াচ্ছে?

—এটা তুমি জানলে কী করে?

—আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে।

—খুব অবাক হওয়ার মতো ঘটনা!

—চলো, আমরাও ওই সব জায়গা দিয়েই শুরু করি। জায়গাটার ম্যাপটা একটু ভালো করে দেখি। আর একটা খুব অবাক ব্যাপার হল, যে ক'টা জায়গায় লোকেদের এই অসুস্থতা দেখা গেছে, তার কোনওটাই কিন্তু ওই ক্যাসলের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাই না?

—একদম ঠিক কথা। কী যে কামড়েছে তা আমরা জানি না, কীভাবে এত জন একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাও জানি না। কিন্তু এ সবই কিন্তু হোয়াইট ক্যাসলের একশো স্কোয়ার মাইল এলাকার মধ্যে।

10 জুলাই, সকাল 7 টা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মার্টন কলেজের কনফারেন্স রুমে উপস্থিত অনিলিখা, মিস্টার পাই ও ফিল। ওদের সঙ্গে সবুজ বলটাও আছে।

—এরকম জিনিসের কথা আমি ভাবতেও পারছি না। ক-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল ফিল।—এখন তো আপনাদের কারুর সঙ্গে কথা বলছে বলে মনে হয় না।

—হ্যাঁ। কালকে থেকে ও খুব চুপচাপ। মুশকিলটা হল, ও অহেতুক কথা বলতে চায় না। আর আমরা চাইলেও যে ও কথা বলবে, এমনটা নয়। কিন্তু যখন ও চায়, যার সঙ্গে কথা বলতে চায়, সে ঠিক বুঝতে পারবে ও কী বলতে চাইছে।

—আমেরিকায় DARPA বা 'ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সি'-তে এরকম রিসার্চ কিছু হচ্ছে জানি, কিন্তু এ তো ভাবাই যায় না।

অনিলিখা বলে উঠল—মিস্টার পাই-কে তুমি কতটা জানো জানি না ফিল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ওনার ল্যাবের রিসার্চ DARPA-র রিসার্চকে পিছনে ফেলে দেবে। ওনারও এ বিষয়ে অনেক রিসার্চ আছে। একটা অত্যন্ত উন্নত রোবটও ওনার আছে। রুজু নামের। কিন্তু পাইয়ের মতে এর কাছে রুজুও কিছু নয়।

—হ্যাঁ। রুজুকে এর ধারেকাছেও রাখব না। রুজু ব্রেন স্ক্যান করে, মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর অভিব্যক্তি স্টাডি করে বোঝার চেষ্টা করে সে কী চায়। সেই অনুযায়ী কাজ করে। রুজু যন্ত্রদের সঙ্গে বেশি ভালো কাজ করে। টেলিমেটি, সেনসর, ওয়ারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদেরকে জানাতে পারে ও কী চায়। দরকার মতো কাজের নির্দেশও দেয়। আমাদের মতো মানুষের সঙ্গে ও কিন্তু এভাবে কথা বলতে বা কী চায় তা জানতে পারে না। এখানেই ক আলাদা। ক প্রয়োজন মতো আমাদেরকেও খুব সহজে জানাতে পারে কী চায়।

একটু থেমে মিস্টার পাই আবার বলে উঠলেন,—তা এবার আমাদের কাজের কথায় ফেরা যাক। খবরে যা শুনছি পরিস্থিতি একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আরও অনেক জায়গা থেকে ওই একই অসুখের কথা শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে ৪0 জন তো মারাও গেছে।

এখন সংখ্যাটা একশো ছাড়িয়েছে। আমাদের যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

—আমার মনে হয় ক-এর কাছে এর সমাধান সূত্র আছে। ও যদি জানাতে পারে আমাদের কী করা উচিত, কোথায় যাওয়া উচিত, তাহলে খুব ভালো হয়। অবশ্য ওর যদি কিছু এ ব্যাপারে জানা থাকে। আমরা তো এ-ও জানি না ও যেজন্য আমাদের এখানে এনেছে, তার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না—অনিলিখা বলে উঠল।

—কালকে ক-কে দেখছিলাম সারারাত আমার ল্যাপটপে অনেক রিসার্চ করছিল। মনে হয় কিছু খুঁজছিল। কিন্তু শেষে কিছুই জানাল না! পাই খুব অস্থিরভাবে বলে উঠলেন,—মুশকিল হল, সময় নেই হাতে। ও যে কী চায়, তাই তো জানা নেই আমাদের।

অনিলিখা ওর সেলফোনে খবরের দিকে চোখ রেখেছিল। হঠাৎ বলে উঠল,—এই মাত্র খবর এসেছে ওয়েলসের ড্যান-এর ওগভ গুহাতে ষোলো জনের একটা গ্রুপ ঢুকেছিল। ওটাতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট হিসেবে গ্রেড 4 গুহা অভিযান বা কেভিং করার জন্য এসেছিল। দলের প্রত্যেকেই এ ধরনের অভিযানের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিল। আনকোরা গ্রুপ নয়। ওদের সঙ্গে গাইড হিসেবে যে ছিল, সে-ও বেশ অভিজ্ঞ। ভেতরে ঢোকার পরে হঠাৎ করে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ-ছ'ঘণ্টার পরেও কেউ না বেরোনোয় বিশেষ উদ্ধারকারী টিম পাঠানো হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ভেতরে ওদের

প্রত্যেককে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে ওদের ওপরে কোনও প্রাণী আক্রমণ করেছিল। কিন্তু জ্ঞান না ফিরলে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ওদের সবাইকে কার্ডিফ হাসপাতালের এমারজেন্সিতে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও পুরো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এটা গত রাতের ঘটনা। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, ওদের মধ্যেও একই অসুখের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে।

—আশ্চর্য! গুহার মধ্যে আক্রমণ! তারপরে একই রকম অসুখের উপসর্গ!

—আমার মনে হয় সবার আগে ওই গুহাতেই আমাদের যাওয়া উচিত। ওখানেই হয়তো রহস্যের সমাধান সম্ভব।—বলেই থেমে গেল অনিলিখা।

—কী হল? থেমে গেলে!—ফিল বলে উঠল।

ঠোঁটের কাছে আঙুল এনে কথা বলতে বারণ করল অনিলিখা। কে যেন ওর সঙ্গে হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করেছে। এটা কি ক-এর গলা? এতদিনে প্রথম বার। একটা অন্য রকম অনুভূতি। মনের অনেক গভীরে যেন কেউ কথাগুলো সরাসরি পৌঁছে দিচ্ছে।

—ঠিক বলেছ অনিলিখা। ওখানেই যেতে হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

10 জুলাই, দুপুর 2 টো, অক্সফোর্ড

অবিনাশবাবু ক্যামেরা নিয়ে আজকে পুরো অক্সফোর্ড ঘুরে বেড়িয়েছেন। হাজার বছরের ইতিহাস এ ইউনিভার্সিটির। পুরোনো দিনের পাথরের রাস্তাঘাট, বাড়িগুলো দেখলেই সমীহ হয়। প্রায় 36টা কলেজ আছে এর মধ্যে। কলেজগুলোর মধ্যেও রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে।

প্রায় শুরু থেকেই অক্সফোর্ড ইংল্যান্ডের ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের উত্থানের মূলেও এই ইউনিভার্সিটি। এখানেই রাস্তায় 1355 সালে ধর্মীয় কারণে অত্যন্ত প্রভাবশালী আর্চ বিশপ অফ ক্যানটারবারি থমাস ক্রেমনারকে সবার সামনে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই জায়গাটা অবাক হয়ে দেখছিলেন অবিনাশবাবু। মানুষ এত হিংস্র হতে পারে?

এখানকার স্টুডেন্টরা চিরকালই নাক উঁচু টাইপের। আর রাজাও এখানকার ছাত্রদের কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা দিয়েছিলেন। তাই সাধারণ লোক আর এই ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির দুজন ছাত্র ও এক পানশালার মালিকের মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে এখানে বড় রায়টও হয় 10 ফেব্রুয়ারি, 1355-য়। একদিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রধান ও ছাত্ররা, অন্য দিকে অক্সর্ফোড শহরের মেয়র ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশ্যই কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা কোণঠাসা হয়ে যায়। প্রায় 90 জনকে

মেরেও ফেলা হয়। পরে ইংল্যান্ডের রাজা অক্সফোর্ডের এ ঘটনার তদন্ত করেন ও ইউনিভার্সিটির পক্ষে রায় দেন। সেই 1355 সাল থেকে 1825 সাল অবধি প্রতি বছর বছরের ওই দিনে শহরের মেয়রকে ও তার পারিষদবর্গকে শহরের প্রধান রাস্তা ধরে মার্চ করে গিয়ে প্রত্যেক মৃত স্কলারের জন্য এক পেন্স করে দিয়ে আসতে হয় এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ। পরে অবশ্য এটা বন্ধ হয়ে যায়।

তা ইউনিভার্সিটি ঘুরতে ঘুরতে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের ভেতরে ঢুকলেন অবিনাশবাবু। এই একটা কলেজ থেকেই ইংল্যান্ডের 14 জন প্রাইম মিনিস্টার বেরিয়েছে। তা হঠাৎ করে এখানেই দেখা হয়ে গেল মিস্টার পাই ও অনিলিখার সঙ্গে।

এত সুন্দর জায়গায় এসে সারাদিন ধরে কী এত ছোটাছুটি করছেন এরা দুজন, তার কিছুই এখনও মাথায় ঢোকেনি অবিনাশবাবুর। এমনকী এত তাড়াহুড়ো করে অক্সফোর্ডেও আসার কোনও অর্থ খুঁজে পাননি উনি। লন্ডনেই তো কত কিছু দেখার ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাচারল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, লন্ডন আই, বাকিংহাম প্যালেস। তা না, এসেই সঙ্গে সঙ্গে অক্সফোর্ড আসার জন্য দৌড়োদৌড়ি। অবশ্য মিস্টার পাই যে স্বাভাবিক নন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই অবিনাশবাবুর। তা না হলে পুরোটা পথ ফ্লাইটে কেউ অঙ্কের বইয়ে মুখ গুঁজে পড়তে পড়তে আসে! আর তাও আবার অঙ্ক। নতুন কী-ই বা আর জানার থাকতে পারে অঙ্কে?

নেহাতই এতদিন একা বিদেশে আসতে ভয় পেতেন। তাই মিস্টার পাই আসবেন শুনে নেচে উঠছিলেন। ভেবেছিলেন ইংরাজি বলতে অসুবিধে হবে। তা এসে বেশ বুঝেছেন লন্ডনে ব্রিটিশদের থেকেও বাইরের লোকের সংখ্যা বেশি। এত সুন্দর ভাবে সাজানো, চারদিকে ছবির মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে নির্দেশ দেওয়া যে কোথাও কোনও অসুবিধে হয় না।

তা দূর থেকে অনিলিখাই আগে এগিয়ে এসে বলে উঠল,—আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে অবিনাশবাবু। ওয়েলস দু-তিন ঘণ্টার পথ।

—এখানে তো কিছু দেখলাম না।

—দেখবেন। ফিরে এসে দেখবেন। আমরা এখন একটা গুহা দেখতে চলেছি।

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। একদম অন্য রকমের অভিজ্ঞতা হবে।

অবিনাশবাবুকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না, আগেই সেটা পাইকে জিগ্যেস করেছিল অনিলিখা। এ ধরনের অভিযানে অভিজ্ঞতা না থাকলে আর শারীরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সুস্থ না হলে তার পক্ষে যাওয়া সত্যিই মুশকিল।

তা তার উত্তরে মিস্টার পাই হেসে বলেছিলেন,—তোমার কী মনে হয়? ভদ্রলোকের হঠাৎ করে এত সাহস বেড়ে গেল কী করে? যে ভয়ে কোনওদিন ভারতের বাইরে আগে পা রাখেনি, সে একা একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওষুধ দিয়েছি। সাহস বাড়ানোর। ব্রেনের অ্যামিগডেলা বলে একটা অংশ আছে, যেটা কিছুটা নিষ্ক্রিয় করে দেয় ওষুধটা। তাই ওনার ভয়-ডর একদম কমে গেছে। কাল রাতে প্যারাসেলিং-এর কথা বলছিলেন।

—কিন্তু উনি পারবেন তো শরীরের এই ধকল সহ্য করতে! গুহার মধ্যে যাওয়াটা কিন্তু এত সোজা হবে না।

—পারবেন না মানে! পারতেই হবে। এই তো সেদিন আমাকে এসে বলছিলেন স্কুলে নাকি লংজাম্পে আর দৌঁড়ে চিরকাল প্রথম হতেন। আর আমি সারাক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে মাথা খারাপ করি বলে নাকি আমার শরীর-স্বাস্থ্যের এই অবস্থা। এবার ওনার আসল দৌড়টা দেখা যাক।

হোটেলের পথে ফিরতে ফিরতে বাঁ-দিকে লুইস ক্যারলের সমাধি পড়ল।

'Alice's Adventures in Wonderland'-এর রচয়িতাও এই ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অঙ্কের প্রফেসার ছিলেন। তবে তাঁকে এই পরিচয়ে তো অনেকেই চেনে না। এরই সামনের মাঠে এখানের একটা বাচ্চা মেয়েকে লেখা গল্প পড়ে পড়ে শোনাতেন লুইস ক্যারল। আর মেয়েটাকে নিয়ে থেমসে বোটিং করতে গিয়েই প্রথম এ গল্প শোনান। পরে লেখেন। ওনার আসল নাম ছিল চার্লস ডজসন। তবে এখন আর সময় নেই ভালো করে ওনার সমাধি দেখার। ওরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল হোটেলের পথে।

10 জুলাই, রাত ৪ টা, ড্যান-এর-ওগভ, ওয়েলস

অক্সফোর্ড থেকে দক্ষিণ ওয়েলসের এই গুহায় পৌঁছোতে গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। কাছাকাছি বড় শহর সোয়ানসি। সেখান থেকে মাইল খানেক পাহাড়ি পথ পেরিয়ে গুহার কাছে এল ওরা।

জুলাই মাস। এখন রাত সাড়ে ন'টায় সূর্যাস্ত হয়। বাইরে যথেষ্ট আলো থাকে। কিন্তু আজকে ব্যতিক্রম। ফিল আগেই বলেছিল—খুব ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে।

জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ বর্ষার কালো মেঘে ছেয়ে আছে।

গুহায় ঢোকার জন্য যা যা লাগে সব কিছুই ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অনিলিখারা সঙ্গে নিয়েছে স্থানীয় গুহাবিশারদ বা স্পিলিওলজিস্ট নীল ক্লার্ককে। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল, রীতিমতো রাগবি খেলোয়াড়দের মতো তাগড়াই চেহারা নীলের। নীল গুহার সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত। গুহার সব জায়গা কখনও কারুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবু নানান সময়ে গাইড হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে এসেছে। গুহায় ঢোকার অনেক পথই ওর চেনা।

তবে ওই গুহার ভেতর দিয়ে প্রায় পনেরো মাইল নানান দিকে যাওয়া যায়। আর কিছু কিছু জায়গা প্রায় একেবারে দুর্গম। তাই অনেক জায়গা আছে যা ওর কাছেও সম্পূর্ণ অচেনা।

আজকের অ্যাক্সিডেন্টের পরে গুহা দর্শকদের জন্য পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুহায় ঢোকার কোনওরকম অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। তাই ওরা ঠিক করেছে, অন্য কোনওদিক দিয়ে গুহাতে ঢুকবে। নীলের একটা পথ জানা আছে। বেশ দুর্গম। আর তাই খুব কম লোকই ওই পথটা জানে। আজকে গুহায় ঢোকার অন্য সব পথ বন্ধ থাকবে।

মিস্টার পাই ভেতরে ঢুকবেন না। বাইরেই ক্যাম্পে থাকবেন। দরকার মতো অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ভেতরে ঢুকবে অনিলিখা, ফিল, নীল আর অবিনাশবাবু। অনিবাশবাবু প্রায় নাছোড়বান্দা। ভেতরে যাবেনই। পাই-এর ওষুধের এফেক্ট একটু বেশিই কাজ করেছে ওনার ওপরে। মাঝে একবার বলেও উঠলেন,—শুনেছি গুহায় কাঁকড়া বিছে থাকে। কী দারুণ হবে হাতে নিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা, তাই না?

তবে এই সাহস আর উৎসাহ কতক্ষণ থাকে, সেটাই দেখার!

গাড়ি দূরে রেখে ওরা পাহাড়ি পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটল। পথ বেশ খাড়া নীচের দিকে। দু-দিকে রোডোডেনড্রন আর পাইনের ভিড়। রোডোডেনড্রন গাছগুলো বেগুনি থোকা থোকা ফুলে ভরা। একটা মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। উঁচু গাছের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে জোর বৃষ্টিও মাটি অবধি পৌঁছোতে পারছে না। তবে পাতার ফাঁক দিয়ে সমানে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে চলেছে। রোডোডেনড্রনের ফুলের গন্ধে উড়ন্ত পোকাদের ভিড় বেড়েছে। চারদিকে নানা রঙের ফুল। সাদা, গোলাপি, বেগুনি, নীল। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পরে ওরা একটা ঝরনার কাছে এল। তার মধ্যে দিয়ে গুহায় ঢোকার এই অপরিচিত পথ। ছোট গর্ত। আর সেটাতে পৌঁছোতে হলে ঝরনার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। ওখানে গুহার মুখের কাছাকাছি কোনও জায়গায় মিস্টার পাই ক্যাম্পে থাকবেন। সবার হাতে ওনার নিজের হাতে তৈরি রেডিয়োট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে যে-কোনও সময়ে গুহার মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান বোঝা যায়। অনিলিখারা গুহার ভেতরে যাওয়ার উপযুক্ত পোশাক পরে নিল। পায়ে গামবুট, মাথায় টর্চ লাগানো হেলমেট। আরও দুটো লাইট। দড়ি। স্কুবা ডাইভিং-এর সরঞ্জাম। গুহার মধ্যে জল থাকবে অনেক জায়গায়। গুহার মধ্যে সাঁতারে অনেক বিপদ থাকে। সবথেকে বড় বিপদ পথ হারিয়ে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু। তাই একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারও সঙ্গে নিয়েছে নীল। প্রত্যেকের পিঠে ব্যাগ। অনিলিখার ব্যাগের মধ্যে ক আছে।

সামনে নীল, সবার পিছনে অনিলিখা। ঝরনার ভেতর দিয়েই ওরা ঢুকল। ঢোকার পরে বেশ খানিকটা কোমর অবধি জল। জলের মধ্যে কয়েকটা স্যালামান্ডার আর অন্ধ ক্রেফিশও চোখে

পড়ল অনিলিখার। স্যালামান্ডার জলে আর ডাঙায় দু-জায়গাতেই থাকতে পারে। খানিকটা টিকটিকির মতো দেখতে। সাদা। গুহার ভেতরে খুব অন্ধকার থাকে বলে গুহাবাসী অনেক প্রাণীই চোখে দেখে না। স্পর্শের ওপরে নির্ভর করে। তাদের রংও বেশির ভাগেরই হয় সাদা। যারা গুহার মধ্যে যাতায়াত করে যেমন শেয়াল, প্যাঁচা, বাদুড় তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

খানিকটা এগোনোর পরে আস্তে আস্তে জল কমে এল। তিন-চার হাত চওড়া পথ। মাথার ওপরে গম্বুজের শেপের গুহার ছাদ। হঠাৎ করে কোথাও জলের গভীরতা বাড়েনি। বেশ খানিকটা হেঁটে ওরা একটা চাতালে গিয়ে উঠল। এখানে জল শুধু হাঁটু অবধি। বড় ছোট নানান পাথরে ভর্তি। ওপরে দেওয়াল থেকে অনেক স্ট্যালাকটাইট ঝুলছে। ধারালো ছুরির মতো। এ ধরনের লাইমস্টোনপ্রধান গুহায় স্ট্যালাকটাইট আরও বেশি হয়। গুহার মেঝে থেকে অনেক স্ট্যালাগমাইট জলের ওপরে মাথা তুলেছে।

সামনের পথ খুব সরু। ওরা এগিয়ে চলল। খানিক বাদে পথটা এতটাই সরু আর নীচু হয়ে গেল যে শুয়ে পড়তে হল। বুকে ভর করে প্রায় একশো মিটার এগিয়ে গেল ওরা। পথ উঁচু-নীচু। জায়গায় জায়গায় পথ হঠাৎ করে বেঁকে গেছে। হেলমেটের আলোতেই যেটুকু দেখা যায়। গুহার দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে, ভেজা। দু-একটা উচ্চিংড়ে আর মাকড়সাও চোখে পড়ল। কিছু কিছু জায়গায় শরীর বেঁকিয়ে দুটো পাথরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে হল। বাঁকগুলোতেই অসুবিধে। কারণ দরকার মতো ঘুরে উলটে ফের চিত হয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

এরকম একটা জায়গায় অবিনাশবাবু শরীর বেঁকিয়ে ঘুরতে গিয়ে খুব বাজে ভাবে আটকে গিয়েছিলেন। শেষে পিছন থেকে অনিলিখা জুতোটা খুলে নিল, যাতে পা বেঁকাতে না অসুবিধে হয়। আর ওনার শরীরটাকে সামনের দিক থেকে তারপরে টেনে তোলা হল। অনিলিখাকেও ওই জায়গায় হেলমেট খুলে বেরোতে হল। অনেকক্ষণ ওই সরু অন্ধকার জায়গায় আটকে ছিল বলে অনিলিখার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। এর আগে কলোরাডোতে আর ভারতের নানান জায়গায় গুহায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা ওর আছে। কিন্তু তবু এরকম অভিযানে আগে কখনও এসেছে বলে মনে পড়ল না। নীল নিজেও এ-পথে একবারই এসেছে।

এই সরু পথটা গিয়ে একটা বিশাল চেম্বারের মতো জায়গায় শেষ হল। অনেক ওপরে গুহার ছাদ। তবে গুহার মেঝেটা সমতল নয়। উঁচু-নীচু পাথর বেয়ে এগোতে হচ্ছিল। খেয়াল রাখতে হচ্ছিল যাতে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা স্ট্যালাগমাইটগুলো নষ্ট না হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এগুলো গড়ে ওঠে। নষ্ট করতে মিনিটও লাগে না। এখান থেকে দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে। নীল একটা পথ দিয়ে এগোচ্ছিল। চেনা পথ।

হঠাৎ ক অনিলিখাকে বলে উঠল,—অন্য পথে যেতে হবে।

—কেন?

—যাকে তোমরা খুঁজছ, সে ওই পথে।

অনিলিখারা অন্য পথ ধরল। এটা ওপরের দিকে উঠে গেছে খানিকটা। তার পরে আবার নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। পাথুরে পথ। ছোট-বড় পাথরে ভর্তি। চার-পাঁচ ফুট উঁচু গুহার ছাদ। তাই সোজা দাঁড়ানোর উপায় নেই বেশির ভাগ জায়গায়।

দূরে জল পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও বাইরে থেকে গুহার মধ্যে জল ঢুকছে। মাটির ওপরের অ্যাসিডিক জল বহু হাজার বছর ধরে লাইমস্টোন গলিয়ে অনেক সময় টানেল তৈরি করে নেয়। আর তাই দিয়ে জল ঢোকে গুহায়। আর যেখানে এ ধরনের আওয়াজ পাওয়া যায় তার কাছেই গুহার মধ্যে লেকও থাকে।

ফিলেরও অনিলিখার মতো দুর্গম গুহায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। তবে বারবার অসুবিধেয় পড়েছেন অবিনাশবাবু। তবে তারমধ্যেই গুনগুন করে 'একলা চলো রে' গানটা গাওয়ার চেষ্টা করছেন। ওষুধের ফল বলাই বাহুল্য। নীল বলে দিল, এ পথে আগে ও কোনওদিন আসেনি। তাই সামনে কী আছে তা ওর সম্পূর্ণ অজানা।

গুহার ছাদের উচ্চতা আসতে আসতে কমে এসেছে। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পরে ওরা হঠাৎ দেখল পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেটা গুহার একটু ওপরের দিকে। আর সামনে পথ নেই। সেটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে নীচের দিকে গুহার মধ্যে দিয়ে সাঁতরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। একমাত্র নীলের পিঠে সরু অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে। নীচে জলের গভীরতা বোঝারও কোনও উপায় নেই। হয়তো এর মধ্যে দিয়ে অনেকটা সাঁতরেও যেতে হতে পারে। সবার আগে তাই নীল জলের মধ্যে নেমে পড়ল। না, বুক অবধি জল। গামবুট খুলে জলে সাঁতারের জন্য বিশেষ জুতো পরে ওরাও নীলের পেছন-পেছন জলের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ল। তারপরে হালকা জলস্রোত ধরে এগিয়ে চলল জলের মধ্যে দিয়ে। মাঝেমধ্যে একটু সাঁতরাতে হচ্ছে। কিন্তু গুহার ছাদ ক্রমশ নীচু হয়ে গেছে। এক জায়গায় এসে ওরা থেমে গেল। জল আর গুহার ছাদের মধ্যে গ্যাপ মোটে একফুট।

হঠাৎ নীল বলে উঠল,—আর এগিয়ো না। তোমরা সবাই সাঁতার ভালো জানো তো?

অবিনাশবাবু বলে উঠলেন,—হেদুয়াতে ছোটবেলা থেকে সাঁতার কেটে আসছি। কুছ পরোয়া নেই। ডুব সাঁতারে দরকার হলে কয়েক মাইল চলে যাব।

এ ধরনের গুহার মধ্যে সাঁতার কেটে যাওয়ার জন্য অন্য ধরনের ট্রেনিং দরকার। সেটা অনিলিখা আর অবিনাশবাবুর নেই। হঠাৎ পায়ের নীচের মাটি যেন হারিয়ে গেল। গভীরতা

বেড়ে গেছে। হাতে জোরালো টর্চ নিয়ে ওরা সাঁতরে খানিকটা এগিয়ে ছোট পাথরের ওপরে এসে দাঁড়াল।

নীল একটু বড় নিশ্বাস নিয়ে বলে উঠল,—নাহ। আর সামনে যাওয়ার উপায় নেই। ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল ওরা। জল যেন ওদেরকে তাড়া করে আসছে। জল আর গুহার ছাদের মধ্যে ব্যবধান আরও কমে গেছে। এখন বড়জোর আধ ফুট ব্যবধান। আর যে পথে এসেছে, তাতে কোনও ভাবেই পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠে ওই ছোট সুড়ঙ্গ পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। হয়তো ওখানেও জল পৌঁছে গেছে। জল ঢুকলে আর তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

ফিলের মতো ডাকাবুকো লোকও ভয় পেয়ে গেছে! বলে উঠল,—একে হাইড্রোফোবিয়া বলে। বাইরের বৃষ্টিতে জল ঢুকে গুহা ভেসে গেছে। জল আরও বাড়বে। কিছুক্ষণ বাদে হয়তো পুরো গুহার নীচের অংশ জলে ভেসে যাবে। আমরা কেউ তখন নিশ্বাস নিতে পারব না।

নীলও বেশ নার্ভাস। তবু বলে উঠল,—আমি একটু সাঁতরে দেখছি সামনে কোনও উঁচু পাথর আছে কি না, যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। কিন্তু আমাকে এবার অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে এগোতে হবে। তোমরা এখানেই দাঁড়াও।

কী হতে চলেছে তা অনিলিখাও টের পেয়েছে। গুহাতে এভাবে অনেকেই প্রাণ হারায়। এমনকী জলের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে তাদের আপ্রাণ চেষ্টার কথাও ও আগেই শুনেছে। ওরা ওখানেই গলা জলে দাঁড়িয়ে রইল নীলের ফিরে আসার অপেক্ষায়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। জল আরও বাড়ছে। জল আর ছাদের মধ্যে আর মোটে তিন ইঞ্চির তফাত। কোনও রকমে শরীর জলে ভাসিয়ে রেখে নাকটা বাইরে রেখে নিশ্বাস নেওয়া হচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে নীল ফিরে এল। কোনও রকমে মাথা তুলে বলল,—পেয়েছি। সামনে একটা বড় চেম্বার আছে। কিন্তু প্রায় 50 মিটার দূরে। বড় নিশ্বাস নিয়ে এক নিশ্বাসে মাঝের পথ পেরোতে হবে। পথ ভুল করলে নিশ্চিত মৃত্যু। আমাকে লক্ষ্য করবে। আমার কাছে সিলিন্ডার আছে।

এতটা! এক নিশ্বাসে। অবিনাশবাবুর সবথেকে বেশি অক্সিজেন দরকার হবে। তাই ওনাকে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা দিয়ে শেষ বড় নিশ্বাস নিয়ে ওরা সাঁতরাতে শুরু করল। পারবে তো ওরা পৌঁছোতে? নীলের মনে রাখার ওপরেই যা ভরসা। ভুল পথে গেলে আর জলের থেকে বেরোতে পারবে না। জলের মধ্যে দিয়ে জোরালো টর্চের আলোয় যতদূর দেখা যায়, শুধু জল

আর জল। আর তার মাঝে পথ আগলে নানান আকারের পাথর। মাঝেমধ্যে উলটো দিক থেকেও স্রোত আসছে। আরও বেশ কয়েকটা পথ নানান দিকে চলে গেছে।

কোনওরকমে মাঝের পথটা পেরিয়ে নীলকে ফলো করে ওরা অবশেষে একটা উঁচু পাথরের সন্ধান পেল। তারপরে পাথর বেয়ে বেয়ে যতটা সম্ভব উঁচু একটা পাথরে গিয়ে বসল ওরা।

তবে এই পাথরও নিরাপদ নয়। আর দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে এখানেও জল চলে আসবে। কিন্তু আর কোনওদিকে যাওয়ার উপায় নেই।

10 জুলাই, রাত 11 টা, ড্যান-এর-ওগভ, ওয়েলস

এখনও খোঁজ নিতে এল না। কোনও খবরও এল না। আমার তো এতদিন এখানে থাকার কথা ছিল না। এসেছিলাম শুধু কয়েক বছরের জন্য। কথা ছিল ওরা আসবে। আবার আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ আসেনি। হয়তো রিনি এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। বলেছিলাম, আমি খুব শিগগিরি ফিরে আসব। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! লাল মাটির ওপরে ছিল আমাদের ঘর। আর সে ঘরের ভেতর থেকেই দেখা যেত তারা ভরা আকাশ। ছুটে আসা বিদ্যুতের চমক। আর মাঝেমধ্যে ঝড় উঠত। গা ঝলসানো গরম হাওয়া। তখন আমরা বাইরে চলে আসতাম। বালির ঝড়ে হারিয়ে যেতাম কিছুক্ষণ। কী সুন্দর যে সে সময়গুলো ছিল।

এখানে আসার আগে বলা হয়েছিল, আমার শরীরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার সব থেকে বড় অস্ত্র। আমার কাছে এলে এখানকার মানুষ আর বাঁচতে পারবে না। আর তাই তো আমি এখানকার সবার থেকে দূরে থাকতাম। নিজের মনে এক্সপেরিমেন্ট করতাম এ গ্রহের জল, মাটি, বাতাস নিয়ে। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতাম আমরা এ গ্রহে থাকতে পারব কি না। দেখলাম আমাদের অনুমান ঠিক। এ গ্রহে দরকার হলে আমরা থাকতে পারি। তেমন বিপদে পড়লে এখানেই আমরা উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারি। তবে যতই বলি না কেন, আমাদের গ্রহের মাটির গন্ধ আলাদা। আহা সে কী মিষ্টি!

আমি আগে যেখানে থাকতাম সেখানে সচরাচর কেউ আসত না। একটা ক্যাসলের মধ্যে। কোনওভাবে কেউ এসে পড়লে তাকে না মেরে আমার কোনও উপায় থাকত না। তা না হলে আমার কথা জানাজানি হয়ে যেত যে! শেষে একদিন তাই হল। এ কয়েক দিন আগের কথা। একটা লোক আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তাই তাকে মেরে ফেললাম। তার পিছু পিছু দুটো কুকুর এল। তাদেরও মরতে হল আমার হাতে। কিন্তু তখনই টের পেলাম একটা বড় পুলিশের দল আমার খুব কাছে চলে এসেছে। শেষে আমার বহুদিনের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হল। এখন এটা আমার নতুন জায়গা। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। মনোরম পরিবেশ। কেউ আর চট

করে আমার খোঁজ পাবে না। আমি কিন্তু আর আগের মতো নেই। আমি এ গ্রহ ধ্বংস করে দেব। এখানকার সবাইকে মেরে ফেলব। আমারও যদি কেউ না থাকে, তাহলে ওদেরই বা থাকবে কেন?

হ্যাঁ, আমি একাই এখানকার সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। আমি চাইলেই যে-কোনও প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আর তাকে ইচ্ছেমতো নির্দেশও দিতে পারি। আমার দলে টেনে নিতে পারি। এখন তো শুধু এক শ্রেণির পাখিকে আমার দলে নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে আমার রক্তের বিষ। আর সে বিষ এখন ওদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে এ গ্রহের প্রান্তে প্রান্তে। দেখি, এরা কীভাবে রেহাই পায়!

আমাকে যারা এখানে রেখে গেল তারাই যদি তাদের কথা না রাখে, আমারও বা কী দায় পড়েছে তাদের নিয়ম মেনে চলার!

মন খারাপ লাগছে আবার। আমার ওই লাল গ্রহটাকে আমি দেখতে চাই। রিনিকে দেখতে চাই। জানি না কবে সেটা সম্ভব হবে। তবে রিনি জানি ঠিক আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে। সে যত দেরিই হোক না কেন।

10 জুলাই, রাত 1 টা, ড্যান-এর-ওগভ গুহার ভিতরে

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। হয়তো পাঁচ-ছ'ঘণ্টা। এই ঘন অন্ধকারে ঘড়ির হিসেবও থেমে যায়। হয়তো বাইরে মিস্টার পাইও ব্যাপারটা টের পেয়েছেন যে ওরা একটা জায়গায় আটকে আছে। কিন্তু উনি কি পুলিশে জানিয়েছেন? জল এখন ফুট দুয়েক নীচে। যখন এসে ওরা বসেছিল, তখন প্রায় সাত-আট ফুট নীচে ছিল। গুহার ছাদ অনেক ওপরে হলেও এটাই সবথেকে উঁচু পাথর। এর ওপরে ওঠার কোনও উপায় নেই। হয়তো বহু বছর পরে কেউ এই ভেসে যাওয়া গুহার মধ্যে এসে খুঁজে পাবে পাথরের ওপরে পড়ে থাকা কয়েকটা কঙ্কাল। তাও এখানে থাকবে কি না কে জানে!

ছাদের ওপর থেকে নেমে আসা স্ট্যালাকটাইটগুলো ভারি সুন্দর। অনেক লম্বা-লম্বা। তার বাইরে ওরা অনেকক্ষণ থেকেই একটা অদ্ভুত ধরনের গন্ধ টের পেয়েছে। বাদুড়ের বর্জ্য। বলা হয় গুয়ানো। গুহার দেওয়ালে বাদুড়ের কলোনি। হাজার হাজার বাদুড় দেওয়াল ধরে ঝুলছে। এরাও কি জলে ডুবে যাবে?

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুরু হল। বাদুড়গুলো যেন এক এক করে খসে পড়তে শুরু করল দেওয়ালের থেকে। আর অনিলিখারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সোজা উড়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। একটা নয়, দুটো নয়, শয়ে শয়ে। মুহূর্তে ওরা বুঝতে পারল ওদের বিপদ। আত্মরক্ষার জন্য পিঠের ব্যাগটাকে দিয়ে ওরা তেড়ে আসা বাদুড়গুলোকে মারতে লাগল।

ছিটকে পড়তে লাগল ওরা। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ। ধারালো দাঁত বসাতে আবার তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল ওরা। এরা কি সেই ভ্যাম্পায়ার ব্যাট! কিন্তু এখানে এরা কী করে? ওদের তো মেক্সিকো আর দক্ষিণ আমেরিকাতেই শুধু পাওয়া যায়। এরাই কি আক্রমণ করেছিল আগের অভিযাত্রীদের। আর এদের কারণেই কি ওই অজানা অসুখ?

হঠাৎ এই আক্রমণ থেমে গেল। যেভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই থেমে গেল। সবক'টা আবার পাক খেয়ে ফিরে গেল। আবার গিয়ে বসল গুহার দেওয়ালে।

অনিলিখা পিঠের ব্যাগ থেকে এতক্ষণে ক-এর আওয়াজ টের পেল।

—ভয় নেই। ওরা আর কিছু করবে না। আমি ওদের ফিরে যেতে বলেছি। কিন্তু আমি যাকে খোঁজ করছিলাম, তোমরা যাকে খোঁজ করছ, সে এখানেই আছে। ওর নির্দেশেই ওরা আক্রমণ শুরু করেছিল। আমি ওকে ডাকছি। ও এখনই এখানে আসবে। ও আমার ডাক শুনতে পেয়েছে।

—কে?

ক-এর উত্তর দেওয়ার দরকার হল না। গুহার অনেক ওপরের একটা ছোট গর্ত থেকে একটা লোক বেরিয়ে আসছে। তার মুখ-চোখ মানুষের মতো হলেও কিছু একটা জিনিস যেন ঠিক বলে দিচ্ছে যে ও মানুষ নয়। কারুর মুখ এতটা নির্লিপ্ত, এত সুন্দর ও একইসঙ্গে এত হিংস্র হতে পারে না। যেন অন্য কোনও জীব। ঘাড়টা অনেক বেশি চওড়া। খাড়া দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে। ওরা সবাই বাকরুদ্ধ। কারুর মুখে কোনও কথা নেই।

অনিলিখা হাতে আগে থেকেই মিস্টার পাই-এর দেওয়া রিমোট শকারটা বার করে নিয়েছে। সেটা 150 মিলি অ্যাম্প পর্যন্ত ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।

—আমাকে ব্যাগ থেকে বার করে ওর হাতে দাও। ভয় পেও না। ও তোমাদের ক্ষতি করবে না। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি।

অনিলিখা ঠিক তাই করল।

আস্তে করে ব্যাগ থেকে ক-কে বার করে উঠে দাঁড়াল পাথরের ওপরে। তার পরে ক-কে হাতের তালুতে নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে। ওর হাত থেকে বলটা নিয়ে নিল লোকটা। লোকটার চোখ লাল। আগুনের মতো জ্বলছে। হাতের ওপরে রেখে চুপ করে খানিকক্ষণ বলটার দিকে তাকিয়ে রইল। কী যেন ভাবল। তারপরে আবার উলটো দিকে ফিরে গেল। যেখান থেকে এসেছিল। ক-কে সঙ্গে নিয়ে। দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওর ওই সরু গর্তে। দূর থেকে অনিলিখা দেখল, ও যেন ক-এর সঙ্গে কথা বলছে। আর চুপ করে বসে আছে। ওর চোখে জল।

এবার আবার অনিলিখা ক-এর গলা মনের মধ্যে শুনতে পেল।

—তোমরা আর চিন্তা কোরো না। যে জন্য এসেছিলাম সে কাজ হয়ে গেছে। ওকেই আমি খুঁজছিলাম। ওই ছিল তোমাদের গ্রহে রেখে যাওয়া আমাদের শেষ সৈনিক। অপেক্ষা করছিল বাড়ি ফেরার।

একটু থামল যেন ক—কিন্তু আজ আর ওর প্রয়োজন নেই। আমাদের গ্রহেই তো আর কেউ নেই। আর তা থাকার মতোও নেই। আমাদের সভ্যতা এখন ইতিহাস। ওই ছিল আমাদের গ্রহের শেষ মানুষ। তোমাদের মতো মানুষ, যারা আমাকে তৈরি করেছিল।

অনিলিখা আস্তে-আস্তে বলল,—তুমি আর ও কোথায় যাবে? তোমাদের তো গ্রহই নেই?

—আমাদের আর অস্তিত্বের দরকার নেই। আমাদের গ্রহের সব প্রাণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, আমরা রোবটরা যখন শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আমাদের কাছে মৃত প্রেসিডেন্টের রেখে যাওয়া শেষ আদেশ এল। আমরা যেন কোনও রকমের আর কোনও যুদ্ধে না জড়াই। আর এই মহাবিশ্বে সামান্য হাতে গোনা যে ক'টা সভ্যতা আছে, তাদেরকে যেন কোনওরকম বিপদে না ফেলি। সেই নির্দেশ মতো আমরা গোটাকয়েক শেষ রোবট ছড়িয়ে পড়লাম অন্য সব গ্রহে, যেখানে আমাদের শেষ সৈনিকরা এখনও আমাদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। হয়তো নির্দেশ না পেলে তারাও হিংস্র হয়ে উঠবে, যেরকম রনি গত কয়েকদিনে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আজ আমার কাজ শেষ। তোমরা ভালো থেকো...

ক চুপ হয়ে গেল। এবার অন্য একটা গলা শুনতে পেল অনিলিখারা। বোধহয় ওই লোকটার গলা।

—যাও, ফিরে যাও বন্ধু। আমি আর তোমাদের ক্ষতি করব না। আমিও থাকব না। ক-ও থাকবে না। থাকবে শুধু তোমরাই। এ তোমাদের গ্রহ। তোমাদের সাহায্যের জন্য বড় টিম ইতিমধ্যেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। খানিকক্ষণের মধ্যে এখানেও চলে আসবে। আমাদের আর খোঁজ কোরো না। বহু যুগ বাদে যখন কেউ এখানে আসবে, তখন তারা এখানে হয়তো একটা কঙ্কাল খুঁজে পাবে। তখন আমি শুধু তাদের মনে করিয়ে দেব পৃথিবীর বাইরেও কোনও সভ্যতা ছিল। তাদেরও বাঁচার স্বপ্ন ছিল। বিদায় বন্ধু।

—আর হ্যাঁ, লোকটা ফের বলল,—তোমরা ওই বাদুড়ের থেকেই সংক্রামিত হচ্ছিলে অসুখে। আর হবে না। আমরা কোথায় তোমাদের থেকে এগিয়ে ছিলাম জানো? আমরা সবার সঙ্গে কথা বলতে জানি। সব প্রাণীর সঙ্গে। আর তাই আমরা নির্দেশও দিতে পারি। আমারই নির্দেশে ওরা তোমাদের আক্রমণ করতে শুরু করেছিল।

লোকটা ক-কে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে গুহার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

28 জুলাই, সন্ধে ছ'টা, কল্যাণগড়

অনিলিখা মিস্টার পাই-এর ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছিল। সঙ্গে অবিনাশবাবু ও গণেশ আছেন।

মিস্টার পাই বলছেন—এজন্যই আমি এই বাদুড় জীবটাকে একটু সমীহ করে চলি। আমরা যতই এদের ঘৃণা করি না কেন, এরা কিন্তু অনেক দিক দিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে। এরা পৃথিবীর চৌম্বকত্বের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যেতে পারে। তারপরে এই অন্ধকারে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে ওড়া। ভাবা যায়! আর উড়তে উড়তে আক্রমণও করতে পারে। খেতেও পারে।

—কিন্তু, হঠাৎ করে ওই লোকটা বাদুড় বাছল কেন?

—বাদুড় হচ্ছে এমন এক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যার মাধ্যমে খুব সহজে আমাদের মধ্যে ভাইরাস ছড়ানো যায়। আর ভ্যাম্পায়ার ব্যাট হলে তো কথাই নেই। রেবিস, ইবোলা, SARS এসব কিন্তু বাদুড় থেকেই এসেছে।

—তা, হঠাৎ আমাদের ওপরে লোকটা খেপে গেল কেন?

—আমাদের এখানে একটা কথা ভাবতে হবে। ও আসার কিছুদিনের মধ্যেই ওর গ্রহ গেল ধ্বংস হয়ে। ও পড়ে রইল একা এক অন্য গ্রহে। আর শুধু তাই না! ও যে খবরের অপেক্ষায় ছিল, তাও আর এল না কোনও দিন। এক দিন-দুদিন নয়, চারশো বছর। ও জানত যে ও মানুষের সামনে এলেই ওর শরীর থেকে মানবদেহে ছড়িয়ে পড়বে এরকম এক ভাইরাস। ভাবো তো ওর সেই একাকীত্বকে। চারশো বছর ধরে শুধু একা অপেক্ষা করার যন্ত্রণাকে। তবু চিরকাল দূরত্ব রাখতে চেয়েছিল। আমাদের কথা ভেবে আমরাই সে দূরত্ব রাখতে দিইনি। উলটে ওর বাসস্থান থেকে জোর করে বার করে এনেছি। হয়তো ওকে নির্দেশই দেওয়া ছিল যে এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যা করা দরকার তা করতে। তা ও সেটাই করতে চেয়েছিল বাদুড়ের সাহায্যে। ওই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর সব প্রান্তে।

কথার মাঝেই গণেশ উঠে এল।

—স্যার, ওই বাচ্চা ছেলেটা এসেছে। ওর বাবা আর মা-কে সঙ্গে নিয়ে।

—আরে, শিগগিরি পাঠিয়ে দাও।

খানিক বাদেই তন্ময় ওর বাবা-মাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

তন্ময় ঢুকেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—জানো ডক্টর পাই, তোমার ওষুধ খেয়ে আমার বাবা একদম ভালো হয়ে গেছে। এই দেখো, বাবা আজ কী লিখেছে। কতদিন পরে লিখেছে।

—আমার ওষুধ খেয়ে নয়। অন্য কোনও কারণে। আরে, আমার ওষুধটা খেয়ে বেড়ালটাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। খুব ঘনিষ্ঠ আরেকজনকেও দিয়েছিলাম পরীক্ষার জন্য। মেমারি

বেড়েছে ঠিক, কিন্তু তার তো সব চুলই উঠে গেল!

গণেশ টুপি পরে বসেছিল। টুপিটা মাথার ওপরে আরেকটু বেশি করে টেনে নিয়ে বলে উঠল,—কয়েক গাছা আছে এখনও। সব যায়নি।

মিস্টার পাই ফের বলে উঠলেন,—তোমার বাবার সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে নিশ্চয়ই ক আছে।—দেখি লেখাটা।

লেখাটা হাতে নিয়ে উনি জোরে পড়তে থাকলেন।

বিদায় বন্ধু। আমরা চলে যাব। হয়তো তোমরা ভাববে আমি কে? আমি তোমাদের মতো কেউ নই। আমার প্রাণই নেই। একটা সভ্যতা, হ্যাঁ তোমাদের মতোই একটা সভ্যতা, তোমাদের মতোই কিছু মানুষ আমাকে তৈরি করেছিল, আমার মতো এক রোবটকে। আমাকে তারা বলতে শিখিয়েছিল যে আমরা মহাবিশ্বের সেরা সৃষ্টি, মহাবিশ্বের সেরা সভ্যতা। কিন্তু মজা দেখো। কয়েকদিনের যুদ্ধেই সবাই শেষ হয়ে গেল। পড়ে রইল আমাদের মতো গোটা কয়েক রোবট। আমরা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধ। আমরা আমাদের মানুষদের জন্য শেষ লড়াই লড়ব। আমরাই শুধু পড়ে আছি। কিন্তু তখনই আমাদের কাছে নির্দেশ এল। মৃত প্রেসিডেন্টের শেষ আদেশ।

—যাও ছড়িয়ে পড়ো সেই সব গ্রহে, যেখানে আমাদের শেষ কয়েকজন মানুষ আছে। আমরা আর নেই। সেটা শুধু ওদেরকে জানিয়ে দাও। আর জানিয়ে দাও ওদের আর কোনও প্রিয়জনও নেই। কোনও গ্রহ নেই। কোনও বাড়ি নেই। সব মিশন শেষ। খেয়াল রেখো যেখানে তারা আছে সেখানকার অন্য কাউকে তারা যেন কোনও ক্ষতি না করে। প্রাণ শেষ করতে লাগে কয়েক মুহূর্ত। আর তৈরি করতে কত লক্ষ মাস, কত লক্ষ বছর লাগে তা আমাদের কারোর জানা নেই। আমরা কেউ প্রাণ তৈরি করতে আজও শিখিনি। আর তাই এ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও সব কাজ শেষ।

—এটা তোমার বাবা লিখেছেন!

—হ্যাঁ, আজকে। আজকে সকালে। শুধু তাই না। আমাকে আর মাকেও এত দিন বাদে চিনতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বললেন।

পাই বলে উঠলেন,—হুঁ। ক-এর কথাই তোমার বাবা লিখেছেন। ক তার শেষ কথা বলে গেছে তোমার বাবার কাছে। বাবাকে সুস্থ করে দেওয়ার আগে।

তন্ময়ের বাবা চুপ করে সোফায় বসে ওদের কথা শুনছেন। চোখের কোণ থেকে নেমে আসা জল বুঝিয়ে দিচ্ছে উনি শুনছেন। উনি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন,—What really interests me is whether God had any choice in the creation of the world. আইনস্টাইন

কথাটা বলেছিলেন কী ভীষণ সত্যি! তবে শুধু সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, ধ্বংসের ক্ষেত্রেও কথাটা একইরকম সত্যি। আমরা জানি না, কখন আমাদের শেষ আমরা নিজেরাই করব।

তিন মাস পরে

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অনিলিখার। প্লেনের কেবিনের আলোগুলো নেভানো। অনুভব করল, প্লেনটা যেন একটা বড় ঝড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। আর হঠাৎ করে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডের অনুভূতি। আবার প্লেনটা তার সামনে উপরে ওঠার চেষ্টা করল। এক মিনিট। তারপর আর নীচের দিকে নোজ ড্রাইভ। একটা অদ্ভুত ফ্রি-ফলের অনুভূতি।

শুধু অনিলিখা নয়। অনেকেই এখন জেগে গেছে। আর কেউ কেউ ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠছে। কেউ মাথা নীচের দিকে করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে।

প্লেনে কি কিছু বড় ধরনের গণ্ডগোল শুরু হয়েছে? বাইরে তো কই সেরকম ঝড়-বৃষ্টি কিছু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

অনিলিখা বহুবার প্লেনে চড়েছে। কিন্তু এরকম অনুভূতি তো আগে কখনও হয়নি। প্লেন এখনও ঝড়ের বেগে নীচের দিকে নামছে। অথচ কোনও সিটবেল্ট পরার ওয়ার্নিং এখনও জারি হয়নি। এরকম আর কতক্ষণ! বোধহয় তিরিশ সেকেন্ড। কিন্তু তাই যেন মনে হল অনন্তকাল। ব্যস, তারপর আবার সব কিছু একদম স্বাভাবিক। যেরকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই শেষ। সবাই তবু নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। যেন কিছুই হয়নি। লন্ডন-দিল্লি প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। অনেকে বিড়বিড় করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। প্যাসেজ দিয়ে বিমান সেবিকার যাতায়াত আবার শুরু হয়েছে।

এখনও কোনও অ্যানাউন্সমেন্ট নেই। কী হয়েছিল? কে জানে! দিল্লি পৌঁছোতে আর বোধহয় বেশি দেরি নেই। হ্যাঁ, ঠিক তাই। মনিটরে দেখাচ্ছে পৌঁছোতে আর মাত্র একঘণ্টা বাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ডিং সিকোয়েন্স চালু হবে।

নাহ, আর ঘুমোনোর চেষ্টা করে লাভ নেই। কি যে হয়েছিল আর জানা যাবে না।

হঠাৎ কে যেন অনিলিখাকে বলে উঠল,—আর ভয় নেই। তোমরা সবাই এবারের মতো বেঁচে গেছ।

কে! কে বলে উঠল?

অনিলিখার চোখ পড়ল, ঠিক সামনের জানলার পাশের সিটে আধশোয়া লোকটার দিকে। জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে।

—ঠিকই ধরেছ। আমি। আমি কিন্তু রনি নই। আমাদের দুই গ্রহের সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের। আমরা কি এত সহজে তোমাদের ফেলে চলে যেতে পারি?

—কে? কে তুমি?—

ধরে নাও তোমাদেরই অভিভাবক। সামান্য কারণে যাতে তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি না বাধাও, তাই আমরা থাকি। ঠিক যেমন ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব। যাতে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধে তোমরা না মেতে ওঠো। এই আজকের ঘটনাটাই ধরো। কেউ জানল না। ক্যাপ্টেন কেন হঠাৎ করে প্লেনটাকে মিসাইলের মতো ব্যবহার করে আরাবল্লী পর্বতে ধাক্কা মারতে চলেছিল? কেউ জানবে না আর! এও জানবে না কেন আবার সেটা ঘটল না। অন্যরকম হতে পারত। এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান লন্ডন থেকে দিল্লি ফেরার পথে হঠাৎ করে উধাও। পরে খোঁজ পাওয়া যেত, প্লেনের ক্যাপ্টেন হল প্রতিবেশী দেশ-এর চর, প্রশিক্ষিত জঙ্গি। ছোট একটা ঘটনা। কিন্তু হয়তো এ থেকে আরেকটা বিশ্ব যুদ্ধ হয়ে যেত। পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো মেতে উঠত ধ্বংসের লীলায়।

কী! ক্যাপ্টেন প্রশিক্ষিত জঙ্গি!

—হ্যাঁ। ওটাই সত্যি! আর এটাও সত্যি, এখন আর ও বেঁচে নেই। ল্যান্ডিং এর পরে খোঁজ নিলে জানতে পারবে ক্যাপ্টেন হঠাৎ করে হার্টফেল করে মারা গেছে। বুঝতেই পারছ, এর মৃত্যুর কারণ আমি। আমি তো আর প্লেনটাকে আরাবল্লীর বুকে ধাক্কা দেওয়ার জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না। প্লেন এখন চালাচ্ছে ফার্স্ট অফিসার।

খানিকক্ষণের জন্য কথা থামল। আবার অনিলিখা শুনতে পেল—

—আচ্ছা, একটা কথা বল তো অনিলিখা। একটা বাচ্চাকে তুমি কি ন্যাড়া ছাদে একলা ফেলে চলে আসতে পারো? আমরাই বা কি করে পারি তোমাদেরকে এভাবে একা ছেড়ে দিতে। একটা একটা করে যখন সভ্যতা হারিয়ে যায়, ভাবি কেন আগে আমরা তা দেখিনি! কেন কিছু করার চেষ্টা করিনি। সত্যিই কি আমরা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ছেড়ে দিতে পারি? আর ক'টাই বা সভ্যতা আছে এই মহাবিশ্বে? হারিয়ে যাওয়ার পরে তো আর কিছুই করার থাকে না। তাই না?

লোকটা ঘুরে তাকিয়েছে অনিলিখার দিকে। একনজর তাকিয়েই অনিলিখা বুঝতে পারল, একেও অনেকটা রনির মতোই দেখতে।

রহস্য যখন ডারউইন



17 মে, 2012

অনিলিখা?

—হ্যাঁ, বলছি।

—আমি আওয়েন। পল আওয়েন। চিনতে পারছ?

—আরে, চিনব না মানে? তা, হঠাৎ করে এতদিন বাদে?

—একটা জরুরি দরকারে ফোন করছি। ডেভিড তো তোমার খুব বন্ধু ছিল। তা ওর খবরটা শুনেছ তো?

—না। আমার সঙ্গে ওর গত দু-বছর ধরে কোনও যোগাযোগ নেই। কি খবর?

—দু-মাস আগে ও এক অভিযানে বেরোয়। একটা টিভি চ্যানেলের হয়ে ও গত একবছর কাজ করত। নানান দুর্গম জায়গায় গিয়ে সেখানকার গাছপালা-জীবজন্তু এসব চ্যানেলে দেখাত। তা এবার গিয়েছিল গ্যালাপাগোসের কাছাকাছি এক দ্বীপে। প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র দ্বীপের মধ্যে নাম না জানা এক দ্বীপ। গ্যালাপাগোস পর্যন্ত হেলিকপ্টারে গিয়ে তারপর সেখান থেকে বোটে। তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ নেই।

—সে কী! ও কি একা ছিল?

—না, ওর সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যান ছিল। নাম মিকুচি। তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

—তা খোঁজাখুঁজি করা হয়নি?

—পুরো জায়গা জুড়ে অনেক তল্লাশি হয়েছে। এখনও কোনও সূত্র মেলেনি। অবশ্য ঠিক কোন দ্বীপে ও গিয়েছিল তা কেউ জানত না। আমার মনে হয় আরও তল্লাশি চালানো উচিত। এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়ার কিছু হয়নি।

—তা তুমি কি নিজে খুঁজে দেখতে চাও?

—হ্যাঁ, তবে আমি চাই তুমিও চলো আমার সঙ্গে। তুমি আগে আমার এখানে চলে এসো। তারপরে এখান থেকে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারেও কথা বলার আছে। সামনাসামনি বলতে পারলে ভালো হয়। হয়তো ডেভিডের হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এ ঘটনার কোনও কানেকশন থাকতে পারে।

—হেঁয়ালি না করে আসল কথাটা বলো তো!

—উহুঁ, ফোনে বলা যাবে না। সানফ্রান্সিসকো তো আগে এসো। তারপরে সব বুঝিয়ে বলব। এখন তুমি বলো কবে আসতে পারবে। সম্ভব হলে নেক্সট উইকএন্ডেই আমরা যেতে চাই। যত দেরি করব, খুঁজে পাওয়ার চান্স ততই কমবে।

—আরে, বললেই তো আসা যায় না। এখন অনেক কাজের চাপ। তা ছাড়া খরচও অনেক।

—ভেবে দেখো। যাতায়াত, থাকাখাওয়া—সব খরচ আমার। এখানে তুমি জাস্ট দুদিন থাকবে। তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়ব। ওই এলাকায় যত দ্বীপ আছে, সবক'টাতেই খোঁজ করব।

—ওরকম একটা রিমোট এলাকায় যাবে কীভাবে? জাহাজে?

—ধুর! আমার নিজস্ব প্লেন আছে। ওটাতে করেই যাব।

—সে আবার কবে কিনলে? তুমি আজকাল কী করো বলো তো?

—এই দ্যাখো! তুমি তো কিছুই খবর রাখো না। নিউমন্ট মাইনিং কোম্পানির নাম শুনেছ?

—শুনব না! নিউমন্ট মাইনিং-এর তো অনেক সোনার খনি আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, কোম্পানিটা আমারই।

—তোমার তো তাহলে বিশাল ব্যাপার!

—দ্যাখো, এখন আর আমার কথা বলার সময় নেই। তুমি যাবে কি না আমাকে SMS-এ জানাও। আমি দু-ঘণ্টার মধ্যে তোমার ই-টিকিট আর ইনভিটেশন লেটার পাঠিয়ে দেব। এখানে এলে জমিয়ে দুদিন আড্ডা মারা যাবে। তখনই সব শুনবে।

ফোনটা রেখে অনিলিখা চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবল। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোনোর পর একই জায়গায় ডেভিড আর ও একসঙ্গে কাজ করেছে কিছুদিন। এখনও চোখে ভাসে ওর চেহারা। উজ্জ্বল চোখ, টিকোলো নাক, কদমছাঁট চুল, হালকা গোঁফ ও দাঁড়ি। সামান্য চওড়া কপাল। কাজ অনেক আছে। তবু যেখানে ডেভিডের খোঁজে অভিযান হচ্ছে, সেখানে না যাওয়াটা অন্যায়।

পলও ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গেই পড়ত। বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে। তেমন বন্ধুত্ব না থাকলেও ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর এক-দেড় বছর যোগাযোগ ছিল। এতদিন বাদে ওর কাছে অনিলিখার ফোন নম্বর থাকার কথা নয়। নির্ঘাত ফেসবুক বা ওই ধরনের কোনও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট থেকে জোগাড় করেছে।

22 মে, 2012

সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল লম্বা কালো লিম্যুজিন। অনিলিখাকে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল পল আওয়েন। হালকা টি-শার্ট, জিনস, ব্যাকব্রাশ করা চুল। রেগুলার জিম করা চেহারা। সঙ্গে দুজন সিকিউরিটি গার্ড। ভারী গলায় পল বলে উঠল,—ওয়েলকাম টু সানফ্রান্সিসকো।

—কেমন আছ পল? তুমি এত ব্যস্ত লোক। কাউকে দিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিলেই তো পারতে!

—ছাড়ো তো ব্যস্ততা! ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর এতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা, আর আমি আসব না? তুমি কিন্তু একটু মোটা হয়েছ।

—তা হব না! কলকাতাতে তো আর এখানকার মতো এত খেলাধুলোর সময় হয় না। সুযোগও এত নেই।

গাড়িতে উঠে বসল অনিলিখা। লিম্যুজিনের লেদার সোফায় গা এলিয়ে অনিলিখা বলে ওঠে, —তা আজকের প্ল্যান কী?

—তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও। এত লং জার্নি। তারপর দেখা যাবে।

—হ্যাঁ, যা বলেছ। যতই আরামে আসো না কেন, তিরিশ ঘণ্টা জার্নির পর আর এনার্জি থাকে না।

—তুমি সানফ্রান্সিসকোয় আগে এসেছ তো?

—না, এয়ারপোর্ট হয়ে অন্য জায়গায় গেছি। শহরটা আর ঘুরে দেখা হয়নি।

—সেকী! সানফ্রান্সিসকো দ্যাখোনি? যখন দরকার আমার ড্রাইভারকে ফোন করবে। ও তোমাকে সানফ্রান্সিসকো ঘুরিয়ে আনবে। আর কোথাও না যাও গোল্ডেন গেট, ক্রুকেড স্ট্রিট, ফিশারম্যানস হোয়ার্ফ মিস কোরো না। পারলে একবার কেবল কারটাও চড়ে নিও।

—হ্যাঁ, সানফ্রান্সিসকো এসেছি, আর এখানকার কেবল কার চড়ব না—তা হয় নাকি?

কথা বলতে বলতে লিম্যুজিনের কালো কাচের বাইরে তাকাল অনিলিখা। বাইরের ঝকঝকে সকালের আলোটাকে পুরোপুরি কাড়তে পারেনি বুলেটপ্রুফ কাচের জানলা। মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। শহরের রাস্তা উঁচু-নীচু। পাহাড়ি এলাকা। শহরের মধ্যেই অনেকগুলো পাহাড়। সমুদ্র আর পাহাড়ের এই কম্বিনেশনটাই সানফ্রান্সিসকোকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

1821 সাল অবধি সানফ্রান্সিসকো স্পেনের অধীনে ছিল। তারপরে মেক্সিকোর আওতায় আসে। 1846 সালে মেক্সিকো আর আমেরিকার যুদ্ধের পরে আমেরিকার মধ্যে আসে।

সানফ্রান্সিসকো শহরের বিল্ডিংগুলো তাই আমেরিকার অন্যান্য শহরের থেকে আলাদা। স্প্যানিশ স্থাপত্যের ছোঁয়া। রাস্তার দু-ধারে ইউরোপিয়ান ভিক্টোরিয়ান হাউস। পলের লিম্যুজিন শহরের গণ্ডি পেরিয়ে সমুদ্রের ধার বরাবর চলল। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। পড়লে নীচে সমুদ্রে। হাইওয়ে ওয়ান যেন এঁকেবেঁকে পাহাড়কে তাড়া করে চলেছে।

খানিকবাদে হাইওয়ে থেকে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি জনবিহীন সরু রাস্তা ধরল। রাস্তাটা চড়াই। ক্রমশ ওপরের দিকে উঠেছে। মিনিট-পাঁচেক বাদে গাড়িটা একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ি বললে ভুল হবে—প্যালেস। গেট পেরিয়ে বাগান, ফোয়ারা। আর বাগানের পর গেটের থেকে প্রায় আধমাইল দূরে পলের 'আওয়েন প্যালেস'।

23 মে, 2012

ব্রেকফাস্টের পরই অনিলিখা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সানফ্রান্সিসকো দেখতে। মেঘমুক্ত ঝকঝকে আকাশ। ঘোরার আদর্শ পরিবেশ। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

1906 সালে সানফ্রান্সিসকো প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পে শহরের বেশিরভাগ বিল্ডিং ভেঙে গিয়েছিল। গ্যাসলাইনের পাইপ ফেটে সারা শহরে আগুন লেগে গিয়েছিল। খবরের হেডলাইন হয়েছিল, 'সানফ্রান্সিসকো সিজড টু এক্সিস্ট'। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই এ শহর আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রায় তখন থেকেই সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রির নাভিকেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল সানফ্রান্সিসকো। আজও বিশ্বের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলোর বেশিরভাগের হেড অফিস সানফ্রান্সিসকো। পথেও তাই যেতে যেতে চোখে পড়ে নানান ব্যাঙ্কের বিশাল বিশাল বিল্ডিং।

প্রথমেই গোল্ডেন গেট ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য তেমন কিছু বোঝা যায় না। দূরে একটা ভিউ পয়েন্ট থেকে ব্রিজ দেখতে হয়। সেখানে গিয়েও অনিলিখার আশা মিটল না। ব্রিজ কুয়াশায় ঢেকে আছে। এটাই সানফ্রান্সিসকোর সমস্যা। শহরের উত্তাপ আর প্রশান্ত মহাসাগরের ঠান্ডা হাওয়া বেশিরভাগ সময় শহরটাকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে রাখে।

ঘোরার তালিকায় এর পরেই এল কেবল কার। কেবল কার ছাড়ে মার্কেট স্ট্রিট আর পাওয়েল স্ট্রিটের জংশন থেকে। পৃথিবীর সবথেকে নামকরা কেবল কার।

গাড়ি পার্কিং জোন-এ রেখে টিকিট কেটে কেবল কারে উঠে পড়ল অনিলিখা। রাস্তার নীচে দিয়ে কেবল কারের দড়ি গেছে। পাহাড়ের ঢাল অনুযায়ী উলটোদিক থেকে আসা কেবল কারের সঙ্গে ব্যালান্স করে এই কেবল কারটা এগিয়ে যাচ্ছে। দু-কামরার ছোট গাড়ি। সামনের কামরাটার দু-ধার খোলা। তাতেই বসল অনিলিখা। বাইরেটা ভালো করে দেখা যায়। গাড়ির পাদানিতে পা রেখে অনেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে।

অসাধারণ দৃশ্য। সরু রাস্তার দু-ধারে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বাড়ি। মাঝেমধ্যে আড়াআড়ি রাস্তা নেমে গেছে দু-ধার দিয়ে। নেমে গেছে বললে কম বলা হয়, মনে হয় নীচের দিকে ডাইভ দিয়েছে। ড্রাইভার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে চড়াই ধরে। গাড়ি হঠাৎ করে থামানো শক্ত। এ গাড়িতে ওঠা মানে যেন একশো বছর পিছিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ অনিলিখার চোখ পড়ল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল। কানে দুল। দাঁড়ি। শক্তপোক্ত এক্সারসাইজ করা চেহারা। জন পেচি না!

—জন!

জন চমকে অনিলিখার দিকে মুখ ফেরাল।

—অনিলিখা, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! তুমি এখানে কোত্থেকে? বেড়াতে এসেছ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তুমি?

—আমি ন্যাচারাল সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত আছি।

—ওখানে তোমার মতো সায়েন্টিস্ট আবার কী করছে?

—আপাতত একজন মহিলাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর নাম শুনেছ?

—মিশরের রানি। খুব সফল ফ্যারাও ছিলেন শুনেছি।

—ঠিক বলেছ। তবে রানি নন, রাজা। মেয়ে হয়েও রাজা পরিচয়েই বাইশ বছর দাপটে শাসন করে গেছেন। মিশরীয় সভ্যতার সেই প্রথম ও শেষ। নকল দাঁড়ি পরতেন। সব জায়গায় ওনার পরিচয় রাজা হিসেবে। তা, ওনাকে নিয়েই ব্যস্ত আছি এখন।

—আচ্ছা, কয়েক বছর আগে ওনার মমি পাওয়া গিয়েছিল না?

—1922-এ হাওয়ার্ড কার্টার মিশরের 'ভ্যালি অব দ্য কিংস' থেকে ফ্যারাওদের মমি আবিষ্কার করেন তা তো জানোই। অন্য ফ্যারাওদের মমি পাওয়া গেলেও 'হ্যাত-শেপ-স্যুৎ'-এর মমি প্রথমে পাওয়া যায়নি। ওর মমি সে সার্কোফ্যাগাস-এ ছিল, সেটা শুধু পাওয়া যায়। তাতে কোনও মমি ছিল না। 2006-এ একটা বেনামি মমি পাওয়া যায়। মমিটা এমন নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল যে তা থেকেই প্রথম সন্দেহ—কোনও ফ্যারাও-এর নয়তো? তা না হলে অত পারফেক্টলি মমিফিকেশন হয় না। ঠিক তাই। পরে দেখা গেল ওটা ওনারই মমি। নির্ঘাত দস্যুরা ওই সার্কোফ্যাগাস ভেঙে মমির অলঙ্কার চুরি করে ওটা বাইরে ফেলে গিয়েছিল।

—তা ওটাই যে 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর মমি তা নিশ্চিত হল কীভাবে?

—ওর সার্কোফ্যাগাস যখন পাওয়া যায়, তখন সেই বাক্সে একটা দাঁতের ভাঙা অংশ পাওয়া গিয়েছিল। এই মমির দাঁতের সঙ্গে ওই দাঁতের অংশ এক্কেবারে মিলে যায়।

—এক্সাইটিং! তা তোমার রিসার্চটা কী?

—চলো, কেবল কার থামলে নেমে বলব।

ঠিক কথা। এ সব গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনে আশপাশের লোকজন নির্ঘাত বিরক্ত হচ্ছে। আর এত আওয়াজের মধ্যে কথা বলাও খুব মুশকিল।

চায়না টাউনে কেবল কার থামলে ওরা নেমে হাঁটতে থাকে। চায়না টাউন যেন ছোট একটা চিন। একটা সময় সানফ্রান্সিসকোতে রেলের রাস্তার কাজ করতে অনেক চাইনিজ এসেছিল। তারা পরে এখানেই থেকে যায়। আর তারই চিহ্ন চায়না টাউন। ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে থাকে।

—মমির গায়ে কোনও কিছুই ছিল না। শুধু গলায় মালার মতো পরা ছিল প্যাপিরাস পাতায় আঁকা গিয়ার হুইলের ছবি। জন বলে ওঠে।

—গিয়ার হুইল? ওই সময়ে? আমার ধারণা ছিল গিয়ারের প্রথম ব্যবহার হয় রোমান সাম্রাজ্যে।

—প্রিসাইসলি। 'হ্যাত-শেপ-স্যুৎ'-এর রাজত্বকাল ছিল 1479 থেকে 1458 BC অর্থাৎ, রোমান সাম্রাজ্যের অনেক আগে। তাই ওই ছবি দেখে আমরাও অবাক হয়ে যাই। ওই সময়ে গিয়ার হুইল। তো এখানেই শেষ নয়। ওই একই ডিজাইনের গিয়ার হুইল পাওয়া গেল বারমুডা টায়াংগেলে ডুবে যাওয়া এক পুরোনো জাহাজে। গিয়ার হুইল না বলে ওটাকে বলা যায় মেকানিকাল কম্পিউটার। 37টার মতো গিয়ার চালিত একটা ঘড়ি।

—এক্সাইটিং! এটা তো মাসতিনেক আগের ঘটনা। তাই না? সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম। রিসেন্টলি ডোবা একটা জাহাজ খুঁজতে গিয়ে একই জায়গায় ডোবা আরেকটা পুরোনো জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এটা হাজারতিনেক বছর আগে ডুবেছিল। সেই জাহাজেই পাওয়া যায় গিয়ার হুইলটা।

—নাহ, তোমার এখনও পড়াশুনোর ভালোই অভ্যেস আছে। তা সেই গিয়ার হুইল আর মমির গায়ে আঁকা ছবির ডিজাইন একদম এক। জাহাজটা ইজিপ্ট থেকে আসছিল। হ্যাত-শেপ-সুৎ-এর ছবি আঁকা মুদ্রাও পাওয়া যায় জাহাজে।

—অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত যে ওই গিয়ার হুইল আর হ্যাত-শেপ-সুৎ ওয়েল কানেক্টেড। আর তাই তোমাদের জানা দরকার গিয়ার হুইলটা কী কাজ করত। নিশ্চয়ই খুব দরকারি কিছু হবে। ঠিক তো? তা কিছু রহস্য উদ্ধার হয়েছে?

—কিছুটা হয়েছে। তবে সেটা গুছিয়ে শুনতে গেলে একটা ক্যাফেতে বসতে হবে। রাজি?

—শিওর।

পাশেই একটা 'সিয়াটেল কফি' ছিল। তাতে ঢুকে দুটো ব্ল্যাক কফির অর্ডার দেওয়ার পর ফের কথা শুরু হল।

—তা তুমি থাকছ কোথায়? জন জিজ্ঞাসা করে।

—পল আওয়েনকে চেনো? আমি ওরই বাড়িতে এসে উঠেছি।

—আরে, পল আওয়েনকে চিনব না? বিশাল বড়লোক। ইনফ্যাক্ট, আমাদের এই প্রোজেক্টটা তো ও-ই ফান্ড করছে। অসাধারণ লোক। আমার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না। 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর মমি এখানে রিসার্চের জন্য আনা হয়েছে শুনে দেখতে আসে। সায়েন্সে

এত ইন্টারেস্ট! সব দেখেশুনে যাওয়ার তিনদিন পরে টু মিলিয়ন ইউ এস ডলার গ্রান্ট। ভাবতে পারো?

—ও কিন্তু আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। অবশ্য কাল থেকেই দেখছি—এত ব্যস্ত থাকে! আমি এখানে এসেছি ডেভিডের খোঁজ করতে। ডেভিড রয়।

জনের কপালে ভাঁজ পড়ল,—এক্সট্রিমলি আনফরচুনেট। আমি ওর প্রোগ্রামটা রেগুলার ফলো করতাম। অসাধারণ কভারেজ থাকত। একটা রিমোট এলাকায় চলে যেত। সেখান থেকে ওখানকার অপরিচিত অর্ধপরিচিত গাছপালা, জীবজন্তু এসব দেখাত। খুব ইন্টারেস্টিং। তা এবার যে কী হল! নো ট্রেস। প্রচুর খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু না ডেভিড, না ওর সঙ্গীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে। ও কি তোমার পরিচিত?

—হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তবে সাবজেক্ট আলাদা। আমার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেভিডের সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স আর পল মেকানিক্যালের। ডেডিড আমার খুব বন্ধু ছিল। সে জন্যই পল আমাকে ডেকে নিল। আমরা ডেভিডকে খুঁজতে যাব। তবে এখনও জানি না আমি কীভাবে অভিযানে সাহায্য করব।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—এবার আসল কথায় ফিরে আসা যাক। গিয়ার হুইলের রহস্যোদ্ধার কদ্দূর?

—আমাদের ধারণা, 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর মেন পাওয়ার ছিল ওই গিয়ার হুইলটা। তা না হলে, ভাবো, মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও দেশে ওর বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহ হল না। ফ্যারাও বলে সবাই একবাক্যে মেনে নিল। 'হ্যাত-শেপ-সুৎ' যতদিন বেঁচে ছিল অন্য দাবিদার 'তুৎমোস-3' চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইল। তুৎমোস-3 সত্যিকারের ক্ষমতা পায় 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর মৃত্যুর পরে।

সবের পিছনে ছিল ওই গিয়ার হুইলের পাওয়ার। অ্যাকচুয়ালি সি ওয়াজ আ সায়েন্টিস্ট। ওই গিয়ার হুইলের ডিজাইন ওনারই আবিষ্কার। চন্দ্র-সূর্য আর কয়েকটা গ্রহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবে কোথায় হবে, সেটা বলা সম্ভব হত ওই গিয়ার হুইলের সাহায্যে। অন্তত হাইরোগ্লিফসের লেখা পড়ে ওই যন্ত্রের সম্বন্ধে এরকমই ধারণা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উনি ওটা নিখুঁতভাবে বলতেন বলেই সবাই ওনাকে ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছিল। ওনার ফ্যারাও হওয়া নিয়েও তাই প্রশ্ন ওঠেনি।

—এরকম কি সম্ভব? এখনও আমরা জানি না, আর সাড়ে তিন হাজার বছর আগে উনি জানতেন?

—পৃথিবীর আর সূর্যের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ওপর সৌরবিকিরণ পরিবর্তিত হয়। সোলার ফ্লেয়ার। আর তার একটা প্রভাব থাকে ভূমিকম্পের—ভলক্যানোর জেগে ওঠার ওপর। আমরা শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি। তবে কোথায় হবে, কবে হবে—এসব যন্ত্রটা কীভাবে অনুমান করত সেটাই রহস্য।

—তা, যে জাহাজটা ডুবেছিল, সেখানে ওই যন্ত্রটা ছিল কেন বলো তো?

—কে জানে? হয়তো জাহাজ যাতে কোনও বিপজ্জনক জায়গায় না যায় তারজন্য ওই ব্যবস্থা। আর যন্ত্রটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার কাছেই একটা মহার্ঘ্য বাক্সের মধ্যে একটা হাতে আঁকা ম্যাপও ছিল। অনেক ক্যালকুলেশন করা একটা কাগজও ছিল। ম্যাপটাও আমরা দেখছি। ওই ম্যাপে একটা বিশেষ জায়গা হাইলাইটেড আছে। ওটা কোন জায়গা বার করার চেষ্টা করছি।

—তা, অত আগের কাগজ পড়ার মতো আছে?

—এখন টেকনোলজি অনেক এগিয়ে গেছে। এক্সরে টোমোগ্রাফি আর সারফেস স্ক্যানিং করে পুরোনো লেখার ছাপ খুঁজে বার করা হয়। প্রবলেমটা হল ম্যাপটা বোঝা। তখন তো ওদের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাটাই অন্যরকম ছিল।

—ঠিক আছে, তোমার রিসার্চ সফল হোক—তাড়াতাড়ি রহস্যোদ্ধার হোক। আজ আমি উঠি। পল হয়তো ডিনারে আমার জন্য ওয়েট করবে। ওখান থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ফোন করে অনিলিখা ক্যাফের সামনে গাড়িটাকে ডেকে নিল। ফিরতে হবে। সানফ্রান্সিসকোর সরু সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে এই লিম্যুজিন নিখুঁতভাবে চালানো সোজা কথা নয়। তা সেটা পলের ড্রাইভার ভালোই জানে। এক ঘণ্টার মধ্যে 'আওয়েন প্যালেস' পৌঁছে গেল অনিলিখা।

24 মে, 2012

ব্রেকফাস্ট টেবিলে চিকেন সসেজ খেতে খেতে অনিলিখা বলে উঠল,—পল, কাল জন পেচির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

একটু চমকে উঠে পল বলে উঠল,—জনকে তুমি চিনলে কী করে? ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট।

—আমি আর জন একসঙ্গে মোটোরোলাতে কিছুদিন কাজ করেছি। এখন তো ও 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর গিয়ার হুইল নিয়ে রিসার্চ করছে। তোমার ডোনেশনের কথাও বলল।

—হ্যাঁ, ডোনেশনটা বড় কিছু না। ভেবে দ্যাখো তো একজন ফ্যারাও—তারও বিজ্ঞানে কত আগ্রহ! অত কাজের মধ্যেও এরকম একটা জিনিস তৈরি করেছে। আর আমরা?

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কাজের বাইরে কিছুই করি না।

—জন বলছিল, হয়তো এই যন্ত্রের ক্ষমতার জন্যই সবাই ওকে ঈশ্বর বলে মানতে শুরু করে। এ জন্যই ওর পঁচিশ বছরের শাসনে কখনও কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি। আর এটাই ওকে এক সফল ফ্যারাও করে তুলেছিল। তাই নিছক বিজ্ঞানে আগ্রহ না, টিকে থাকার তাগিদেই এটা ওনাকে করতে হয়েছিল। এ জন্যই তো গিয়ার হুইলের রহস্য তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা দরকার।

কফিতে চুমুক দিয়ে টাইয়ের নটটা টাইট করতে করতে পল ফের বলে উঠল,—সে কথা ছাড়ো, তোমাকে একটা খুব গোপনীয় কথা বলছি। আমার-তোমার বাইরে এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমি জানি ডেভিড কোথায় গিয়েছিল, আর সেজন্যই নিজে তল্লাশি চালাতে চাই।

—সেকী! সে কথা তুমি পুলিশকে জানাওনি?

—না। সে কথাটা বোঝাতে গেলে যা বলতে হত, তা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যেত। কারণ সেখানে চলে আসত চার্লস ডারউইনের নাম। চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বিগল যাত্রার কথা কে না জানে! আর এখানে যা বলতে হত তা ওই যাত্রার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত। আর সেটাই আমি আপাতত জানাতে চাই না।

—কি বলছ পল?

—আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কে ছিলেন বলো তো? রিচার্ড আওয়েন। উনি ছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত অ্যানাটমিস্ট আর চার্লস ডারউইনের বন্ধু। চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বিগল যাত্রার সময় যত ফসিল পেতেন তা সব লন্ডনে আমার পূর্বপুরুষকে পাঠিয়ে দিতেন। অ্যাকচুয়ালি রিচার্ডই ফসিল দেখে বলে দিতেন যে ওটা পরিচিত কোনও প্রাণী, না বিলুপ্ত কোনও প্রাণীর ফসিল। আর কার সঙ্গে রিলেটেড, কতটাই বা মিল। এভাবেই মেগাথেরিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

—তাই নাকি? সেরকমভাবে তো ওনার নাম শুনিনি!

—সেটাই তো দুর্ভাগ্য! অথচ ডারউইনের সমস্ত কৃতিত্বের পিছনে মূলত রিচার্ড আওয়েনরই অবদান! তা না হলে ডারউইন ফসিল দেখে কিছুই বুঝতে পারতেন না। ওনার এ ব্যাপারে কিছুই পড়াশুনো ছিল না। আর 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এর মতো বইও লিখতে পারতেন না। কারণ ওনার পুরো 'ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর আইডিয়াটাই তো ফসিল নির্ভর। ওনার নিজের মনেই প্রশ্ন ছিল কেন কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আর কেনই বা একইরকমের একই প্রজাতির কিছু প্রাণী আজও বহাল তবিয়তে আছে। পরে বোঝেন, যারা পরিবর্তনের মাধ্যমে

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তারাই টিকে থাকে। পরিবর্তন সফল না হলে চিরকালের মতো তারা হারিয়ে যায়।

—তা তোমার গোপনীয় কথাটা কী? ডারউইন তো পুরো যাত্রাটার কথাই 'ভয়েজ অব দ্য বিগল-এ লিখে গেছেন। আমিও বইটা পড়েছিলাম। দারুণ লেখা। অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি। অসাধারণ খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা।

—পুরোটা পড়েছ?

—হ্যাঁ। 1831-এ বেরিয়ে 1836-এ আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ডের ডাভেনপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন কে জানত যে এটা ইতিহাসের সবথেকে ফেমাস জার্নি হতে চলেছে, তাই না?

—কিন্তু 'ভয়েজ অব দ্য বিগল'-এ তো পুরো যাত্রাটার কথা ছিল না।

—মানে?

—যাত্রা শুরু হয় 27 ডিসেম্বর, 1831-এ। 17 ফেব্রুয়ারি 1832, বিগল নিরক্ষরেখা ক্রস করে দক্ষিণ গোলার্ধে ঢোকে। ওই সালেরই 29 ফেব্রুয়ারি ওরা ব্রাজিলের বাহিয়া পৌঁছোয়। ওদের মেন কাজটা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি সার্ভে করা। তাই পুরো দক্ষিণ আমেরিকার কোস্টলাইন বরাবর ওরা যায়। ওরা যে শুধু সমুদ্র ধরেই গিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। ওদের বেশ কিছু সময় ল্যান্ডেও কেটেছিল। ডারউইনের অনেকটা সময় কেটেছিল আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসে, অ্যাটাকামা মরুভূমিতে আর আন্দেজ পাহাড়ে। তা না হলে এই অভিজ্ঞতা হত না। 20 অক্টোবর, 1835 সালে বিগল গ্যালাপাগোস দ্বীপ থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করে। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, কেপ অফ গুড হোপ, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসিকন দ্বীপ ছুঁয়ে ইংল্যান্ডের ফলমাউথে ফিরে আসে 1836 সালের 2 অক্টোবর।

—তোমার তো সব ডেট মুখস্থ দেখছি।

—তার কারণ, ওই ডেট নিয়েই তো গণ্ডগোল। 1835 সালের 20 অক্টোবর-এর পর থেকে নেক্সট কুড়ি দিনের কথা ডারউইনের লেখায় পাওয়া যায় না। প্রশ্ন, ও ক'দিন উনি লেখেননি কেন? নাকি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে সে লেখা প্রকাশ করেননি।

—হতেই পারে মাঝে কয়েকদিন লেখেননি।

—ঘটনাটা হল, উনি লিখেছিলেন, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে ওই লেখার পাতাগুলো উনি ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে বন্ধু রিচার্ড আওয়েন-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

—মানে? তুমি সে লেখা দেখেছ?

—হ্যাঁ। সেটাই বলছি। বাড়ির সিন্দুকে খুব যত্নে কয়েকটা পাতা ল্যামিনেটেড অবস্থায় বহুদিন ধরেই রাখা ছিল। ওই সিন্দুকে আমাদের পরিবারের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও রাখা আছে। শুনেছিলাম ওটা রিচার্ড আওয়েনের লেখা ডায়েরির কিছু পাতা। বাকি ডায়েরিটা ছিল না। তাই ওটা ওনারই লেখা কি না তা কখনও বোঝার উপায় ছিল না। দু-মাস আগে সিন্দুকের জিনিসগুলো গোছাতে গিয়ে ওই পাতাগুলো আমার নজরে আসে। কৌতূহলবশত পড়ে ফেলি। পড়েই মনে হল এটা রিচার্ড-এর লেখা নয়, কারণ রিচার্ড তো বিগলে যাননি। এ নির্ঘাত স্বয়ং ডারউইনের লেখা, ঠিক ওই মাঝের কুড়ি দিনের—যা ওই 'ভয়েজ অব দ্য বিগলে' বেরোয়নি। আমার আগের তিন প্রজন্ম ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই করেননি। তাই ওই লেখা বোঝার যোগ্যতা কারও ছিল না।

—তা তুমি কি ওই লেখা ডেভিডকে দেখিয়েছিলে?

—ঠিক তাই। ওই লেখাতেই ছিল আরেকটা আইল্যান্ডের কথা, যেখানে ডারউইনরা গ্যালাপাগোস-এর পরে যান। সেখানে ওনাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। এমন কোনও অদ্ভুত আইল্যান্ড আমাদের পরিচিত বিশ্বে নেই। ডেভিডকে আমি ওই আইল্যান্ডে জয়েন্টলি যাওয়ার কথা বলি। ডেভিড তখন তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তখনই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। এটাই তো ওর ইন্টারেস্ট এরিয়া। আমি নিশ্চিত যে ও ওখানেই গেছে। আর একা ওই আইল্যান্ডে গিয়েই ও বিপদে পড়েছে।

—তা ঠিক কী লেখা ছিল ওই আইল্যান্ড সম্পর্কে?

—দাঁড়াও, তার জন্য ওই পাতাগুলো বার করা দরকার।

মুখটা টিস্যু পেপারে মুছে নিয়ে পল বলে ওঠে,—আজ রাতে তোমাকে দেখাব। তবে খেয়াল রেখো এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

24 মে, 2012, রাত আটটা

আগামী কালই অনিলিখারা বেরিয়ে পড়বে। সমস্ত ব্যবস্থা রেডি। ও আর পল ছাড়া অভিযানে যাবে রবার্ট। রবার্ট খুব ভালো শিকারি। অজানা দ্বীপ। সঙ্গে শিকারি থাকা দরকার। এ ছাড়া থাকবে পাইলট। তবে ঠিক হয়েছে পাইলট দ্বীপের ভেতরে ঢুকবে না। বাইরেই থাকবে।

অনিলিখা আর পল এসে স্টাডি রুমে বসেছে। বিশাল স্টাডি রুম। মেঝে, দেওয়াল সব কাঠের। দামি পাইন কাঠ। ঘরের হলদেটে আলোয় পলের মুখের দুপাশে পড়া ভাঁজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখটাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ল্যামিনেট করা কয়েকটা পাতা সামনের বড় টেবিলের ওপর রেখে পল বলে উঠল,—পৃথিবীর সব থেকে বিখ্যাত ডায়েরির পাতা। কি আমি পড়তে শুরু করব?

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে পল শুরু করল—

ডারউইনের ডায়েরি

23 অক্টোবর, 1835, বিকেল পাঁচটা

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া। লম্বা পথ। মাঝে কিছু পলিনেশিয়ান আইল্যান্ড দেখার ইচ্ছে আছে। গ্যালাপাগোস দেখার রোমাঞ্চ এখনও ভুলতে পারছি না। ওইটুকু একটা আইল্যান্ড। আর তার মধ্যেই এত বৈচিত্র্য। আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসে আমার যে ধারণা হয়েছিল, সেটাই যেন আরও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ওখানে যে অস্ট্রিচ দেখেছিলাম তা যেন অন্য অস্ট্রিচদের থেকে আলাদা। পা-গুলো ছোট ছোট। ওপরের দিকটা আরও ভারী। গ্যালাপাগোসে ওই অস্ট্রিচেরই আরেক রূপ দেখলাম। এগুলোর পা বড়। এই যে একই প্রাণীর নানান চেহারা—তা কি নানান জায়গায়, নানান পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে?

এই যে হামিং বার্ড—এই পাখির নানান চেহারা নানান দ্বীপে। কোথাও এদের ঠোঁট লম্বা, সরু। কোথাও ঠোঁট ছোট, গোল। যে দ্বীপ যত বেশি পাথুরে, সেখানে এদের ঠোঁট তত সরু-লম্বা। পাথরের ফাঁক থেকে খাবার খুঁজে বার করার তাগিদেই কি ওদের চেহারার এই পরিবর্তন? যেখানে ওরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে পরিবর্তনে সফল হয় না, সেখানেই কি বিলুপ্ত হয়ে যায়?

আমরা প্যাম্পাসে যে অস্ট্রিচটাকে রোস্ট করে খেলাম, তার হাড়গোড় ইংল্যান্ডে পক্ষী বিশারদ জন গোল্ডকে পাঠিয়েছিলাম। ও বলল, ওটা নাকি অস্ট্রিচ নয়—রিয়া। রিয়ার সংখ্যা বর্তমানে সাংঘাতিকভাবে কমে এসেছে। আমারও ওই পাখিটাকে দেখে তাই মনে হয়েছিল। ওই প্রাণীটার ছোট ছোট পা, ভারী শরীর দেখেই মনে হচ্ছিল এদের ধরা খুব সহজ। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে রিয়াও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, পরিবেশের সঙ্গে মানাতে না পেরে। কিন্তু ওরই গোত্রের আরেকটা প্রাণী অস্ট্রিচ হয়তো টিঁকে থাকবে। পুন্টা অ্যাল্টায় প্রচুর ফসিল দেখেছিলাম। নানান টাইপের প্রাণীর। ক্যাপিবেরা, অ্যাগাউটি—যে গোত্রের প্রাণী, সেরকমই টেপির শ্রেণির একটা প্রাণীর ফসিল পেলাম। এরা কি পরিবেশের সঙ্গে মানাতে পারেনি বলে প্রকৃতির খেলায় বাতিল হয়ে গেছে?

আমি এখন জাহাজের মধ্যে আমার কামরায় বসে ডায়েরি লিখছি। জাহাজের বাকি অফিসাররা বাইরের ডেকে আগুন ঘিরে বসে আছে। মাঝেমধ্যে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা না বলে বসে থাকি। পাঁচ বছরে যা হয় আর কী! একই কথা নানান মোড়কে, নানান রংচঙ মাখিয়ে বলেও শেষ হয়ে গেছে। তবে এ ক'বছরে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা বলেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি। জাহাজে এসেছিলাম ফিৎজরয়কে সঙ্গ দিতে, তখন বুঝিনি যে এই জীবজগতের প্রতি আমার এত আগ্রহ আছে! যত দেখছি তত আগ্রহ বাড়ছে। মনে হচ্ছে যেন এক অজানা রহস্যের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি।

এই যেমন পুমা। পুমা আসলে একধরনের সিংহ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকায় পুমা দেখা যায়। নিরক্ষরেখার উষ্ণ বনাঞ্চলেও যেমন এদের দেখা যায়, তেমনই আবার দেখা যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর মতো ঠান্ডা হাড়-

কাঁপানো জায়গাতেও। সমতলেও যেমন দেখেছি, তেমনি এদের পায়ের ছাপ দেখেছি চিলির কার্ডিয়েলাতে দশহাজার ফুট উঁচুতে। ল্যা-প্লাডাতে পুমার শিকার হয় হরিণ, অস্ট্রিচের মতো প্রাণীরা। মানুষের ওপর এরা কখনও আক্রমণ করে না। কিন্তু চিলিতে যেহেতু হরিণ, অস্ট্রিচ মেলা ভার, তাই সেখানে ওদের মেন ডায়েট মানুষ। প্রত্যেক জায়গায় পুমার চেহারা আলাদা, ব্যবহার আলাদা। যেন একই প্রজাতির আরেকটা প্রাণী। কচ্ছপগুলোরও তাই। প্রত্যেকটার খোলসের রং একদ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে আলাদা—সে দ্বীপের সঙ্গে রং মিলিয়ে।

আমার চোখের রং নীল। শুনেছি আগে ইংল্যান্ডে নীলচে চোখের লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। এখন সংখ্যাটা বাড়ছে। এটা কি এ জন্যই যে নীলচে চোখ বেশি আকর্ষক, আর তাই এটা সঠিক পরিবর্তন!

ডায়েরি লেখার কাজে বাধা আসছে। ডেকে হল্লা হচ্ছে। আজ ওদের মদ্যপানটা কি একটু বেশিই হয়ে গেছে? দেখে আসি তো কী ব্যাপার। আজকের লেখা এখানেই ইতি।

23 অক্টোবর, রাত একটা, 1835

ভারি অদ্ভুত এই দ্বীপটা। না দেখলে আমাদের পুরো যাত্রাই বিফল হত। এই দ্বীপে আসার কিন্তু কোনও প্ল্যান ছিল না। ডেকে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে ওপরে উঠে আসি। দেখি একটা অদ্ভুত প্রাণী জালে ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা ডলফিনের মতো। কিন্তু রং উজ্জ্বল লাল। ডানার পাশ থেকে হাতের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আছে। ডাঙায় হাঁটার সময় হয়তো সেটায় ভর করে হাঁটে। সবথেকে আশ্চর্য, আমরা যে ওকে ধরেছি—ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি, এমন কোনও ভয়ডরই ওর মধ্যে নেই। জাল থেকে বের করার পর দিব্যি আনন্দে আমাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। হাত থেকে খাবার নিতে থাকল। এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বের কথা আমাদের কারোরই জানা নেই। এটাকে ধরে রিচার্ডের কাছে পাঠালে ও নির্ঘাত শক্ত একটা নাম দিয়ে বসবে। আমি ওটাকে ডলফিন-ই বলব।

আমরা গল্প করছি—হঠাৎ ডলফিনটা ঝড়ের বেগে রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দিল। ঘটনাটার জন্য আমরা একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। ছুটে রেলিং-এর ধারে গিয়ে দেখি ওরই মতো আরও দুটো ডলফিন। ওটা গিয়ে ওই দলে ভিড়ে গেছে। আর উত্তর-পশ্চিম দিকে ডলফিনোচিত ভঙ্গিতে সাঁতরে যাচ্ছে।

আমরা ওর পিছু নিলাম। একটু অ্যাডভেঞ্চার আর কি! মিনিটদশেক বাদে দেখি আমরা অজানা একটা দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি। দূর থেকে তার তটরেখা দেখা যাচ্ছে। ম্যাপে এই দ্বীপটার কোনও চিহ্ন নেই। দ্বীপটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সামান্য তট। তারপর সমুদ্র থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে। সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে এরকম ভূখণ্ড সৃষ্টি করে। হয়তো এ দ্বীপটাও বেশি পুরোনো নয়।

দ্বীপের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা ঘোরার পর খানিকটা সমতল তটভূমির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান দিয়ে হেঁটে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যাবে। জাহাজ নোঙর করে আমরা ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ করলাম যে এখানকার গাছগুলো ভিন্ন প্রজাতির। সব গাছেই কেমন একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। খুব তীব্র পারফিউমের মতো। পথে কয়েকটা ছোট লেক পড়ল। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা লেকের ধারে গিয়ে বসলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল। দ্বীপটার মধ্যে কিন্তু কোনও জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। প্রাণহীন দ্বীপ না কি? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি ঝোপের মধ্যে থেকে একটা হরিণ শ্রেণির প্রাণী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিণ শ্রেণির বলছি, কারণ হরিণের মতো রং নয়। গাঢ় নীল। আমি প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। উলটে মুখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। এই অদ্ভুত রঙের জন্য ও খুব সহজেই অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে উঠতে পারে।

সব জায়গাতেই কিছু লোক থাকে যারা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কোনও কাজ করে না। ক্রিস ওরকমই একজন। হঠাৎ করে ছুটে এসে প্রাণীটাকে গাছের ডাল নিয়ে তাড়া করল। অবশ্য তাড়া করায় ভালোই হল। আরেকটা জিনিস দেখতে পেলাম। দেখলাম, এই প্রাণীটার সঙ্গে হরিণের আরেকটা তফাত হল এটা হরিণের দশভাগের একভাগ বেগেও ছুটতে পারে না।

আমরা ঠিক করলাম, জাহাজে না ফিরে তাঁবু খাটিয়ে দ্বীপেই রাত কাটাব। তেমন হিংস্র কোনও জানোয়ার এই দ্বীপে আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য অনেক অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।

রাতে খাওয়ার পর আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে বসলাম। কী অপূর্ব এই দ্বীপ। পাহাড়-হ্রদ-সমুদ্র, সবুজে ঢাকা উপত্যকা—কী নেই এই দ্বীপে। কেউ যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এক জায়গায় এনে জড়ো করেছে।

কিন্তু এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কিছু একটার যেন অভাব আছে। তাই বোধহয় সামনের পাইনের বনে ঝাঁপিয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখেও মন খারাপ লাগছিল। নুইয়ে পড়া উইলো গাছের পাতায় যেন কীসের বিষণ্ণতা। শনশন বাতাসে যেন শোনা যাচ্ছে ম্যাপল পাতার কান্না।

পাঁচ বছর হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। বাবা-দাদা কে কেমন আছেন কিছুই খবর পাইনি। কী লাভ হয়েছে এই পাঁচ বছর জাহাজে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে। নানান ধরনের জীবজন্তু, গাছপালা আর জীবাশ্মের সন্ধানে জীবনের কয়েকটা মূল্যবান বছর হারিয়ে বসে আছি। জীবজগতের এই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না কেন, এটুকু বুঝেছি আমার নেই। এর থেকে ভালো ছিল গ্রামে গিয়ে প্রিস্ট হওয়া। বাবার কথা মতো না এলেই ভালো করতাম।

আমার পাশে বসে আছে কেন ডারিংটন। চুলে ঝুঁটি বাঁধা। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। জাহাজের কলকবজা খুব ভালো বোঝে। মেনটেনান্সের জন্য ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারাক্ষণ হইচই করতে ভালোবাসে। তা সে-ও

দেখছি মনমরা হয়ে বসে আছে। দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। হুঁ-হাঁ বলে কাটিয়ে গেল। বুঝলাম ওর মনের অবস্থা ভালো নেই।

এরমধ্যে খানিকক্ষণ ধরে একটা মসমস আওয়াজ শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন-ই আবিষ্কার করল—শজারু। আমার ঠিক দু-ফুট দূরে নির্ভয়ে বসে আছে। ভয় অবশ্য আমারই পাওয়ার কথা। কাঁটা ফুটলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সতর্ক হওয়ার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। আমার অবশ্য নয়, কেন-এর। কেন কী একটা ফল খাচ্ছিল। তারই আকর্ষণে কি না জানি না, হঠাৎ করে শজারুটা কেন-এর গা ঘেঁষে বসল। কেন-ও চমকে উঠেছিল। কিন্তু এবার আমার চমকে ওঠার পালা। কেন শজারুটাকে কোলে তুলে দিব্যি আদর করছে। খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে উঠল,—ডারউইন, হাত দিতে পারো। এটা শজারু নয়, এর কাঁটাগুলো একেবারে নরম। হাত দিলে বেশ আরাম হয়।

একটু দ্বিধা নিয়ে কেন-এর কথা মতো শজারুটার গায়ে হাত দিলাম। আশ্চর্য কাঁটাগুলো শজারুর মতো শক্তও নয়, বিঁধেও যায় না। খুব নরম, লম্বা লম্বা রোমের ওপর হাত দিলে যেমন লাগে সেরকম। আর প্রাণীটাও সত্যি অদ্ভুত। এর কোনও ভয়ডর নেই। দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের মাঝখানে বসে রইল। যেন আমাদের পোষা, সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটা বাড়ছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে তাই মোমবাতির আলোয় ডায়েরি লিখতে বসেছি। খানিকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে ভাবনাটা শুরু হয়েছে সেটা আর আজকে লিখলাম না। কাল দেখা যাবে সেটা নেহাতই অমূলক কি না।

25 অক্টোবর, 1835

গত দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। জানি না, আমিও এই দ্বীপ ছেড়ে বেরোতে পারব কি না! নাকি আমার অবস্থাও কেন, রোজ, জন, ডেভ-এর মতো হতে চলেছে।

শুরু করা যাক কাল সকাল থেকে। পরশু রাতে কেন-এর নাকডাকা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। শজারু শ্রেণির প্রাণীটাও আমাদের তাঁবুর মধ্যে এসে শুয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় চলে গেছে।

আরেকটু পরে আমরা দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরোলাম। দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। গাছ থেকে যে গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সেটা যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া টপিকাল হলেও যে জঙ্গলটায় ঢুকলাম তার সঙ্গে টপিকাল ফরেস্টের তেমন মিল নেই। পাইন, ওক, দেবদারুর মতো শীতপ্রধান জায়গার গাছের ভিড়। আরও বেশ কিছু অজানা-অচেনা গাছ। একটা গাছ দেখে আখরোট বলে মনে হল। সেরকমই বড় বড় পাতা। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলাম হঠাৎ গাছের পাতাগুলো গুটিয়ে গেল। আমরা যেভাবে হাতের পাতা গুটিয়ে নিই ঠিক সেভাবে। বেশিরভাগ গাছই ন্যাড়া ন্যাড়া মতন। পাতা খুব কম। শুধু ডালপালা ছড়িয়ে নির্জীবভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটা সাপ চোখে পড়ল। নেতিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিং কোবরা। সাপের রাজাকে এরকম নিস্পৃহভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেও ফণা তুলল না। আস্তে আস্তে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অসুস্থ হবে হয়তো।

ওদিকে ডেভ চেঁচিয়ে উঠল—লাল ইঁদুর!

ওর আঙুল লক্ষ করে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। সাপটার থেকে হাতদুয়েক দূরে টকটকে লাল রঙের ইঁদুর। শিকার ও শিকারির এভাবে পাশাপাশি বসে থাকা কল্পনা করা যায় না। যেন দুজনেই কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আর জীবনের সব আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছে।

আমার মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা কীরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি আমার এতদিনের পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা—সবই কি ভুল? বিভিন্ন দেশের অজস্র জীবজন্তু উদ্ভিদশ্রেণি দেখে আমি সিদ্ধান্তে আসতে চলেছিলাম যে, প্রত্যেক জীব তার জীবনধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরির্বতন ঠিক দিকে হলে সেই জীব এই জীবজগতে টিঁকে যায়। না-হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেক দেশের পুমার চেহারা তাই একেকরকম। হার্মিং বার্ড একেকরকম। কিন্তু এখানে যেন সবকিছুই অন্যরকম। কারও কোনও আত্মরক্ষার অস্ত্রই নেই। এখানকার শজারুর না আছে কাঁটা। হরিণের না আছে গতি। তবু তারা কীভাবে যে জীবন সংগ্রামে টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকলাম। খানিকবাদে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। জায়গাটা থেকে চারদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় উঠে গেছে। একটা কম-খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

খানিকটা ওঠার পর গাছের ভিড় আরও কমে গেল। আমরা ওই পাহাড়ের প্রায় ওপরে উঠে গেছি। দ্বীপের বেশ খানিকটা জায়গা এখান থেকে দেখা যায়। সবুজ বনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লেকগুলো ওপর থেকে দারুণ লাগছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।

এরই মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। একবার নয়, তিন-তিনবার। ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি জনের রাইফেলের নল থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ওর থেকে মোটামুটি কুড়ি হাত দূরে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। চিতাবাঘটা নাকি পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের দিকেই আসছিল। এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটাকে কাছ থেকে দেখলাম। অদ্ভুত! এর পায়ের পেশি দেখলে মনে হয় না যে এগাছ বেয়ে উঠতে পারে। খুব জোরে ছুটতে পারে বলেও মনে হল না। শরীরের গঠন সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

চিতাবাঘটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আমরা ঝোপ সরাতে সরাতে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগোবার পরে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। চারদিকে বেশ কিছু প্রাণীর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটু দেখেই বুঝতে পারলাম যে এগুলো অন্য কোনও প্রাণীর নয়, চিতাবাঘেরই। কী ব্যাপার! এখানে কি

কোনও দাবানল লেগেছিল? চারদিকের গাছ-মাটি দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না, তাহলে কি আরও শক্তিশালী কোনও প্রাণীর শিকার হয়েছে এরা?

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সবার খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তাঁবুর উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করলাম। তাঁবুতে ফিরে দুপুরের খাওয়া সারা হল। একটা আর্মাডিলো ধরা হয়েছে। খোলসসুদ্ধ রোস্ট করা হয়েছিল। প্রথম দিকে আর্মাডিলোর মাংস খেতে জঘন্য লাগত। কীরকম একটা বিদঘুটে গন্ধ। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

খাওয়ার পরে বিশ্রাম না নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটু অন্যদিকে। সবাই খুব হতোদ্যম। বেরোনোর আর উৎসাহ নেই। তাই একাই বেরোতে হল। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

বনের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা হথহর্ন গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। গাছের সেই বিদঘুটে গন্ধটা মনকে কেমন অবসন্ন করে দিচ্ছে। জীবনকে সেই মুহূর্তে এতটাই অর্থহীন মনে হল যে সেই গাছের তলাতেই বসে রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেতাম। একা এই অচেনা বনে রাত কাটানো। কিন্তু তখন সেই ভয়ও নেই। শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। নেহাত মনের জোরে উঠে দাঁড়ালাম। রওনা হলাম তাঁবুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু চাঁদের আলোতে এই বনানীর মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে পেলাম না। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক ঘোরার পরে বুঝলাম যে পথ হারিয়েছি। সকাল হওয়ার আগে ফেরার চেষ্টা বৃথা।

জঙ্গলের মধ্যে রাত না কাটিয়ে একটু খোলা জায়গায় থাকা ভালো। তারই সন্ধানে এগোতে গিয়ে মনে হল, দূরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ এগোনোর পর যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম তা লিখে বোঝানো মুশকিল। খানিক দূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে, আর সেই লেকের ধারে প্রায় জনা তিরিশ লোক জড়ো হয়েছে। দেখতে অনেকটা আমাদেরই মতন, হাতদুটো আরেকটু লম্বা। মুখটা ছোট, কিন্তু চওড়া। গায়ের রং কালো নয়, ফরসার দিকেই বলা যেতে পারে।

ওদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা জাতীয় কিছু একটা হচ্ছে বলে মনে হল। বেশ কয়েকটা একই ধরনের ছোট ছোট কাঠ পাশাপাশি মাটিতে রাখা আছে। এক এক করে জনাদশেক লোক এসে যে যার মতো কাঠ নির্বাচন করল। তারপর কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগল। একজনকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত মনে হল। বোধহয় সে-ই সবথেকে আগে আগুন জ্বেলেছে। একজন নেতা গোছের লোক এসে সেই লোকটার গলায় ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে বোনা একটা মালা পরিয়ে দিল।

লেকের ধারে এক জায়গায় বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে চিতার মতো করা ছিল। লোকটা গিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েকটা লোক লতাপাতা দিয়ে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কাঠের সঙ্গে বাঁধল। আরও কিছু কাঠ

চাপানো হল। কী হতে চলেছে বুঝতে পারছি না। এবার একটা মেয়ে এসে ওই কাঠের ওপর কী একটা তরল ছড়িয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা শুরু করল।

কী হতে চলেছে? পুরস্কার হিসেবে এ লোকটাকে জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে? এখানে কি তবে মৃত্যুটাই পুরস্কার? সবাই কি এখানে মরতে চায়।

এসব ভাবছি, ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে মন্ত্র জাতীয় কিছু একটা বলতে লাগল। মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে সবাই গোল হয়ে আগুনটাকে ঘিরে বসল। কারও মুখে কোনও কথা নেই, হাসি নেই। এ এক অদ্ভুত সভা। আমিও যে কতক্ষণ বসেছিলাম কে জানে!

সকাল হতে ওই লোকগুলো উলটো দিকের বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আমাকেও আশা করি ওরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না।

ওদের সম্বন্ধে আরও জানা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য, উৎসাহ পেলাম না। মনে হল, এখানেই বসে থাকি। জীবনের বাকি সময়টা যেন এখানে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। খিদে পেয়েছে, ফিরতেই হবে। গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে আসার সময় চিহ্ন রেখেছিলাম। সেরকম একটা গাছ খুঁজে পেতেই ফেরাটা সহজ হয়ে গেল। ফিরতে ফিরতে আরও একঘণ্টা হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো তাঁবু। আমাকে দেখেই ক্যাপ্টেন ফিৎজরয় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে ডারউইন? আমি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোমার অবস্থাও কেন আর ডেভের মতো হল কি না।

একটু থেমে ফিৎজরয় ফের বলে উঠল, না, না, এ দ্বীপে আর নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। সবাই কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—কেন, ডেভের কী হয়েছে?

—শুধু কেন, ডেভ? কাল সন্ধে থেকে তোমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন নিখোঁজ। রাত আটটা নাগাদ তোমরা কেউ ফিরলে না দেখে আমরা মশাল নিয়ে বেরোলাম। কাল দুপুরে যেদিকে গিয়েছিলাম, সেদিকেই তোমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে এগোলাম। কালকে আমরা যতদূর গিয়েছিলাম তার থেকে আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেলাম। আরেকটা ছোট টিলা মতন পাহাড় পথে পড়ল। সেটা বেয়ে ওপরে উঠলাম। পাহাড়টা বেশ ন্যাড়া। গাছ নেই বললেই চলে। তাই দূর থেকে হঠাৎ কেন আর ডেভকে দেখতে পেলাম। ওরা দুজনেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে কেনকে ধরে ফেললেও ডেভকে ধরতে পারিনি। তার আগেই নীচে ঝাঁপ দিয়েছে। ওর কোনও চিহ্নই নেই। খাড়া পাহাড়টার নীচের দিকে জঙ্গল। কেন-এর তখনও ঘোর কাটেনি। বারবার বলে চলেছে,—আমি মরতে চাই, আমি মরতে চাই।

কালকের পর থেকে এখনও অবধি ওর একই অবস্থা চলছে। পাতার রস খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

—আর ডেভ?

—আমরা পাহাড় থেকে নেমে ঘণ্টাখানেক বাদে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। ডেভের মৃতদেহ পেলাম না, তবে যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। চারদিকে হাজার হাজার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরাও প্রত্যেকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। কত ধরনের প্রাণীর কঙ্কাল যে ছড়িয়ে আছে তা বলে বোঝানো যাবে না। কিছু কিছু কঙ্কাল তো আমার পরিচিত সব প্রাণীর চেয়ে অনেক বড় চেহারার প্রাণীর বলে মনে হল। মনে হল ওই জায়গাটা সবাই সুইসাইড স্পট হিসেবে ব্যবহার করে। ওখান থেকে আমরা সোজা ফিরে এলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সবাই ক্লান্ত-অবসন্ন। সবার মন খারাপ। বাকিদের খোঁজ এখনও পাইনি।...তা তোমার কী খবর?

আমিও আমার রাতের অভিজ্ঞতা ফিৎজরয়কে খুলে বললাম।

—আমার মনে হয়, এই দ্বীপের পরিবেশে এমন কিছু আছে, যার জন্য এখানকার জীবজন্তুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। হয়তো তাঁরা বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। আরেকটা জিনিসও লক্ষ করার মতো। এ দ্বীপের গাছ, পশুপাখি পৃথিবীর বাকি যে-কোনও জায়গার থেকে একদম অন্যরকম। আমার মনে হয় এ দ্বীপে বেশ কিছুদিন থেকে এখানকার জীবজন্তুদের স্টাডি করা দরকার।

আমার কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণু�ভাবে বলে উঠল,—ডারউইন, তোমার মতো শুধু রিসার্চ করতে আমি আসিনি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে কোস্ট সার্ভে করে আমার সহযাত্রীদের সাবধানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই আমার ইচ্ছে কালকেই এ দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কাল সকালেই। সবাইকে আমি এই দ্বীপে হারাতে চাই না। মনে রেখো প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা বাকি পাঁচজনের খোঁজে বেরোলাম। দ্বীপের বেশ কিছু জায়গা একেবারে দুর্গম। দিনের শেষে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন ওই পাঁচজনের খোঁজ তো পাওয়াই যায়নি, উলটে আরেকজন খালাসিকেও শুনলাম সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে-ও নিখোঁজ।

সত্যিই এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর থাকা উচিত হবে না। অন্তত সব সহযাত্রীর ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

জীবজগতের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ-খাওয়াতে না পারলে সেই জীব হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়। খালি শক্তিমানেরাই টিঁকে যায়। কিন্তু এই দ্বীপ সব দিক দিয়েই ব্যতিক্রম। তার কারণ, এ দ্বীপের প্রত্যেকটা জীব মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। অভিশপ্ত জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক, এই কামনা করে। তাই কোনও জীবনসংগ্রাম নেই, কোনও প্রতিযোগিতা নেই, লড়ে বেঁচে থাকার তাগিদ নেই। এধরনের পরিবেশে কী দরকার অভিযোজনের? কী দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর? তাই এখানে

শক্তিমানেরা হারিয়ে যায়। তারা আত্মঘাতী হয়। পড়ে থাকে তারাই—যারা দুর্বল, যারা নিরীহ। কাল আরও ক'টা প্রাণী দেখতে পেলে ভালো হয়। আজ এখানেই রাখি। হাত যেন আর চলছে না।

পল পড়া থামাল।

—ব্যস, এখানেই শেষ? অনিলিখা বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, এরপরে আর কিছু নেই।

—তা, তার পরের কয়েকদিনে কী হয়েছিল, কী দেখেছিল—কিছুই তো লেখেননি!

—আমার মনে হয় ওরা তার পরদিনই ওই দ্বীপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর এই শক কাটাতে ওনার সময় লেগেছিল। এতজন সতীর্থের মৃত্যু। খবর বেরোলে ক্যাপ্টেন ফিৎজরয় অস্বস্তিতে পড়ে যেত। প্রশ্ন উঠত কেন প্রয়োজনীয় সাবধানতা নেওয়া হয়নি। তবে এ দ্বীপের ঘটনায় ডারউইন নিজেই যে তার থিয়োরি সম্বন্ধে কনফিউসড হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিত। তা না-হলে, বিগল যাত্রার 23 বছর বাদে 1859 সালে ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশান' লিখবেন কেন? ফেরার দু-এক বছরের মধ্যেই লিখতে পারতেন। 23 বছর অপেক্ষার কী কারণ থাকতে পারে?

—তা আমরা যে যাব, দ্বীপটা ঠিক কোন দ্বীপ তা বোঝা যাবে তো?

—হ্যাঁ, সেসব ইনফরমেশন আমি ইতিমধ্যেই জোগাড় করে নিয়েছি। এটা 00 অক্ষাংশ—910 পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে। আমার প্লেনের জিপিএস ভুল করবে না। চলো এখন রেস্ট নেওয়া যাক। কাল থেকে নেক্সট কয়েকদিন যথেষ্ট পরিশ্রম হবে।

স্টাডিরুমের দেওয়ালে পরপর বেশ কয়েকটা ছবি। দাঁড়িওয়ালা গোলফ্রেমের চশমা পরা এক প্রফেসার সুলভ ছবি দেখিয়ে পল বলে ওঠে—ইনিই রিচার্ড আওয়েন। ডারউইনের যাবতীয় কৃতিত্বের অন্তত পঞ্চাশভাগ এনার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই পাননি। দেখি ওনার বংশধর হয়ে এ দ্বীপ আবিষ্কার করে কিছুটা স্বীকৃতি যদি পাওয়া যায়।

বাকি ছবিগুলো দেখে পল আর অনিলিখা খানিকবাদে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

25 মে, 2012

সানফ্রান্সিসকো থেকে প্লেনে বারো-তেরো ঘণ্টার যাত্রা। ভোর পাঁচটায় বেরোলেও ওই দ্বীপে পৌঁছোতে অনিলিখাদের সন্ধে হয়ে গেল। দ্বীপটা খুঁজতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। স্যাটেলাইটের দৌলতে দ্বীপ খোঁজা এখন খুব সোজা।

তবে শক্ত কাজ ছিল প্লেনটা ল্যান্ড করানো। ছোট প্লেন হলেও ল্যান্ডিং-এর ঠিকমতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় মাইক নিখুঁতভাবে প্লেন নামাল চরের ওপরে।

মাইক হল পলের পাইলট। আফ্রিকান। তবে ওদের দুই পুরুষ আমেরিকায় থাকে। রং কুচকুচে কালো। মাঝবয়সি। চোখের নীচটা খানিকটা বসা মতো। ভোঁতা নাক। চোখে-মুখে হিংস্রতার ছাপ। একটু জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে। মাইক দ্বীপের ভিতরে ঢুকবে না। ঢুকবে রবার্ট, পল আর অনিলিখা। প্লেনেই রবার্টের সঙ্গে অনিলিখার পরিচয় করে দিয়েছে পল। রবার্ট শিকারি। এরকম বেশ কিছু শিকারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ওর আছে। কথা খুব কম বলে। পল ওর পরিচয় দেওয়ার পর রবার্ট কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সন্ধে হয়ে গেছে বলে ওরা সে রাতের মতো চরেই তাঁবু করে নিল। পল অনেক ক্যানড ফুড এনেছে। স্যুপ, সেদ্ধমাংস, কাটা ফল, সবই আছে। তা ছাড়া আছে একটা ফোল্ডিং ইউটিলিটি সেন্টার, যাতে রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম—মাইক্রোয়েভ, ফ্রিজার, প্লেট, কাঁটাচামচ সবই আছে। অন্তত আগামী দশদিনে খাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। এ দ্বীপে আসামাত্রই বুনো গন্ধটা ওরা টের পেয়েছে। অদ্ভুত একটা মন মাতানো গন্ধ। মনটাকে কেমন যেন অবসন্ন করে দেয়।

খেতে খেতে পলই বলে উঠল,—এ দ্বীপে আমরা কিন্তু চার দিনের বেশি থাকব না। ডারউইনদের মতো অবস্থা না হয়। অনেক অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি। রেগুলার খেতে হবে। সুইসাইড করার ইচ্ছে আবার না জেগে ওঠে।

—হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই কীরকম নিস্তেজ লাগছে। অথচ কী সুন্দর আইল্যান্ডটা! তা চারদিনের মধ্যে কি ডেভিডকে খুঁজে পাওয়া যাবে? অনিলিখা বলে ওঠে।

—চারদিনে না পাওয়া গেলে দশদিনেও পাওয়া যাবে না।

—তা আমরা খুঁজব কীভাবে? কোনদিকে যাব?

—আমরা উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর যাব, ঠিক যেদিকে ডারউইন নিজে গিয়েছিলেন।

বলে পল কাগজে একটা ম্যাপ আঁকতে শুরু করল।

পলের হাতে ধরা মঁব্লা স্পেশাল এডিসন—নেপোলিয়ান কালেকশনের পেনটা দেখে অনিলিখা বলে ওঠে,—এটা ডেভিডের পেন না?

—কেন এ পেন কি শুধু ওর কাছেই থাকতে পারে? এটা আমার। একটু রেগেই যেন বলে উঠল পল। তারপর বলল, —একটা জিনিস শুধু মাথায় ঢুকছে না। এ দ্বীপটা আগে আবিষ্কৃত হয়নি কেন?

—হয়তো যারাই এ দ্বীপে আসে তাদেরই ডারউইনদের মতো অবস্থা হয়। বলেই অনিলিখা থেমে গেল। জঙ্গলের মধ্যে থেকে কার যেন আর্তচিৎকার ভেসে এল। রবার্ট আর পল বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল কিন্তু চাঁদের আলোর বাইরে কিছুই দেখা গেল না।

27 মে, 2012

দুদিন কেটে গেল। ডেভিডের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে দ্বীপটা সম্বন্ধে ডারউইনের লেখা যে ঠিক সে ব্যাপারে অনিলিখা নিশ্চিত। অন্য দিক থেকে বলা যায়—এ দ্বীপটাই যে ডারউইনের দ্বীপ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমত দ্বীপটায় প্রাণী নেই বললেই চলে। যা আছে তারা অন্যরকম। অন্তত যে-ক'টা প্রাণী এরমধ্যে চোখে পড়েছে তাদের দেখে তা-ই মনে হয়েছে। কালকেই যেমন—গাছ থেকে পড়া একটা নারকোল ওরা ভেঙে খেতে যাবে, দেখে গুটিগুটি পায়ে একটা অ্যাগাউটি এসে হাজির। এর রং মেটে নয়, সবুজ। অ্যাগাউটিটা নির্ভয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়িয়েছে তা-ই না, চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে, যেন ওকে নারকোলটা ভেঙে কেউ খেতে দেবে। অ্যাগাউটিরা কামড়ে নারকোল ভেঙে ফেলতে পারে। ওদের মতো এ ব্যাপারে এক্সপার্ট আর নেই। দেখা গেল, এটা তা পারে না, সেরকম শক্ত চোয়াল বা দাঁতই নেই। যাই হোক, অনিলিখাদের বদান্যতায় এটা সামান্য একটু খেতে পারল। এমনিতে কী করে খায় কে জানে!

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু একটা পথ উত্তর-পশ্চিম দিকে গেছে। মনে হয় এপথে যাতায়াত আছে। তবে গাছের ডালপালা কেটে কেটে এগোতে হচ্ছে। একটাই বাঁচোয়া, জঙ্গল খুব ঘন নয়। তা হলে এগোনো মুশকিল হত। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি দ্বীপে যেমন ঘন বন হয়, এখানে সেরকম কিছু নেই। গাছেরাও যেন এ দ্বীপে থাকতে চায় না। ছোট ছোট পাতাহীন গাছ-ঝোপ-ঝাড়। হঠাৎ একটা কচ্ছপের দেখা মিলল। কচ্ছপ বলাটা অবশ্য ঠিক হবে না, কারণ এর খোলস বেশ নরম। কী করে আত্মরক্ষা করে সেটাই আশ্চর্য।

বিকেলের দিকে একটা উটশ্রেণির অদ্ভুত প্রাণীর মুখোমুখি হল ওরা। অনিলিখা দেখেই চিনেছে। ম্যাক্রোশেনিয়া। বহু হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উট, লামা, অ্যালপাকা প্রজাতির জীব। পা-গুলো আরেকটু লম্বা। দশফুটের মতো উচ্চতা। লম্বা গলা, ছোট মাথা। নাকের ফুটো চোখের ওপরে। পা-গুলো গণ্ডারের মতো পেশিবহুল। তবে এই প্রাণীটা উধাও হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ বুঝতে পারল অনিলিখা। প্রায় না দেখে ছুটে এসে ধাক্কাই মারছিল পলকে। ওটাকে ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেল দু-ফুটের বেশি দূরত্বের কোনও কিছুই স্পষ্ট দ্যাখে না প্রাণীটা।

যখনই কোনও প্রাণী দেখছে, রবার্ট আর পল দুজনে মিলে প্রচুর ছবি তুলেছে। মাপঝোপ করছে। হঠাৎ করে ওদের এত আগ্রহ কেন, কে জানে? ডেভিডকে খোঁজাটা যেন মূল উদ্দেশ্য নয়। ডেভিডের কথা তুলতেই পলের উত্তর,—আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক না। ধৈর্য ধরো। ওর গায়ে তো আর চিপ বসানো নেই যে ট্র্যাক করে দেখতে পারব।

রবার্ট খুব কম কথা বলে। রাতে খেতে বসে হঠাৎ পলকে একটা বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল,—ওই জাহাজের ম্যাপটাতেও যে এই একই দ্বীপের কথা বলেছে তা তুমি বুঝলে কী করে?

—সে ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। যারা ওই সময়কার ম্যাপ সম্বন্ধে জানেন তাঁদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি। তারা নিশ্চিত এই দ্বীপই চিহ্নিত ছিল ম্যাপটাতে।

—কোন ম্যাপটার কথা বলছ পল? অনিলিখা অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

—ও তোমাকে বলা হয়নি। বারমুডা টায়াংগেলে সাড়ে তিনহাজার বছর আগে একটা জাহাজডুবি হয়েছিল। তাতে একটা গিয়ার হুইল পাওয়া গিয়েছিল, যার ছবি 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর মমির ছবির সঙ্গে মেলে। তুমি তো এটা আগেই শুনেছ! ওই জাহাজেই আরেকটা ম্যাপ পাওয়া গিয়েছিল। ওই গিয়ার হুইলের কাছেই। সেই ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে এই দ্বীপেরই উদ্দেশ্যে ওই জাহাজ রওনা হয়েছিল। সেরকমই ডাইরেকশন দেওয়া ছিল।

—তাহলে কি ওদেরও জানা ছিল এ অদ্ভুত দ্বীপের কথা? আশ্চর্য!

—হতেই পারে। 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর যখন বিজ্ঞানে এত আগ্রহ ছিল! পল বলে ওঠে।

—'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-এর সময় ইজিপ্টের অনেক বাণিজ্য বিস্তার হয়েছিল। উনি নানান দেশে অভিযান করেন। যুদ্ধের জন্য নয়। মূলত বাণিজ্য বিস্তারের জন্য। হয়তো একই কারণে এই দ্বীপে আসতে চেয়েছিলেন। রবার্ট বলে উঠল।

—কিন্তু জাহাজ আর পৌঁছোয়নি। বারমুডা টায়াংগেলেই সলিল সমাধি। গিয়ার হুইল থাকা সত্ত্বেও। পল বলে ওঠে।

—তার মানে অন্তত দু-দুবার অভিযান হয়েছে এই অভিশপ্ত দ্বীপে। একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে,—পল, এখানে তো ফোনের কোনওরকম নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। দরকার হলে কাউকে কিছু জানাব কী করে?

—আমার কাছে স্যাটেলাইট ফোন আছে। তা দিয়ে প্রয়োজনে জানানো যাবে। এসব ফোন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। ফোনের নেটওয়ার্কের দরকার হয় না। তবে ফেরা পর্যন্ত আমরা কেউ কোনওভাবে এ দ্বীপ আবিষ্কারের কথা জানাব না। এ খবর যাবে আমার কাছ থেকে। এ দ্বীপের ওপর আমারই সবথেকে বেশি অধিকার। তাই আমি চাই না আগ বাড়িয়ে তোমরা কিছু জানাও। অবশ্য এ আবিষ্কারের সঙ্গে তোমাদেরও নাম যুক্ত থাকবে।

—পল, আমার নাম থাকল, কি না থাকল সেটা বড় কথা নয়। আমি তো এসেছি শুধু ডেভিডকে খুঁজতে। কিন্তু সেটাই তো খুব সিরিয়াসলি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। অনিলিখা বলে ওঠে।

পল চেঁচিয়ে ওঠে,—তা তুমি কী করতে বলছ? মাইক লাগিয়ে ওর নাম অ্যানাউন্স করব? ডেভিড! ডেভিড!

অনিলিখা চুপ করে রইল। যতই হোক পলের জন্যই তো এখানে আসা। সব খরচ তো ও-ই বহন করছে।

ওরা আজ রাতে খানিকটা খোলা জায়গা দেখে তাঁবু খাটাল। জায়গাটা পাথুরে। ছোট-বড় নানান চেহারার পাথরে জায়গাটা ভরে আছে। তবু তারই মধ্যে জায়গা করে তিনটে তাঁবু খাটানো হয়েছে। খানিকদূরে একটা ঝরনা আছে। সেখান থেকে খাবার জল আনা হয়েছে। এ দ্বীপের আরেকটা অবাক করার মতো ব্যাপার হল এখানকার গাছ। যে ক'টা গাছ পরিচিত বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে পড়ে আপেল, চেরি, স্ট্রবেরি, আখরোট ও কাঠবাদামের গাছ। সবক'টাই শীতপ্রধান জায়গার গাছ। এখানকার গরমে কী করে হয় কে জানে?

অনিলিখা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ভাবতে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কোনওরকম যোগাযোগ করতে হলে পলকে জানাতে হবে। ওর স্যাটেলাইট ফোনই একমাত্র যোগাযোগের উপায়। পলের অনুরোধেই অনিলিখা ঠিক কোথায় আসছে তা বাড়িতেও জানায়নি। অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অনিলিখার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল পল। রবার্টকে ঠিক শিকারি বলে মনে হয় না। হয়তো শখের শিকার করে থাকতে পারে। কিন্তু শিকারির মতো হাবভাব, সজাগ দৃষ্টি নেই। মাঝে মাঝে ডায়েরি খুলে কি সব নোট করে।

বাইরে সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাঁবুর ফাঁক থেকে অনিলিখা দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আগামী দু-এক দিনেই পূর্ণিমা হবে। প্রায় বৃত্তাকার চাঁদের স্পর্শে এই পরিবেশ আরও মায়াবী হয়ে উঠেছে। কাঁপতে থাকা আঁধার রাতের গাছগুলো, পাতার ওপরে বৃষ্টির শব্দ, ঝোড়ো বাতাসের শনশন শব্দ আর মাঝেমধ্যে অপার্থিব আওয়াজ—এই দ্বীপকে যেন আরও রহস্যময় করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই এই দ্বীপ সারা পৃথিবীর কাছে অজানা থেকে যাবে। এখানকার জীবজগৎ থেকে শুরু করে সবকিছুই যেন অন্যরকম। তারা যেন আলাদাই থাকতে চায়। থাকতে চায় সব হিসেবের বাইরে।

28 মে, 2012

এরকম যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি অনিলিখা। ছ'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে ছ'টায় ওদের বেরিয়ে পড়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু আজ সকালে রবার্টের দেখা নেই। পল তাঁবুতে খোঁজ করতে গেল। সেখানেও রবার্ট নেই। আশপাশের বেশ খানিকটা জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হল, কোথাও রবার্ট নেই। অথচ কিছু না বলে চলে যাওয়ার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন নয় ও। ওর সব জিনিসপত্র যেরকম ছিল সেরকমই আছে। শুধু ডায়েরিটা নেই।

সকাল দশটা অবধি খোঁজাখুঁজি করেও যখন রবার্টকে পাওয়া গেল না, তখন ওরা ঠিক করল যে পথ ধরে এগোচ্ছিল সে পথ ধরেই আরও এগিয়ে যাবে ওরা। যদি রবার্ট এগিয়ে গিয়ে থাকে।

বাঁ-হাতে সিগার, ডান হাতে একটা লাঠি নিয়ে পল আগে আগে যেতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে হাঁটতে হাঁটতেই পল একটা কাগজ বের করে। তাতে চোখ বুলিয়ে বলে ওঠে,—আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। এরপর ডারউইনের কথামতো একটা ছোট পাহাড় পাওয়ার কথা। পাহাড়টা পেরোলেই পাওয়া যাবে জায়গাটা।

—কোন জায়গা?

—একটা ছোট নদী পড়বে, তাতে নাকি সোনার নাগেট পাওয়া যায়।

—ও এটাই তা হলে তোমার আসল উদ্দেশ্য। সোনার সন্ধান! সেজন্যই অতরকম যন্ত্র নিয়ে ঘুরছ। হাতের লাঠিটা কি সোনার ডিটেকটার? মাটিতে তাই ঠুকে ঠুকে দেখছ! অনিলিখা থেমে বলে ওঠে—'ওহ, তুমি সত্যিই ব্যবসায়ী!

পল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কথাটার সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলে উঠল,—খেয়াল রেখো সামনে কোনও পাহাড় দেখতে পাও কি না। ডেভিড এ পথেই এসেছে। সোনার খোঁজে এগোলেই ডেভিডকে পাওয়া যাবে।

আরও মিনিট কুড়ি পরে একটা পাহাড় চোখে পড়ল। বেশ চড়াই। গাছ কম। পাথুরে পথ ধরে ওরা পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে লাগল। মাঝেমধ্যে বেশ বড় পাথর। তার ওপর পা ফেলে ব্যালান্স রেখে ওপরে ওঠা। ওপর থেকে কয়েকটা জলধারা নীচে নেমেছে। তাতে বেশ স্রোত।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পাহাড়ে চড়ার পর ওরা অপেক্ষাকৃত একটা সমতল জায়গায় এসে পৌঁছোল। একটা পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় হঠাৎ লক্ষ করল খানিকদূরে একটা পুমা। ওদের দিকেই আসছে।

পল মুহূর্তের মধ্যে ওর বন্দুক বার করে তাক করেছে পুমাটার দিকে। পুমাটা কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। খানিকদূরে একটা মরা হরিণ জাতীয় প্রাণী পড়েছিল। ওর নজর সেই দিকে। অনিলিখা বলে উঠল,—গুলি ছোড়ার দরকার নেই পল। এখানকার পুমা মৃত প্রাণীই খেয়ে থাকে। আমরা ওর প্রধান শিকার নই। চেহারা দেখেই বোঝা যায় জোরে ছুটতে পারে না।

পলকে আজ বেশ ক্লান্ত লাগছিল। অনিলিখা তাই বলে উঠল,—তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল রাতে ঠিকমতো ঘুমিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে রবার্টের জন্য চিন্তা হচ্ছে। কোথায় যে গেল! এখানে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। বলে একটা পাথরের ওপর বসে আরেকটা সিগার ধরাল পল।

—পল, তুমি যে ডারউইনের লেখা নদীর কথা বললে, ওটার কথা তো ডায়েরির পাতায় কোথাও ছিল না!

পল মুচকি হেসে বলে উঠল,—লাস্ট কয়েকটা পাতা আমি আসলে গোপনীয়তার কারণে দেখাইনি। ওটাতে একটা নদীর কথা লেখা ছিল। সেখানে অনেক সোনার নাগেট ডারউইন খুঁজে পান।

—পল, তুমি যখন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে, তখন আমার ওপরে এটুকু বিশ্বাস তোমার রাখা উচিত ছিল। না থাকলে আসতে বলাই উচিত হয়নি।

—বিশ্বাস করে ডেভিডকে বলেছিলাম বলেই তো আজকে এই অবস্থা। এই অংশে যদি কোনও সোনা পাওয়া যায় তো তার ওপর আমাদের বংশেরই পারিবারিক অধিকার। এ আবার বলার কী আছে? ডারউইন নিশ্চয়ই জানত যে তার সব সাফল্যের মূলে রিচার্ড আওয়েন। তাই রিচার্ডকে এই ডায়েরির পাতাগুলো আলাদা করে দিয়ে গিয়েছিল যাতে এই সোনার অধিকারী রিচার্ডই হয়। আর ডারউইন জানত রিচার্ড এ দ্বীপের কথা গোপন রাখবে। ডেভিড ওই সোনার খোঁজেই নির্ঘাত এখানে এসেছিল। বিশ্বাস ঘাতকতা করে।

—আর আমি যদি একটু অন্যরকম বলি। ডারউইন ডায়েরির পাতাগুলো রিচার্ড আওয়েনকে দেয়নি, দিয়েছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিৎজরয়কে। ফিৎজরয় তো সঙ্গেই ছিল। ডারউইন আর ফিৎজরয় ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। তো কেন শুধু শুধু কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ডারউইন অতদূরে ইংল্যান্ডে রিচার্ডকে পাঠাতে যাবে? তার থেকে তো সহজ ছিল ফিৎজরয়কে দিয়ে রাখা। ফিৎজরয়ও এটা গোপনই রাখত।

—তুমি কি বলতে চাইছ অনিলিখা?

—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে আমাদের ডেভিড ফিৎজরয়ের বংশধর। ও-ই এই ছেঁড়া পাতাগুলোর আসল মালিক। ও যখন এটা পায় প্রথমেই ওর তোমার কথা মনে হয়, কারণ তুমি সবথেকে বড় গোল্ড মাইনিং কোম্পানির মালিক। ডেভিডের আগ্রহ মূলত ছিল এখানকার ফ্লোরা আর ফনায়। এখানকার অদ্ভুত জীবজগতে। তবে পরে মূল্য বুঝতে পেরে সোনার মালিকানা ও অংশীদারিত্বও হয়তো দাবি করেছিল। তুমি ওকে আশ্বাস দিয়ে এখানে নিয়ে আসো। আর নিয়ে আসার পরই ওকে মেরে ফেলে একমাত্র দাবিদারকে সরিয়ে দাও। ভেবেছিলে ওর মৃত্যুর খবর কেউ পাবে না। ওর পেনটা তোমার কাছে দেখেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল। তারপর যেভাবে তুমি দ্বীপের

মধ্যে এগোচ্ছিলে, আমি নিশ্চিত হই যে এটাই তোমার প্রথমবার আসা নয়। এই দ্বীপে কোথায় কি—কোনদিকে যেতে হবে—তা নিয়ে তোমার মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

মুহূর্তে পলের মুখ-চোখের চেহারা পালটে গেল। ক্রুর হাসি হেসে পল বলে উঠল,—এতটা যখন বুঝেইছ, তখন পুরোটাই শোনো। রবার্টও একই সন্দেহ করেছিল। তাই ওরও একই দশা হয়েছে। ওর ডেডবডিটা দিয়ে আশাকরি ইতিমধ্যে পুমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে। তোমারও একই দশা হোক, যাতে বাইরের কাউকে না বলতে পারো। মাইক ছাড়া আর কেউ জানে না যে তোমরা আমার সঙ্গে এসেছ। আর জানা গেলেও এ দ্বীপের মাহাত্ম্য তো আছেই। সুইসাইড প্রমাণ করে দেব। আর মাইক! মাইক তো আমার পোষা গুন্ডা। অনেক মার্ডার ও নিজে হাতে করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি মাইকের হাতে মরবে না। মরবে আমার হাতে। গুডবাই অনিলিখা!

পল মুহূর্তের মধ্যে সিগারটা ফেলে ওর কোল্ট পাইথন .357 রিভলভার বার করে নেয়। অনিলিখার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকে। একটা গুলি অনিলিখার ডানহাতে লাগে। সেই অবস্থাতেই অনিলিখা ছুটতে থাকে। নিশ্চিত মৃত্যু যদি এড়ানো যায়। হঠাৎ পিছনের ঝোপে আলোড়ন তুলে একটা প্রাণী বেরিয়ে আসে। বহু লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত এই বিশালাকার জীব পল আর অনিলিখার মাঝে। দু-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কুড়ি ফুট উচ্চতার কিম্ভূতকিমাকার এই প্রাণীটা অনিলিখাকে আড়াল করে আছে। মেগাথেরিয়াম। বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ আর এই অদ্ভুত প্রাণীটার আর্তচিৎকার পেছনে ফেলে অনিলিখা প্রাণপণে ছুটতে থাকে। ছোট-বড় নানান আকারের পাথরের ওপর দিয়ে ছোটা মুশকিল। হঠাৎ সামনের একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে অনিলিখা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে গড়াতে থাকে। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে একটা বড় পাথরে এসে লাগে। পরমুহূর্তেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

29 মে, 2012

আস্তে আস্তে মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল অনিলিখার কাছে। যে মুখটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখতে ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। রং ফরসার দিকে, পেশিবহুল সুদর্শন চেহারা, চওড়া কাঁধ, ছোট অথচ চওড়া মাথা, গোঁফ দাঁড়িওয়ালা মুখ। আরও দুটো মুখ দেখা গেল। একইরকম দেখতে। সবাই অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলেশহীন চোখ। অনিলিখা নিজের দিকে লক্ষ করল। ডান হাতের গুলির জায়গাটায় নানারকম লতাপাতা শিকড় বাঁধা। মাথার পিছনেও অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাতেও পাতালতার ব্যান্ডেজ। এরাই তাহলে অনিলিখাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

দূরে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে গোল করে ঘিরে বসে আছে আরও জনা কুড়ি মেয়ে-পুরুষ। পরনে গাছের পাতা, বাকলের পোশাক। আর নানান শেপের ছোট ছোট সোনার টুকরো দিয়ে বানানো গয়না। সবাই অনিলিখার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকানোরই কথা। এরকম পোশাক, এরকম দেখতে কোনও মানুষকে এরা দ্যাখেনি নিশ্চয়ই।

অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যেও অনিলিখা বুঝতে পারল এরা কারা। ক্রোম্যাগনান মানবগোষ্ঠী, যারা আজ সারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একটা সময় হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেকটাস আর ক্রোম্যাগনান—এই তিন ধরনের মানব গোষ্ঠী ছিল। আজ শুধু রয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্সরা। তা ক্রোম্যাগনানরা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ এরা। এদের বলা হত আদিম মানব গোষ্ঠীদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান। এদের শিল্পকলা ফ্রান্সের গুহাতেও দেখতে পাওয়া যায়। তা, এরা এখানে এল কী করে?

খানিকবাদে আগুন ঘিরে এরা গোল করে হাঁটতে থাকে। মাঝেমধ্যে হাতদুটো আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে উঠছে। এ সবই কি অনিলিখার আরোগ্য কামনায়? না কি অন্য কিছু? কে জানে!

অনিলিখার মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন। পল এখন কী করছে? ও কি সোনার সন্ধান পেয়ে গেছে? ও নিশ্চয়ই অনিলিখাকে খুঁজে বের করে মারার চেষ্টা করবে। অনিলিখা মারা গেলে অনিলিখার সঙ্গে-সঙ্গেই মুছে যাবে পলের সব কুকীর্তি। কিন্তু তার থেকেও বড় প্রশ্ন ও অনিলিখাকে এই অভিযানের সঙ্গী করল কেন? অনিলিখা তো আর সোনা খোঁজায় এক্সপার্ট নয়। নাহ, আর ভাবা যাচ্ছে না, মাথা ঝিমঝিম করছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে নিশ্চয়ই। আবার চোখ বুজল অনিলিখা।

8 জুন, 2012

অদ্ভুত এদের জীবন। কোনও জটিলতা নেই। কোনও চিন্তা নেই। শুধু একটাই প্রশ্ন, 'কাল কী খাব?' অন্য কোনও প্রশ্ন নেই বলেই লক্ষ বছরেও এদের কোনও পরিবর্তন হয়নি। জীবনটা একরঙা। এরা না করে চাষবাস, না পশুপালন। এদের না আছে কোনও বাসস্থান, না আছে পরিবার। এরা এমন কিছু করে না যার জন্য প্ল্যান করতে হয়। এমন কিছু ভাবে না যা কালকের চৌহদ্দির বাইরে। খিদে পেলে যা পায় তা-ই শিকার করে খেয়ে নেয়, যে ফল সামনে পায় তাই খেয়ে নেয়। সারা রাত খোলা আকাশের নীচে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমোয়।

দিনের বেশিরভাগ সময়টা অলসভাবে গল্প করে কাটায়। শিকারের গল্প করে। কেউ হয়তো পুমা সেজে দেখায়, কীভাবে পুমা শিকার করেছিল। মেয়েরা দল বেঁধে নেচে নেচে গান গায়। বাকি সবাই অবাক দৃষ্টিতে দ্যাখে।

এদের ভাষা একেবারেই অন্যরকম। মুখের বিভিন্ন অংশে—দাঁতে, তালুতে জিভের স্পর্শে আওয়াজ করে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে। এরা এতদিন ধরে বিচ্ছিন্ন বলেই হয়তো এদের ভাষা এতটা অন্যধরনের। প্রত্যেকের সম্পত্তি বলতে একটা রান্নার পাত্র, জল রাখার একটা কাঠের পাত্র, পাথরের কুঠার আর তিরধনুক। ধনুকের ছিলাটা তৈরি করে পুমার লিগামেন্ট থেকে। তিরের মুখে লাগিয়ে নেয় জংলি ফুলের বিষ। কেউ শিকার করে আনার পরে তা দলের অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন। কেউ কারও ওপর নির্ভর করে না। এদের মধ্যে নেতা থাকে না। তবে এরা মোটামুটি কুড়ি-তিরিশ জনের দলে ঘোরে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারপিট করে না।

অনিলিখার সবথেকে অবাক লেগেছে এদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক। সবাই সবার জন্য ভাবে। যে দুর্বল, যার কোনও শিকার করার ক্ষমতা নেই, তারই সবার আগে শিকারের ভাগ জোটে। অথচ আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুর মধ্যে অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। যেন কিছুই হয়নি। আজই দুপুরে একজন মাঝবয়সি মহিলা মারা গেল। আগেই অসুস্থ ছিল হয়তো। লোকটা বোধহয় ওর স্বামী হবে। এতটুকু কাঁদল না। মাটি খুঁড়ে বডিটা ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েকটা গাছের পাতা ছড়িয়ে দিল। তারপর অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। এরা কি মৃত্যুকে ভালোবাসে? কে জানে? তবে জীবনের ওপর এদের যে বিশেষ আগ্রহ নেই তা দেখেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে চুপ করে এক জায়গায় দল বেঁধে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখে মনে হয় মৃত্যুই চায়, কিন্তু উপায়টা জানা নেই।

9 জুন, 2012

এত আনন্দ অনিলিখা আগে কোনওদিন পায়নি, যতটা পেল ডেভিডকে দেখতে পেয়ে। ডেভিড মারা যায়নি। এই দ্বীপের ওই আদিবাসীরাই ডেভিডকে উদ্ধার করে প্রায় আড়াই মাস আগে।

অনিলিখার থিয়োরিই ঠিক। ডেভিডের পূর্বপুরুষ ছিল ফিৎজরয়— ডারউইনের বিগল জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফিৎজরয়ের কাছে রাখা ডারউইনের লেখা ডায়েরির ছেঁড়া পাতা পেয়ে ডেভিডই যোগাযোগ করে পলের সঙ্গে। ভেবেছিল সোনার খোঁজ পেয়ে পলই ওই এক্সপিডিশানটা ফান্ড করবে। পল সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে রাজিও হয়ে যায়। একজন ক্যামেরাম্যান, মাইক আর ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে এই আইল্যান্ডে। ডেভিডের সঙ্গে যে পল ছিল—এটা পলই জানাতে দেয়নি। ডেভিডের কাছ থেকে এখানকার ফ্লোরা-ফনা অর্থাৎ গাছ জীবজন্তু সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিয়ে নেয় পল। তারপর একদিন হঠাৎ

ক্যামেরাম্যান মিকুচি হারিয়ে যায়। আর তার পরদিনই পাহাড়ে ওঠার সময় ডেভিডকে লক্ষ করে গুলি চালায় পল। তারপর পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেয় বডিটা।

ওকেও বাঁচায় এখানকার আদিবাসীরা। এই দ্বীপে অদ্ভুত কিছু জীবনদায়ী শিকড়-বাকড় আছে। তারই সাহায্যে আদিবাসীরা নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে ডেভিডকে রক্ষা করে। ওদেরই যত্ন-শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে ওঠে ডেভিড। কিন্তু এখনও ও যথেষ্ট দুর্বল। কীভাবে এ দ্বীপ থেকে বেরোনো যায় এসব নিয়ে যখন প্ল্যান করছে, তখনই ও অনিলিখার দেখা পায়।

সব শোনার পর অনিলিখা বলে,—পলের মতলব প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারিনি। কলেজ লাইফেও তো অনেক কুকীর্তি করেছিল, যা আমি আর তুমি শুধু জানি। ভাবছিলাম হঠাৎ করে এতটা চেঞ্জ! রাতারাতি তোমাকে বাঁচাতে ওর এত আগ্রহ!

—মনে আছে, একবার টেস্ট ডেটাবেসে ঢুকে ও পরীক্ষার প্রশ্ন লিক করে দিয়েছিল। আরেকবার নিজে খারাপ পরীক্ষা দিয়েছিল বলে আমাদের সবার ডিজিটাল উত্তরপত্র কোরাপ্ট করে দিয়েছিল। সেবার শুধু ওর জন্যেই রিটেস্ট নিতে হয়েছিল। কীভাবে কাজটা করেছে সেটা কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলাম। ডেভিড বলে ওঠে।

—ওকে তো সেবার তুমিই বাঁচিয়েছিল! সব জেনেও কিছু বলোনি। অনিলিখা বলতে থাকে, আমার এখনও মনে আছে আমেরিকার ডিফেন্সের অত্যন্ত সুরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একবার ও ঢুকে গিয়েছিল। তা নিয়ে কত কাণ্ড! পুলিশে পুলিশে ক্যাম্পাস ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। কত তল্লাশি। কে করেছে, কী জন্য করেছে। সেবারও আমরা বলিনি বলে ও বেঁচে গিয়েছিল।

একটু থেমে কী মনে হতে অনিলিখা ফের বলে ওঠে,—আচ্ছা, তুমি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার লিখে খুব নাম করেছিলে না? এখনও করো?

—হ্যাঁ, ওটাই তো আমার মূল কাজ। আমি 'ডেটা-সিকিওর' বলে যে কোম্পানিটা তৈরি করেছি তারা অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারেই স্পেশালিস্ট। আমরা বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করি, যাতে নেটওয়ার্ক ও ডেটা সুরক্ষিত রাখা যায়। আর তুমি? তুমিও তো অ্যান্টিসাইবার ফ্রড রিসার্চে খুব নাম করেছ! তুমিই তো সেই অটোসেপারেটর সফটওয়্যারটা তৈরি করেছ যা কম্পিউটারে ভাইরাস বা স্প্যাম দেখলেই তাকে নেটওয়ার্ক থেকে আলাদা করে দেবে, আর ডেটা সুরক্ষিত করবে। তুমি তো এবার ডেটা প্রটেকশান নিয়ে একটা স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড পেলে, তাই না?

সম্মতি জানিয়ে অনিলিখা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

—কী ভাবছ?

—আচ্ছা রবার্টকে তুমি চেনো?—অনিলিখা বলে ওঠে।

—রবার্ট কে?

—আমাদের সঙ্গে এবারকার টিপে রবার্ট ছিল। পল পরিচয় দিয়েছিল শিকারি হিসেবে। আমার কিন্তু কেন জানি না ওকে শিকারি বলে কখনওই মনে হয়নি। বরঞ্চ হাবেভাবে বেশ শিক্ষার ছাপ। যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে হত। বিজ্ঞানীসুলভ হাবভাব। জামার পকেটে ফাউন্টেন পেন আর নোটবুক নিয়ে ঘোরে এমন শিকারি আগে দেখিনি।

—কীরকম দেখতে?

—চোখে রিমলেস চশমা। পাকানো গোঁফ, কদমছাঁট চুল। উন্নত নাক। চওড়া ভুরু। ডান কানের পাশে লক্ষ করার মতো বড় কালো আঁচিল।

—আরে, উনি তো ফিল রবার্ট। ফিল আবার শিকারি হল কবে? ওটা তো ওর নেহাত শখ। আসলে ফিল হল ইউএসএ গভর্নমেন্টের সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রধান অ্যাডভাইসার। নামকরা সায়েন্টিস্ট। যখনই কোনও সাইবার ফ্রড হয় সরকার সবার আগে ওরই দ্বারস্থ হয়। ওর মতো সাইবার ক্রাইম ধরার ব্যাপারে এক্সপার্ট আর নেই।

শুয়ে থাকলেও অনিলিখার চোখেমুখে উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

—মাই গড! আমার অনুমানই তাহলে ঠিক। দ্যাখো, আমাদের তিনজনকেই ওর সঙ্গে না নিয়ে এলেও চলত। প্রশ্ন, আমাদের নিয়ে এল কেন? এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি। প্ল্যান করে আমাদের এই দ্বীপে নিয়ে আসে যাতে আমরা ওর কুকর্মে বাধা দিতে না পারি। আর ও আমাদের মারার সুযোগ পায়।

—কী কুকর্ম?

—ঠিক জানি না। তার আগে প্রশ্ন আমাদের তিনজনের মধ্যে কি কমন? মনে হয় বড় ধরনের কোনও সাইবার ফ্রড, করার প্ল্যান ওর ছিল। যাতে ও নিজে এক্সপার্ট। আমরা তিনজনেই ওই একই লাইনের। আমি, তুমি ও রবার্ট—আমরা তিনজনেই ছিলাম ওর এই কুকর্মের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ও আমাদের এই দ্বীপে নিয়ে এসে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এক যাত্রায় তিনটে ফল। সোনার খোঁজ, বিজ্ঞানীর সুনাম আর বড় ধরনের সাইবার ফ্রড করা।

—তা, সে তো এই দ্বীপে না এনেও মারতে পারত।

—আমাদের অন্য যেখানেই মারুক না কেন, তা নিয়ে তদন্ত হবেই। যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে এই দ্বীপে এসে সবাই আত্মহত্যা করতে চায় তাহলে সেটাই যথেষ্ট। আমরা নিজেরা আত্মহত্যা করেছি—ব্যস। এ ছাড়া এই ভূখণ্ডে এখনও কোনও দেশের অধিকার

নেই। এ তো মানচিত্রের বাইরে থাকা এক আইল্যান্ড। এখানে কোনও দেশের আইনকানুনও খাটে না। তা ছাড়া এখানে আসাটা ওর বড় অ্যালিবাই। যদি আমেরিকায় সাইবার ক্রাইম ধরাও পড়ে ও বলবে তখন ও আমেরিকায় ছিল না। অন্য কোনও দেশের আইনকানুনও ওকে স্পর্শ করতে পারবে না।

—ঠিকই বলেছ। কি বদমাশ! আমাকেও যখন ও এখানে নিয়ে এসেছিল, বলেছিল কোনওরকমভাবে যেন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ না করি। গোপনীয়তার স্বার্থে। এখন মনে হচ্ছে ওর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেই এটা কেউ জানতে পারত না যে আমরা এই আইল্যান্ডে এসেছি। আর ওর সঙ্গে এসেছি।

আজ অনিলিখা গত দু-দিনের তুলনায় অনেক সুস্থ বোধ করছে। এরা কী একটা পাতার রস খাওয়াচ্ছে, তাতে ক্ষতও যেমন তাড়াতাড়ি শুকোচ্ছে, একই সঙ্গে শক্তিও যেন তাড়াতাড়ি ফিরে পাচ্ছে। এখানে অনেকেই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বলে এরা এসব ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এখানে মরা অত সহজ নয়।

আজ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন সবাই কেমন যেন উত্তেজিত। অন্যদিন ওরা মাঝেমধ্যে অনিলিখার তদারক করতে আসে। আজ ওরা মাটিকে বারবার প্রণাম করছে। একটা গাছকে ঘিরে গোল করে ঘুরছে। মাঝেমধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়ছে টানটান হয়ে। কী যেন কান পেতে শুনছে। তিরধনুক নিয়ে অন্যদিনের মতো শিকারের চেষ্টা করছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে না।

এই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যটা যে শুধু ওদের মধ্যে তা-ই নয়। কয়েকটা অ্যাগাউটি সমানে ছোটাছুটি করছে। এ ক'দিন বাঁদরগুলোকে দেখা যায়নি। আজ ওরা সমানে একগাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। একটা শ্লথ সামনের গাছটাতে গত তিনদিন ধরে এক জায়গায় বসেছিল। আজ নেমে কোথায় চলে গেছে।

অনিলিখা যেটা ভাবছিল, ডেভিড সেটাই বলে উঠল,—কিছু একটা ঘটতে চলেছে এই দ্বীপে। জঙ্গলের সব জন্তুর মধ্যে ছটফটানিটা লক্ষ করেছ? ওরা আমাদের অনেক আগে অনুভব করতে পারে। এই আদিবাসীরাও টের পেয়েছে। মাটির পুজো করছে। কী হতে পারে?

—ভূমিকম্প! দেখেছিলাম এই দ্বীপটা ঠিক দুটো টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলে রয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প হওয়ার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক।

—আজকে কত তারিখ?

—হিসেব তো সব গুলিয়ে গেছে। তবে মে-র শেষদিক বা জুনের শুরুর দিক বলে মনে হয়। কেন বলো তো?

—নাসা থেকে একটা বড় সৌরঝড় এক্সপেক্ট করছিল। এই সময়ই।

—ওহ মাই গড! সব এখন মিলে যাচ্ছে। সৌরঝড় হলে বা সোলার ফ্লেয়ার হলে এ ধরনের আইল্যান্ডে ভূমিকম্পের চান্স অনেক বেড়ে যায়। ম্যাগনেটিজম ইনডিউসড আর্থকোয়েক। চৌম্বকতা থেকে ভূমিকম্প। একটু থেমে আবার অনিলিখা বলে ওঠে,—এবার বুঝতে পারছি কেন এখানে বিবর্তন থেমে আছে। যে যার মতো আগের অবস্থায় আছে। সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট বা ন্যাচারাল সিলেকশন, কোনওটাই হয়নি।

—কেন? এ দ্বীপ ভূমিকম্প প্রবণ বলে?

—ঠিক তাই। আমরা না বুঝলেও কিন্তু জীবজগৎ ঠিক বুঝে যায়। নিশ্চয়ই আগেও এখানে বড়সড়ো ভূমিকম্প হয়েছে। আর তাই অন্য জায়গা থেকে প্রাণীরা এ দ্বীপে আসে না। বাঁচার জন্য কমপিটিশন না থাকায় এদের পরিবর্তনেরও দরকার হয় না। দুর্বলরা বেঁচে থাকে। ঠিক যেমন আফ্রিকায় রিসেন্টলি এক মানব প্রজাতি পাওয়া গেছে যাদের গত দশহাজার বছরেও স্বভাবে, হাবভাবে, চেহারায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। এরা হল হাডজা সম্প্রদায়। এরা আফ্রিকার তানজানিয়ার রিফট ভ্যালির বাসিন্দা। আজও চাষবাস বা পশুপালন করতে জানে না। শিকার করে চালায়। সময় কীভাবে দেখতে হয় জানে না। 3-এর বেশি সংখ্যার ধারণা নেই। কারণ হিসেবে দেখা গেছে ওরা আফ্রিকার যে এলাকায় থাকে সে জায়গা অত্যন্ত অনুর্বর। চাষবাস হয় না। খাবার, জল পাওয়া যায় না। তাই অন্য কেউ ওই এলাকায় আসে না। এখানেও ঠিক একই ব্যাপার। এই আইল্যান্ডে কেউ আসে না। যারা আছে তারাও জানে যে-কোনও সময় এই দ্বীপ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কি দরকার নিজেদের পরিবর্তনের। পরিবর্তন ছাড়াই যদি দিব্যি চলে যায়। আর পরিবর্তিত হয়েও তো বাঁচা যাবে না ভূমিকম্পের দৌলতে। হয়তো যাদের ক্ষমতা ছিল, তারা বহু যুগ আগেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। তাই এই দ্বীপে আমরা তেমন কোনও পাখি দেখিনি। যারা পড়ে আছে, তাদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে। অন্য সব জায়গায় যারা বাতিল হয়ে গেছে, এখানে তারা বহাল তবিয়তে টিকে থাকতে পেরেছে কম্পিটিশন নেই বলে। ডারউইনও তাই এ দ্বীপ দেখে এ রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেননি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ দ্বীপের কথা লিখলে উলটে লোকে ওনার থিয়োরি মানবে না।

—অসাধারণ রিজনিং অনিলিখা। কিন্তু তা হলে তো আমাদের এখনই এ দ্বীপ ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। তুমি কি হাঁটতে পারবে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় অনিলিখা। কিন্তু তার আগেই পুরো আকাশটা যেন দুলে ওঠে চোখের সামনে। ডেভিড বসে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায়। পুরো দ্বীপ যেন

হঠাৎ জেগে উঠেছে। সবাই পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। একটা ছোট নীল হরিণ অনিলিখার পাশে কান উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা টেপির একবার ওদিকে যাচ্ছে, একবার ফিরে আসছে।

হঠাৎ মাটিটা ফাটতে শুরু করল। বড় বড় ফাটল হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ছে। আর ফালাফালা করে দিচ্ছে দ্বীপটাকে। ডেভিড আর অনিলিখা যেখানে দাঁড়িয়ে তার দশফুট সামনে একটা বড় ফাটল লম্বালম্বি উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে।

—ছুটে লাভ নেই ডেভিড! তুমি বেরিয়ে কোথায় যাবে? চারদিকে তো সমুদ্র। একটু ভাবতে দাও।

হঠাৎ একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাওয়া যায়। মাথার অনেক ওপরে একটা হলুদ রঙের হেলিকপ্টার। ডেভিড হাত নেড়ে পাগলের মতো লাফাতে থাকে। খোলা জায়গা, তাই ওদের চোখে পড়েছে। দ্রুত নেমে আসে হেলিকপ্টারটা। ইউ এস কোস্টাল গার্ডের লকহেড এইচসি 130। অনেক কষ্টে ল্যান্ড করে। কোনওরকমে অনিলিখাকে ধরে ডেভিড হেলিকপ্টারে গিয়ে ওঠে। পাইলটের পাশে বসে আছে জন। জন পেচি। অনিলিখাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে,—ঠিক আছে অনিলিখা? আর চিন্তার কিছু নেই।

6 জুলাই 2012

—তুমি কী করে জানলে জন যে আমরা বিপদে পড়েছি? অনিলিখা বলে ওঠে। ডেভিডের ফার্মহাউসে অনিলিখা, জন আর ডেভিড মিলিত হয়েছে ঘটনার প্রায় একমাস পরে।

—দ্য গ্রেট গ্রেট গিয়ার হুইল। ধন্য ফ্যারাও হ্যাত-শেপ-সুৎ। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এরকম একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ওটার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে এই দ্বীপে একটা মেজর আর্থকোয়েক হতে চলেছে। সোলার ফ্লেয়ার দশহাজার বছর পরে সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছোনোর জন্য। আর তুমিই তো বলেছিলে যে তোমরা ডেভিডকে খুঁজতে এরকম জায়গায় আসবে। তবে সমস্যা হচ্ছিল যে সোলার ফ্লেয়ারের জন্য প্লেনের জি পিএস সিস্টেম কাজ করছিল না। তাই দ্বীপটা খোঁজা সহজ হয়নি।

—তোমার মাথায় সাইবার ফ্রডের কথাটা কখন এল অনিলিখা? জন লেদার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বলে উঠল।

—এটা আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না যে এত কাঠখড় পুড়িয়ে ও কেন আমাকে ইন্ডিয়া থেকে ওই দ্বীপে নিয়ে গেল। স্পেশালি ও জানে যখন ওই দ্বীপে কোনওরকম গণ্ডগোল করলে সেটা আমি ঠিক বুঝে যাব। আমাকে নিয়ে আসা মানে তো খাল কেটে কুমির নিয়ে আসা। আমি বা ডেভিড পলকে কাছ থেকে যেভাবে দেখেছি, ও কোনও সাইবার ফ্রড জাতীয়

কাজ করলে সেটা সবার আগে আমরাই বুঝতে পারতাম। আর পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন আমাদের জন্য ও ধরা পড়ত। এ ছাড়া রবার্টকে নিয়ে আমরা তিনজনেই এই বিষয়ের নামকরা বিজ্ঞানী। রবার্টের পরিচয় জানার পরই মনে হল—পলের আসল উদ্দেশ্য কি অন্যকিছু? বিশাল মাপের কোনও সাইবার ফ্রড!

অবশ্য সোনার খোঁজ করাটা আর এ ধরনের দ্বীপ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী হিসেবে নামকরা—এগুলো ছিল ওর কাছে বোনাসের মতো। এমনিতেই ওর আক্ষেপ ছিল যে রিচার্ড আওয়েন তেমন স্বীকৃতি পায়নি।

—আর প্ল্যানটা কী সাংঘাতিক ছিল! ডেভিড বলে ওঠে,—অনিলিখা এটা না বললে কিছুতেই বোঝা যেত না। পল টিডি অ্যামেরিট্রেডের মতো শেয়ারব্রোকিং এজেন্টের ডেটাবেস হ্যাক করে। শেয়ার মার্কেটের ট্রেডারদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, বাড়ির ঠিকানা, জন্মতারিখ ও অন্যান্য যাবতীয় তথ্য ও বের করে নিয়েছিল। পলের প্ল্যান ছিল একটা নির্দিষ্ট দিনে এসব তথ্যের সাহায্যে ও ওই শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার অ্যাকাউন্টগুলোর কন্ট্রোল নিয়ে নেবে। তারা কিছু বুঝতে পারার আগেই পল ইচ্ছেমতো ওদের হয়ে ট্রেড করে কিছু শেয়ারের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেব। যে শেয়ারের দাম এভাবে বেড়ে যাবে তা ও নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে বিক্রি করে লাভ করতে শুরু করবে। যে শেয়ারের দাম কমে যাবে তা পল কম দামে কিনে নেবে যাতে পরে তা বেশি লাভে বিক্রি করে দেওয়া যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহু বিলিয়ন ডলার লাভের প্ল্যান ছিল ওর। এ ছাড়াও পরে শুনেছি বিভিন্ন লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে সেখান থেকে টাকা ট্রান্সফার করার একটা প্ল্যানও ওর ছিল। সবই তুমি বানচাল করে দিয়েছ অনিলিখা।

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—আসল কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়। আমরা ফিরে আসি 10 জুন সকালে। আমি এ ব্যাপারে ইউ এস সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সচেতন করি। ওরা 11 জুন খোঁজ করে জানতে পারে যে টিডি অ্যামেরিটেডের মতো ব্রোকিং এজেন্টের ডেটাবেস হ্যাক করা হয়েছে। এই সংস্থা শেয়ার ইনভেস্টরদের ইনভেস্টমেন্ট সামলায়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নিতে ওদের 12 জুন হয়ে গিয়েছিল।

—তো? তাতে কী?

—পরে জানা গেছে, পলের আসল প্ল্যান ছিল 8 জুনই, এই কাণ্ড ঘটানোর। তা কিন্তু ও করতে পারেনি। আর সেটা আমার জন্য নয়। আমি তখন কিছুই জানাতে পারিনি। ওর হয়ে এ কাণ্ডটা যারা ঘটাত তারা সবাই ছিল আমেরিকায়। পলের কথামতো তারা পল বা মাইকের

ফোনের অপেক্ষা করছিল। আর সেটাই হয়ে ওঠেনি। পল আর মাইক নিজেদের মধ্যেও যোগাযোগ করতে পারেনি।

—কেন? ওই আইল্যান্ড সুনামিতে ধ্বংস হয় তো 9 জুন! অর্থাৎ 8 জুন তো পল ও মাইক বেঁচেই ছিল। তা জানাতে পারল না কেন?

—এখানে পলের মতো অতি চালাককেও প্রকৃতির হাতে চেকমেট হতে হল। পলের কাছে যোগাযোগের একটাই উপায় ছিল। সেটা হল স্যাটেলাইট ফোন। কিন্তু সোলার ফ্লেয়ার বেড়ে যাওয়ার জন্য স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পলের আধুনিকতম প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ফোনও তখন কাজ করেনি। ও এদেরকে নির্দেশ দিতে পারেনি। কারণ, ওটা স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল।

—তাহলে? শেষে প্রকৃতির কাছেই হার মানতে হল পলকে।—জন বলে ওঠে।

—পল আর মাইকের কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি, তাই না?

—পুরো দ্বীপটারই হদিশ পাওয়া গেল না, তো পল আর মাইক।

9.2 রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প। সুনামি ঢেউ-এর উচ্চতাই ছিল আট-ন'তলা বাড়ির সমান। তাও এসেছে 500 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে। পুরো দ্বীপটাই একঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমার মনে হয় 'হ্যাত-শেপ-সুৎ'-ও ওর যন্ত্রের মাধ্যমে এই বিপদের কথাই বুঝতে পেরেছিল এ দ্বীপের সম্বন্ধে। ও জানত যে যখনই সোলার ফ্লেয়ার বাড়বে এই দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই ও এই দ্বীপে অভিযান করে। পলের মতো সোনার খোঁজে নয়। বিজ্ঞানের আগ্রহে।

ডেভিড চুপ করে বসে থাকে—আমাদের জন্য যারা এত কিছু করল, আমরা কিন্তু তাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না অনিলিখা। তাদের ফেলে পালিয়ে এলাম।

—কষ্ট পেও না ডেভিড, ওরা তো মৃত্যুই চেয়েছিল। এমনকী হয়তো শেষ মুহূর্তে পুজোও করছিল ভূমিকম্প চেয়ে, বাঁচার জন্য নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মৃত্যুই ছিল ওদের নিয়তি, আর শেষে সে মৃত্যুই ওরা পেল। ডারউইনের কথাতেই বলি,—It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is the one that is most adaptable to change, অর্থাৎ তারাই থাকে যারা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। ওরা তো সেটাই করেনি যুগ যুগ ধরে। তাই বাঁচার অধিকারও ওরা হারিয়েছিল বহু কাল আগেই।

রহস্যের দশ আঙুল



১। 16 নভেম্বর

ট্রেনটা বেশ খানিকক্ষণ সিগন্যালের অপেক্ষায় খোলা প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো মেঘের আড়ালে তারাভরা আকাশও উধাও। এমনিতেও এই সময় বিকেল পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে যায়।

বাইরে তাই পরিচয়হীন প্রান্তর, সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা রঙহীন পাহাড় উপত্যকা। ট্রেনের ভিতরেও ঠান্ডা হাওয়া খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। লংকোটের বোতামগুলো আবার আটকে নিচ্ছিল অনিলিখা। যে-কোনও পোশাকেই শেষ পর্যন্ত এই শীতের কাছে হার মানতে হয়।

—তোমার হাতের আঙুলগুলো খুব সুন্দর। এরকম আঙুল খুব কম দেখা যায়।

চমকে উঠল অনিলিখা। প্রশ্নটা এসেছে উল্টো দিকে বসে থাকা বৃদ্ধা মহিলার থেকে। দেখে একসময় খুব সুন্দরী ছিলেন বলে মনে হয়। ঘাড় অব্দি সাদা চুল। ধারালো নাক, চোখ, মুখ। মুখের চামড়া এখনও তেমন কুঁচকে যায়নি। ফরসা গালে গোলাপি আভা। একটা দামি নীল রঙের ড্রেসের উপরে থ্রিকোয়ার্টার হাতাওয়ালা সাদা সোয়েটার।

সামান্য হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা বলে উঠল,—এর আগে অবশ্য অন্য কারুর মুখে আমার আঙুল নিয়ে এরকম প্রশংসা শুনিনি।

—কারণ তারা লক্ষ্য করে না। আমি করি। আর আঙুল দেখেই বুঝতে পারি কে কীরকম। আঙুলের ছাপেই তো তোমার সব পরিচয় থেকে যায়, তাই না?

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আপনি ফিঙ্গার প্রিন্ট-এর কথা বলছেন তো?

—ঠিক তাই। জানো তো, এর শুরু কিন্তু হয়েছিল ভারতে। 1853 সালে উইলিয়াম হারশেল বলে এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মী ভারতে চাকরি করতে যায়। ওই সময় নাগাদ বড় একটা সিপাহী বিদ্রোহ হয়। শেষে ইস্ট ইন্ডিয়ার হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেয় ব্রিটিশ রাজপরিবার। হারশেল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কাজ শুরু করে। গ্রামবাংলায় দায়িত্ব পায়। ওর তখন খুব কম বয়স। বছর পঁচিশেক হবে। ওদিকে ওই সময় সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ শাসকরা সাধারণের আস্থা হারিয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা তখন এতটাই ছিল যে কেউ রাজস্ব দিতে চাইত না, ইংরেজদের কর্মী হয়ে কাজ করতে চাইত না, ইচ্ছে করে দেরি করে কাজ করত। মূল উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনও উপায়ে ইংরেজদের জীবন ও তাদের রাজকার্যে বাধা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলা। তা সেই সময় কানাই বলে একজন একটা প্রোজেক্টে যন্ত্র সরবরাহের কাজ পেয়েছিল। তখন হারশেল তার হাতের ছাপ কন্ট্রাক্টে ব্যবহার করে, যাতে সে ঠিক সময়ে যন্ত্র সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

—কিন্তু হারশেল ওই আইডিয়াটা বোধহয় পেয়েছিল ভারতের সতীদাহ প্রথা থেকে। কারণ সতীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার আগে তার হাতের ছাপ লাল আলতায় ডুবিয়ে সে ছাপ রেখে দেওয়া হত।

—ঠিক বলেছ। তাহলেই ভাবো আমাদের এই আঙুল কতটা দরকারি! তা তুমি কোথা থেকে? ভারত না বাংলাদেশ?

—না, ভারত। কলকাতা। অবশ্য আমি যে ভাষায় কথা বলি সেই একই ভাষায় বাংলাদেশের লোকেরাও কথা বলে। বাংলা।

—তুমি একজনের সঙ্গে ফোনে বাংলায় খানিকক্ষণ কথা বলছিলে। তাই মনে হল। আরেকটা কথা বলি। তুমি যে লেখিকার বই এতক্ষণ পড়তে পড়তে আসছিলে, উনি আমার মা।

—বলেন কী? সুসান জেমস আপনার মা? উনি তো বিখ্যাত লেখিকা। ওনার মতো ভালো ক্রাইম থ্রিলার স্রষ্টা খুব কমই আছে। লেখায় দারুণ একটা ভিক্টোরিয়ান পরিবেশ তৈরি করেন উনি। এতক্ষণ ওনার লেখায় এমন বুঁদ হয়েছিলাম যে, ট্রেনেও এতটা সময় কীভাবে কেটে গেল টের পেলাম না। আপনিও কি লেখেন?

মুচকি হাসলেন বৃদ্ধা,—না, না। আমি মা'র মতো লেখার ক্ষমতা পাইনি।

—আপনি কী করেন?

—আমি সার্জেন। প্লাস্টিক সার্জারি আমার স্পেশালাইজেশন। এখন অবশ্য নিজে আর তেমন একটা অপারেশন করি না। আমার নাম সারা। একসময় আমার খুব জমজমাট প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছিল। বেশ কিছু জটিল অপারেশন আমার হাতেই হয়েছিল একসময়।

বৃদ্ধা একটু থেমে বলে উঠলেন,—ট্রেন যে কখন ছাড়বে কে জানে! আমার বাড়ি ব্রেকনে। নিউপোর্ট স্টেশন থেকে আরও দেড়ঘণ্টা লাগবে গাড়িতে। আমার ড্রাইভার ইতিমধ্যেই স্টেশন পৌঁছে গেছে।

এর মধ্যে ট্রেনে আবার ঘোষণা হল। ট্রেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। সিগন্যালের যে সমস্যা হয়েছিল ব্রিস্টলের কাছে, সেটা কেটে গেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অনিলিখা বলে উঠল,—যাক, ট্রেন তবে ছাড়ছে।

বৃদ্ধা ফের বলে উঠলেন,—আজ বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত 1টা হয়ে যাবে। তোমারও সোয়ানসি পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় দেড়টা বাজবে।

—স্ট্রেঞ্জ! আপনি কী করে জানলেন, আমি সোয়ানসি যাচ্ছি?

—তোমার সিটের পিছনে সোয়ানসি অব্দি রিজার্ভেশনের কার্ডটা এখনও লাগানো আছে।

—বাহ! আপনার দৃষ্টিশক্তি তো দারুণ!

—হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু খারাপ হলেও এখনও বেশ ভালোই আছে। আমার মার পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমি কিছুটা পেয়েছি।—বৃদ্ধা একটু থেমে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে বলে উঠলেন,—এটা আমার কার্ড। এতে আমার ঠিকানা, ফোন নাম্বার আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে আমাদের পুরোনো বাড়ি। আমাদের বাড়ির একটা অংশ আমরা গেস্ট হাউস হিসেবে খুব কম ভাড়ায় দিই। চলে এসো একদিন। তোমার ভাড়া লাগবে না। আমি খুব লোক ভালোবাসি। অত বড় প্রপার্টিতে একা থাকতে ভালো লাগে না। মাঝেমধ্যে লোক এলে ভালো লাগে। এই শনিবার কী করছ?

—এই শনিবার আমার একটু কাজ আছে।

—রোববার?

—রোববার হতে পারে। সোমবার তো ছুটি আছে। একটু ভেবে দেখি। আপনার মা কি ওখানেই থাকতেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই ওনার যাবতীয় লেখার কাজ করতেন। আমার বাড়িতে এখনও সেই কনসারভেটরিটা একদম একইভাবে রাখা আছে, যেখানে বসে উনি ওনার বিখ্যাত নভেলগুলো লিখেছিলেন। ঠিক একইভাবে ওনার ঘরে ওনার প্রিয় চেয়ার, টেবিল, সোফা সব রাখা।

—তবে তো যেতেই হবে। উনি আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখিকা। তবে এত কম লিখেছেন।

—উনি আসলে লিখতে শুরু করেছিলেন অনেক পরে।

এসব কথার মধ্যে ট্রেন ছেড়েছিল। মিনিট কুড়ি বাদে ব্রিস্টল স্টেশন। তার আরও পঁচিশ মিনিট বাদে নিউপোর্ট স্টেশন। আর কোথাও ট্রেন দেরি করেনি। বৃদ্ধা নিউপোর্ট স্টেশনে নেমে গেলেন।

অনিলিখার ট্রেনে সোয়ানসি পৌঁছতে আরও এক ঘণ্টা লাগবে। তাই মাঝের সময়টা ও আবার সুসান জেমসের লেখা 'দ্য বয় হু নেভার কেম ব্যাক' অর্থাৎ 'যে ছেলেটা আর কোনওদিন ফিরে আসেনি'—বইতে নিবিষ্ট হল। অত বছর আগের লেখা। কিন্তু এখনও ভাষার মাধুর্যে, গল্পের প্লটে আর লেখার টানে পাঠককে বই নামিয়ে রাখতে দেয় না।

২। 20 নভেম্বর

এত ব্যস্ততার মধ্যে কাজের বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তবে সুসান জেমসের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ তো ছাড়া যায় না।

ব্রেকন পাহাড়ি শহর। ওয়েলসের ব্রেকন পাহাড়ে যেতে হলে এই শহর হয়েই যেতে হয়। তাই যারা ট্রেক করতে আসে, তারা এখানেই আস্তানা গাড়ে।

সোয়ানসি থেকে গাড়িতে ব্রেকন দেড় ঘণ্টা লাগল। শহর পেরিয়ে একটু বাইরে বিশাল বাড়ি। বাড়ি শব্দটা উল্লেখ করলে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। ক্যাসলের আদলে প্রায় একশো একর জায়গা নিয়ে বাড়ি। বাড়ির মধ্যে একটা বড় পুকুর। তার পাশের রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলে আরেকটা গেট। গেটের পাশে সিকুইরিটি অফিস আছে। সারা আগেই অনিলিখার আসার কথা বলে রেখেছিলেন। ওখানেই গাড়ি রেখে খানিকটা হেঁটে নুড়ি পাথর ফেলা পথ পেরিয়ে গেস্ট হাউস। আরও খানিকটা এগোলে টিউডর গথিক স্টাইলের বিশাল বাড়ি।

ব্রেকফাস্ট করে এলেও গেস্ট হাউসে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে জিনিসপত্র রেখে সামান্য খাবার খেয়ে বাড়ির চারদিক দিয়ে একবার ঘুরে এলো অনিলিখা। বিশাল বড় এলাকা। বেশ সাজানো বাগান। দুটো ফোয়ারা আছে বাগানে। বেশ কিছু পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো।

বারোটার সময় এক মাঝবয়েসি মহিলা এসে অনিলিখাকে মূল বাড়িতে নিয়ে গেল। এ বাড়ির হাউসকিপার।

দেখেই বোঝা যায়, যে বাড়ির বর্তমান মালিকও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। তা না হলে এ বাড়ি ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য এত কর্মচারীও রাখা যায় না।

সারা ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছিলেন। ডাইনিং রুমটা বিশাল। দু-দিকেই দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা। দেওয়ালে নানান ধরনের পেন্টিং। মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছবিগুলো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের না হলেও বেশ ভালো।

বিশাল ওভাল শেপের টেবিলে নানান ধরনের খাবার সাজানো ছিল। নানান ধরনের স্যান্ডউইচ, স্যুপ, স্যালাড। সারা একটা কালো গাউনের উপরে কালো ফুলহাতা সোয়েটার পরে অনিলিখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মুখে-চোখে এমন আভিজাত্যের ছাপ সচরাচর দেখা যায় না।

অনিলিখাকে দেখে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে একগাল হেসে বলে উঠলেন,—আসতে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

—না, না। দেড় ঘণ্টা লাগল গাড়িতে। পথটাও খুব সুন্দর। দু-ধারে পাহাড়, উপত্যকা, ঘাসজমি। ছোট ছোট গ্রাম। এখানে না এলে সত্যি মিস করতাম। তা আপনাদের এই বাড়ি কতদিনের পুরোনো?

—ধরো, আমরাই চার প্রজন্ম ধরে আছি। আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের বাবার দিক থেকে এ বাড়িটা পান। প্রায় চারশ বছর পুরোনো। তাই নিয়মিত মেরামতি করতে হয়। অনেক সময় ঠিক সেরকম জিনিস পাওয়া শক্ত হয়। আমি আবার এমন কিছু করতে চাই না, যাতে এই বাড়ির অরিজিনাল চেহারা থেকে অন্যরকম কিছু হয়।

কথায় কথায় জানা গেল, সারার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে বেশ ধনী। শুধু তাই নয়, রাজ পরিবারের সঙ্গে লতায় পাতায় সম্পর্ক আছে। সুসান জেমস ওঁর লেখালেখির সূত্রে যথেষ্ট রোজগার করেছিলেন। তাই এ বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। সুসানের একমাত্র মেয়ে সারা। সারা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাস করে দীর্ঘ দিন ডাক্তারি করেন। ওনারও প্রাইভেট প্রাক্টিস বেশ ভালোই ছিল। এক মেয়ে। মেয়ে এখানেই থাকে। কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে তেমন কিছু বললেন না সারা।

লাঞ্চের পরে সারা বাড়ির খানিকটা অংশ ঘুরিয়ে দেখালেন অনিলিখাকে। বড় তিনতলা বাড়ি। ঘোরানো চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ওক আর পাইন দিয়ে বাড়ির ভিতরের মেঝে তৈরি। ঘরগুলোর ছাদেও ওকের বিম ব্যবহার করা হয়েছে।

সুসান জেমস দোতলার যে ঘরে থাকতেন, যেখানে পড়াশোনা করতেন, ওনার পছন্দের কনসারভেটরিতে যেখানে লেখালেখি করতেন, সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সারা। ঘরগুলো ঠিক একইরকমভাবে সাজানো আছে। বিশাল কাচের গোল কনসারভেটরি। কনসারভেটরি থেকে বাইরের ফোয়ারা, পুকুর খুব সুন্দর দেখা যায়। সামনেই একটা খুব সুন্দর ম্যাগনোলিয়া গাছ আছে। ফুলে ছাওয়া এত সুন্দর গাছের সামনে বসে উনি কীভাবে রহস্য খুনের প্লট ভাবতেন কে জানে!

ওনার ব্যবহৃত টাইপরাইটারটাও এখনও ঠিক একইভাবে রাখা আছে। ওনার লেখা সব নভেলের ফাস্ট এডিশন বুককেসে যত্ন করে সাজানো আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বিলিয়ার্ডস রুমে ঢুকল অনিলিখারা।

হঠাৎ উপর থেকে কোনও নারী কণ্ঠের চিৎকার। এমন রক্তজল করা সে চিৎকার, যে চমকে উঠেছিল অনিলিখা। মনে হল বাড়ির উপর দিকের কোনও ঘর থেকে এল।

সারা বলে উঠলেন,—ও আমার মেয়ের গলা। ওর শরীর সবসময় ভালো থাকে না। তখন ও মাঝেমধ্যে এরকম চিৎকার করে ওঠে। আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু এর কোনও চিকিৎসা নেই।

—উনি বাইরে বেরোন না?

—আগে বেরোত। কিন্তু এখন সবসময় প্রায় ঘরেই থাকে। মাঝেমধ্যে ও এক অন্য কল্পনার জগতে হারিয়ে যায়। তখন ভয় পেয়ে এরকম চিৎকার করে ওঠে। এমনিতেই আমাদের যা সম্পত্তি তাতে ওর তো আর রোজগার নিয়ে কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমি যথেষ্ট রেখে যাচ্ছি ওর জন্য।—সারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অনিলিখাও আর এ প্রসঙ্গে কথা বাড়াল না। বুঝতে পারছিল এটা বৃদ্ধার গভীর বেদনার জায়গা।

গল্প করতে করতে ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শীতের বিকেল। চারটেতে দিনের শেষ আলো দূরের গাছের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছিল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। মাথা তুলে বাড়ির দিকে তাকাতে অনিলিখা দেখল উপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হল জানলার কাছে কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে। ওদের লক্ষ্য করছে।

—এ বাড়ি কে তৈরি করেছিল জানো অনিলিখা?

—কে?

—থমাস হারপার। বিখ্যাত আর্কিটেক্ট। শুনেছি 1630 সালে প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ড খরচ হয়েছিল। বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। তবে এ-বাড়ির জায়গায় তার আগে অনেক পুরোনো একটা অ্যাবে ছিল। জানি না চার্চটা দেখেছ কিনা। ওটা অন্য দিকে। আমাদের প্রপার্টির মধ্যে। এখানে সেই চার্চের সঙ্গে যুক্ত সব মঙ্ক বা সন্ন্যাসীরা থাকত। সেটা অবশ্য হাজার বছর আগের কথা।

অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে বিকেলের শেষ আলোয় বাড়িটা দেখছিল। বাড়ি জুড়ে বেশ কয়েকটা টাওয়ার। বাড়ির কোনের দিকগুলোতে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য টারেট অর্থাৎ বড় টাওয়ারের উপরে আরেকটা ছোট গোল টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। টারেটের উপরে পাথরের পাখির মূর্তি পিনাকেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসবই টিউডর গথিক স্থাপত্যের অংশ। সারা পাশের বাগানগুলোতেও নিয়ে গেলেন। বাগান জুড়ে অনেক কর্ক আর ইউ গাছ। বিভিন্ন দেশ থেকে নাম না জানা কিছু রেয়ার গাছ এনে লাগানো হয়েছে। অনিলিখার সবথেকে পছন্দ হল জাপানিজ গার্ডেনটা। সেখানে একটা জাপানিজ স্টাইলে টি-রুম আছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে সেখানে চা খেল। তারপরে সারা বাড়িতে ফিরে গেলেন। অনিলিখা গেস্টহাউসে।

সন্ধেবেলা গেস্টহাউসে ফিরে অনিলিখা বই পড়ছিল। ওর সেলফোন বেজে উঠল। সারা।

রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব। তুমি সাড়ে সাতটার সময় ডাইনিং রুমে চলে এসো। তোমাকে আমার মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

গেস্ট হাউসে এই সময় আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। একা এখানে ডাইনিং রুমে খাওয়ার থেকে সারার সঙ্গে সন্ধে কাটানোটা অনেক ভালো। তাই সওয়া সাতটা নাগাদ

বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে গেল অনিলিখা। বাইরে এখন বেশ ভালো ঠান্ডা। হাওয়াও আছে। একটা ভারি লেদার লং কোট পরে বেরিয়ে এল অনিলিখা।

গেস্টহাউসের দায়িত্বে এক চাইনিজ মহিলা। বেরোতেই তার সঙ্গে দেখা হল। অনিলিখা রাতে বাড়িতে খাবে না, ও বাড়িতে খাবে জানাতে তার ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠল। কী কারণে কে জানে!

গেস্ট হাউস পেরিয়ে বাঁ-দিকে গেলে জাপানিজ গার্ডেনটা প্রথম পড়ে। সেটা পেরিয়ে নুড়িবাঁধানো পথ পেরিয়ে মূল বাড়ির দিকে এগোল অনিলিখা। এখন বাইরে বাগান জুড়ে ল্যাম্পের ঝিমিয়ে পড়া হলুদ আলো। দূর থেকে মূল বাড়িটার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যেন ওর উপরে আরও বেশি করে অন্ধকার নেমে এসেছে। বেশিরভাগ ঘরেই কোনও আলো জ্বলছে না।

বিশাল বিশাল কাচের জানলাগুলোর দু-একটা দিয়ে আলো আসছে। সেগুলো যেন রাতের অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো জ্বলছে।

মনে হল ওই বাড়ির তিনতলার একটা ঘরের জানলা যেন সামান্য খোলা। কেউ একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অনিলিখাকে লক্ষ্য করছে।

বাড়ির কাছাকাছি যেতে এক লম্বা চওড়া মহিলা এগিয়ে এলেন। মাঝবয়েসি। অনিলিখা এনাকে আগে দেখেনি। মেরি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে অনিলিখাকে ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। নানান রকমের ব্যবস্থা। স্যুপ, রোস্ট চিকেন, ফিশ পাই। সঙ্গে কিছু ভারতীয় খাবার আছে।

খাওয়ার পরে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে গল্প জুড়লেন। অনিলিখাকে একটা কম বয়সি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললেন, এটা কে বল তো?

অনিলিখা বলল—আপনার মায়ের ছবি। তবে অনেক কম বয়সের।

সারা একটু হেসে উঠে বললেন,—তোমাকে আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগের একটা গল্প শোনাই। তারপরে না হয় বলব এটা কার ছবি।

সারা বলতে শুরু করলেন।

—এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা। 1941 সালের জানুয়ারি মাস। সুসান জেমস তখন লন্ডনে। সেপ্টেম্বর 1940 থেকে জার্মানরা লন্ডনে বোমা ফেলতে শুরু করল। দিনে রাতে যে-কোনও সময় বোমারু বিমানের ঝাঁক উড়ে আসত লন্ডনের আকাশে। শিলাবৃষ্টির মতো নেমে আসত বোমা। মূল টার্গেট ছিল লন্ডনের ব্যবসার কেন্দ্রগুলো ও সেইসব জায়গা যেখানে বেশি

লোক থাকার সম্ভাবনা। 1941 সাল শুরুর আগেই এ সব বোমায় প্রায় তেরো হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। অসংখ্য বাড়ি গুঁড়িয়ে গেছিল।

সরকার থেকে সবাইকে বলা হয়েছিল বড় শহরে না থেকে ছোট ছোট গ্রামে থাকতে। লন্ডন, ব্রিস্টল, বার্মিংহ্যামের মতো বড় শহরগুলো ছিল সহজ টার্গেট।

বাধ্য না হলে তাই কেউ সেই সময়ে লন্ডনে থাকত না। সুসান কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই লন্ডনে এসেছিল। সুসান ছিল একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স। সে সময়ে নার্সের দরকার ছিল সবথেকে বেশি।

—সুসান, মানে আপনার মায়ের কথাই বলছেন তো?—সুসান সম্বন্ধে যেভাবে সারা গল্পটা বলছিলেন, তার জন্যই অনিলিখাকে প্রশ্ন করতে হল।

সারা খানিকক্ষণ ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলেন অনিলিখার দিকে। তারপরে মুচকি হেসে ফের বলে উঠলেন,—সব যদি শুরুতেই বলে দিলাম তাহলে আর গল্প বলছি কেন? একটু ধৈর্য ধরো।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যুদ্ধের সময় লন্ডনে নার্সদের খুব দরকার ছিল। সে জন্যেই সুসান এক দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে লন্ডনে এসেছিল। লন্ডনে প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে এক বাড়ি ভাড়া নেয় সুসান। সে বাড়িতে অন্য এক ভাড়াটে ছিল। নাম ছিল তার বেকি। সেও প্রায় সুসানের সমবয়েসি।

বেকি এসেছিল নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। ওর বাবা ছোটবেলায় মারা যায়। মায়ের কাছে মানুষ। অভাবের সংসার। খুব ভালো ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পরে আর পড়ার সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করে বেড়াত। কখনও বোমা তৈরির কারখানায় কাজ, কখনও হাউসকিপারের কাজ।

লন্ডনেও এসেছিল চাকরির সন্ধানে। একটা কাপড়ের কারখানায় কাজ করত। বেকি আর সুসান দুজন দুজনকে দেখে খুব অবাক হয়। ওদের দুজনের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত মিল। দুজনেই ব্লন্ড। মুখের আদলেও অনেক মিল। একইরকম রোগা। উচ্চতায় দুজনেই প্রায় সমান।

তবে দুজনের মধ্যে তফাত ছিল দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ডে, পড়াশোনায়, পছন্দে। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব থাকলেও সুসান অবাক হয়ে দেখত ও যা করে, বেকি তাই নকল করার চেষ্টা করে। সুসান যে ধরনের জামা পরবে, ঠিক সেরকমই জামা বেকি তার কিছুদিনের মধ্যে জোগাড় করে পরবে। সুসান যা খেতে পছন্দ করে, বেকি তা না ভালোবাসলেও ঠিক সেটা খাওয়ার অভ্যেস করার চেষ্টা করবে। সুসান যেভাবে কথা বলে, বেকিও যেন ঠিক সেভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে। একইরকম চুলের স্টাইল রাখে।

একদিন সুসান বিরক্ত হয়ে এ ব্যাপারে বেকিকে জিগ্যেসও করেছিল। বেকি উত্তর দিয়েছিল, সুসানই নাকি তার রোল মডেল। সুসান যেভাবে সবার সঙ্গে মিশতে পারে, সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে, সেটা নাকি বেকি শিখতে চায়।

যুদ্ধের জন্য সেসময় সব কিছুর সাপ্লাই ছিল সীমিত। খাবার, পোশাক—সব কিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল। একজনের জন্য সপ্তাহে একটা ডিম, 50 গ্রাম চা, 200 গ্রাম চিনি। এমনকী জামাকাপড়ের সাইজের উপরেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এসময়ে জামাকাপড়, খাবার শেয়ার করলে একটু সুবিধে হত। তাই সুসান এটা মেনে নিয়েছিল। ও জানতে পেরেছিল যে, ওর অজান্তে ওর কিছু পোশাক বেকি মাঝেমধ্যে পরে।

যুদ্ধের সময় মানুষ সব সময় বন্ধু খোঁজে, কথা বলার লোক খোঁজে। তাই ওদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। মাঝে মধ্যেই বিমান আক্রমণের আগাম সূচনা দিয়ে সাইরেন বেজে উঠত। আর বাড়িতে থাকলে দুজনেই তখন পড়ি কী মরি করে ছুটে গিয়ে মাটির নীচের অ্যান্ডারসন শেলটারে আশ্রয় নিত। যুদ্ধের আগে থেকেই লন্ডনের বেশিরভাগ বাড়িতে বোমা আক্রমণের থেকে বাঁচতে এরকম শেলটার তৈরি করা হয়েছিল।

সেরকমই এক ছুটির দিনে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। দুজনেই কোনওরকমে ছুটে গিয়ে মাটির নীচের ওই শেলটারে আশ্রয় নিল। ওখান থেকেই ওরা আওয়াজ পেল একঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে আসার। সে আওয়াজের মধ্যেই একটা প্রবল বোমা বিষ্ফোরণের আওয়াজ হল খুব কাছ থেকে। উপর থেকে মাটির ধস নেমে এল।

বেশ খানিকক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বেকি। জ্ঞান ফিরতে মাটি সরিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে এল। নানাজায়গায় কেটে ছড়ে গেছে, বোমার আঘাতে ছোট পাথরের টুকরো লেগে হাতে পায়ের নানান জায়গা দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বড় কিছু হয়নি। কিন্তু সুসানের ভাগ্য ভালো ছিল না। ওর উপরে মাটি পাথর এমনভাবে পড়েছিল যে তখনই সুসান মারা যায়। ওর দেহ পরে পুলিশ উদ্ধার করে।

—মানে! সুসান জেমস মারা যান? তাহলে ইনি কে?

সারা,—এটা হল আসল সুসান জেমসের ছবি। বেকির কাছে সুসানের সব ডিটেলস ছিল। সুসানের কোনও কিছুই ওর অজানা ছিল না। সুসানের ব্যাগ ও বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান জিনিসে সুসানের যাবতীয় পরিচয়পত্রও রাখা ছিল। বেকি এটাও জানত সুসানের খুব কাছের কোনও লোক জীবিত নেই। বেকি বুঝল, এটাই ওর কাছে একটা খুব বড় সুযোগ। উত্তরাধিকার সূত্রে একটা বিশাল সম্পত্তি পাওয়ার। একইসঙ্গে একটা বিখ্যাত পরিবারের অংশ হয়ে ওঠার স্বীকৃতি।

তাই সুসান মারা গেল না। মারা গেল বেকি। রাতারাতি বেকি হয়ে উঠল সুসান জেমস। সুসান এর পরে লন্ডন ছেড়ে ফিরে আসে এখানে, ব্রেকনে। মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পত্তি উপভোগ করতে। কাজ করার আর কোনও দরকার ছিল না।

এখানে আসার পর সময় কাটানোর জন্যও কিছু লেখালেখি শুরু করে। আস্তে আস্তে ওর লেখা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যতদিনে পঞ্চম নভেলটা শেষ করে, ততদিনে সুসান জেমসের নাম রহস্য লেখিকা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এই জনপ্রিয়তা খুব উপভোগ করলেও, কোথাও হয়তো মনের মধ্যে আক্ষেপ ছিল যে ওর আসল পরিচয় বেকি মিলারকে কেউ মনে রাখল না।

একটু থেমে সারা ফের বলে উঠলেন,—তুমি যার লেখা পড়েছ, তা সবই আমার মায়ের অর্থাৎ বেকির।

কিন্তু এই আসল কথাটা তো কেউই জানে না! এটা মিডিয়া জানতে পারলে তো বড় রকমের হইচই পড়ে যাবে। পড়ার ঘরে, কনসারভেটরিতে যে ছবি দেখেছি, সবই কি বেকি মিলারের?

ঠিক তাই। তোমাকে দুজনের ছবি পাশাপাশি দেখাই। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কতটা মিল ছিল। অবশ্যই খুব প্রিয়জনেরা, বাবা বা মায়ের চোখে হয়তো পার্থক্যটা ধরা পড়ত। কিন্তু কয়েক বছর বাদে বেকি যখন সুসান হয়ে ফেরে তখন তাঁরা কেউই বেঁচে ছিলেন না, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের ওই সময়ে কারুর এসব নিয়ে প্রশ্ন করারও সময় ছিল না।

একটু আসছি—বলে সারা অন্য ঘরে গেলেন।

অনিলিখা অবাক! এত বড় অজানা রহস্য ওর কাছে হঠাৎ করে সারা কেন বললেন?

অনিলিখা স্ট্রবেরি আইসক্রিম খাচ্ছিল। খেতে খেতে কীরকম যেন তন্দ্রা আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন কীরকম নেশা হচ্ছে। ঘরের আলোগুলো আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছিল। একটা নীল আবছা আলো শুধু ছড়িয়ে পড়ছিল চোখের সামনে। ওর খাবারে কি কিছু মেশান ছিল?

খানিকবাদে দূর থেকে আবার সারার গলা শোনা গেল। সারা ফিরে এসেছেন। ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

কী? কেমন লাগছে? তখনকার দিনে রাতারাতি এরকম আরেকজনের পরিচয় নিয়ে নেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে তা যথেষ্ট কঠিন। তবে অসম্ভব নয়।—বলে ফের হেসে উঠলেন। কারুর হাসির মধ্যে যে এ ভাবে নিষ্ঠুরতা মিশে থাকতে পারে তা সারার হাসি না দেখলে অনিলিখা কোনওদিন টের পেত না।

অনিলিখা আর কথা বলার অবস্থায় ছিল না। জ্ঞান হারানোর পূর্বমুহূর্তে মনে হল সারার শেষ কথাগুলো যেন একটা গুহার দেওয়ালে বারবার ধাক্কা খেতে খেতে হারিয়ে গেল।

৩। কয়েক মাস আগে...3 জুন

শনিবার। এই একটা দিনই বাড়ির সব কাজের জন্য রেখে দেয় জন। রোববারটা একদম নিজের ইচ্ছে মতো কাটাতে চায়।

জন অবাক হয়ে ক্রেডিট কার্ডের বিলটা দেখছিল। অনেক খরচের মধ্যে দু-একটা ছোট-ছোট খরচের উল্লেখ বিলে আছে, যার কথা ওর খেয়াল পড়ল না। এমনিতে ও এভাবে খুঁটিয়ে কখনও দেখে না। একা থাকে। মা ও বাবা দুজনেই বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। ও একটা নামকরা কনসাল্টিং কোম্পানিতে কাজ করে। যা পায়, তাতে এ-ধরনের বিল মিলিয়ে ছোটখাটো খরচের হিসেব দেখার কোনও প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু আজ প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

যদিও বিলে সব চেনা দোকানেরই নাম, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে সেদিন সেখানে কেনার কথা কিছুতেই মনে করতে পারল না। যেমন টেস্কো সুপারস্টোর থেকে 19 পাউন্ডের বিলটা। সামান্য খরচ। কিন্তু তারিখটাই সন্দেহজনক। সেদিন তো যদ্দুর মনে পড়ছে ও বার্মিংহ্যামে গিয়েছিল অফিসের কাজে। সেলফোনের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল জন।

জনের বাবার অ্যালজাইমার ছিল। বছর পঞ্চাশ যখন বয়স, তখন এর লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে। জনের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। পঞ্চাশে পা দিতে অনেক দেরি আছে। কিন্তু এরকম ভুলে যাওয়া আবার সেরকম কিছুর পূর্বাভাস নয় তো? আবার মনে করার চেষ্টা করল জন। সত্যি কি ওই দোকানে গিয়েছিল?

কিন্তু না। পরিষ্কার মনে আছে সেদিন ভোর ছ'টার ট্রেনে বার্মিংহ্যামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল জন। ও অফিসের এক্সপেন্সের ফাইল খুলে দেখল। এই, এই তো—পরিষ্কার—সিট নাম্বার, তারিখ, সময় লেখা টিকিট। তারপরে এও মনে আছে ট্রেনটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল। 30 মিনিট পরে ব্রিস্টলের একটা ট্রেনে উঠে ব্রিস্টল থেকে আবার বার্মিংহ্যামের ট্রেন ধরেছিল। যে মিটিং-এর জন্য যাওয়া, সে মিটিং-এ জয়েন করতে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে ওই দিনেই কী করে বাথ শহরের একটা সুপারস্টোর থেকে ও কোনও কিছু কিনতে পারে! আরেকটু খেয়াল করতে ও রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। আরও দুটো দোকানের নাম

আছে অন্য দুই দিনে, যেখানে ও গত একমাসে কখনও যায়নি। তাহলে কি ওর ক্রেডিট কার্ড চুরি হয়েছে? কেউ ওর কার্ড দিয়ে অন্য কিছু ইচ্ছেমতো কেনাকাটি করছে?

ছুটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বের করল। নাহ, ক্রেডিট কার্ড তো মানিব্যাগে ঠিকই আছে। আর এই কার্ডের ডিটেলস তো কারুর কাছে থাকার কথাও নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। ক্রেডিট কার্ডের নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে কার্ড ক্যান্সেল করতে হবে অবিলম্বে।

ফোন করতে করতে টিভি চালাল জন। বিবিসি-র ব্রেকিং নিউজ। রাত সাড়ে দশটা। খানিক আগেই লন্ডনে লন্ডন ব্রিজের কাছে একটা গাড়ি অনেক পথযাত্রীকে চাপা দিয়ে গেছে। কতজন মৃত বা আহত এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

একইসঙ্গে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে লন্ডন ব্রিজের কাছেই 'বরো' মার্কেটে বেশ কিছু পথচারীকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশ কিছু নিশ্চিত করে না বললেও বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে করা হচ্ছে এটা কোনও সন্ত্রাসবাদী হানা। খানিক আগেই বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর আওয়াজ পাওয়া গেছে। লন্ডন ব্রিজের কাছাকাছি বেশ খানিকটা জায়গায় পুলিশ যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে মৃতের সংখ্যা একাধিক। তবে সংখ্যা ঠিক কত, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

কীভাবে যে এ বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদকে থামানো যাবে কে জানে! সত্যি যদি এটা সন্ত্রাসবাদীদের কাজ হয়, তাহলে এরকম ঘটনা তো যেখানে যে কেউ ইচ্ছে মতো ঘটাতে পারে।

যে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, এখানে এরকম ছুরি তো যে-কোনও বড় স্টোরেই পাওয়া যায়। টেস্কোতেও।

একটা ফোন আসছে। অচেনা নাম্বার থেকে। ফোনটা ধরে বেশ খানিকক্ষণ 'হ্যালো, হ্যালো' বলে গেল জন। উল্টোদিক থেকে কিছু শোনা গেল না। এত রাতে ফোন!

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল জনের। যদি কেউ ওর ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করে থাকে, তাহলে সে কেন অত কম টাকার ট্রান্সাকশন করবে। কার্ডের যা লিমিট তাতে তো অনেক দামি কিছু কেনা যেত। অনেক বেশি টাকা তুলে ফেলা যেত। তার কাছে অন্য অনেক সুযোগও ছিল। অন্য কোনও কারণের জন্য এই কার্ডের তথ্য চুরি করা হয়নি তো?

ওর কার্ড দিয়ে সন্ত্রাসবাদের জন্য কোনও কাজ করা হয়নি তো? যেমন ছুরি। ছুরি কেনা হয়নি তো ওর কার্ড দিয়ে? সে ক্ষেত্রে সেই ছুরি পুলিশের হাতে গেলে কে ছুরি কিনেছিল সে

তথ্য বার করতে ওদের এক ঘণ্টাও লাগবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই ছুরি কোন দোকান থেকে কেনা, কে কোন কার্ডে কিনেছে, সে তথ্য বার করে নিতে পারবে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল জনের।

আরেকবার নিশ্চিত হতে ক্রেডিট কার্ডের বাকি কেনাকাটার হিসেব দেখতে গিয়ে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করল। শেষ কয়েকদিনে ক্রেডিট কার্ডে কেনার হিসেব দেখতে গেলে অ্যাকাউন্টে দেখা সম্ভব। কিন্তু অ্যাকাউন্টসে ডিটেলস দেখার পরপরই ভয়ে উত্তেজনায় ওর চোখ যেন ঝাপসা হয়ে এল। দেখাচ্ছে আজ ওর কার্ডে লন্ডনের একটা হোটেলে থাকার জন্য পেমেন্ট করা হয়েছে। কেন্সিংটনের কাছে হিলটন হোটেল।

সে কী! তাহলে মনে যে আশংকা হচ্ছিল, যে সামান্য সম্ভাবনাটার কথা ও ভাবছিল, সেটাই কি সত্যি। ওর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কেউ ওকে এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, যাতে আসল অপরাধীর সন্ধান সহজে কেউ না পায়!

দু-মাস আগের ঘটনা। তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে ও সন্দেহ করছিল যে ও সব দরকারি চিঠিপত্র পাচ্ছে না। তারপরে একদিন তার প্রমাণ পেয়েছিল। যে চিঠি সকালে মেল বক্সে ছিল, ইচ্ছে করে বার করে নেয়নি পরে নেবে বলে, সন্ধেবেলা অফিস ফেরত বাড়ি ঢোকার সময় সে চিঠি পায়নি। এরকম কয়েকবার দেখার পরে ও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে বাড়ির বাইরের মেলবক্সটা পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু তাতে যে এই চিঠি চুরি সমস্যার সমাধান হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ও কখনই নিশ্চিত হয়নি।

ওকে কেউ অনেক আগের থেকে টার্গেট করেনি তো?

কিছু আগে পাওয়া ফোনটা কার ছিল? নাম্বারটা দেখাচ্ছে লন্ডনের। কেনই বা একবার ফোন করে ছেড়ে দেওয়া হল। একবার কাঁপা হাতে ফোন করল জন। নাম্বারটা কার যদি বোঝা যায়! কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। তাহলে কি ও এ-বাড়িতে আছে কিনা সেটা বোঝার জন্যই ওকে পুলিশ থেকে ফোন করেছিল?

মাথায় কিছুই ঢুকছিল না কী করবে! সামনের দেওয়াল ঘড়িটার কাঁটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল।

বসার ঘরে গিয়ে আবার টিভি চালাল জন। পুলিশ থেকে এখনও কোনও অফিসিয়াল খবর নেই। একজন সাংবাদিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘটনার ধারাভাষ্য দিচ্ছে। লোকটার আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত সাধারণ জনতা যাদের একটা বড় অংশ শনিবারের রাতে লন্ডনের এই এলাকার পাব ও রেস্টুরেন্টগুলোতে খেতে ও মজা করতে এসেছিল। এরকম যে একটা ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যাবে তা ভাবতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে

আততায়ী তিনজনকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আরও অনেকে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ব্রিটিশ আর্মড পুলিশ বেশ খানিকটা এলাকা আলাদা করে ঘিরে রেখেছে। সাধারণ জনতা যারা ওই এলাকা থেকে বেরোচ্ছে, তাদের সবাইকে মাথার উপরে হাত তুলে যেতে বলা হচ্ছে, যাতে ওদের মধ্যে কোনও আততায়ী মিশে থাকলে তাকে পুলিশ চট করে সনাক্ত করতে পারে।

মূল তিন টেররিস্টকে যখন মেরে ফেলেছে, তখন তাদের সনাক্তকরণ করতে নিশ্চয়ই এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। একইসঙ্গে তারা কোথায় ছিল, তাদের হোটেল বুকিং খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই পুলিশ বেশি সময় নেবে না।

হোটেলটার ফোন নাম্বার খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না। এটাই একমাত্র উপায় জানার যে ওর পরিচয় দিয়ে কেউ ছিল কিনা। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল যে ও গতকাল যে ঘরে ছিল সেখানে একটা দামি পেন ফেলে এসেছে। পেনটা পাওয়া গেছে কিনা সে প্রসঙ্গে ফোন করছে। রিসেপশনের মহিলা রেকর্ড অনুযায়ী ওর নাম খুঁজে পেতেই ওর সন্দেহটা যে একেবারে নির্ভুল প্রমাণ হয়ে গেল। কথায় কথায় বুঝল যে ওরা চারজন ছিল। চারটে রুম ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে একজন ওর পরিচয়ে ছিল। ওদের কাছে এখনও খুব সম্ভবত পুলিশ খবর নেয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জানতে পেরে যাবে যে ওদের হোটেলে উঠেছিল লন্ডনের চার টেররিস্ট। ফোনটা আর ধরে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল জন।

ও কি তাহলে ইতিমধ্যেই পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে? নাকি সন্ত্রাসবাদীরাই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। ওর তিন তলার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে উঁকি মারল জন। অনেক রাত। বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি দেখতে পেল না। ফিরে আসছিল। হঠাৎ খেয়াল করল দুটো গাড়ি আস্তে আস্তে ওর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে ও ঠিক করে নিল ওকে কী করতে হবে। ওর দরকার কিছুটা সময় যাতে ও প্রমাণ করতে পারে যে ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ও এর সঙ্গে কোনওরকমভাবে যুক্ত নয়। এখন এ ধরনের ঘটনায় একবার যখন ওর নাম জুড়ে গেছে, পুলিশ ওকে গুলি করতেও কোনওরকম দ্বিধা করবে না। সেখানে ওকে ওর পরিস্থিতি বোঝানোর সময় দেবে কিনা সন্দেহ।

ফোন আবার বাজছে। এ যেন মৃত্যু ওকে ডেকে চলেছে।

৪। 3 জুন

এখানে পরপর একইরকম অনেকগুলো বাড়ি। জিপিএস-এ বাড়ির ঠিকানা দিলে এই এলাকায় নিয়ে আসে। কিন্তু দুটো বাড়ি আগের একটা বাড়িকে ওর বাড়ি বলে দেখায়। এর জন্য যে ওর একদিন পালাতে সুবিধে হবে একথা আগে কোনওদিন ভাবেনি জন। বাড়ির

ড্রয়িংরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাগান। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল। বাগানের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরোনোর একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় এসে পৌঁছল। বাড়িতে যেটুকু টাকা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এনেছে ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ড। আরও একটু টাকা তুলে নিতে হবে।

কাল বাগান পরিষ্কারের কাজ হচ্ছিল বলে গাড়িটা একটু দূরে পাশের রাস্তায় রেখেছিল। বলা যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে গাড়িটা রেখেছিল। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে হেডলাইট না জ্বেলেই বেরিয়ে এল। পাড়া ছাড়ার পর হেডলাইট জ্বেলে স্পিড বাড়াল। যত তাড়াতাড়ি দূরে যাওয়া যায়। রাতের রাস্তায় গাড়ি খুব কম। শুধু হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তা ধরা দিচ্ছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে মোটরওয়ে ধরল।

ওয়েলসের দিকে লোকের ভিড় একটু কম। ওখানে একটা ছোট গ্রামে লুকিয়ে পড়া সব থেকে ভালো হবে। তাই ওদিকে যাওয়া ঠিক করল জন। খানিকবাদে মোটরওয়ে থেকে চেপস্টাও যাওয়ার এক্সিট নিয়ে এগিয়ে চলল। পথে একটা ছোট গ্রাম পড়ল। কারওয়েন্ট। এখানেই একটা ছোট হোটেলে রাত কাটিয়ে কাল ঠিক করবে কোথায় যাবে! শনিবারের রাত। তাই এত রাতেও বেশ কিছু ছোট হোটেল রেস্টুরেন্ট খোলা আছে। একটা ছ'কামরার অনামী হোটেলে থাকা ঠিক করল জন।

হোটেলের ঘরে এসে ফোনের দিকে তাকাতেই দেখল মিসড কল। গাড়ি চালাচ্ছিল বলে আগে খেয়াল করেনি। রাজের। ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া যায়। দু-তিন মাস আগে একটা পাবে আলাপ হয়। একটা টেবিলে বসে খাচ্ছিল জন। তখন রাজ নিজেই এসে আলাপ শুরু করে। খুব ভালো বুদ্ধিমান ছেলে। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুদিন ওরা দেখা করেছে। একসঙ্গে ফুটবল, রাগবি ম্যাচ দেখেছে। রাজনীতি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক করেছে।

এমন কেউ কেউ থাকে যারা চট করে বন্ধু হয়ে যায়। রাজ সেরকম। পাঞ্জাবি। ওর বাবা 1980 সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে আসে। রাজের এখানেই জন্ম, এখানেই পড়াশোনা। একটা অ্যাকাউন্টান্সি ফার্মে কাজ করে। জন কিছু হিন্দিও শিখেছে ওর কাছ থেকে। ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। ও কী বলে জানা যাক। রাজ খুব বুদ্ধি রাখে। নিশ্চয়ই ভালো কিছু পরামর্শ দিতে পারবে। তবে অনেক রাত হয়েছে। দ্বিধা নিয়ে ফোন করল জন। কয়েকবার রিং হওয়ার পরেই রাজের গলা।

পুরো ঘটনা খুলে বলল জন। এটা বলতে পেরে ওর নিজের একটু হালকা লাগল। যে দমবন্ধ করা টেনশনটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেটা একটু কমল।

—তোমার উচিত সবার আগে এই ফোনটা ইমিডিয়েটলি ফেলে দেওয়া। তুমি এই হোটেলে কী পরিচয়ে উঠেছ?

—কেন? আমার পরিচয়ে।

—তুমি কি পাগল? এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। কেউ যদি পথে জিগ্যেস করে নাম বলো ডেভিড, বলবে থাকো সুইনডনে। আমি একজন ডেভিডকে চিনি যে আমার সঙ্গে কাজ করত। নিজের আসল পরিচয় এখন কোত্থাও দিও না। আর একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এখনই ওখানে চলে যাও। আমিও ওদের বলে রাখছি। ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

—কীভাবে? ওরা আবার কীভাবে সাহায্য করবে?

—ওরা তোমার অন্য কিছু পরিচয়ের ব্যবস্থা করবে, যাতে তুমি কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে পারো।...দাঁড়াও, তার আগে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। বাকিটা সামনাসামনি বলব।

দশমাইল দূরের একটা পেট্রোল পাম্পের অ্যাড্রেস দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল জন। গাড়ি ঝড়ের বেগে ছোটাল। সত্যি, এরকম না হলে বন্ধু!

৫। ৪ জুন

রোববার। শনিবারের বদলে এই সপ্তাহে আমরা রোববার সবাই মিট করব বলে ঠিক করেছিলাম। একটাই কারণ। অনিলিখাদিও আসতে পারবে। অনিলিখাদি অবশ্য এখনও আসেনি। সকাল-সকাল প্রতীকদের বাড়ি এসে বসে আছি। বিশ্বজিৎদাও আসবে না আসবে না করে ন'টা বাজতেই হাজির। তবে আজ জমজমাট আড্ডার সুর কেটে গেছে।

লন্ডনে আবার টেররিস্ট অ্যাটাক! টিভি চলছে।

টিভিতে খবর দেখার পরে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না। সারা বিশ্ব জুড়ে এই সন্ত্রাসবাদ কবে কমবে কে জানে! এখনও বিবিসি-তে দেখিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে কয়েক ঘণ্টা আগে লন্ডনে ফের টেররিস্ট হানা হয়েছে। খবরে বলছে শনিবারের রাতে লন্ডন ব্রিজে কয়েকজন টেররিস্ট একটা সাদা ভ্যান নিয়ে বেশ কয়েকজনের উপর দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চালিয়ে দিয়েছে। তারপরে ওই ভ্যানে করে খানিক দূরে গিয়ে বরো মার্কেটে নেমে ওই টেররিস্টরা ছুরি দিয়ে যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই মারার চেষ্টা করেছে।

খবরে দেখাচ্ছে অন্তত সাতজন মারা গেছে। আটচল্লিশ জন আহত। ওই জায়গায় বেশ কিছু পাব-রেস্টুরেন্ট আছে। শনিবারের রাতে তাই অনেক লোকের ভিড় ছিল। জমজমাট উৎসবের পরিবেশ ছিল। টেররিস্টরা সে সুযোগ নিয়েছে। যাকে সামনে দেখেছে তাকেই মেরেছে।

যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছে। পুলিশ থেকে জানিয়েছে তিনজন টেররিস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনজনকেই ঘটনার খবর পাওয়ার আট মিনিটের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আর কোনও টেররিস্ট ঘটনাস্থলে নেই। তবে এখনও অনেকটা জায়গা পুলিশ ঘিরে রেখেছে। চিরুনি তল্লাশি চলছে। যদি কেউ কোথাও লুকিয়ে থাকে।

সবাই চুপ করে খবর শুনছিলাম। প্রতীক খবর দিয়েছে মাসিমা ঘিয়ের লুচি আর তরকারি করছেন। তার আশায় আছি। এরকম একটা খারাপ খবরের মন খারাপ করা ভাবটা যদি তাতে একটু হলেও কাটে।

নীরবতা কাটাতে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—বুঝলি, এই গরমে ভেবেছিলাম লন্ডনে যাব। কয়েকটা দিন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচগুলো দেখে আবার ফিরে আসব। শচিন এখন ওখানে আছে। একটু আড্ডাও মারা যেত। সে আর হল না।

—সে কি বিশ্বজিৎদা! তুমি আবার শচিনকে চিনলে কী করে?

বিশ্বজিৎদা খুব গম্ভীর মুখে সামনের টেবিলে রাখা চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলে উঠল,—সে অনেক কথা। সেরকম তো অনেকের সঙ্গেই আলাপ আছে। কিন্তু সেসব কথা তো আর তোদেরকে বলা যাবে না। পাঁচকান করে বেড়াবি। শুধু সামনা সামনি কখনও দেখা হলে, কার কাছ থেকে শচিন অফস্পিন বোলিংটা শিখেছিল সেটা জিগ্যেস করে নিস।

আমরা হাই হাই করে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে উঠলাম। কিন্তু বিশ্বজিৎদার উত্তর দেওয়ার দরকার পড়ল না। কারণ অনিলিখাদির ইতিমধ্যে ঘরে আবির্ভাব ঘটেছে। গায়ে নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। খোলা উসকোখুসকো চুল। দেখেই বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে।

প্রতীক বলে উঠল—কী ব্যাপার অনিলিখাদি? এত দেরি? তোমার জন্য মা লুচি শুরু করতে পারছে না।

অনিলিখার যে ঘিয়ের লুচি বেজায় পছন্দ এটা আমরা সবাই জানি। অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—স্যরি। বেরোনোর সময় টিভি চালানোটাই ভুল হল। টিভি খুলতে দেখি এই কাণ্ড। এই কয়েকমাস আগে যখন লন্ডনে ছিলাম এই বরো মার্কেটের একটা পাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরেছি। সব চেনা জায়গা।

দেখো, সেসব বন্ধুদের মধ্যে আবার কেউ এসব টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত কিনা!—বিশ্বজিৎদা খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না।

—না, না। একজন বাদে আমার বন্ধুর লিস্টে সেরকম আর কেউ নেই।—বিশ্বজিৎদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল অনিলিখাদি।

তন্ময় বলল,—সত্যি এরকমভাবে টেররিস্টরা যদি মানুষ মারার পরিকল্পনা করে, তাহলে কোনও সরকার এসব ঘটনা আটকাবে কী করে? যে কেউ তো একটা বড় ছুরি ব্যাগে নিয়ে ঘুরতে পারে। কী করে আগে থেকে বুঝবে?

—এজন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য টেররিস্টের উপরে নজরদারি রাখা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটার আগেই অনেক ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্সের তথ্যের উপরে নির্ভর করে পুলিশ কাজ করে, যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা জানতেও পারি না। কিন্তু দু-একটা ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স এরকম মিস করলেই তা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায়। আমাদের পৃথিবীটা সত্যি দিন-কে-দিন তাই এত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

—আশা করা যায় সব ক'জনকেই পুলিশ ইতিমধ্যে মেরে ফেলেছে। খবরে তো তাই বলছে।—সহেলি বলে ওঠে।

—হয়তো ঘটনার সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত, তাদেরকে ধরেছে। তবে মনে রাখতে হবে এসব টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি হঠাৎ করে হয় না। এর সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকে যারা পিছনে থেকে প্ল্যান করে। অনেক ক্ষেত্রে তারাই কর্মকাণ্ডের আসল পাণ্ডা হয়। এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাজ হবে তাদেরকে খুঁজে বার করা।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল,—আমাকে হয়তো কয়েক মাস বাদে লন্ডন আর সেখান থেকে এডিনবরা যেতে হবে। কয়েক সপ্তাহ থাকব। তখন এসব জায়গায় গেলেই এই সব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসবে।

—অফিসের কাজে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। একটা কাজেই যেতে হচ্ছে। একটা কনফারেন্স আছে।

এর মধ্যে ঘরে লুচি এসে ঢুকল। আলোচনা আর বেশি এগোল না। কারণ অনিলিখাদিও লুচি দেখে মুহূর্তে প্লেটে মনোসংযোগ করল।

৬। 20 জুলাই

বহুদিন বাদে একটা ছুটি নিল হ্যানা। ও অক্সফোর্ড সার্কাস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে স্টেশন-সুপারভাইজারের কাজ করে। দায়িত্বের কাজ।

স্টেশন চত্বর পরিষ্কার আছে কিনা, কোনও প্যাসেঞ্জারের কোনওরকম অসুবিধে হল কিনা সেটা দেখার থেকে শুরু করে স্টেশনে কন্ট্রাক্টররা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, মেন্টেনান্সের

কাজ সব কিছু ঠিকভাবে এগোচ্ছে কিনা...সব কিছু দেখার দায়িত্বই হ্যানার। হ্যানা বিয়ে করেনি। ওর সব সময় জুড়ে শুধুই এই ট্রেন আর স্টেশন। নেশার মতো হয়ে গেছে।

একা থাকে। সকালে কফি নিয়ে সোফায় বসে সবে চুমুক দিয়েছে, সেলফোনটা বেজে উঠল। অফিস থেকে ফোন। সবার তো জানার কথা যে ও আজ বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে।

বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরল না। কফি কাপে চুমুক দিল। কিন্তু ফোন আবার বেজে উঠেছে। একই নাম্বার থেকে ফোন। ফোনটা ধরতেই উল্টো দিক থেকে ডিউটি স্টেশন ম্যানেজার পলের গলা ভেসে এল।

হ্যানা!—কাঁপা উত্তেজিত গলা পলের,—খবরটা পেয়েছ?

—কী?

—উল্টোদিক থেকে ফের পলের কথা ভেসে এল—এখনি এখানে চলে এসো। ঠিক দশ মিনিট আগে স্টেশনে একটা বড় বোমা বিষ্ফোরণ হয়েছে। অনেকে মারা গেছে। শিগগিরি চলে এসো। এখখনি।

বলো কী! বোমা বিষ্ফোরণ? অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে? এটা লন্ডনের ব্যস্ততম স্টেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাও আবার এরকম পিক আওয়ারসে। এসময় অফিস যাত্রীর কীরকম ভিড় থাকে তা ভালোই জানে ও। মাথা যেন ঘুরে গেল হ্যানার।

গতকাল রাত দশটাতে ও স্টেশন থেকে বেরিয়েছে।

টিভি চালাল হ্যানা। খবরে সবে ব্রেকিং নিউজ এসেছে। ঠিক দশ মিনিট আগে অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে বড় বোমা বিষ্ফোরণ হয়েছে। কতজন হতাহত হয়েছে, বলা যাচ্ছে না।

কাল দক্ষিণের একটা এস্ক্যালেটরে একটা বড় কাজ হচ্ছিল। ও নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে কিছু হয়নি তো?

ওর ফোন বাজছে। ওর বন্ধু শোভির ফোন। শোভি অবশ্য ঠিক সহকর্মী নয়। কয়েকমাস আগে আলাপ। ফোনটা ধরতেই উল্টো দিক থেকে শোভির উত্তেজিত গলা।

—হ্যানা, হ্যানা! কী হয়েছে শুনেছ?

—হ্যাঁ! আমাকে ডিউটি স্টেশন ম্যানেজার পল এখনি জানিয়েছে। আমি যাচ্ছি।

—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। পুলিশ তোমাকে জেরা করবে। ওরা হয়তো তোমার খোঁজে ইতিমধ্যে বেরিয়েও গেছে। তুমি এখনই পালিয়ে যাও।

—কেন? আমার পালানোর কী আছে?

—আমি কাছাকাছি ছিলাম। জানতে পেরেছি পুলিশ নাকি তোমার এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কথা ভাবছে।

—কী! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী করে জানলে?

—এখন বেশি কথা বলতে পারছি না। তবে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। খানিক ভাবার সময় পেয়ে যাবে।

—কিন্তু যাব কোথায়?

—আমি সে ব্যবস্থা করেছি। বেরোলেই দেখবে তোমার বাড়ির বাইরে উল্টো দিকের রাস্তায় টেলিফোনের পাবলিক বুথটার কাছে একটা কালো অডি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যা পোশাকে আছ, তাতেই ওতে উঠে বোসো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো। লিফটে নেমো না।—ফোন ছেড়ে দিল শোভি।

মাথা কাজ করছে না হ্যানার। এখনও নাইট ড্রেসেই আছে। কোনওরকমে একটা জিনস আর টি-শার্ট গলিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল হ্যানা। পাঁচ তলায় ফ্ল্যাট। প্রায় ছুটে নীচে নেমে দেখল বাইরে খানিকটা দূরে একটা কালো অডি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ড্রাইভার ওকে দেখে হাত নাড়ল। বাঁদিকের দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে এল হ্যানা। গাড়িতে ড্রাইভারের সিটে একটা এশিয়ান লোক বসে আছে। উঠতে-না-উঠতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

100 মিটার যেতে-না-যেতে হ্যানা লক্ষ্য করল উল্টোদিক থেকে একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে ছুটে আসছে। বড় রাস্তার থেকে ওর ফ্ল্যাটের লেনে গিয়ে ঢুকল। তাহলে ওর ফ্ল্যাটেই হানা দিচ্ছে। ওর কি পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হল? ওকে কেন পুলিশ সন্দেহ করছে? শোভিই বা একথা জানল কী করে?

শোভির কথাই ঠিক। এরকম পরিস্থিতিতে পুলিশ যে-কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। সে কারণে একটু ভেবে নিয়ে তারপরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বোধহয় ভালো হবে।

ও শুধু সামনের ড্রাইভারকে জিগ্যেস করে উঠল,—কোথায় যাচ্ছি?

ড্রাইভার দক্ষিণ লন্ডনের একটা চেনা ফোর স্টার হোটেলের নাম উল্লেখ করে বলে উঠল,—শোভি সাহেব বলেছেন আপনার ফোনটা অফ করে রাখতে। ওরা ট্র্যাক করবে।

হ্যানা সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা অফ করে দিল। মাথা কাজ করছে না। এতদিন বাদে ছুটি নিল। এরকম একটা দিনের শুরু যে এভাবে হবে কে জানত?

৭। 20 জুলাই

সারাদিন ঘরের বাইরে জোরে পায়ের আওয়াজ শুনে বারবার চমকে উঠেছে হ্যানা। তিনতলায় কোণের ঘর। আসার পর থেকে আর বেরোয়নি। শোভি ঘর থেকে বেরোতে বারণ

করে দিয়েছে। কয়েকমাস আগে একটা পাবে শোভির সঙ্গে প্রথম আলাপ হ্যানার। আজ এই বিপদের দিনে এরকম একজন বন্ধু পাশে না পেলে কী যে হত!

ওর পরিচয় এখন অন্য। হোটেলে চেকইন করেছে টিনা নামে। গাড়ি থেকে নামার আগেই ড্রাইভার ওকে টিনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দিয়েছিল। কী করে কোথা থেকে টিনা নামের এই মহিলার লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড শোভি জোগাড় করেছিল কে জানে! টিনার সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল আছে হ্যানার। তবে একটু খেয়াল করে দেখলেই তফাত বোঝা যায়। কিন্তু হোটেলে চেকইন করার সময় সেটা কেউ খুঁটিয়ে দেখে না।

হ্যানা এটুকু বুঝেছে, এর জন্যই হয়তো ও বাড়তি কয়েক ঘণ্টা পেয়েছে! ওকে একটা এক্সট্রা ফোনও দিয়েছে ড্রাইভার। এই ফোনেই ফোন করবে শোভি। হ্যানা নিজের ফোন বন্ধ করে রেখেছে।

টিভিতে এখনও সমানে বিবিসি-র খবরে দেখিয়ে যাচ্ছে। হতাহত একশোর উপরে। গত কয়েক ঘণ্টা লন্ডনের পুরো আন্ডার গ্রাউন্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ও MI5-কে নিয়ে 'কোব্রা' মিটিং করেছেন। কীভাবে এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় তা নিয়ে দফায় দফায় বিভিন্ন এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার মেরি খানিক আগে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন,—ভিতরের কারুর এর সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা আছে। তা না হলে এরকম বোমা বিষ্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হত না। যে-কোনও সময় টিভিতে নিজের ছবি দেখার আশঙ্কাটা হ্যানাকে টিভি বন্ধ করতে দিচ্ছে না।

হঠাৎ হ্যানা চমকে উঠল। একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসছে।

ফোনটা কাঁপা হাতে ধরতে উল্টো দিক থেকে শোভির কণ্ঠ।

—আমি খানিকক্ষণের মধ্যেই আসছি। রুমেই থেকো।

—আমি কি পুলিশের সঙ্গে কথা বলব?

—না, না। কোনও কথা বলতে যেও না। ওরা তোমাকেই সন্দেহ করছে। তোমাকে হয়তো এক্সপ্লেন করতেও সময় দেবে না।

—কিন্তু আমাকে সন্দেহের কারণ কী?

—এক, তুমি ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে এটা করার সুযোগ ছিল না। দুই, বোমাটা একটা টি-শার্টে জড়ানো ছিল। টি-শার্টটা তোমার।

—মানে? কী করে জানল?

—বোমাটা ওই টি-শার্টে জড়ানো ছিল সেটা ফরেনসিক এক্সপার্টরা টি-শার্টের ছেড়া টুকরো দেখে বলেছে। টি-শার্ট এর ছবি কম্পিউটার স্ক্রিনে তৈরি করার পর ও ছবি দেখে তোমার ডিউটি ম্যানেজার বলেছেন যে গত বছর ওটা তোমাকে অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল। ক্যান্সার রিসার্চ ফান্ডের জন্য তুমি সবচেয়ে বেশি অনুদান সংগ্রহ করেছিলে বলে।

—তুমি এত কিছু জানছ কী করে?

একটু চুপ থেকে শোভি বলে উঠল,—তুমি কি আমার পরিচয় জানতে চেয়েছ কখনও? এটুকু শুধু জানতে যে আমি একটা সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে কাজ করি। এটুকু বলি আমিও ওই তদন্তের দলেই আছি। তা না হলে এত কিছু জানতাম কী করে! নেহাত তুমি আমার বন্ধু বলে আর তোমাকে আমি নিরপরাধ বলে জানি বলে বলেছি।

একটু চুপ করে রইল হ্যানা। সত্যিই কোনওদিন শোভির পরিচয় জানা হয়নি। প্রশ্ন করলে শোভিও এড়িয়ে গেছে। হ্যানা বলল,—কিন্তু ওটা তো প্রায় চার সপ্তাহ আগে ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনে দান করে দিয়েছিলাম। তার মানে কেউ ওখান থেকে ওটা পরে সংগ্রহ করেছে।

—হতে পারে। তবে আমি এখন ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

ফোনটা ছেড়ে একটু ভাবতে বসল হ্যানা। তাহলে কি কেউ ইচ্ছে করে ওকে ফাঁসাতে চাইছে! বেশ কিছুদিন ধরে ফলো করছে? ওর পরে একই দোকানে গিয়ে ঠিক ওই টি-শার্টটাই কিনেছে। কিন্তু বোমা নিয়ে ভিতরে ঢুকল কী করে? অনেক প্রশ্ন, কিন্তু ওর সময় এখন খুব কম।

হ্যানা বুঝতে পারল মাকড়সার জালে ও আটকে গেছে।

৮। 20 জুলাই

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্টিফেন তার টিম নিয়ে মিটিং করছিল। দশ ঘণ্টা আগে অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশনে বড় বোমা বিষ্ফোরণ হয়েছে। এর মধ্যেই তদন্ত অনেক এগিয়েছে। এখানে যে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে তা শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু তদন্ত যত এগিয়েছে তত একজনের দিকেই সব প্রমাণ এগিয়েছে। হ্যানা মার্শাল। ওই স্টেশনের সুপারভাইজার। আজই ছুটিতে। কী সুন্দর অ্যালিবাই। ঘটনার পরে খবর দেওয়ার পর থেকে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালবেলায় ফোন করে আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই বেপাত্তা। যদি কোনওভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত না থাকত তবে অবশ্যই আসত।

গত কয়েকদিন স্টেশনের একটা এসক্যালেটর সারানোর কাজ হচ্ছিল। গতকাল অনেক রাত অব্দি কন্ট্রাক্টররা কাজ করেছে। সেখানেই একটা ব্যাগের মধ্যে বোমাটা ছিল। আর বোমাটা

জড়ানো ছিল একটা টি-শার্টে। সে টি-শার্ট যে হ্যানার, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

বোমার মধ্যে ষড়ভূজ নাট ও লোহার টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে খানিক আগে হ্যানার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা নাট ও লোহার টুকরোর কেমিক্যাল কম্পোজিশন মেলে কিনা তা টেস্ট করার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। এই মাত্র ল্যাব রিপোর্ট এসে গেছে। একদম এক রাসায়নিক গঠন। আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটাই আশ্চর্য, হ্যানার অতীতে কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। বাবা স্কটিশ, মা ইংল্যান্ডের। প্রোফাইল চেক করলে সন্দেহ করার কোনও কারণই থাকে না। যদি শেষে প্রমাণিত হয় যে হ্যানাই এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাহলে প্রথম প্রশ্নই হবে ও কী কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটাল? অন্য কোনও অফিসিয়াল কারণ? কারুর উপরে প্রতিশোধ?

এর মধ্যে আরেকটা খবর নিয়ে এল চিফ ইন্সপেক্টর বব। এই তদন্তের মূল দায়িত্ব সব ববেরই উপরে। যা সন্দেহ করা হচ্ছিল, ঠিক তাই। আজ ছুটিতে থাকলেও ভোর ছ'টার সময় হ্যানা ওর স্পেশাল অ্যাক্সেস ব্যবহার করে স্টেশন চত্বরে ঢুকেছে। আর তার ঠিক মিনিট পনেরো বাদে আবার বেরিয়ে গেছে। মাঝে কোথায় কখন গিয়েছিল তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এস্ক্যালেটরের কাছের সিসিটিভি ক্যামেরাটা আবার খারাপ। সেটাও যে প্ল্যান করে আগে থেকেই খারাপ করা হয়েছে, সেটাও নিঃসন্দেহে।

জীবিত বা মৃত যে-কোনও অবস্থায় হ্যানাকে দ্রুত ধরতে হবে। তা না হলে ওর কাছে লন্ডন আন্ডার গ্রাউন্ডের উপরে যা তথ্য আছে, তা দিয়ে এরকম আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটানো কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সাংবাদিকদের সামনা সামনি হতে হবে। সাধারণ জনতাকে কীভাবে আশ্বস্ত করা যায় এটাই ভাবছিল স্টিফেন। এর মধ্যে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। উল্টোদিকের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল স্টিফেন।

—কী হ্যানার খোঁজ পাওয়া গেছে? কোথায়? অন্য নামে আছে?

খবর এসেছে হ্যানা অন্য নামে একটা হোটেল ভাড়া নিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পরপর কয়েকটা ফোন করল স্টিফেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে হোটেল ঘিরে ফেলা হবে।

৯। 20 জুলাই

হ্যানা বুঝতে পারছিল না কী করবে। ওর বন্ধু বলতে তেমন কেউ কোনওদিনই ছিল না। সেভাবে কারুর সঙ্গে আড্ডাও কোনওদিন মারেনি ও। শুধু কাজ আর কাজ। গ্র্যাজুয়েশনের পর থেকে সেই যে এই কাজে ঢুকেছিল, তারপর থেকে কখনও চাকরিও পরিবর্তন করেনি গত পনেরো বছর।

ওর মতো দক্ষ সুপারভাইজার যে খুব কমই হয়, এটা ওর শত্রুরাও স্বীকার করে নেবে। ওর কাজের রেকর্ড নিশ্চয়ই পুলিশও খুঁটিয়ে দেখবে। এরকম করার কোনও ইচ্ছে থাকলে কি এতদিন এই দপ্তরে এভাবে কাজ করতে পারত, এরকম একটা পরিস্থিতিতে যে ও কখনও পড়বে তা কোনওদিন ভাবতেও পারেনি। ওর কি পালিয়ে আসাটা ঠিক হয়েছে?

কিছু কিছু জিনিস এখন ওর মনে পড়ছে যেটা গত কয়েক সপ্তাহে ওর স্বাভাবিক লাগেনি। মাঝেমধ্যে ওর মনে হত, যেন কেউ ওকে নজর করছে।

গত পরশু পোস্টে একটা বড় বাক্স প্যাকেজ হিসেবে পেয়েছিল।

নেওয়ার পরে প্যাকেজ খুলে বেশ অবাক হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু নাট, বোল্ট আরও অনেক মেরামতির সরঞ্জাম ছিল। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষে ঘরে রেখে দিয়েছিল। প্যাকেজে ওর নাম, ঠিকানা ঠিকই ছিল। কিন্তু প্রেরক যে কে, বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল পরে একদিন পোস্টঅফিসে গিয়ে খোঁজ করে ঠিক জায়গায় ফেরত দিয়ে আসবে। সে সময় হয়ে ওঠেনি।

এছাড়া কয়েকদিন আগে ওর মনে হয়েছিল ওর ই-মেইল আইডি যেন হ্যাক করা হয়েছে। লগে দেখেছিল যে ওর কিছু ই-মেইল একটা অন্য আই পি অ্যাড্রেস থেকে পাঠানো হয়েছে। অথচ ও তো একই কম্পিউটার থেকে ই-মেইল সবসময় করে।

এ ছাড়াও ওর মনে হয়েছিল এমন কিছু ই-মেইল এসেছে যা দেখে মনে হয় ওর অন্য কিছু ব্যাঙ্ক জাতীয় দরকারি তথ্য বার করার চেষ্টা হয়েছে ওর ই-মেইলের সাহায্য দিয়ে। তখন এটা নিয়ে বেশি ভাবেনি, কারণ এরকম কোনও সম্ভাবনার কথাই ওর মাথায় আসেনি। মনে হয়েছিল ওর ইমেল আইডি থেকে কেউ যেন কিছু মেইল করেছে। কিন্তু সেই ই-মেইলগুলো খুঁজে পায়নি। তাহলে কি কেউ ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছিল গত কয়েকমাস ধরে?

হঠাৎ ওর মনে হল, বাইরের দরজার সামনে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার দিকে একটু এগোতেই বাইরে থেকে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনল।

ইতিমধ্যে আবার ফোন বাজছে। একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন। দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফোন ধরল। ফোন ধরতেই আবার শোভির গলা।

—পালাও হ্যানা। ওরা তোমাকে ঘিরে ফেলেছে।

—কীভাবে পালাব?

—ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ফোন কেটে গেল। হ্যানার মাথা কাজ করছিল না। তিনতলার উপরে ঘর। পুরোনো দিনের বাড়ি। পরে পরিবর্তন করে হোটেল হয়েছে। কাচের জানলা টেনে উপরে তুলে ফেলা যায়।

তাতে দেড় ফুট মতো জায়গা হয়। কোনওরকমে তা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করল হ্যানা।

ইতিমধ্যে বাইরের দরজায় জোর ধাক্কার আওয়াজ। মনে হল দরজা যেন এখনই ভেঙে ফেলবে। তাড়াহুড়ো করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনতলার কারনিশে। নীচে রাস্তা আর সেখানে বেশ কিছু পুলিশ আগে থেকেই মোতায়েন ছিল। কী করবে বুঝতে পারার আগেই বেশ কিছু গুলি ওর দিকে ছুটে এল। তিনতলা থেকে নীচে মাটিতে এসে পড়ল শরীর। ছুটে এল কিছু পুলিশ। না, প্রাণ নেই। স্পট ডেড।

১০। 15 অক্টোবর

ইমিগ্রেশনের এত বড় লাইন আগে কখনও দেখেনি অনিলিখা। খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। আসলে গত কয়েক মাসে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হানা হয়েছে ইংল্যান্ডের বুকে। কখনও লন্ডন, কখনও ম্যাঞ্চেস্টার, কখনও কার্ডিফ। প্রত্যেকটাই ঘটেছে জনবহুল জায়গায়। তাই অনেক বেশি সতর্কভাবে তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তরের উপর নির্ভর করে বিচার করা হচ্ছে যে-কোনও নতুন আগন্তুককে। কোনওরকম সন্দেহ হলেই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

অনিলিখা ইংল্যান্ডে বহুবার আগে এসেছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকার কথা সিস্টেমে। তার উপর নির্ভর করে অনেক তথ্যই ওদের কাছে থাকবে। তবু হাজারো প্রশ্ন। এবারে কী জন্য, কতদিনের জন্য, কোথায় থাকবে...ইত্যাদি। যে আফ্রিকান মহিলা কাউন্টারে ছিলেন মাঝে একবার কী একটা জিগ্যেস করতে আরেকজনের কাছে গিয়ে আবার দু-মিনিট পরে ফিরে এলেন। সব মিলিয়ে অনিলিখা যখন বেরোল, তখন লন্ডন থেকে সোয়ান্সী যাওয়ার কানেক্টিং বাস মিস হয়ে গেছে। আবার এক ঘণ্টা পরে বাস। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না। তাই ভেতরে এসে টারমিনাল 3-এর সেন্ট্রাল বাস স্টেশনে বসল অনিলিখা। খানিকদূর দিয়ে একজন সুট-টাই পরা ভদ্রলোক হেঁটে গেল। ভারতীয়। খানিকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ অনিলিখার মনে হল লোকটা যেন খুব চেনা। সুভদ্র সেন না?

একসঙ্গে বহু বছর আগে সাউথ পয়েন্টে পড়েছে। কী করছে এখানে? একটু দ্বিধা নিয়েই অনিলিখা চেঁচিয়ে উঠল,—সুভদ্র!

—অনিলিখা!! তুই এখানে?

—অফিসের কাজে এসেছি। একমাসের জন্য।

—তাই নাকি! গ্রেট।

—তুই?

—আমি এখানেই থাকি। অনেক বছর।

—কী কাজে আছিস?

—এটাই তো। আমার কাজটা এমন যে চট করে বলা যায় না। তবে ধরে নে আমি এখানকার লোকেদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করি।

—তার মানে ইদানীং যা অবস্থা তাতে বেশ চাপে আছিস। তাই তো?

হ্যাঁ, আর বলতে! যা চলছে, অন্য কিছু ভাবার সময়ই পাচ্ছি না। সব ছুটি ক্যান্সেল।...তুই একদিন আমার বাড়ি চলে আয়। রেডিং। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

খসখস করে একটা কাগজের উপরে ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখে অনিলিখার হাতে দিয়ে দিল। বলল,—আজ এখনই একটা কাজে ছুটতে হবে। তাই আর কথা বলছি না। তুই কি একা এসেছিস? তোর নাম, ঠিকানাটাও দিয়ে রাখ।

অনিলিখা ওর হোটেলের ঠিকানা, ফোনের নাম্বার লিখে দিল। কাগজটা নিয়ে সুভদ্র আর দাঁড়াল না। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

সুভদ্র সেন। বহুবছর বাদে দেখা। খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে ছিল। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। সব সময় নানা চালাকি করত। নিয়ম ভাঙতে ওস্তাদ। ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে গিয়ে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সঙ্গে আড্ডা দিত। সবাইকে বোকা বানাতে ওস্তাদ। তবে সবার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি আলাপ জুড়তে পারত। এটাই ছিল ওর স্পেশাল ক্ষমতা। দাবাও খেলত চমৎকার।

এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এটা ভাবতে পারেনি অনিলিখা। হঠাৎ ওর মনে পড়ল দেশে থাকতে কয়েক বছর আগে কী একটা ব্যাপারে যেন নামটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। ও একটা ছোট দলের মধ্যে ছিল যারা রুলেট খেলা নিয়ে ক্যাসিনোতে কিছু জালিয়াতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরে অবশ্য ওদের শাস্তি পেতে হয়নি।

রুলেট খেলায় রুলেটের টেবিল আর বল উল্টোদিকে ঘোরে। তাই কোন ঘরে গিয়ে সেই বল শেষে পড়বে এটা কিছুতে বলা সম্ভব নয়। আর বেটিং হয় কোন ঘরে পড়বে তার সংখ্যা, সে ঘরের রং কী হবে—এসবের সম্ভাবনা নিয়ে। তাই আইনস্টাইনও বলেছিলেন যে রুলেট খেলা নিয়ে প্রেডিকশান কখনও সম্ভব নয়। প্ল্যান করে জেতা সম্ভব নয়।

কিন্তু ওই তিন জনের টিম সেটাই সম্ভব করেছিল। আর তাই বারবার কোনও এক অজানা টেকনিকের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ক্যাসিনোতে রুলেট খেলায় কোটি-কোটি টাকা জিতত। ধরা পড়লেও ওদের শাস্তি হয়নি। দেখা গিয়েছিল যে ওরা নিজেদের তৈরি রুলেট টেবিলে কম্পিউটার ও লেসার টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে কোথায় গিয়ে বল পড়বে সেটা বারবার করে পর্যবেক্ষণ করত। এভাবে বারবার দেখে ব্রেনকে এমনভাবে ট্রেন করেছিল যে নির্ভুল

অনুমান করতে পারত। কিন্তু ক্যাসিনোতে রুলেট খেলার সময় কোনও কিছুর সাহায্য নিত না। শুধু সেই অভ্যেসের উপর নির্ভর করে সঠিক অনুমান করত। তাই ধরা পড়লেও আইন ভাঙেনি। কোনও শাস্তিও পেতে হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই তখন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

খুব প্রতিভাবান বলেই এটা ওর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে একবার সুভদ্রর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

১১। 16 অক্টোবর

এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি ব্রিটেনে। একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলা। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বারবার হামলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জনবহুল শহরে। বেশ কিছু ধরপাকড় হলেও যার দিকে প্রধান সন্দেহের আঙুল উঠেছে, সেই মূল অভিযুক্তই বারবার যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে খুঁজে বের করা যাচ্ছে না।

আগে সন্দেহভাজন দুষ্কৃতির প্রোফাইল চেক করে অনেক হামলা আটকানো যেত। ধর্ম, পরিবার, কোন দেশ থেকে এসেছে, কীরকম বয়স, ক্রিমিনাল রেকর্ড, উগ্রবাদে বিশ্বাস...এসবের ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুষ্কৃতিদের উপরে নজরদারি করা সম্ভব হত। এক্ষেত্রে যেন কার কাছ থেকে যে আক্রমণ আসবে সেটার ধারণাই করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকবারে মূল অভিযুক্তের চরিত্র আলাদা। ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা। আগে থেকে সন্দেহ করা অসম্ভব। যারা করেছে তারা প্রত্যেকেই যেন ভেতরের লোক। তাদের কাছে এতটাই তথ্য বা নিয়ম ভাঙার ক্ষমতা ছিল যে তাদেরকে আটকানো যায় না।

সামনে আবার ব্রিস্টলে ইউনাইটেড নেশনসের ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দেশের নেতারা আসবেন। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কুড়ি মানুষ। সবরকম সাবধানতা আগে থেকে নেওয়া হলেও সেই কড়াকড়ির ফাঁক গলে যে-কোনও টেররিস্ট চলে আসবে না সেটাই বা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

বিভিন্ন দেশের নেতারা থাকবেন কাছের নিউপোর্টের কেলটিক ম্যানর রিসর্ট হোটেলে। প্রশ্ন উঠছে তাদের নিরাপত্তায়। কীভাবে MI5 তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। যারা এসব নেতাদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবেন, তাদের প্রত্যেকের প্রোফাইল খুব সতর্কভাবে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। এনিয়ে MI5-এর একটা বড় টিম কাজ করছে।

MI5-এর অফিসার রুনির দায়িত্ব পড়েছে এরকম এক মহিলার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার। ভারত থেকে আসছে। বাঙালি। নাম অনিলিখা। কনফারেন্সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর তার জন্য বাতাসের গতিপথ কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবে। বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাদা কথা বলবে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এ

মহিলার একটা ইন্টারেস্টিং অতীত আছে। বেশ কিছু বিশ্বজোড়া রহস্য সন্ধানে এই মহিলা যুক্ত ছিল। MI5-এর চোখে এই মহিলা অত্যন্ত প্রতিভাবান। তাই খারাপ কিছু করতে চাইলে, তারও ক্ষমতা রাখে। চোখের দৃষ্টিতেও সেই ইনটেলিজেন্সেরই ছাপ। রুনি অনিলিখার ছবির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই সুন্দরী মহিলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

১২। 22 অক্টোবর

কয়েকমাস আগে এই মহিলার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ অনিলিখার। নাম কোর্টনি। আমেরিকায় থাকেন।

অনিলিখা খুব কম সময় ফেসবুকে থাকে। এমনকী অন্যদের রাখা ইনবক্সে মেসেজের উত্তরও পাঠাতে পারে না। দেখেও না খেয়াল করে। কিন্তু প্রথম থেকেই এই মহিলাকে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে অনিলিখার। এখন কোর্টনির থেকে আসা মেসেজ ইনবক্সে না দেখলে সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়।

কারণ উনি অন্য কোনও কথা তেমন বলেন না। শুধু একটা করে দাবার চাল দেন। আর অনিলিখা তার পরে উল্টো চাল দেয়। এটা যে রোজ হয় তা ও না। এমনও হয়েছে যে মহিলা সপ্তাহে একটাই চাল দিয়েছেন।

দাবা অনিলিখার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। ও অনেক টুর্নামেন্টও জিতেছে। ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু এরকম মজার খেলা আগে কারুর সঙ্গে খেলেনি। যে খেলা কয়েকঘণ্টায় শেষ হয়ে যেতে পারে, সে খেলা এভাবে মাসের পর মাস ধরে চালিয়ে যাওয়া। শুধু একটা মুভ দিয়ে থেমে যাওয়া। তারপরে আবার অপেক্ষা করা। কবে উত্তর আসবে তার প্রতীক্ষা। এটাই অবাক ব্যাপার। এর মধ্যে যে ধৈর্য আর গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় লুকিয়ে আছে সেটাই অবাক করে অনিলিখাকে। মহিলার সঙ্গে ভালো পরিচয় না থাকলেও, মহিলা যে খুব ভালো খেলেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। খুব নামকরা পরিচিত কোন প্লেয়ার হলেও অবাক হবে না অনিলিখা। অনিলিখা কালো গুটি নিয়ে খেলছে। সিসিলিয়ান ডিফেন্স। গত তিন মাস ধরে এ খেলা গড়িয়েছে।

E4 C5

NF3 D6

D4 CD4

ND4 NF6

NC3 G6

। । । ।

কচ্ছপের গতিতে এগিয়ে এখন 42 চালে। আবার কোর্টনির দানের প্রতীক্ষায়।

দাবা খেলায় দানের সময় টাইম লিমিট থাকে। এখানে সে চাপ নেই। যত ইচ্ছে সময় নাও। ঘড়ি থেমে আছে। চাইলে যে কারুর সাহায্যও নিতে পারো। শুধু চাল ফেরত নেওয়ার উপায় নেই। অনেক সময় অনিলিখা রীতিমতো পড়াশোনা করে চাল দেয়। ইংল্যান্ডে এসেও রোজ অন্তত একবার করে অনিলিখা দেখে, আগের চালের কোনও উত্তর এল কিনা।

আজ ইনবক্স দেখে মন ভালো হয়ে গেল। চাল এসেছে। কিন্তু কী সাংঘাতিক! এটা তো খেয়াল করেনি অনিলিখা। অনিলিখা যে চালই দিক না কেন আর ঠিক দুই চাল বাদে ওর রানি একটা ঘেরাটোপের মধ্যে আটকে পড়বে। বেরোতে পারবে না। এটা প্রায় চেক মেট হওয়ার সামিল। কী সাংঘাতিক প্ল্যান। যুদ্ধ হচ্ছিল অন্য দিকে, কিন্তু সারাক্ষণ কোর্টনির আসল লক্ষ্য ছিল রানিকে এভাবে বন্দি করা। অনিলিখার রানি এখন একেবারে অকেজো।

তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। ফের দাবার বোর্ডে মন দিল অনিলিখা।

১৩। 30 অক্টোবর

আজ রেস্টুরেন্টে অনিলিখার ল্যাপটপ পালটে গেল। অবশ্য ওরই দোষ। ওরকম একটা ভিড়ে ঠাসা রেস্টুরেন্টে ল্যাপটপের ব্যাগ স্টাফের কাছে রাখাটাই ঠিক হয়নি।

জাইকা রেস্টুরেন্ট। বেশ নামকরা। রয়াল অ্যালবার্ট হলের কাছে। ওখানে একটা অফিসের মিটিং ছিল। রাত আটটা নাগাদ বেরোনোর সময় ল্যাপটপ নিতে গিয়ে অনিলিখা খেয়াল করল, সেটা পাল্টে গেছে। ওর ব্যাগের মধ্যে যে নোটবুক, অফিসের কার্ড ছিল তা আর নেই। ব্যাগ একরকম হলেও, ব্র্যান্ড এক হলেও এই ল্যাপটপটা আনকোরা নতুন। ইচ্ছে করে একাজ কেউ করেনি নিশ্চয়ই। এরকম ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এখন উপায়? শুধু ল্যাপটপ নয়, অফিসের কার্ড, পেন, দরকারি কিছু কাগজও ছিল ওই ব্যাগে।

প্রচণ্ড টেনশনে ছিল পরের কয়েক ঘণ্টা। অফিসের অনেক দরকারি কাজের ফাইল ছিল ওই ল্যাপটপে। ল্যাপটপ বন্ধ করাও ছিল না। চালু অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল অফিস থেকে। তাই অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে কিছু দরকারি তথ্য খুঁজে বার করা শক্ত নয়। ঠিক মতো ব্যাকআপ ও নেওয়া হয়নি। হারালেও বেশ অসুবিধেয় পড়ে যাবে।

সামনেই ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স। তাতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও জার্মানির চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক ঘণ্টার একটা প্রেসেন্টেশান আছে অনিলিখার। শুধু তো ওই এক ঘণ্টার বক্তব্য রাখা নয়, তার পিছনে অনেক ডেটা পয়েন্ট, অনেক রিসার্চ থাকে। যার সঙ্গে পালটে গেছে, সেও নিশ্চয়ই টের পাবে

কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাগ খুললেই। সাড়ে ন'টা অব্দি রেস্টুরেন্টেই অপেক্ষা করল অনিলিখা। খবর এল না। অগত্যা ওর যোগাযোগের নাম্বার রেস্টুরেন্টে রেখে হোটেলের দিকে রওনা হল।

যথেষ্ট টেনশন হচ্ছে। অনেক ব্যক্তিগত তথ্য তো থাকেই ল্যাপটপে। এগুলো কারুর হাতে গেলে সে কীভাবে ব্যবহার করবে সেটাই চিন্তার কথা। অনেক দরকারি ফাইল পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রোটেক্টেড থাকলেও আজকাল কে যে কীভাবে সেই পাসওয়ার্ড বের করে নেবে বলা মুশকিল।

হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছে, ঠিক এমনসময় আবার ফোন এল। যে ব্যক্তির সঙ্গে ল্যাপটপের ব্যাগ পালটে গিয়েছিল, তিনি এসে ব্যাগ ফেরত দিয়ে ওনার ব্যাগ নিয়ে গেছেন। একইসঙ্গে এরকম অসুবিধেয় ফেলার জন্য অনিলিখার উদ্দেশ্যে দুঃখ প্রকাশও করে গেছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিলিখা ফিরে চলল রেস্টুরেন্টে ব্যাগ সংগ্রহ করতে। যাক, শেষ পর্যন্ত ব্যাগ ফেরত পেয়েছে অনিলিখা। ব্যাগের ভিতরের সবকিছুও ঠিকঠাক আছে। এমনকী ব্যাগের ভিতরে মহার্ঘ মঁব্লা পেনটা পর্যন্ত যথাস্থানে আছে। অর্থাৎ যিনি ব্যাগটি পেয়েছিলেন তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।

অফিস থেকে কাছের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন যাওয়ার পথে রোজ একজন ভিখিরি বসে থাকে। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে রোজ সে চেলো বাজায়। ভারি সুন্দর মন উদাস করা সুর। লোকটার মোটা নাক। চোখের নীচটা বেশ খানিকটা বসা। নাক আর ঠোঁটের মাঝের অংশে একটা গভীর কাটা দাগ। একদিকের গাল কীরকম আগুনে পোড়া কালো। মুখে চোখে হিংস্রতা। মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে এসেছে।

অনিলিখা বিশ্বাস করে, কাউকে আগে থেকে ভালো বা খারাপ ভাবা উচিত নয়। মূল সমস্যা হল আমরা আগে থেকে কারুর সম্বন্ধে ধারণা করে বসি। সাদা কালো রং লাগাই। তারপরে যেটা ভাবি, সেটাই তার সঙ্গে পরিচয়ে আগে থেকে আরোপিত করি। অনিলিখা এর বাইরে।

কিন্তু এই লোকটার মুখের মধ্যে কী যেন আছে যা অনিলিখাকে স্বস্তি দেয় না। মাঝে মধ্যে লোকটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয় ওই লোকটার দৃষ্টি ওর উপরেই নিবদ্ধ। যেন এই হাজার লোকের ভিড়ে লোকটা অনিলিখার জন্যই ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত আটটা। আশেপাশের রাস্তা শুনশান। শুধু ল্যাম্পের হলুদ আলো যেন ভিজে রাস্তায় জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে। অফিস থেকে ফেরার সময় অনিলিখা যখন লোকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মনে হল লোকটা ঠান্ডায় কাঁপছে। আজ ওর চেলোটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ। পাশেই বাস স্ট্যান্ড। এ সময় হঠাৎ জোর বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল অনিলিখা।

সেখান থেকেই লোকটাকে লক্ষ্য করতে থাকল। চোখ বন্ধ করে বসে আছে। মাঝেমধ্যে ঠান্ডায় কেঁপে উঠছে। দূর থেকে দেখলে অনেক সময় ভুল ধারণা হয়। একজনকে যখন কাছ থেকে দেখা যায়, যখন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার চারপাশের পৃথিবীটা দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন তার আসল চরিত্রটা ধরা পরে। ওর মনে হল লোকটা পরম স্নেহে একটা ছবি আঁকড়ে ধরে আছে।

অনিলিখা বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওর ছাতাটা লোকটাকে দিয়েছিল। আর তখন দেখেছিল, লোকটার সামনের ফ্রেমবন্দী ছবিতে ওই লোকটার সঙ্গে একটা কমবয়েসি ছেলে ও এক মহিলা আছে। অনিলিখা জিগ্যেস করেছিল, কে ওরা। উত্তরে জানতে পেরেছিল, ওর ছেলে আর বউ। কিন্তু ওরা আর নেই। আগে ও যেখানে থাকত, সেই বহুতল কাউন্সিল হাউসে আগুন লাগায় তারা মারা গেছে। বিধ্বংসী আগুন এমনভাবে লেগেছিল যে মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওরা এসেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে লন্ডনে আশ্রয়ের খোঁজে। এখনও খুঁজে চলেছে ওর স্ত্রী-পুত্রকে। হয়তো তারা এখনও বেঁচে আছে এই আশায় নির্ভর করেই ওর বাকি জীবন কেটে যাবে।

লোকটা কথা বেশি বলে না। শুধু বলেছিল যে সে নাকি দেখেছে, মাঝেমধ্যে অনিলিখাকে একটা বিশাল লম্বা দাড়িওয়ালা লোক উল্টো দিকের রাস্তা থেকে লক্ষ্য করে। সেটা ও আগে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি।

অনিলিখা চুপ করে থাকে। কিন্তু এবারে ওরও লন্ডনে থাকাকালীন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। মাঝেমধ্যে ওর অফিস থেকে দেওয়া ফোনটায় আলো জ্বলে ওঠে। একটা ঘসঘস আওয়াজ হয়। এবারে ডেটা ইউসেজও অনেক বেশি হয়েছে। কোনওভাবে ওর ফোনে কোনও স্পাই সফটওয়ার নেই তো?

১৪। 21 নভেম্বর

ছবিগুলো যেন একটু-একটু করে জুড়ছিল। আস্তে-আস্তে অনিলিখার চোখের সামনে ফিরে আসছিল আবছা-আবছা কয়েকটা চেহারা। গেস্টহাউস থেকে যার সঙ্গে এ-বাড়িতে প্রথম এসেছিল সেই মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা খুব গম্ভীর। চোখদুটো হিংস্রতায় জ্বলছে।

কিছু দূরে সারা। একটা চেয়ারে বসে। মুখে নিষ্ঠুর হাসি। চোখ দুটো যেন দরজায় লাগা বুলেটের গর্তের মতো কঠিন। আস্তে আস্তে উঠে বসল অনিলিখা। মাথাটা এখনও ঘুরছে।

অনিলিখা খেয়াল করল, এ ঘরে আগে আসেনি। ঘরে আলো খুব কম। পাশে জানলা থাকলেও পর্দা টানা। তার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসেছে। এটা গেস্টহাউস নয়। এটা এই

পুরোনো মূল বাড়িরই একটা অংশ। ওর হাত দুটো কব্জির কাছে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা। মুখ বাঁধা।

কাজের মহিলাটি অনিলিখাকে টেনে তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। অনিলিখা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। এই মহিলার গায়ে যে অসুরের শক্তি তা ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে। তা ছাড়া ওর হাত বাঁধা। ঘরে আরও অন্য লোক আছে।

মহিলা আস্তে-আস্তে ওকে পাশের ঘরের দরজার দিকে নিয়ে গেল। সারাও পিছু-পিছু আসছেন। বিশাল একটা কাঠের দরজা পেরিয়ে এবারে যে ঘরটার মধ্যে ওরা ঢুকল, সেটা বিশাল। এ ঘরটাও একইরকম অন্ধকার। কোনও আলো নেই। শুধু পর্দা টানা। জানলার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে সেটুকুই শুধু ঘরে আলোছায়ার চাদর পেতেছে। দূরে একটা হেলানো চেয়ারে একটা মেয়ে বসে আছে। ওর আরও কাছে নিয়ে যাওয়া হল অনিলিখাকে।

কাছ থেকে দেখতে পেল অনিলিখা। এই কি সারার মেয়ে? এককথায় অপরূপা সুন্দরী। কিন্তু গায়ের রঙ মৃত মানুষের মতো। খয়েরি চোখ। বয়স অনিলিখার মতোই। ওরই মতো কালো চুল। নাক-চোখ-মুখে ওর সঙ্গে বড় রকম মিল আছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে, পুরোপুরি উন্মাদের ছাপ। দু-হাতেরই কনুই থেকে নীচের অংশ পুরো ব্যান্ডেজে মোড়া। ঠোঁটের কোণে অনিলিখার উদ্দেশ্যে বিকৃত হাসি।

অনিলিখাকে আরেকটু কাছে নিয়ে যেতে হঠাৎ মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আরও কাছে এসে অনিলিখার মুখের থেকে ঠিক দু-ইঞ্চি দূরে মুখটা রেখে খুব কৌতূহলের সঙ্গে ওকে দেখতে লাগল। তারপর আবার অদ্ভুতভাবে খিকখিক করে হেসে অনিলিখাকে চারদিক দিয়ে ঘুরে-ঘুরে ভালো করে দেখল।

ওই কাজের মহিলা এবারে শক্ত করে অনিলিখার হাতটা ধরে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা অদ্ভুত ভাবে অনিলিখার আঙুলগুলো নিয়ে দেখতে থাকল। একটা একটা করে। তারপরে ফের অনিলিখার মুখের খুব কাছে মুখ এনে খসখসে গলায় বলে উঠল,—খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। ঠিক এরকমই চাই।

তারপরে খানিক দূরে গিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠল। অনিলিখাও চমকে উঠল।

—মা! আমার ঠিক এরকমই চাই। এরকম আঙুল।—তারপরে বীভৎসভাবে হাসতে শুরু করল। সারা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ওর মেয়ের কাছে।

বললেন,—তাই হবে সোনা। তাই হবে। সেজন্যই তো ওকে নিয়ে এসেছি।

অনিলিখার কাছে এসে সারা আবার বলে উঠলেন,—বলেছিলাম না, তোমার আঙুলগুলো খুব সুন্দর। সত্যি তাই। জানতাম ওর খুব পছন্দ হবে। এটা ওর এক আজব খেয়াল। যার যেটা

পছন্দ সেটাই ওর লাগবে আর আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর কাজের মহিলাকে বলে উঠলেন,—যাও, অনিলিখাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও।

অনিলিখা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কথা শেষের আগেই অনিলিখা হঠাৎ করে মহিলার হাত ছাড়িয়ে হাত তুলে কনুই দিয়ে পাশের মহিলার মাথার পাশের দিকে আঘাত করল। মহিলা ছিটকে দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু আর কিছু করার আগেই অনিলিখা টের পেল সারা মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক বের করেছেন। আর সে বন্দুক অনিলিখার উপরেই তাক করা।

একইসঙ্গে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী লোক ছুটে এসে অনিলিখাকে পিছন থেকে জাপটে ধরেছে। অনিলিখা লাফিয়ে উঠে বাঁ-পা দিয়ে পিছন দিকে একটা জোরালো লাথি মারল। অন্য যে কেউ হলে পড়ে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে ওর মনে হল যেন একটা লোহার স্তম্ভে লাথি মেরেছে। লোকটা আরও জোরে ওকে পিছন থেকে জাপটে ধরল।

বাধ্য হয়ে অনিলিখা খানিকক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা করে থেমে গেল। লোকটার গায়ে অসুরের জোর!

সারা ফের হেসে উঠলেন,—এখান থেকে পালানোর কোনওই উপায় নেই। জেমস কিক বক্সিং-এ ন্যাশনাল চাম্পিয়ন ছিল। এখন আমার এখানে। এরকম আরও অনেকে আছে। কাজ করে...জেমস! মেয়েটাকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অনিলিখাকে লোকটা ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এর মধ্যে অনিলিখা ফের শুনল সারার মেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে—আমার আঙুলগুলো একদম ভালো না। একদম বাজে। আমার ওর আঙুলগুলোই চাই! এখনই চাই!

এ-বাড়ির মধ্যে যে এরকম একটা গোপন সুড়ঙ্গ আছে তা ভাবাই যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে বিলিয়ার্ডস রুমে নিয়ে আসা হল ওকে। ঘরের কোণে একটা বড় গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। ওটা সরিয়ে ফেলা হল। তার পরে ক্লকটা যেখানে ছিল সেখানকার মাটির উপরে জোরে পা দিয়ে ধাক্কা মারতে সামনের দেওয়ালে একটা লুকোনো দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

দরজাটা এমনভাবে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল, এমনিতে খেয়াল করা যেত না। দরজার মধ্যে দিয়ে অনিলিখাকে নিয়ে অনিলিখার পিছন পিছন জেমস এগোল। অনিলিখার আগে আরও দুজন লোক। মিনিট পাঁচেক বাদে ওকে যে ঘরে নিয়ে আসা হল সেটা একটা আধুনিক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারকেও হার মানায়।

অনিলিখাকে জোর করে একটা খাটে শুইয়ে ফের হাত আর পা বেডের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

এর মধ্যেই চেনা একটা গলা পেল অনিলিখা। সুভদ্রর।

—কী, লাস্ট চালটা মনে আছে অনিলিখা? বুঝতে পারোনি তো যে আমি শুধু তোমার বোড়ে, হাতি আর ঘোড়া খাওয়ার জন্য বসে ছিলাম না। আসল লক্ষ্য ছিল ওদের উপরে আক্রমণের আড়ালে তোমার রানিকে ঘিরে ধরা। এমনভাবে ঘিরে ধরা যাতে তা সহজে আর আমার সাজানো ফাঁদ থেকে বেরোতে না পারে। রানিকে ফাঁদে ফেললে রাজা আর কতদূর! আর কয়েক দানেই চেক মেট হতে।

হ্যাঁ, এবার আমাদের কাজের কথায় আসি। এখানে অবশ্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার জন্য আলাদা রানি খুঁজে বের করি। যেমন চার দিন বাদে কেলটিক ম্যানরে যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার রানি তুমি। এবারে খুন হবে তিন দেশের প্রধান নেতা। সবার মনে হবে এই ঘটনায় তুমিই হলে মূল অভিযুক্ত। তোমার স্পেশাল অ্যাক্সেস কার্ড, তোমার আইডি ব্যবহার করে ঠিক তোমার মতোই একজন যখন এ ঘটনা ঘটাবে, তখন কেউ জানবেও না যে তোমার কোনওই দোষ ছিল না। তুমি কোনওভাবে যুক্ত ছিলে না এর সঙ্গে। তোমার সঙ্গে চিরকালের জন্য একটা নতুন টাইটেল যুক্ত হয়ে যাবে—মোস্ট ওয়ান্টেড ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট। হয় আমরা তোমাকে মারব, না হলে ওরা।

—কিন্তু আমাকে বাছলে কেন?

—গুড কোয়েশচেন। আমরা প্রত্যেকবার সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটানোর মাস খানেক আগে থেকে প্ল্যান শুরু করি। এমন একজনকে খুঁজে বের করি যার প্রোফাইল এমন হয় যে তাকে আগে থেকে কোনওভাবে সন্দেহ করার উপায় থাকে না। তোমাকে যেমন সন্দেহ করার কারণ নেই। অন্য কেউ হলে তার উপরে আগে থেকেই পুলিশের নজরদারি অনেক বেশি হত। আর দুই, তোমাকে এখানে কেউ ভালো করে চেনে না। তাই তোমার আই ডি দিয়ে অন্য কেউ যদি ঢোকে, তাহলে তাকে দেখে সবাই অনিলিখাই ভাববে। তবে এক্ষেত্রেও আমরা এমন একজনকে বেছে নিয়েছি, যাকে কিনা দেখতে অনেকটা তোমারই মতো। বুঝতেই পারছ কার কথা বলছি। অবশ্যই আমরা বিভিন্ন সন্ত্রাসের ঘটনার জন্য এ ধরনের কাউকে যখন বেছে নিই, তখন তার পিছনে এই কারণগুলো ছাড়াও আরও অন্য অনেক কারণ থাকে। এক্ষেত্রে যেমন তুমি যেসব রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে দেখা করবে, অন্যরা সে সুযোগ খুব কমই পাবে। তবে কোথায় কবে আমরা এরকম ঘটনা ঘটাব, পুরো প্রসেসটার প্ল্যানিং-এর সাতটা ধাপ আছে।

—কীরকম?

—প্রথম, প্ল্যান করা হয় কোথায় কবে কীভাবে ঘটনাটা ঘটানো হবে। সেটা আদৌ সম্ভব কিনা, কীভাবে কতটা ক্ষতি সম্ভব সেটা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাকে ওরা তারপরই জানায় কীরকম প্রোফাইলের লোক লাগবে।

যেমন, হয়তো জানাল এমন একজনকে দরকার যে লন্ডনে বাস চালায়।

দুই, এবার আমার কাজ শুরু হয়। আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। প্রচুর লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। আমি নিজে MI5-এ কাজ করি। ওদের চাহিদার উপর নির্ভর করে আমি বের করি কার পক্ষে এটা করা সবথেকে সহজে সম্ভব।

তিন, এবার সময় আসে তাকে ঘিরে দাবার ঘুটি সাজানোর। আমি, সারা, আমরা সবাই মিলে সেই বেচারির আইডেন্টিটি ফ্রড করি। অর্থাৎ সেই লোকটার সব ব্যক্তিগত তথ্য বার করে নিই। সবকিছু।

চার, এবার সেই লোকটার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের উপরে নির্ভর করে ঠিক করা হয় কে এই কাজ সারবে। এই আসল অপরাধী কে তা আমিও অনেক সময় জানতে পারি না। এটা ওরাই ঠিক করে। আমার কাজ শুধু তার কাছে সব তথ্য তুলে দেওয়া। এবার সেই আসল ক্রিমিনাল অন্যজনের পরিচয় নিয়ে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটায়।

পাঁচ, নিশ্চিত করা হয় যে সেই আসল অপরাধী পালিয়ে যেতে পারে।

ছয়, পুলিশের সামনে তুলে ধরা হয় আমাদের সাজানো গুটি সেই নিরপরাধ মানুষটাকে যার পরিচয় নিয়ে এ কাণ্ড ঘটেছে। সন্দেহের কারণ ওরাও পায় না। কারণ সব ফরেন্সিক এভিডেন্স তার বিরুদ্ধেই থাকে। পুলিশকে, এখানকার ইন্টেলিজেন্সকে বিভ্রান্ত করি যাতে তারা সবাই নকল খুনির পিছনে ছোটে।

সাত, আমরা নিশ্চিত করি যাতে এই নিরপরাধ লোকটা, এই সাজানো গুটি বোর্ডের বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ কাউকে কিছু বলার আগেই মারা যায়। সে আমাদের হাতেই হোক কি পুলিশের হাতে হোক।

—বুঝলাম। এক্ষেত্রে সেই সাজানো গুটি হলাম আমি। আর তাই আমার ফোন ট্যাপ করে আগে থেকে আমি কোথায়, কবে যাচ্ছি সব খোঁজখবর নিতে, তাই তো?

—একদম। আমরা সবই জানতাম। কোনওটাই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। এখানে যেমন শুধু সারার মেয়ে কেরীর ইচ্ছেতেই তোমার আঙুলগুলো কেটে নেওয়া হবে না। আমরা জানি কিছু জায়গায় কিছু মিটিং-এ যাওয়ার জন্য ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানের ব্যবস্থা করেছে। তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। যাতে অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকতে না পারে। এক্ষেত্রে তাই যেই এ কাজটা করতে যাক না কেন, তার তোমার দেওয়া আঙুলের ছাপের দরকার পড়বে। আর তাই চার দিন বাদে এ ঘটনাটা যখন ঘটবে, তখন তাতে তোমার জায়গা নেবে আর কেউ না, কেরী নিজেই। স্পেশাল কাজের জন্য স্পেশাল পারসন। তবে ওকে ওখান থেকে ঘটনার পরে দ্রুত বের করে নেওয়ার জন্য আমাদের লোক থাকবে। কেরীর মাথা যখন ঠিক থাকে, তখন ওর

মতো বুদ্ধি খুব কম মহিলাই রাখে। এটা ও ওর মা সারা, দিদা বেকির কাছ থেকে পেয়েছে। —থামল সুভদ্র ওরফে শোভি।

ফের বলে উঠল,—কী আর কোনও প্রশ্ন? শেষ ইচ্ছে?

—কিন্তু আমাকে মেরে ফেলে কী লাভ?

—না, সত্যি এভাবে মেরে ফেলার তেমন কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু শত্রুকে জীবিত রাখতে নেই। কবে তুমি আবার কীভাবে প্রমাণ করে দেবে যে তুমি এসবের পিছনে ছিলে না। তবে তোমাকে তো ঘটনার দিন অব্দি বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তা না হলে কী করে প্রমাণ হবে যে তুমিই এর পাণ্ডা।

আর দেখো, আমি কিন্তু এতে সরাসরি যুক্ত নেই। আমার শুধু টাকার দরকার। ঠিক যেমন সারার। আমরা এভাবে এক-একজনের আইডেন্টিটি ফ্রড করে শুধু কোটি-কোটি ডলার রোজগার করি। সেটাই আসল উদ্দেশ্য। এর পিছনে আসলে কারা আছে তা তুমি আন্দাজ করতেই পারছ! তাদের হাত অনেক অনেক দূর অব্দি যায়। আমরা শুধু দাবার বোড়ে, ঘোড়া, গজ। তাদের চিনিও না।

—তোমরা যাদের উপরে দোষ চাপিয়েছ, যাদেরকে অপরাধী সাজিয়েছ, তাদের সবাইকেই কি মেরে ফেলেছ?

—অবশ্যই। তাদের সবাইকে হয় আমরা মেরেছি, না হলে তাদের যাতে পুলিশ বা MI5 মারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পুলিশের মুখের কাছে তুলে দিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছি যাতে ওরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। যেমন ধরো, স্টেশন সুপারভাইজার হ্যানাকে ওরা মেরেছিল। কাউকে কাউকে এখানে এনে মেরে ফেলা হয়েছে। এবার জনের কথায় আসি। বেচারী ভালোমানুষ জন কিছুই জানত না। ওর সম্বন্ধে তো এখনও অনেক কাগজে ফলাও করে খবর বেরোয়। সবাই পুলিশকে এখনও দোষারোপ করে ওর মতো একজন টেররিস্টকে ধরতে পারেনি বলে। কিন্তু যে নেই, তাকে আর ধরবে কী করে। ভাবো তো! পুলিশের বিরাট টিম আজও দিনরাত এক করে জনকে খুঁজে যাচ্ছে, আর আসল অপরাধী তার আড়ালে যা ইচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে। ওকে কয়েকমাস আগে এখানেই ডেকে এনে মেরে ফেলা হয়েছে। ও বাঁচার জন্য এখানে পালিয়ে এসেছিল।

বানের টানে ভেসে যাওয়ার আগে কেউ হাতের কাছে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তাই ওদেরকে লোভ দেখিয়ে এখানে ডেকে আনাটা সহজ কাজ ছিল। এদের পালানোর অন্য কোনও জায়গা ছিল না। এদের সবাইকে এখানকার ডেথচেম্বারগুলোতে গ্যাস প্রয়োগে

মারা হয়েছে। তারপরে শরীর এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনওদিন ওদের মৃতদেহ পাওয়া না যায়।

এতক্ষণ সারা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন। এবারে এগিয়ে এলেন।

বলে উঠলেন,—নাহ! আর সময় নেই শোভি। টিম অপারেশন থিয়েটারে অপেক্ষা করছে। কেরীও খুব এক্সাইটেড। ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা লিসার থেকে নিয়েছিল। সেবারে কীরকম খুশি হয়েছিল দেখেছিলে তো! ও এবারে তার থেকেও অনেক বেশি এক্সাইটেড।

দুজন নার্স ইতিমধ্যে ঘরে এসে গেছে। অনিলিখার চাকা লাগানো বেডটা ওরা ঠেলে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। তারপরে ওকে বেড থেকে তুলে শোয়ানো হল অপারেটিং টেবিলে। মাথার উপরে বিশাল সার্জিকাল লাইট। তিনজন ডাক্তার। তাদের প্রত্যেকের গায়ে নীল গাউন। মুখ ঢাকা, ক্যাপ পরা। শুধু চোখ দেখা যাচ্ছে। মাথার কাছে অ্যানাস্থেশিয়ার মেশিন। অনিলিখার মুখে অক্সিজেনের টিউব লাগিয়ে দেওয়া হল। অপারেশন এখনই শুরু হবে। অনিলিখা আড়চোখে দেখল শুধু শোভি, জেমস আর সারা নয়। আরও দুজন টানটান চেহারার শক্তিশালী লোক ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক এই সময় একজন ডাক্তার হঠাৎ ডাক্তারি মাস্ক খুলে ফেলল। আর কেউ না, স্বয়ং স্টিফেন! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক বের করে বলে উঠল,—কেউ কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে না। পুরো এলাকা পুলিশ আর MI5-এর মিলিটারি কম্যান্ডোরা ঘিরে ফেলেছে। পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি চালাতে বাধ্য হব।

বাকি দুজন ডাক্তারও মুখোশ খুলে ফেলেছে। তাদের হাতেও বন্দুক।

সারা ওর রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটা গুলি এসে ওর হাতে লাগল। চিৎকার করে হাত চেপে মাটিতে বসে পড়ল সারা। শোভি আর জেমস হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক তেমনই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আরও দুজন। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে গুলি চালাতে গেল। সময় পেল না। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন পুলিশ ঢুকে এসেছে। বলতে গেলে বিনা বাধায় তারা সারা ও অন্যান্যদের অ্যারেস্ট করল। যেটুকু বাধা এসেছিল, তা কেরীর থেকেই। পুলিশের হাত কামড়ে মেয়েটা পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু সুবিধে হয়নি। পিছমোড়া করে নিয়ে যাওয়ার সময় তখনও চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছিল, ওর নাকি অনিলিখার আঙুলই চাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিলিখার হাতে পায়ে লাগানো লোহার বেড়ি খুলে ফেলল পুলিশ।

অনিলিখা উঠে বসল। বলে উঠল,—সুভদ্র! এবার আমার কথা শোনাই। শুধু রানিকে ফাঁদে ফেললেই খেলা শেষ হয় না। তার পরেও হারার সম্ভাবনা থাকে।

আমার যখন প্রথম ল্যাপটপ চুরি হয়, তখনই আমি পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলাম। জানতাম, এটা স্বাভাবিক নয়। আমাকে ঘিরে অন্য কোনও চক্রান্ত হচ্ছে। এমনকী আমার ফোন যে ট্র্যাপ করা হয়েছে, তাও বুঝতে পেরেছিলাম। পুলিশকে জানিয়েছিলাম যাতে ওরাও আমার ফোন ট্র্যাপ করে। এমনকী কোর্টনি নামের ফেসবুকের ফেক প্রোফাইল থেকে দাবার চাল, সেটাও আমার কাছে সেই জন্যই এতই ইন্টারেসটিং লেগেছিল। অপরাধী নিজে কতটা বোকা হলে আর কতটা দুঃসাহস থাকলে, নিজেকে এভাবে আমার হাতে তুলে দেয়! হয়তো বারবার অপরাধ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলে বলেই তোমার দুঃসাহস এতটা বেড়েছিল। আমিও শুধু-শুধু চাল দিইনি। তার আড়ালে উদ্দেশ্য ছিল কোথা থেকে আসছে সেই আই পি আড্রেস ট্র্যাক করা। কোথা থেকে এ কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে তা আন্দাজ করা।

স্টিফেন এগিয়ে এল। অনিলিখার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল,—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি রাজি না হলে তোমাকে সামনে রেখে এত কিছুর সন্ধান পেতাম না। কাজটা তোমার পক্ষে কতটা রিস্কি আর শক্ত ছিল, আমরা তা জানি। তবে এখনও তো অনেক বাকি। কী বল অনিরিকা?

স্টিফেন অনিলিখার নামটা এখনও ঠিকভাবে বলতে শেখেনি।

১৫

কেলটিক ম্যানর রিসর্ট হোটেল। সন্ধে ছ'টা। প্রেসেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে অনিলিখার। অনেকেই মুগ্ধতা জানিয়ে গেছে অনিলিখার বক্তব্যের পরে। খানিক আগে জার্মানির চ্যান্সেলার ও কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে আলাদা আলোচনাও হয়েছে অনিলিখার। কীভাবে গ্লোবাল ওয়ারমিং বা উষ্ণায়নের জন্য বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে ও তার জন্য জার্মানির অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে আলোচনা ছিল। জার্মানির চ্যান্সেলার অত্যন্ত অবাক হয়েছেন অনিলিখার এই তথ্যবহুল রিসার্চের কথা জেনে। এরকম হতে থাকলে বন্যা, হিট ওয়েভ, ঝড় বাড়বে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমবে। জার্মানি ও ইউরোপের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে পারে। এ বিষয়ে সব শুনে উনি আরও আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন এ বিষয়ে রিসার্চে উপযুক্ত ফান্ডিং-এর ব্যবস্থা করবেন। অনিলিখাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য।

খানিক পরেই ডিনার মিটিং হবে। উপস্থিত থাকবে বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ নেতা, সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিক, দেশ বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণিজন। বিশাল বলরুমে এক-এক

করে সবাই জড়ো হচ্ছে। বাইরে কড়া নিরাপত্তা।

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় একটা ছোট আনাউন্সমেন্টের পরে ডিনার পার্টি চালু হয়ে গেল। অনিলিখা আজ পরেছে কালো সিল্কের শাড়ি। অনেকের দৃষ্টিই যে ওর দিকে তা ও বুঝতে পারছে। খুব কম ভারতীয় মহিলাই আছেন এখানে। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে।

কিন্তু সে লোকটা কোথায়? কীভাবে তাকে চিনবে অনিলিখা? আর তাকে না পেলে তো দাবার আসল রাজারই খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কিছু দূরে স্টিফেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য এক মহিলার সঙ্গে গল্প করছে। একটু খেয়াল করতে অনিলিখা বুঝল, ইনি হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রাউলিং। হ্যারি পটার তেমন ভালো না লাগলেও রাউলিং-এর সঙ্গে আলাপের এ-সুযোগ ছাড়া যাবে না। আজ স্টিফেনের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। স্টিফেন ও ঘরে ছড়িয়ে থাকা গোয়েন্দারা যে প্রত্যেক আগন্তুক ও অতিথির উপরে নজর রেখেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে সাতটায়। বিশাল হলঘরের এককোণে তিনজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। এবার শুরু করল ভিভাল্ডির 'ফোর সিজনস'।

এখনও কোনও সন্দেহজনক লোকের খবর নেই। তাহলে কি সব সাবধানতা সত্ত্বেও ওদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে? ওরা কি জেনে গেছে যে ওদের প্ল্যান ভেস্তে গেছে? নাকি ওরা এখনও জানে যে, অনিলিখার জায়গায় অন্য কেউ আসবে?

ঠিক এইসময়ে একজন ছ'ফুট লম্বা বিশাল চেহারার টাকমাথা ভদ্রলোক অনিলিখার দিকে এগিয়ে এল। খুব কাছে এসে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল,—আমি শেখ জাবের আল আহমেদ। আপনাকে আমি কী নামে ডাকব?

অনিলিখা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—অনিলিখাও বলতে পারেন।

লোকটা মুচকি হেসে বলে উঠল,—আমরা রেডি।

ওরা এখনও জানে না যে, অনিলিখা আছে অনিলিখাতেই। তাতে কোনও রহস্য নেই।

দাবার বোর্ডে রাজা এতদিনে সত্যি কোণঠাসা হতে চলেছে।

রহস্য যখন সংকেতে



১

আবার পাওয়া গেল শুধু কঙ্কাল।

আমাদের শনিবারের আসরে আজকের মধ্যমণি বিশ্বজিৎদা নয়, এমনকী অনিলিখা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, অনিলিখাও নয়। আজকের মূল আকর্ষণ বহুপ্রচলিত বাংলা দৈনিকের প্রথম পাতার এই খবরটা। বহুক্ষণ ধরে হাত বদল হয়ে, এক হাত থেকে আরেক হাতে গিয়ে শেষে এখন তার অবস্থান আমাদের মাঝের টেবিলে। এখনও যেন কত কী বলতে চায়, আর তাই বারবার আমাদের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ছে খবরের বিষয়টা। সকাল থেকে যে-ক'বার টিভি চালিয়েছি, বারবার সেই একই খবর। নেহাত আমাদের এই বসার ঘরে টিভি নেই। আমাদের আজকের আড্ডায় ঘুরে ফিরে আসছে সেই একই খবর। সেই একই আলোচনা—কঙ্কাল কাণ্ড।

এই নিয়ে গত দু-সপ্তাহে তৃতীয় বার। ঠিক দুদিন পরপর খুন।

প্রথম খুন ব্যারাকপুরে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রফেসার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। নামকরা প্রফেসার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অনেক রাত করে কলেজ থেকে ফিরেছেন। একসঙ্গে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে খেয়েছেন। খাতা দেখবেন বলে পাশের ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সারা রাত শুতে যাননি।

সকাল হতে পড়ার ঘরে ঢুকে ওনার স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে যান। ওনার চিৎকার শুনে বাড়ির কাজের লোক ছুটে আসে। উনি ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছেন। পড়ার ঘরে ওঁর থেকে একটু দূরে মেঝের উপরে উপুড় হয়ে গোবিন্দবাবু পড়ে আছেন। বা বলা যায় গোবিন্দবাবুর পোশাকে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে।

তখনও ওটাই যে প্রফেসার গোবিন্দবাবুর সেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরে ডিএনএ টেস্ট থেকে জানা যায় যে ওটা গোবিন্দবাবুর কঙ্কাল। কিন্তু যে লোক কয়েক ঘণ্টা আগেও হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ করে কী হতে পারে যে সে রাতারাতি কঙ্কালে পরিণত হল। মৃত্যুর কোনও কারণ এখনও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় খুন ইন্দ্রনীল মুখার্জি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বাড়ি সল্টলেক। একটা নামি আইটি সংস্থায় কাজ করতেন। বছর ছয়েক চাকরি করেছেন। অবিবাহিত। ছোট পরিবার। বাবা, মা, ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন।

এখানেও খুন রাতের বেলায়। বাড়ির কাজের লোক মুন্না সকালে রোজকার মতো ডাকতে এসে অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকে। দেখে ইন্দ্রনীলবাবু রাতে যে পোশাক পরে শুয়েছিলেন, ঠিক সেই পোশাকেই খাটে শুয়ে আছেন। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ পড়ে ওটা

ইন্দ্রনীলবাবু নন, ওনার পোশাকে একটা কঙ্কাল। ঠিক যেন একটা কঙ্কাল ইন্দ্রনীলবাবুর পোশাকের মধ্যে ঢুকে শুয়ে আছে।

এই দৃশ্য দেখে মুন্না ভয় পেয়ে ভোজপুরী ভাষায় যে চিৎকার শুরু করেছিল, এক ঘণ্টার আগে তা থামেনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। পরে একই ভাবে প্রমাণিত হয় যে ওটা ইন্দ্রনীলবাবুরই কঙ্কাল।

তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে যে সন্ধে ন'টা নাগাদ কোনও এক কুরিয়ার এসেছিল। ইন্দ্রনীলবাবুর জন্য কোনও একটা গিফট প্যাক নিয়ে। এত রাতে সাধারণত কোনও কুরিয়ার আসে না। পাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান ইন্দ্রনীলবাবু। আর তার খানিক বাদে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে শোয়ার ঘরে চলে যান। গিফট প্যাকে কী ছিল, কোত্থেকে এসেছিল সে বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ।

তৃতীয় খুন গতকাল। এবার খুন হলেন মহিলা। পরিচিত অভিনেত্রী লিলি বসু। বয়স পঞ্চাশের কাছেপিঠে। বাড়ি লেক গার্ডেনস। ইদানীং সিনেমা খুব একটা করছিলেন না। টিভিতে একটা জনপ্রিয় সিরিয়ালে অভিনয় করছিলেন।

কালকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। ওনার স্বামী বাইরে থাকেন। গত পরশু সন্ধের দিকে কেউ ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে সামান্য কিছুক্ষণ সময় ছিল। চলে যাওয়ার পরে রাত দশটা নাগাদ সামান্য খাবার খান। অন্যদিন এর পরে বেশ খানিকক্ষণ টিভির সিরিয়াল দেখেন। ওইদিন শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি শুতে চলে যান।

সকালে সাড়া না পেয়ে বাড়ির কাজের মেয়ে মীনা ডাকতে গিয়ে দেখে, ঘরের মেঝেতে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। গত কয়েকদিনের দুটো ঘটনার পরে কারুর বুঝতে দেরি হয়নি যে ঠিক কী হয়েছে। এটা যে ওনারই কঙ্কাল তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন আসেনি। তবে এখনও ডিএনএ শনাক্তকরণ হয়নি।

বুঝলে অনিদি, এখানেও একটা শার্লক হোমসের দরকার ছিল। যা হচ্ছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।—সহেলি বলে উঠল।—কী করে খুনি বারবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে খুন করে যাচ্ছে বলো তো। কেউ টেরও পাচ্ছে না। আর খুন বলে খুন, এটা কী ধরনের মার্ডার যে শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকছে। এরকম কি আদৌ সম্ভব?

অনিলিখা আজকে খুবই অন্যমনস্ক। কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে অনেক বই কিনে সেখান থেকে সোজা আমাদের শনিবারের আসরে। এতক্ষণ ওই খবরটা নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, প্রায় ইচ্ছে করেই যেন কোনও কথা বলেনি। অথচ বেশ বুঝতে পারছি হাতে 'দ্য ফর্মুলা' বলে

লিউক ডরমেল-এর একটা বই থাকলেও বইয়ের পাতা ওলটানোর মাঝে আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে। আর অন্য কিছু একটা কথা ভাবছে।

সহেলির কথায় এতক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে উঠল,—শার্লক হোমসের কথা বললি বলে বলছি। জানিস তো, শার্লক হোমসের লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের কি হয়েছিল।

বেশ বুঝতে পারলাম, অনিলিখা ওই খুনের ব্যাপারে কোনওরকম আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে। আলোচনার মোড় অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা।

তবু অনিলিখা কথা বললে না শুনে থাকা যায় না।

অনিলিখা বলতে থাকে—আর্থার কোনান ডয়েল 1921 সালে ফ্রান্সের লিয়নে ডক্টর এডমন্ড লোকার্ডের ল্যাবরেটরিতে যান। ডক্টর লোকার্ড কে জানিস তো? উনি হলেন আধুনিক ফরেনসিকসের জনক। ওনাকে ফ্রান্সের শার্লক হোমস বলা হত।

তা উনি শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলকে দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে 'ব্ল্যাক মিউজিয়াম' দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে লোকার্ডের ফরেনসিকসের টেকনিকের উপর নির্ভর করে যেসব অপরাধীকে ততদিনে ধরা হয়েছিল, তাদের সবার অপরাধের রেকর্ড রাখা ছিল। তা সেসব কুখ্যাত অপরাধীদের অনেক ছবির মধ্যে হঠাৎ একটা ছবি দেখে আর্থার কোনান ডয়েলের মনে হয় ছবিটা যেন ওনার খুব চেনা।

একটু খেয়াল করে দেখে উনি বলে ওঠেন,—আরে এ তো জুলসের ছবি, আমার গাড়ি চালাত। ওর ছবি এখানে কী করে?

ডক্টর লোকার্ডও ওনার এই কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যান। বলে ওঠেন,—হ্যাঁ, ওর নাম জুলস বোনেটই বটে। কুখ্যাত অপরাধী। অনেকগুলো গাড়ি চুরি, খুন, নানান ধরনের অপরাধের জন্য অবশেষে ধরা পড়ে। আমার টেকনিকের উপরেই নির্ভর করে ওকে আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের ধরা হয়। গাড়ি ব্যবহার করেও অনেক খুন করত জুলস।

কিছুদিন পরে জানা যায় যে জুলস শুধু আর্থার কোনান ডয়েলের গাড়িই চালায়নি, আরেকজন বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্টের গাড়িও তার পরে চালাত। তিনিও টের পাননি যে তার ড্রাইভার এত বড় অপরাধী।

এটাই মজা। যত বড় ডিটেকটিভই হোক না কেন, অপরাধীকে ধরা অত সহজ হয়ে ওঠে না। সেই অপরাধী সামনে থাকলেও অনেক সময় বোঝা যায় না।—একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—দেখিস, এর জন্য তোরা আবার শার্লক হোমসের বই পড়া ছেড়ে দিস না।

—বলো কী অনিলিখাদি?—পাশ থেকে তন্ময় বলে উঠল।—শার্লক হোমসের স্রষ্টাও এরকম ঠকে গিয়েছিল। নাহ, আর শার্লক হোমসই পড়ব না। আচ্ছা, ওই ডক্টর লোকার্ড কে

ছিলেন বলো তো?

—ওই যে বললাম। ডক্টর এডমন্ড লোকার্ড হলেন আধুনিক ফরেনসিকসের প্রবক্তা। উনিই প্রথম ফরেনসিকসের সেই বিখ্যাত নীতির কথা বলেন—'every contact leaves a trace.' বা 'প্রত্যেক স্পর্শ অপরাধীর প্রমাণ রেখে যায়।'

আজও এটাই হল অপরাধী খুঁজে বার করার মূল মন্ত্র। ফরেনসিকসের ভিত্তি। খুনির আঙুলের ছাপ কাচে থেকে যায়, কিংবা সে যে পথে এসেছে, সেখানে পায়ের ছাপ থেকে যায়। কখনও মৃতের গায়ে লেগে থাকা ফাইবার থেকে অপরাধীকে খুঁজে বার করা হয়। কখনও-বা যা দিয়ে খুন করা হয়েছে, তার মধ্যেই অপরাধীর পরিচয় লুকিয়ে থাকে।

—তা এখানে তো কোনও প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।—আমি আবার মূল আলোচনায় ফেরার চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ, সেটাই তো চিন্তার কথা। তবে কিছু না কিছু শিগগিরি পাওয়া যাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে আসল প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

—কীরকম?

—এক, খুনগুলোর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে? মনে তো হয় না। তাহলে খুনির উদ্দেশ্য কী? দুই, আর সবথেকে বড় প্রশ্ন, যারা খুন হয়েছে তাদের সবাইকে ঠিক তার আগের রাতে বা কয়েক ঘণ্টা আগে সুস্থ স্বাভাবিক দেখা গেছে, তা হলে এত তাড়াতাড়ি তারা কী করে কঙ্কালে পরিণত হল? জানিস তো মৃত্যুর পরে মৃতদেহে কি হয়?

—রিগর মরটিস?—অর্ধেক শোনা দুটো শব্দ ছুড়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করল প্রতীক।

—ভুল বলিসনি। মৃত্যুর পরে আমাদের শরীরে পেশিতে নুন এসে জমে। এটা মৃত্যুর প্রায় বারো ঘণ্টা বাদে শুরু হয়। আর তার পরে আরও বারো ঘণ্টা জুড়ে এটা সবথেকে বেশি বোঝা যায়। এসময়ে প্রথমে মুখের পেশি, তার পরে হাত, তারপরে পায়ের পেশিগুলো ক্রমপর্যায়ে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়। তার পরে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাসলগুলো শিথিল হতে থাকে। একেই বলে রিগর মরটিস।

কখন মৃত্যু হয়েছিল তা বুঝতে রিগর মরটিস সাহায্য করে। শরীরের উষ্ণতা থেকে, মৃতদেহে পাওয়া পোকার লার্ভা থেকে, কখন মারা গিয়েছিল তা আন্দাজ করা হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা হল অন্য। মৃত্যুর পরে শরীরে তো আস্তে আস্তে পচন শুরু হবে। হঠাৎ করে তো আর কঙ্কালে পরিণত হতে পারে না। এক্ষেত্রে সেটাই হল সবথেকে অবাক ব্যাপার। সেটা বোঝা গেলেই অর্ধেক রহস্য সমাধান হয়ে যাবে।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—তবে এটা নিশ্চিত যে এটাই শেষ খুন না। আরও খুন হবে। আর আমার মন বলছে, এসব মৃত্যু যতই সম্পর্কহীন মনে হোক না কেন, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও কারণ আছে। আর সেটাই বার করতে হবে।

এতটা বলে অনিলিখা আবার অন্যমনস্ক হয়ে অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে আবার পরে নিল। আজকাল যখনই অনিলিখা খুব গভীরভাবে কোনও কিছু চিন্তা করে, এই আংটি খোলা-পরা করতে থাকে, দেখেছি।

২

জানলার বাইরের আকাশে আবিরের নানান রং। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে দিগন্তরেখা নানান রঙের তুলির আঁচড় কাটতে ব্যস্ত। আর সেই রঙের খেলা দেখতে কখনও উটে চড়ে, কখনও কচ্ছপে করে, কখনও বা মাথায় পাগড়ি পরে এগিয়ে আসছে মেঘের দল। এখন ইংল্যান্ডে বসন্ত।

এরকম আনন্দের অনুভূতি অপরাজিত বসুর আগে কখনও হয়নি। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে আজকে উনি ট্রিনিটি ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির ও নানান দেশের অগ্রগণ্য গণিতজ্ঞের সামনে ওনার সদ্য আবিষ্কার করা মৌলিক সংখ্যার সূত্র নিয়ে প্রথমবার বললেন। পুরো দেড় ঘণ্টা পিন ড্রপ সাইলেন্স। তার পরে নানান প্রশ্ন। লেকচার শেষের পরে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল। আর হাততালি চলেছিল একটানা পাক্কা পাঁচ মিনিট। হবে নাই-বা কেন? হাজার হাজার বছর ধরে মৌলিক সংখ্যাকে ঘিরে যা রহস্য ছিল বিশ্বের তাবড় ম্যাথেমেটিশিয়ানদের কাছে, সেই রহস্যই সমাধান করেছেন অপরাজিত।

2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17...এরা সব হল মৌলিক সংখ্যা। যে সংখ্যাকে শুধু সেই সংখ্যা দিয়ে বা 1 দিয়ে ভাগ করা যায়, তাই হল মৌলিক। গ্রিক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড দু-হাজারেরও বেশি বছর আগে বলে গিয়েছিলেন যে, যে-কোনও যৌগিক সংখ্যা তৈরি হয় দুটো মৌলিক সংখ্যা গুণ করলে। কথাটা খুব সামান্য শোনালেও আজকের যাবতীয় তথ্য গোপন রাখার বা এনক্রিপশনের মুলে এই মৌলিক সংখ্যা আর ইউক্লিডের বলা এই তত্ত্ব।

এই যে আমরা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কম্পিউটারে কেনাবেচা করছি, তার মূলেও এই মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যার জন্যই বলতে গেলে আমাদের করা যে-কোনও অনলাইন কেনাবেচা বা তথ্য আদানপ্রদান আজ সুরক্ষিত হয়। ছোটবেলায় কলকাতায় একটা নামকরা সরকারি স্কুলে পড়েছেন অপরাজিত। তখনই প্রিয় অঙ্ক শিক্ষকের মুখে শুনেছিল অয়লারের ইকুয়েশন। সেই ইকুয়েশন যা কোন সংখ্যা মৌলিক তা বার করতে পারে। ওনার ফর্মূলা ছিল f(x)=x2+x+41. অয়লারের ফর্মূলা কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যার অনুমান করতে পারেনি। তাই

অয়লার সারাজীবন এই মৌলিক সংখ্যার পিছনে ছুটলেও শেষ পর্যন্ত এই মৌলিক সংখ্যার রহস্য ওনার কাছে অধরাই থেকে যায়।

অয়লার একা নন। অয়লার মারা যান 1783 সালে ব্রেন হেমারেজে। ওনার পরেও অনেক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তাদের সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন এই রহস্যের সন্ধানে। কী সূত্রে সব মৌলিক সংখ্যা অনুমান করা যায়। সব কিছুতেই তো একটা প্যাটার্ন থাকে। মৌলিক সংখ্যা কী প্রকৃতির সেই সব নিয়মের উপরে?

জার্মান গণিতজ্ঞ বারনহারড রাইমান থেকে নাৎসিদের কোড যিনি বার করতে পেরেছিলেন এই অ্যালান টিওরিং অব্দি অনেকেই চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু অধরাই থেকে গিয়েছিল সেই রহস্য।

সেই ছোটবেলা থেকেই মৌলিক সংখ্যার নেশা যেন রক্তে ছড়িয়ে পড়েছিল অপরাজিতর। সেই স্কুল, কলেজ, অধ্যাপনা সব জুড়ে শুধু এই মৌলিক সংখ্যা।

2000 সালের পর থেকে এই মৌলিক রহস্য সন্ধানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। যেভাবে অনলাইনের যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন রাখা হয়, তাকে বলে 'পাবলিক কি' এনক্রিপশন।

ধরো, আমি চাই তুমি আমাকে একটা মেসেজ পাঠাবে, আমি ছাড়া আর অন্য কেউ সে মেসেজ পড়তে পারবে না। আমি তোমাকে আমার 'পাবলিক কি'টা দিয়ে দেব। তুমি তার সাহায্যে মেসেজটাকে এনকোড করে আমাকে ফেরত পাঠাবে। এই মেসেজটা অন্য কারুর হাতে গেলেও চিন্তা নেই, সে এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না, কারণ তার কাছে এটা পড়ার জন্য দরকারি অন্য 'প্রাইভেট কি'টা নেই। ওটা শুধু আমার কাছেই আছে আর তার সাহায্যে আমি তোমার মেসেজটা পড়তে পারব। এই নীতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের যাবতীয় RSA অ্যালগরিদম।

কিছুদিন আগে অপরাজিতকে একটা সায়েন্স ফেস্টিভালে এই এনক্রিপশনের বিষয়ে বলতে বলা হয়েছিল। সেখানে ছিল জুনিয়র স্কুলের একদল ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে একজন এসে শেষে সরাসরি বলেছিল যে সে কিছুই বোঝেনি। সত্যিই তো এসব শক্ত কথা কি স্কুল লেভেলে বোঝা সম্ভব?

তার জন্যও অপরাজিত বলেছিল,—ধরো আমার ঘরের দামি জিনিসপত্র সব একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলাম। সে ঘরের দরজায় যে তালা, তার দুটো চাবি, দুটোই না থাকলে কেউ তা খুলতে পারবে না। তাই একটা চাবি চুরি গেলেও ক্ষতি নেই। কারণ অন্য চাবিটা শুধু আমার কাছেই আছে। এখানেও ঠিক সেরকম।

এই 'পাবলিক কি' গুলো আসে দুটো খুব বড় মৌলিক সংখ্যাকে গুণ করে। যে দুটো মৌলিক সংখ্যা গুণ করে এই বড় সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তারা হয় 'প্রাইভেট কি', শুধু আমার কাছে থাকা রহস্য উন্মোচনের চাবি। এই 'প্রাইভেট কি' বার করা আজকের সবথেকে শক্তিশালী কম্পিউটারের পক্ষেও অসাধ্য। কিন্তু কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পিড রোজ বাড়ছে। তাই দরকার পড়ছে আরও বড়, আরও বড় মৌলিক সংখ্যার। আর সেখানেই অপরাজিতের সূত্র আগামী দিনে সারা পৃথিবীর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

এর মধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলা সামান্য ফাঁক থাকায় বাইরের বৃষ্টির শব্দ ভেতর অব্দি আসছিল। বাইরে থেকে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। অনেকটা গন্ধরাজের মতো এর গন্ধ। দেশের কথা মনে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে অর্ধেক জীবন দেশের বাইরে কেটে গেল।

এ আবিষ্কারের পেছনে যে কত মাস কত বছর কেটে গেছে তা অপরাজিতই শুধু জানে। সবাই যখন ছুটির দিনগুলোতে বেড়াতে চলে যেত বাড়ির সবার সঙ্গে, তখনও মুখ গুঁজে এ-রহস্যের অলিগলিতে হারিয়ে গেছে অপরাজিত। এ এক অজানা ভাষা। এ ভাষা একবার জানতে পারলে—তখন খ্যাতি, অর্থের মোহ সামনে আসে না।

কফি খেতে খেতে এসবই ভাবছিল অপরাজিত। চিন্তা ব্যাহত হল। সেক্রেটারি ভিকি এসে জানাল একজন ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভিকি কার্ডটা এগিয়ে দিল। কার্ডটা দেখে একটু অবাক হল অপরাজিত। কোনও নাম নেই। শুধু লেখা 'চিফ সায়েন্টিস্ট নিউ লাইফ'। এনার কি দরকার থাকতে পারে ওর সঙ্গে? যাই হোক দেখা করতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। এমনিতেও গত কয়েকদিন এত জন দেখা করতে এসেছে, এত জন শুভেচ্ছাবার্তা দিতে এসেছে, এক্ষেত্রেও যে সেরকমই কিছু হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩

দু'মিনিট বাদে ভিকি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মাঝারি হাইট। চোখে গোল চশমা। চুল দাড়ি সাদা। ট্যান্ড চামড়া। দেখে মনে হয় বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে। সে তুলনায় যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। গায়ে দামি নীল সুট, আকাশি টাই।

হ্যা-আ-আ-লো—একটা অদ্ভুত সুরেলাভাবে কথাটা বলে ভদ্রলোক অপরাজিতর করমর্দন করল। এমন ভাবে 'হ্যালো' বলল যে অন্য কেউ বললে মনে হত, কেউ যেন ইয়ার্কি করছে।

তার পরে অপরাজিতর টেবিলের উলটো দিকের একটা চেয়ার টেনে ভদ্রলোক বলতে শুরু করেন—আপনার কাজে আমি মুগ্ধ। আপনি যা বললেন তার আসল তাৎপর্য বুঝতে

লোকেদের বহুবছর লেগে যাবে। এটা একটা দু-হাজার বছরের রহস্যের সমাধান শুধু নয়, এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তার থেকে আরও অনেক বেশি।

দুটো কফি আনতে বলে দিল অপরাজিত। ভদ্রলোককে বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছিল ওর।

ও বলে উঠল,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি তো শুধু মৌলিক সংখ্যা বার করার একটা সূত্র বলেছি একটা প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সত্যিকারের প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এই প্যাটার্নটা কি অন্য কিছু বোঝায়? এ যেন কোনও অজানা মহাজাগতিক সংকেত—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অপরাজিত। ফের বলে উঠল,—তা আপনি—মানে আপনার নামটা তো কার্ডে দেখলাম না।

—এটাই কি ঠিক নয়? একজন বিজ্ঞানীর পরিচয় তার কাজে। তার নাম কী তাতে কী এসে গেল? তার কাজ শুধু বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তা আপনার জন্য বলি। আমার নাম ডেভ। আমি 'নিউ লাইফ' সংস্থার অধিকর্তা ও চিফ সায়ান্টিস্ট। সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। আমি চাই আপনি আমাদের সংস্থায় মুখ্যপরামর্শদাতা ও পার্টটাইম ডিরেক্টার হিসেবে যোগ দিন।

—আমি? তা আপনাদের গবেষণার মূল বিষয়?

—আমরা নতুন মাইক্রোবায়োলজিকাল বা আণুবীক্ষণিক প্রাণ তৈরির চেষ্টা করছি।

—মানে? নতুন প্রাণসৃষ্টি। আমাদের হাতে তৈরি হবে নতুন আণুবীক্ষণিক প্রাণী? যেমন বিজ্ঞানী ভেন্টার-এর টিম সাম্প্রতিককালে করেছেন?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ভেন্টার খুব কম সংখ্যক জিন আছে এরকম কিছু ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে দরকারি জিনগুলো বেছে নেন। একবারে সেটা সম্ভব হয়নি। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, মূলত প্রসেস অফ এলিমিনেশনের ভিত্তিতে ওনারা কৃত্রিমভাবে কীভাবে প্রাণ তৈরি করা যায় তার সন্ধান পান। মাইক্রোব তৈরি করেন।

উনি কিন্তু জানতেন না, যে কৃত্রিমভাবে প্রাণ—ওই মাইক্রোব তৈরি করার জন্য ঠিক কোন জিনটা থাকা দরকার, আর তা কী জন্য জরুরি।

আমাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যে কৃত্রিম মাইক্রোব তৈরি করেছি, তার প্রত্যেকটা জিন কীসের জন্য তা আমরা জানি। অন্ধকারে হাতড়ানো নয়। এবার আমরা তার পরবর্তী পর্যায়ে কাজ করছি।

—পরবর্তী পর্যায়? মানে?

—আমরা শুধু কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করতেই চাই না, আমরা চাই তাদেরকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করতে।

যেরকম চাই, ঠিক সেরকম ভাবে যেন আমাদের হাতে তৈরি এই প্রাণী কাজ করে। ওরা থাকবে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু নামকরা জেনেটিক সায়েন্টিস্ট আছেন, নামকরা সিনথেটিক বায়োলজিস্টরা, বায়োটেকনলিজিস্টরা আছেন। এখন শুধু আপনার সাহায্য পেলেই হবে।

অবাক হয়ে বলে উঠল অপরাজিত—কিন্তু আমি তো বায়োলজিস্ট নই। আমি কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।

হেসে উঠল ডেভ। বলে উঠল,—সে ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন না। এটুকু বলব প্রাণের সন্ধান অনেকটা কোড ব্রেকিং-এর মতো। ধরুন আপনাকে হাজার হাজার বুদ্ধিমান প্রাণী, তাদের চরিত্র আর তাদের জিনের গঠন দিয়ে দেওয়া হল। এবার আপনার কাজ হল তার ভিত্তিতে বোঝা কোন জিন ঠিক কীভাবে কাজ করে। এটা বোঝার জন্য দরকার আপনার স্কিল, আপনার প্যাটার্ন বোঝার ক্ষমতা।

একটু থামল ডেভ।—আমি জানি আপনি অর্থের জন্য একাজ করবেন না। না হলে বলতাম, আমরা যা করতে চলেছি তা আমাদেরকে পৃথিবীর সবথেকে ধনী করে তুলতে পারে। আমরা আমাদের নিজস্ব জিন ব্যাঙ্ক তৈরি করতে পারি। আর প্রয়োজন মতো তা দিয়ে নতুন নতুন প্রাণী তৈরি করতে পারি।

এভাবে তৈরি একটা মাইক্রোব দিয়ে পরিবেশ থেকে ক্ষতিকর গ্যাস সরিয়ে নিতে পারি, কোনও দামি ড্রাগ তৈরি করতে পারি, এমনকী যুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারি। এ আবিষ্কারের মূল্য আর চাহিদা কী হতে পারে ভাবতে পারছেন? তবে সবার আগে আমার লাগবে আপনার মতো সেরা ব্রেন, কোড ব্রেকিং ক্ষমতা আর অঙ্কের পারদর্শিতা। আমরা দেখেছি প্রাণ তৈরির রহস্যের মূলে আছে এই মৌলিক সংখ্যা। পরে সেকথা বলব।

একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠল,—যদি আপনি সফল হন, পৃথিবী আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে আপনার এই আবিষ্কারের জন্য। অনেক তো বললাম। এবার আমাদের সঙ্গে আপনার কাজ করতে কোনও আপত্তি নেই তো?

চুপ করে বসে থাকল অপরাজিত। জানাল—আরেকটু সময় চাই ভাবার জন্য।

—হ্যাঁ, তা নিন না। আমি আপনাকে কাল ফোন করব। আপনি সবে ঘাসে পা ফেলেছেন। এবার আপনার ছোটার সময়, ঘরে বসে থাকবেন না।

এরকম অত্যাধুনিক বায়োটেকনোলজি ল্যাব আগে কখনও দেখেনি অপরাজিত। চারদিকে অত্যাধুনিক নানান যন্ত্রের ছড়াছড়ি। লন্ডনের উপরেই যে এরকম একটা ল্যাব থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। বেশ কিছু রোবট কাজ করছে।

একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখতে বলল ডেভ।

—কী দেখছেন?

—ছোট ছোট অনেকগুলো টিউব। নড়ছে যেন।

—এটা কি বলতে পারবেন?

ঘাড় নাড়ল অপরাজিত। জানে না।

—এটাই হল ভেন্টারের পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি সেই মাইক্রোব সিন 3.0, যার মধ্যে মোটে 473টা জিন আছে। 'মাইকোপ্লাজমা মাইকয়েডস' নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার থেকে বিভিন্ন জিন এক এক করে বাদ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ভেন্টারের টিম দেখেন যে ওই 473টা জিন থাকলে তা দিয়ে একটা নতুন প্রাণ তৈরি করা সম্ভব।

নাম দেন সিন 3.0, কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো জিনের কী কাজ, সেটা উনি আদৌ বোঝেননি। তবে না থাকলেও দেখেছেন সেক্ষেত্রে সেই মাইক্রোবে প্রাণ সৃষ্টি হয় না।

বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে অনেক হইচই শুরু করে। বলা হয় মানুষ প্রথমবার কৃত্রিমভাবে প্রাণ তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি যদি প্রাণ তৈরি করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা জিনের অর্থ বুঝে তা দিয়ে তৈরি করতে হবে। যেমন আমি করেছি 473টা জিন দিয়ে। এর থেকে কম জিন দিয়ে প্রাণ তৈরি করা যায় না, সেটা আমি দেখেছি।

—মৌলিক সংখ্যা। 473 হল মৌলিক সংখ্যা।—আস্তে আস্তে বলে উঠল অপরাজিত।

—একদম ঠিক। এবার বুঝতে পারছেন মৌলিক সংখ্যা কত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে-ক'টা মাইক্রোব তৈরি করেছি শুধু দরকারি জিন মিলিয়ে, তাদের সবক্ষেত্রেই দেখছি, তাদের জিন সংখ্যা মৌলিক। 473 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয়। যেটা প্রমাণ করে যে ভেন্টার সিন 3.0 মাইক্রোবটা আরও কম সংখ্যক জিন দিয়েই তৈরি করতে পারতেন।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, যে প্রাণীদের মধ্যে যৌগিক সংখ্যার জিন থাকে, শিওরলি তাদের মধ্যে কিছু অদরকারি জিন আছে। তা যা বলছিলাম। আমরা যে মাইক্রোব তৈরি করেছি, তার প্রত্যেকটা জিন কী কাজ করে তা আমার জানা। কিন্তু এবার আমরা এর পরের ধাপে যেতে চাই, যেখানে আমি যা চাই, ঠিক সেই ক্ষমতাই থাকবে এই মাইক্রোবের মধ্যে।

আর তাই এর উপরে আমরা আরও বিভিন্ন জিন ঢুকিয়ে দেখছি, তাতে কী হয়। ধরো আমরা চাই একটা মাইক্রোব আগ্নেয়গিরির মধ্যে বেঁচে থাকুক। সেক্ষেত্রে কী জিন লাগবে সেটা যাতে আমরা বার করে, এই মাইক্রোবকে ঠিক সেই ক্ষমতা দিতে পারি, সেটাই হবে আমাদের চেষ্টা। আর সেখানেই আপনার মতো অসাধারণ গণিতজ্ঞর সাহায্য দরকার।

একটা কম্পিউটারের কাছে এগিয়ে গেল ডেভ। ফের বলে উঠল—আমরা জেনোম ডিজাইন করি কম্পিউটারে আর তার পরে তা টেস্ট টিউবে রাখি। আমরা হাজার হাজার মাইক্রোবের ব্যবহার, চরিত্র, ক্ষমতা আর তাদের মধ্যে কী জিন আছে, তা দেখে বিভিন্ন ধরনের জিন বার করার চেষ্টা করছি। ঠিক কোনটার জন্য কী হয়, সেটা বার করা খুব শক্ত কাজ আর তাই সে কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না। আমার ধারণা আপনার সাহায্যে সে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি এগোবে।

চ্যালেঞ্জটা হল এ ধরনের বেসিক মাইক্রোব থেকে পরের ধাপের উন্নত প্রাণীতে যাওয়া। তার জন্য অবশ্য মানুষের মতো 20000 জিন দরকার হবে না, আমার বিশ্বাস কম জিনেই হবে।

—তা যত জিন থাকে, সে প্রাণী কি তত বুদ্ধিমান হয়?

—না, না। একেবারেই না। প্যারিস জাপানিকা বলে একটা খুব রেয়ার জাপানি ফুল আছে, যার জিনের সংখ্যা মানুষের 50 গুণ। তাই জিনের সংখ্যা বেশি মানেই যে সে প্রাণী বেশি বুদ্ধিমান সেটা ভাবার কিছু নেই। তার একটা কারণ একটা বড় অংশ জেনাম (genome) করে না। জিনের সংখ্যা মৌলিক না হলেই বুঝতে হবে তার মধ্যে অনেক অদরকারি জিন আছে। কী রহস্য তা বুঝতে পারছেন তো? ঈশ্বর হল সবথেকে বড় গণিতজ্ঞ।—বলে ডেভ হেসে উঠল।

একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠল,—কী ঠিক করলেন? আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন তো?

অপরাজিত মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভ ভারি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল,—রাইট ডিসিশন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আপনি এ পর্যন্ত যা করেছেন, তা সবই প্রায় লজিকের উপর নির্ভর করে। এবার কিন্তু আপনাকে এই লজিকের জগতের বাইরে যেতে হবে। শুধু কল্পনাই আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে।

চলুন, আপনাকে ইভলিউশনারি বায়োলজিস্ট স্যামের সঙ্গে আলাপ করাই। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে জীবজগতে যা পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের এই 'নতুন প্রাণ' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাকে কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক পেছনে ফেলে দিতে পারে।

—কিন্তু তাতে এমনও তো হতে পারে যে আমরা যা চাই, তার থেকে অন্যরকম কোনও প্রাণী তৈরি হয়ে গেল। আর আমরা তার উপরে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারালাম।

—হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। তবে আমার মনে হয় আমরা সেই জিনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, যা দিয়ে কোনও প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সেটাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরাই আমাদের ঈশ্বর।

কথা বলতে বলতে অপরাজিতকে নিয়ে ল্যাবের ভেতরদিকে ডেভ এগিয়ে গেল।

৫

বাইরে বেশ কয়েকবার কলিংবেলের আওয়াজ। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুচরিতা দেখল বাবা এসেছে। কিন্তু কীরকম উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা। উশকোখুশকো চুল। গাড়িটা দূরে কোনওরকম পার্ক করে রাখা। যেন কোনও কিছু তাড়া করেছে পেছনে।

তাড়াতাড়ি দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল সুচরিতা। উপর থেকে মা'র গলা এল—কে? কে এল দেখত।

—বাবা।

—সে কী? এত তাড়াতাড়ি? এতবার বেল দিচ্ছে সমানে।

এর মধ্যে আরও দুবার বেল বেজে উঠল।

ঘরে ঢুকেই অপরাজিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—একটু কথা আছে। তাড়াতাড়ি এসো।

—দাঁড়াও, একটা কাজের মধ্যে আছি। পাঁচ মিনিট দাও।

—না, এখনই এসো। খুব জরুরি আলোচনার দরকার আছে।

অবাক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কেয়া।

—কী ব্যাপার?

—আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। ভারতে।

—সে কী? কেন? সুচরিতার তো সামনেই জি সি এস ই পরীক্ষা। এখন আমরা কী করে যাব?

একটু থেমে অপরাজিত বলে উঠল,—তুমি কি চাও আমি জেলে যাই? বা আমাকে কেউ মেরে ফেলুক?

—মানে? কী হয়েছে?

একটু থামল অপরাজিত। গম্ভীর গলায় বলে উঠল,—আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। জানি না দেশে গিয়েও রেহাই পাব কিনা। কিন্তু অন্তত কিছু দিন সময় পাব, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ

করার।

—তা কী করেছ তুমি?

—আমি বেশ কয়েকমাস আগে একটা সংস্থার অনুরোধে জাল ইউরো নোট শনাক্তকরণের জন্য একটা যন্ত্র তৈরি করার রিসার্চের কাজ করেছিলাম। লাইট সার্কিট, আল্ট্রাভায়োলেট রে, ম্যাগনেটিক ও লেসার সেন্সরের সাহায্যে নোটের উপরে থাকা প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে কীভাবে একটা জাল নোটকে কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আলাদা করা যায়, সেটাই বোঝা ছিল আমার কাজ। তার উপরে ভিত্তি করে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বার করার লজিকও আমি আবিষ্কার করি। কিন্তু আমি এটা কখনও ভাবিনি যে আমার বার করা লজিক ঠিক উলটো কাজে ব্যবহার হবে। সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে আরও উন্নত জাল নোট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এমন জাল নোট যা কোনও যন্ত্রে ধরা পড়বে না।

—তা তুমি কী করে জানলে যে তোমাকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে?

—জানি না, কালকে এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়ে দেখি আমাকে টাকা তুলতে দিচ্ছে না। আজকে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। সেখানেও টাকা তুলতে পারলাম না। কাউন্টারের লোকটার মুখ দেখে বুঝলাম সে-ও কিছু বুঝছে না। আমাকে শুধু বলল,—কিছু একটা মেসেজ পাচ্ছে। তাই ও আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে দিতে পারছে না।

ছেলেটা নেহাত ট্রেনি ছিল, বাচ্চা ছেলে, তাই বুঝতে পারেনি। আমি এক ঝলক পাশ থেকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কী ঘটনা। আমার অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটির কারণে MI 6 থেকে ব্লক করেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু স্যামকে ফোন করলাম। ও তো MI 6-এ আছে। কী হতে পারে জানার জন্য। ও এমনিতে বলত না। কিন্তু আমাকে বহু বছর ধরে ভালো করে জানে বলেই বলল। যা জানাল তা ভারি মারাত্মক।

জাল টাকা তৈরির একটা চক্র কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে। আমার নামও নাকি ওতে জড়িয়ে আছে। আর তাই আমার নাম এখন সন্দেহভাজন অপরাধীদের তালিকায় ঢুকে গেছে। স্যাম না থাকলে হয়তো জানতেও পারতাম না। আমাকে গ্রেফতার এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওরা হয়তো আমার বিরুদ্ধে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করছে।

একটু থামল অপরাজিত। ফের বলে উঠল,—আসলে এর পেছনে কে আছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ওরা আমার গবেষণার অপব্যবহার শুরু করেছিল। আমি আগে তা বুঝতে পারিনি। ওদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলার পরে আর কাজ করব না বলাতেই ওরা আমাকে ফাঁসাতে

চাইছে, যাতে আমি আবার ওদের কাছে ফিরে যাই। বাইরের আর কেউ যেন এটা না জানতে পারে।

—কে? কারা এরা?

—এদের প্রধান ডেভ। থাক, তোমাদের আর জেনে দরকার নেই। পরে বলব,—আপাতত আমরা এখনই দেশে ফিরে যাব। ওখানে থেকেই প্রমাণ করব যে আমি এ বিষয়ে কোনওভাবে জড়িত নই। এ বিষয়ে সত্যি বুঝতে পুলিশের বেশি সময় লাগবে না। তখন কিছুদিন পরে ফিরে আসা যাবে।

—কবে এখান থেকে দেশে ফেরার কথা ভাবছ? পরের মাসে?

—পরের মাসে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ। আজকেই। এখনই আমরা বেরিয়ে যাব। স্যাম বলল কালকের পরে এখান থেকে বেরোনো শক্ত হয়ে যাবে। আজকেই আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তার পরে দেখা যাক।

৬

সকালে চা-এর সঙ্গে খবরের কাগজ পড়াটা অনিলিখার বহুদিনের অভ্যেস। তবে আজকাল বেশিরভাগ খবরেই বিশেষ আগ্রহ পায় না অনিলিখা। যত নেগেটিভ খবর। আচ্ছা, দেশের সব লোকজন কি এতটাই খারাপ। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ তো ভালো কাজ করছে। কই তাদের নিয়ে তো আর খবর থাকে না কাগজে। ভালো লোকেদের কাজের খবর আরও পাঁচটা লোককে ভালো কাজ করতে উৎসাহ দেবে।

যদি অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে এখানকার খবর দেখে, সে ভাববে পৃথিবীতে খুন-জখম-হিংসা আর সিনেমা ছাড়া আর কিছু হয় না।

এসব সত্ত্বেও রোজ কাগজটা না পড়লে যেন সকালটা শুরু হয় না। আজকের কাগজের প্রথম পাতার দিকে চোখ পড়তেই অনিলিখা চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অপরাজিত বসু মারা গেছেন তার কলকাতার বাড়িতে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 55 বছর। মৌলিক সংখ্যার উপরে ওনার বিখ্যাত গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে কাগজে।

এক বছর আগে বেশ কিছুদিন ধরে ওনার নাম বেশ কয়েকটা কাগজের শিরোনামে ছিল। মৌলিক সংখ্যার একটা জটিল সমীকরণ উনি তৈরি করেন, যা দিয়ে সব মৌলিক সংখ্যা অনুমান করা সম্ভব। দেশবিদেশে বেশ কিছু পুরস্কারও পান এজন্য। অনিলিখার সঙ্গে অপরাজিত বসুর পরিচয় অবশ্য এই সূত্রে নয়। অনেক দিন আগে থেকেই ওনার কাজের সঙ্গে অনিলিখা পরিচিত। ওনার মতো এত ভালো কোনও গণিতজ্ঞ ভারত কেন সারা পৃথিবীতে

বিরল। অপরাজিতবাবুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখাও হয়েছে অনিলিখার। ভদ্রলোক তো ইংল্যান্ডে ছিলেন, কলকাতায় এলেন কবে?

যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে ওনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করা শক্ত হল না অনিলিখার পক্ষে। ঠিক করল একদিন অফিস ফেরত ওনার বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবে।

পরের কয়েকদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় পেল না। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে এক শনিবার সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল অনিলিখা। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছে অপরাজিত বসুর পুরোনো বাড়ি। বনেদি যৌথ পরিবার। এই বাড়িতে অপরাজিতের দুই ভাই, তাদের পরিবারও থাকেন। নিরিবিলি কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। কেউ না কেউ সারাক্ষণ ঘরে আসছে। তবু শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে ওনার মেয়ে ও স্ত্রীকে আলাদাভাবে পাওয়া গেল।

মেয়ের নাম সুচরিতা। হঠাৎ করে দেখলে বিদেশিনী মনে হয়। খুব ফরসা, লম্বা অ্যাথলেটিক চেহারা। বাড়িতে একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্টের উপরে টি-শার্ট পরে আছে। অপরাজিতবাবুর স্ত্রী একটা সাদা শাড়ি পরে আছেন, যদিও পরার ধরন দেখলে বোঝা যায়, শাড়ি পরতে অভ্যস্ত নন। বহুদিন বাইরে ছিলেন। এখন এখানে এসে কলকাতার অনিয়মের জীবনে ধাতস্থ হতে যে একটু সময় লাগছে, সেটা ওনার কথাবার্তায় পরিষ্কার বোঝা যায়। অনিলিখার নামের সঙ্গে ওনারা দুজনেই পরিচিত। অপরাজিতবাবুও নাকি অনেক সময় অনিলিখার কথা বলতেন।

তা যাই হোক, কথায় কথায় অনিলিখাই বলে উঠল,—হঠাৎ করে এত কম বয়সে যে উনি মারা যাবেন, ভাবাই যায় না। উনি তো শেষ অব্দি খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন। শরীর খারাপ, এরকমও কখনও শুনিনি।

কেম্ব্রিজে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করতেন শুনেছি। তা হঠাৎ করে কী হল?

অনিলিখা লক্ষ করছিল অপরাজিতবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ এ ব্যাপারে কথা বললেও ওনার মেয়ে সুচরিতা শুরু থেকেই চুপচাপ।

অনিলিখার মনে হল সুচরিতা যেন কিছু একটা বলতে চায়। দ্বিধা করছে। সুচরিতাকে লক্ষ করে অনিলিখা বলে উঠল—এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে চাও? আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারো। আমি কাউকে জানাব না। সত্যি বলতে কী ওনার মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে হয়নি, তা তোমরা সরাসরি না বললেও, তার আভাস ইতিমধ্যেই তোমাদের কথায় পেয়েছি।

সুচরিতা একবার মা'র দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ইংরেজি টানে বাংলায় বলে উঠল,—আমার মনে হয় না আমার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। আমরা হঠাৎ করে ইংল্যান্ড থেকে

চলে আসি। বলতে পারেন এক দিনের মধ্যে। আসলে বাবা হঠাৎ জানতে পারে যে বাবাকে একটা জাল নোটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে পুলিশ সন্দেহ করছে।

—উনি? জাল নোটের ব্যবসায়?

—বুঝতেই পারছেন এটার মধ্যে যদি কোনওভাবে বাবার মতো মানুষের যুক্ত থাকার কোনওরকম চান্স থাকত, তাহলে আমিও একথা আপনাকে বলতাম না। বাবা ওর সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত থাকতে পারে না। কেউ ইচ্ছে করে বাবাকে এ ব্যাপারে ফাঁসিয়েছিল। কিন্তু সেই অপরাধে ধরা পড়ার ভয়ে, দুর্নাম হওয়ার ভয়ে বাবা সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসে। এখানে এসে কিছু নামকরা আইনজ্ঞর সঙ্গে এ ব্যাপারে কী করা যায়, তা নিয়ে পরামর্শ নিচ্ছিল। ভেবেছিল যে এর সঙ্গে যুক্ত নয় তা শিগগিরি প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু সেই সময়টুকু বাবা শেষ পর্যন্ত পেল না।

—তা ওনার মৃত্যুর কারণ কী বলছে ডাক্তার? ভাইরাল ফিভার থেকে?

সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে সুচরিতা বলে উঠল,—এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলি। আমি আর বাবা মেট্রোতে করে স্প্লানেড থেকে ফিরছিলাম। ট্রেনে ভিড় ছিল। হঠাৎ বাবার পায়ে যেন ছুঁচের মতো কিছু একটা বিঁধল। বাবা তখন আমায় কিছুই বলেনি। স্টেশনে নামার পরে বাবা আমাকে একটু দেখতে বলে। দেখি পায়ের মোজা যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু উপরে, হাঁটুর একটু নীচে, সামান্য লাল দাগ। ভেবেছিলাম কোনও পোকা কামড়েছে। তখন বাড়ি ফিরতে তেমন কোনও অসুবিধেও হয়নি। বাড়ি আসার পর বমি শুরু হয়। খুব জ্বরও আসে। আর ভোররাতের দিকে আমরা ডাক্তার ডাকি। উনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু সে সময় আর আমরা পাইনি। তার আগেই বাবা মারা যায়।

—তা ডাক্তার দেখে কিছু সন্দেহ করেনি?

—না, ডাক্তার সেরকম কিছু বলেনি। এভাবে হঠাৎ জ্বরে মৃত্যুর কারণও বুঝতে পারেনি। আমরাও ভয়ে ভয়ে ছিলাম, যে বাবার তো মৃত্যু হয়েছেই, এসবের মধ্যে দিয়ে আবার বাবার নামে যে অভিযোগটা উঠেছিল সেটা জানাজানি না হয়ে যায়। বাবার মতো মানুষের কোনও বদনাম হোক, এটা আমরা চাইনি। তাই এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। তা আপনার কি মনে হয় অনিলিখাদি? বাবাকে কি খুন করা হতে পারে? মেট্রোর ওই ঘটনার সঙ্গে কী বাবার মৃত্যুর কোনও যোগাযোগ আছে?

—কী জানি? হতেও পারে। পোস্ট মর্টেম করলে হয়তো জানা যেত, ওনার রক্তে কোনও বিষ ছিল কিনা। এরকম তো হতে পারে যে মেট্রোতে ওনার পায়ে কোনও বিষ ইনজেক্ট করা হয়েছিল।

—কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে কীভাবে বিষ ঢোকাবে? আর বাবা তা টের পাবে না?

—সে অনেক ভাবে করা সম্ভব। জুতোর সামনে ধারালো কিছু লাগিয়ে, ছাতা দিয়ে, আরও নানান ভাবে ইনজেক্ট করা যেতে পারে। এরকম আগেও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে কোনও সন্দেহজনক কাউকে দেখেছিলে আশেপাশে?

—সেদিন বেশ ভিড় ছিল। আর বাবা তো সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেওনি। আমি একটু দূরে লেডিজ সিটে বসেছিলাম। নামার পরে বলেছিল। তাই খেয়াল করিনি। তা এরকম কোনও ঘটনা কি আগে কখনও ঘটেছে?

—হ্যাঁ, সেরকম অনেকই হয়তো হয়েছে। বেশিরভাগ সময় এই সব গুপ্ত হত্যার কথা জানাও যায় না। তবে একটা ঘটনা তো অনেকেই জানে।

যদ্দুর মনে পড়ছে 1978-এর সেপ্টেম্বরে জর্জি মারকভ নামের এক প্রবাসী বুলগেরিয়ান লন্ডনে এভাবে খুন হয়েছিলেন। উনি একটা বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবিসিতে কাজ করতেন। হঠাৎ ওনার মনে হয় পায়ের উরুতে বোলতার মতো কিছু একটা কামড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন ওনার পাশেই একজন লোক। রাস্তায় পড়ে যাওয়া ছাতা তুলছে। তখন কোনও সন্দেহ হয়নি মারকভের। রাতে ওনার জ্বর আসে। বেশ কয়েকবার বমিও হয়। শেষে ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সব রকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও চারদিন বাদে উনি মারা যান।

পরে ওনার পায়ের উরুর কাছে একটা ছোট ফুটো পাওয়া যায়। সেখানে একটা খুব ছোট প্যালেটও পাওয়া যায়। প্যালেটের মধ্যে ছোট ছোট ফুটো ছিল। সম্ভবত সেখানে রাইসিন-এর মতো কোনও মারাত্মক বিষ কম পরিমাণে রাখা ছিল। আর ওখান থেকে আস্তে আস্তে ওই বিষ বেরিয়ে এসে রক্তে মিশেছিল।

পরে জানা যায় জর্জি মারকভকে মারার পেছনে তখনকার বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের হাত ছিল। ওনাকে রাজনৈতিক কারণে মারা হয়, কারণ উনি এভাবে বিষ প্রয়োগে কীভাবে বুলগেরিয়া সরকার রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের গোপনে হত্যা করছে তা নিয়ে লিখেছিলেন।

এটাই একমাত্র কেস নয়। এরকম হয়তো আরও অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। কিন্তু কখনও তা প্রকাশ্যে আসেনি।

কথা শুনতে শুনতে কেয়া দেবী ও সুচরিতা দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। দুজনের চোখেই জল। কেয়া দেবী কিছু একটা বলতে গেলেন, শোনা গেল না।

সুচরিতা বলে উঠল,—কিছু করা যায় অনিলিখাদি? ওরা যে শুধু বাবাকে মেরেছে তাই না, বাবাকে একটা বড় চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে ওদের জন্য। ওরা আমাদের সব সুখ শান্তি

নষ্ট করে দিয়েছে। শেষ দিকে দেখেছি বাবা কোনও কাজও করতে পারত না এই অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে। আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি পারবেন এব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে? আপনার তো এত জানাশোনা।

—অবশ্যই চেষ্টা করব। এত বড় অন্যায় যারা করেছে, তাদেরকে তো আর এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তবে এর পেছনে একটা খুব বড় শক্তিশালী গ্রুপ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। সবই যদিও অনুমান, তবু এ ধরনের চক্রান্তে ওনার মতো একজন বিশ্বের অগ্রগণ্য ম্যাথামেটিশিয়নকে জড়ানো, তার পরে অন্য দেশে এসে ওনাকে হত্যা করা, এসব তো আর ছোট কোনও গ্রুপের কাজ হতে পারে না। ওনাকে আমি দেখেছি, ওনার মতো মানুষের শত্রু হওয়াও খুব কঠিন কাজ। তোমাদের কি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়?

—ইংল্যান্ড থেকে আমরা যেদিন হঠাৎ ফিরে আসি সেদিন বাবা ডেভ বলে কারুর কথা বলেছিল। কিন্তু তার বেশি আর কিছু বলেনি। বাবা এমনিতে কাজের কথা আমাদের সঙ্গে একদমই বলত না।

—আচ্ছা, বাবা মারা যাওয়ার আগে এখানে, মানে সেদিন রাতে তোমাকে কিছু বলেছিল? —অনিলিখা সুচরিতাকে ফের প্রশ্ন করে।

—না, শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। তবে জ্বরের মধ্যে কিছু একটা যেন বলতে চাইছিল। শেষের দিকে মাথাও ঠিক ছিল না। তা না হলে এত কথা বলার থাকতে, আমাকে একটা সুডোকুর বই শেষ মুহূর্তে ধরিয়ে দেয় আর বলে যত্ন করে রাখতে।—সুচরিতা বলে ওঠে।

—বইটা আছে? একটু দেখি।

—আমি আসলে কখনও সুডোকু খেলিনি আগে। তাই বইটা সরিয়ে রেখেছিলাম। দেখি পাই কিনা।

—একটু খুঁজে দেখো। আমার ওটা অবশ্যই লাগবে। আমি নিশ্চিত ওটা তোমাকে তোমার বাবা শুধু শুধু দেননি। নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলার ছিল ওনার। যেটা উনি ইচ্ছে করে মুখে বলে যেতে চাননি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে। আর বিশেষ করে যখন সুডোকু খেলো না, তখন তো শুধু শুধু উনি এটা দেবেন না।

খানিক বাদে সুচরিতা একটা পাতলা হলুদ রঙের বই নিয়ে আসে। উপরে লেখা 'অ্যাডভান্সড সুডোকু'। বইটা নেড়েচেড়ে খানিকক্ষণ ধরে দেখল অনিলিখা।

—কি কিছু পেলেন?

—বলছি। তার আগে বলো তোমার বাবা কি সুডোকু ভালোবাসতেন?

—বাবার এমনি ধাঁধার উপরে খুব ঝোঁক ছিল। তবে খুব একটা যে সুডোকু খেলত তা নয়। এখানে আসার পরে বরঞ্চ এ বইটা নিয়ে কয়েকবার বসে থাকতে দেখেছি।

—জিগ্যেস করছি কারণ এ বই-এর মধ্যে তোমার বাবা কিছু কিছু সংখ্যা লিখে মার্ক করেছেন। কিছু সংখ্যাকে আলাদা করে গোল দাগ দিয়েছেন। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, অনেক জায়গায় একটা ঘরের সঙ্গে পাশের ঘরের নাম্বার নিয়ে দুটি সংখ্যা ঘিরে দাগ দিয়েছেন। শুধু সুডোকু সলভ করার জন্য তো এটা কোনওভাবেই দরকার হতে পারে না। এটার পেছনে একটাই কারণ থাকতে পারে, তা হল ওনার 253 বা 361-এর মতো তিন অঙ্কের কিছু সংখ্যার দরকার হয়ে পড়েছিল। একটা কাগজ দাও তো। আমাকে একটা জায়গায় এই সংখ্যাগুলো আলাদা করে একটু লিখে রাখতে হবে।

সুচরিতা একটা অন্য ঘর থেকে কয়েকটা সাদা কাগজ নিয়ে এল। অনিলিখা গোল করা সংখ্যাগুলো একটা কাগজে পরপর সেখানে লিখে ফেলল। বেশ কিছু সংখ্যা। তবে কোনওটাই তিন অঙ্কের থেকে বড় নয়। সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনও সিকোয়েন্স নেই। র‍্যান্ডম নাম্বার। কিছু সংখ্যা আবার দুবার করে লেখা।

12, 23, 29, 11, 16, 46...253, 78, 91, 23...এরকম।

কিছুই বুঝতে পারল না অনিলিখা। খুব শক্ত সিকোয়েন্স হলেও চটজলদি তা ও বার করে ফেলত। কিন্তু না, এটা তা নয়। অন্য কিছু।

উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল অনিলিখা। পাশে একটা বুক কেস আছে। নানান ধরনের বই। বেশিরভাগ বাংলা বই। মাঝে দু-একটা ইংরেজি বই।

—এ বইগুলো তো এখানে আগেই ছিল, তোমরা এবার আনোনি, তাই তো?

—হ্যাঁ, আমরা এবারে তাড়াতাড়িতে কিছুই আনতে পারিনি। সময়ই পাইনি গুছিয়ে আনার। ওখানে আমাদের এত ভালো ভালো বই ছিল। সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। শুধু দু-একটা বই—যেগুলো বাবার খুব প্রিয়, সেগুলো বাবা আলাদা করে নিয়ে এসেছিল।

আলমারি ঠাসা প্রচুর বই। কিন্তু তার মধ্যে ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা খুব কম। গীতাঞ্জলির একটা ইংরেজি অনুবাদ বুককেসের তৃতীয় তাক থেকে উঁকি মারছে। ওটার দিকে দেখিয়ে অনিলিখা বলে উঠল,—এটা কি এবারে এনেছিলেন? দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা পরে রাখা হয়েছে।

—হ্যাঁ, ওটা আসলে বাবার খুব প্রিয় বই। আমাকেও বারবার পড়তে বলত। ওই একটা বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

বইটা বার করে পাতা ওলটাল অনিলিখা। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ একেবারেই ভালো লাগে না অনিলিখার। সেই ভাষার মাধুর্য কোথায়? তবু প্রথম কবিতার দুটো লাইন পড়ল অনিলিখা।

Thou hast made me endless, such is thy pleasure,

This frail vessel thou emptiest again and again,

and fillest it ever with fresh life.

এটা কি সেই বাংলা কবিতার অনুবাদ?

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব। ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।'

ইংরেজি অনুবাদে কোথায় সেই শব্দের অনুরণন, কোথায় সেই ফিরে ফিরে আসা শব্দের সঙ্গে মনের কথা বলা। এ অনুবাদ একেবারেই পছন্দ নয় অনিলিখার।

বইয়ের পাতা উলটে বুককেসে রেখে ফিরে আসছিল। হঠাৎ আবার কী মনে হতে ফিরে গেল। আবার বইটা নিয়ে এল অনিলিখা। পাতা উলটে উলটে সুডোকুর থেকে পাওয়া সংখ্যাগুলোর পাশাপাশি এ বইটা দেখে কিছু ইংরেজি অক্ষর লিখে যেতে শুরু করল।

—কী দেখলেন অনিলিখাদি? কিছু সাহায্য করব?—পাশ থেকে উৎসুক হয়ে উঁকি মারল সুচরিতা।

—একটু সময় দাও, বলছি। আমি বইটায় কিছু জায়গায় পেনসিলে দাগ দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে নেই তো?—বলে সোফার উপরে পা তুলে বসল অনিলিখা। নিজের মনে বিভোর হয়ে কাগজে কিছু একটা লিখতে থাকল।

মিনিট পাঁচেক বাদে নীরবতা ভাঙল অনিলিখার। ততক্ষণে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কপালের উপরে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে নিয়ে চুলটা ক্লিপ দিয়ে আটকে বলে উঠল,—যা ভেবেছিলাম। শুধু শুধু তোমাকে এই সুডোকুর বইটা দিয়ে যাননি। তিন লাইনের একটা ছোট মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন।

সেকী? কীভাবে?

—আমি শুরুতে গীতাঞ্জলী বইটা থেকে প্রত্যেক শব্দকে পরপর একটা আনুক্রমিক নাম্বার দিয়েছি—1, 2, 3, 4, 5, 6...এরকম। এবারে এই সুডোকুর বইতে ঠিক যে সংখ্যাগুলোতে গোল দাগ দেওয়া আছে, সেই সংখ্যা অনুযায়ী গীতাঞ্জলীর থেকে ওই সংখ্যা মিলিয়ে শব্দগুলো আলাদা করে নিয়েছি। এভাবে যে শব্দগুলো পেয়েছি, তার প্রথম অক্ষরগুলো পরপর লিখে ফেললে যা পাওয়া যায়, তাই হল এই মেসেজ।

—আরেকবার বলুন—সুচরিতা অবাক হয়ে বলে উঠল।

অনিলিখা ফের বলে উঠল—দাঁড়াও, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—ধরো সুডোকুর বইতে প্রথমে গোল করে হাইলাইট করা সংখ্যা হল 7। এবারে গীতাঞ্জলীর কবিতা যেখানে শুরু হয়েছে, তার সপ্তম শব্দ হল 'Is'। আমি তার প্রথম অক্ষর ঠজ্জড শুধু নিয়েছি। সুডোকুর বই থেকে পাওয়া সংখ্যার সঙ্গে গীতাঞ্জলীর শব্দের ক্রমানুযায়ী একই সংখ্যার শব্দ মিলিয়ে যে শব্দগুলো এভাবে পেয়েছি, তার প্রথম অক্ষরগুলো পরপর সাজালে যা হয় তা হল—

I created new synthetic life. However, it fell into the wrong hands. Now the entire world is in danger from Dave.

অর্থাৎ—

আমি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছি। কিন্তু তা এখন খারাপ লোকের হাতে। যে-কোনও সময়ে পৃথিবী এখন বিপন্ন হতে পারে। ডেভের জন্য।'

—ডেভ?—উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সুচরিতা—এই তো মিলে গেল। অনিলিখাদি, এই ডেভের কথাই ইংল্যান্ড ছাড়ার মুহূর্তে বাবা আমাদের বলেছিল। কে এই ডেভ জানি না। এর জন্যেই আমরা ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতে চলে আসি। আমি নিশ্চিত এই লোকটাই বাবার মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত আছে।

—আচ্ছা। কে এই ডেভ জানতে হবে। শুধু তাই না, কীসের বিপদ তা-ও বুঝতে হবে। এমনকী বিপদ হতে পারে, যার জন্য সারা পৃথিবী বিপন্ন হতে পারে। নতুন সিন্থেটিক লাইফ? তার সঙ্গে উনি যুক্ত হলেন কীভাবে? সত্যিই খুব বড় কোনও চক্রান্ত হবে।

খানিকবাদে অনিলিখা বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। অপরাজিতবাবুর পরিবারের অনুরোধে পুলিশে খবর দেওয়া যাবে না। কিন্তু একইসঙ্গে অপরাজিতবাবুকে যে খুন করেছে, সে হয়তো এখনও কলকাতাতেই আছে। হয়তো অন্য কোনও বড় ষড়যন্ত্রের প্ল্যান করছে। অপরাজিতবাবুকে খুন করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? সেটা জানার একমাত্র উপায় হল উনি কী নিয়ে কাজ করছিলেন, কীসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা ভালোভাবে জানা। জাল টাকার কোনও চক্রের সঙ্গে কি সত্যিই কোনও যোগাযোগ ছিল ওনার? আর তাই তারা খুন করেছে অপরাজিতবাবুকে? কিন্তু উনি তো তা লিখে যাননি সংকেতে।

মুশকিল হল উনি বাড়িতে নিজের কাজের কথা কিছুই বলতেন না। আর তাই কেম্ব্রিজে পড়ানোর বাইরে উনি কী করতেন সেটা বাড়ির লোকেদেরও অজানা। একজনের কথাই সবার

আগে মনে পড়ল অনিলিখার। মিস্টার পাই-এর। ওনার সঙ্গে সবার আগে যোগাযোগ করতে হবে।

৭

সন্ধে সাতটা। খানিকক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্ত হবে। নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোট-বড় নানান সাইজের বাহিনী অলসভাবে ঘোরাফেরা করছে। দূরে দিগন্তরেখার নীচে হারিয়ে যাওয়া সূর্য তার দিনান্তের শেষ আলো উদারভাবে তুলে দিয়েছে ওই মেঘ বাহিনীর হাতে। ঘর ফেরা পাখির ডাকে এখন চারদিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা অচেনা পাখি দূর থেকে চিক-চিক-চিক করে মাঝেমধ্যে বেশ জোরে জোরে ডেকে উঠছে। চারদিকে যতদূর দেখা যায়, শুধু সবুজ। সবুজের নানান শেড। পাম আর নারকোল গাছের সারি। তার মধ্যে বাতাসে ভেসে আসছে জলপ্রপাতের শব্দ। প্রকৃতির অসীম উদারতা যেন আগলে রেখেছে এই জায়গাকে।

আর কয়েকদিন বাদেই জিলের অবসর। গত তিরিশ বছর পোরটেরিকোতে কাটানোর পরে জিল অবসর নেবে। ফিরে যাবে ওর বাড়ি কলোরাডোয়। জিলের দুই ছেলে। একজন ক্যালিফোর্নিয়ায় কাজ করে, আর অন্যজন নিউ জারসিতে। বছরে কয়েক দিনের জন্য দেখা হয় ওদের সঙ্গে। স্বামী জন বহুদিন হল মারা গেছেন। তবে এসবের বাইরে জিলের যদি আরও আপনার কেউ থেকে থাকে, তা হল এই কাজ।

আর এই টেলিস্কোপ। অ্যারেকিবো টেলিস্কোপ। 1950 সালে এই টেলিস্কোপ প্রতিষ্ঠিত হয়। চারদিকের সবুজের মধ্যে স্টিলের বিশাল বৃত্তাকার টেলিস্কোপ। জিলের গত তিরিশ বছর কেটে গেছে অন্য গ্রহের প্রাণের সন্ধানে। কয়েক বছর আগে এই টেলিস্কোপে পাওয়া সংকেত থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে মানুষ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একা নয়। অন্য গ্রহেও মানুষের মতো বা তার থেকে আরও অনেক বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।

আর একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। তাদেরই মধ্যে কেউ, তাদেরই কোনও বংশধর আজও আমাদের মধ্যেই আছে? আমরা হয়তো তাদের আলাদা করে চিনতে পারি না।

গায়ে কাঁটা দিল জিলের। সংকেত রহস্যের ঘটনা মনে পড়তে। সেবারে যাই হোক না কেন, সবার শেষে এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে জিলের সারা জীবন ব্যর্থ হয়নি। যে ঘটনার কেন্দ্রে ছিল অনিলিখা। সেই অনিলিখার সঙ্গে মাঝে দু-একবার সামান্য যোগাযোগ হয়েছে জিলের। কী এনার্জি আর সাহস ওই মেয়েটার। আর সব সময় মুখে কী মিষ্টি হাসি। কী সুন্দর উজ্বল চোখ। এখনও যেন জিলের চোখে ভাসে।

সেই ঘটনার পরে এখনও রোজ মনে হয়, আবার বুঝি এল সেই সংকেত। কিন্তু, না আর আসেনি। হয়তো তার প্রয়োজনও হয়নি ওদের দিক থেকে। আবার যখন প্রয়োজন হবে, ঠিক

আসবে সেই সংকেত।

অনিলিখার মতে ওদের সেই বংশধরেরা পৃথিবীতেই আছে। যারা এখনও ওদের পাঠানো সংকেতের ভাষা, সেই বৃত্তের ভাষা বুঝতে পারে। লুকিয়ে আছে পেরুর প্রত্যন্ত কোনও প্রান্তে। তাদের সঙ্গে নাকি সেই ভয়ানক অগ্নুৎপাতের রাতে ওর দেখাও হয়েছিল।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে শুধু তাদের কাছে অন্য গ্রহ থেকে পাঠানো সংকেত যায়, তারা অন্য গ্রহের পাঠানো সে সংকেত বুঝতেও পারে, অথচ সে সংকেত পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী টেলিস্কোপগুলোতেও ধরা পড়ে না। সে সংকেত টেলিস্কোপে তখনই ধরা দেয়, যখন সে সংকেত পুরো মানবজাতির উদ্দেশ্যে হয়। ঠিক যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে সংকেত রহস্যে।

এসব ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ ফোন কেঁপে উঠল। কল আসছে।

জিল অবাক হয়ে গেল নাম্বারটা দেখে। অ্যালিয়েনরা কি মন পড়তে পারে? কন্ট্রোল রুম থেকে স্বয়ংক্রিয় ফোন। আবার আসছে। এই ফোন এই নিয়ে গত তিরিশ বছরে মোটে সাতবার পেয়েছে জিল, যার মধ্যে একবারই তা সঠিক ছিল।

অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার মহাকাশের কোনও জায়গা থেকে ন্যারো ব্যান্ড সিগনাল পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের আরেকটা টেলিস্কোপকে জানায়। ওই টেলিস্কোপ সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে দেখে আকাশের ওই দিক দিয়ে সত্যিই কোনও সংকেত আসছে কিনা। দ্বিতীয় টেলিস্কোপেও একই সংকেত গেলে কম্পিউটার অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের অভিমুখ সামান্য পরিবর্তন করতে বলে।

যদি অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য সিগনাল চলে যায়, আর আবার আগের পজিশনে মুখ ঘোরালে ফিরে আসে, তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, টেলিস্কোপ সত্যিই নির্দিষ্ট দিকের কোনও তারার কাছ থেকে সংকেত পাচ্ছে। এর পরই কম্পিউটার এর কথা 'সেটি' বা 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স' টিমের গুরুত্বপূর্ণ সব বিজ্ঞানীদের জানায়।

জিল ঘরের পোশাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। কোনওরকমে পোশাক পরিবর্তন না করেই ছুট লাগাল কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে।

আজকে জিল ছুটিতে থাকলেও, এমনিতে কাজের দিন। তাই কন্ট্রোল সেন্টারে অনেকেই আছে। সবাই হুমড়ি খেয়ে স্ক্রিনে চোখ রেখেছে। মেসেজ আসছে। 1420 মেগা হার্জে। হাইড্রোজেন এই কম্পাঙ্কেই বিকিরণ করে। 1977 সালে 15 আগস্ট কর্নেল ইউনিভারসিটির দুই পদার্থবিদ মরিসন আর কোকোনি লিখেছিলেন যে যে-কোনও অ্যালিয়েন সভ্যতা এই

কম্পাঙ্কেই সবার আগে সংকেত পাঠাবে। এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কম্পাঙ্ক। মহাবিশ্বে সবথেকে বেশি রেডিয়েশন আসে হাইড্রোজেন থেকে আর তার কম্পাঙ্ক 1420 মেগা হার্জ।

ইতিমধ্যে কন্ট্রোল সেন্টারে নিস্তব্ধতাভঙ্গ হয়েছে। মনিটরে ফুটে উঠছে একটার পর একটা বৃত্ত। আর তার সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে উত্তেজনার পারা।

এরকম সংকেত আগে আরেকবার দেখেছেন জিল। তবে সেবারে এ ভাষা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এখন আর তার নয়। এ ভাষা বৃত্তের জটিল ভাষা। এ ভাষা বুঝতে যদিও আজও সময় লাগে। তবে কি আবার বড় কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে পৃথিবীতে? তা না-হলে হঠাৎ করে ওরা আবার এই সংকেত পাঠাবে কেন?

৮

কলকাতা পুলিশের ফরেনসিক এক্সপার্ট রাজর্ষি সরকারের উপরে এবারে এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা যে সাধারণ পুলিশের কর্ম নয়, তা পরিষ্কার। এই নিয়ে সাত-সাতটা রহস্যজনক মৃত্যু। আর প্রত্যেকটাতেই পাওয়া গেছে শুধু কঙ্কাল। আরেকটা জিনিসও প্রত্যেকটা জায়গায় পাওয়া গেছে তা হল একটা কাগজে লেখা টাইপ করা সংখ্যা 666। অবশ্য এটার কথা মিডিয়াকে জানানো হয়নি। অহেতুক কাজে আরও অনেক বেশি অসুবিধে হত।

সপ্তম হত্যাটা আজকেই হয়েছে। ভোরবেলা খবর আসে যে আরেকটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেনে। কার সেটা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সন্দেহ করা হচ্ছে, এটা বিখ্যাত লেখক রূপম বসুর। ওনার বয়স পয়ষট্টির মতো হয়েছিল। থাকতেন শিবপুরেই। নিজের বাড়িতে।

কালকে রাতে উনি বাড়ি ফেরেননি। অনেক সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে রাত দশটা নাগাদ ফিরতেন। তাই রাত এগারোটা অবধি কেউ চিন্তা করেনি। তার পরেও না ফিরে আসায় সব জায়গায় খোঁজাখুজি শুরু হয়। ওনার সব বন্ধুর বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া শুরু হয়। উনি সেখানে যাননি। ভোর হতেই পুলিশে জানানো হয়। আর তার কয়েক ঘণ্টা বাদেই এই কঙ্কাল পাওয়া যায় বটানিকাল গার্ডেনে।

উনি কালকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যা পোশাক পরেছিলেন, তার সঙ্গে যে পোশাক পরা অবস্থায় কঙ্কাল পাওয়া যায়, তার বর্ণনা একদম মিলে গেছে। একটা পুকুর ধারে গাছের পাশে এই কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেছে রাজর্ষির কাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসেছে রাজর্ষি।

গাড়ি নিয়ে যতটা সম্ভব কাছাকাছি এসে, গাড়ি দাঁড় করিয়ে দ্রুত পায়ে ইনস্পেকটর লাহিড়ি আর ফরেনসিক টিম নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে গেল রাজর্ষি। যা ভয় ছিল, তাই হয়েছে। চারদিকে কৌতূহলী লোকের ভিড়। ফরেনসিকের মূল কথাই হল ক্রাইম সিনকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও অপরিবর্তিত রাখতে হবে, যাতে কোনও এভিডেন্স নষ্ট না হয়। অনেক লোক ওই জায়গায় গিয়ে থাকলে অপরাধীকে শনাক্ত করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। প্রমাণ পাওয়া গেলেও সেটাই যে আসল অপরাধীর, সেটা আদালতে প্রমাণ করা সহজ হয় না। যাই হোক, এখন আর কিছুই করার নেই। তবু প্রথমেই রাজর্ষির টিম টেপ দিয়ে পুরো জায়গাটা আলাদা করে দিল।

গাছের পাশে কঙ্কালটা চিত হয়ে পড়ে আছে। শুধু কঙ্কালের মাথা আর হাফ হাতা শার্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা হাতের হাড় দেখা যাচ্ছে। হাতে গ্লাভস পরে জায়গাটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল রাজর্ষি।

রাজর্ষি নিজে ফরেনসিক এন্টোমোলজিস্ট। যে-কোনও মৃত্যুর পরে মৃতদেহে নানান ধরনের পোকা ও মাছি জড়ো হয়। তারা শরীরে বাসা বাধে, ডিম পাড়ে। সেই লার্ভার লাইফ সাইকেল থেকে মৃত্যুর সময় বোঝা যায়। ওর সঙ্গে অন্য এক্সপার্টরাও থাকে, যাদের প্রত্যেকের সাহায্য এ ধরনের তদন্তে লাগে।

সকালে কঙ্কালটা এভাবে পড়ে থাকতে প্রথম দেখে এই বাগানেরই এক কর্মচারী। সন্ধে ছ'টায় বটানিকাল গার্ডেন বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে সব লোককে বার করে দেওয়া হয়। মোটামুটি দেখে নেওয়া হয় আর কেউ ভেতরে আছে কিনা। কিন্তু পুকুরধারে গাছের আড়ালে এরকম একটা জায়গা কারুর চোখে না পড়তেই পারে।

সকাল 5টায় এখান দিয়ে যাওয়ার সময় ওই মালির চোখে পড়ে। মনে হয় গাছের ফাঁক দিয়ে কী একটা যেন বেরিয়ে আছে। তখনও বাগান খোলেনি। তাই এগিয়ে এসে কে ওখানে দেখতে গিয়ে কঙ্কালটা খুঁজে পায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। আজ ভোর রাতেই থানায় রূপমবাবুর সম্বন্ধে মিসিং পার্সেন ডায়েরি করা হয়েছে। তাই মৃতদেহ কার তা পোশাকের বর্ণনা থেকে বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। ওনার বাড়িতে খানিক আগেই জানানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির লোক এসে যাবে।

বাগানের লোকটাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করে তেমন কিছু নতুন তথ্য পেল না রাজর্ষি। রাজর্ষির সঙ্গে সবসময় একটা নোট নেওয়ার খাতা থাকে। ও সব ডিটেলস লিখে নিল। ফিঙ্গার প্রিন্ট, আশেপাশে পড়ে থাকা যাবতীয় ছোটখাটো জিনিস আলাদা আলাদা করে প্লাসটিকের ব্যাগে ভরে নিল ওর টিম।

অনেক কিছুই হয়তো এখানে ঘটনার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তবু এখানে পড়ে থাকা একটা ফাইবারও অপরাধীকে খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে।

গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিড়। কিছু কিছু জায়গায় মাটির উপরে পায়ের দাগ। যত্ন করে পুরো জায়গাটার ছবি তুলে নিল রাজর্ষি।

কঙ্কালের হাতের পাশে একটা ছোট বাক্স। তাতে কাগজে লেখা সেই একই সংখ্যা 666।

প্রত্যেকবার খুনি এটা লিখে রেখে কী প্রমাণ করতে চায়? এটাই কি খুনির সিগনেচার? এর থেকেই প্রথম সন্দেহ শুরু হয় যে এর মধ্যে বড় একটা রহস্য আছে, এগুলো স্বাভাবিক খুনির কাজ নয়।

এ রহস্যের সমাধানের জন্য ট্রেস এভিডেন্সই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ট্রেস এভিডেন্স বলতে বোঝায় আশেপাশে পড়ে থাকা চুলের টুকরো, কোনও ফেব্রিক, ধুলো, সিগারেটের টুকরো—এরকম সব আর কি। কঙ্কালের চারদিকে তেমন কোনও পোকা, মাছি জড়ো হয়নি। যা এটাই প্রমাণ করে যে স্বাভাবিক কোনও ডিকম্পোজিশন বা পচন হয়নি শরীরের।

পাশে একটা বই পড়ে আছে। সেটা যত্ন করে তুলে নিল রাজর্ষি। বাংলা বই। 'রহস্য যখন শিবপুরে'। মনে হয় রূপমবাবু এটাই পড়ছিলেন। এর মধ্যেও হাসি পেল। বইটারই একটা চরিত্র হয়ে গেছেন রূপমবাবু নিজে।

৯

না, কিছুই মাথায় ঢুকছে না রাজর্ষি সরকারের। এতদিন ভালো কাজ করে যেটুকু সুনাম হয়েছিল, পুরোটাই প্রায় খোয়াতে চলেছে এই কেসে। এমনকী দপ্তরের যারা রাজর্ষিকে সমীহ করে চলত, যারা ভাবত ওর মতো দক্ষ ইনস্পেকটর ও ফরেনসিক এক্সপার্ট কলকাতা পুলিশে দুর্লভ, তাদের মধ্যেও কানাঘুসো চলছে—এটাই বুঝি রাজর্ষি স্যারের কেরিয়ারের শেষ।

একমাত্র মিষ্টি খেলেই মন খারাপ খানিকক্ষণের জন্য কাটে। সকাল থেকে তাই প্রায় ছ'টা রসগোল্লা খাওয়া হয়ে গেছে। টিফিন বক্সের থেকে আরেকটা রসগোল্লা নিয়ে মুখে ফেলল রাজর্ষি।

অষ্টম খুনটাও কালকে হয়ে গেছে। এবারে খুন বছর চল্লিশেকের একজন দক্ষিণ ভারতীয়। নাম ভেঙ্কট গণেশান। ব্যবসায়ী। বেশ বড় একটা দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট চেনের মালিক। গতকাল রাতে একটা ক্লাবে পার্টি ছিল। পার্টির পরে বাড়ি না ফিরে ক্লাবেরই একটা ঘরে ছিলেন ভেঙ্কট। দুপুর দুটো অবধি ভেঙ্কটের সাড়া না পাওয়ায়, আর বাড়ি থেকে দুবার ফোন আসার পরে, ক্লাব কর্ত,পক্ষের টনক নড়ে। তার পরে দরজা খুলে দেখা যায় এই কাণ্ড। ঘরের সোফার উপরে ভেঙ্কটের কঙ্কাল। রাত দশটার পরেও একাধিক লোক ভেঙ্কটের সঙ্গে

হোটেলের ঘরে দেখা করতে এসেছে। পুলিশ ক্লাবের রেজিস্টার থেকে এই সময়ের পরে যারা যারা এসেছিল, ক্লাবে ঢুকেছে, তাদের সবার নাম-ঠিকানা জোগাড় করে তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু এখন অবধি কোনও আশার আলোই পাওয়া যায়নি।

আর হ্যাঁ, ওই একই কাগজ পাওয়া গেছে। যাতে লেখা সেই একই সংখ্যা 666।

পরপর নাম, বয়স, পেশা, খুনের জায়গা সব সাজিয়েও কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পেল না রাজর্ষি। মোডাস অপার্যান্ডি থেকেও খুনির সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণা করা যাচ্ছে না।

উদ্দেশ্যটা কী? যারা খুন হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন পেশা। ভিন্ন জায়গার বাসিন্দা। কোনও সূত্রেই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও যোগসূত্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। ডিজিটাল ক্যামেরায় ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবিগুলো ফের এক এক করে ল্যাপটপে দেখতে শুরু করল রাজর্ষি। যদি আরও কোনও কিছু চোখে পড়ে। খুব টেনশনে পড়লে রাজর্ষি সমানে পা নাচায়। আজকে ওর সেটাই হচ্ছে।

ঠিক এরকম সময় বেয়ারা এসে জানাল, একজন মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বাইরে অপেক্ষা করছে।

যতসব উটকো ঝামেলা। নির্ঘাত আবার কোনও সাংবাদিক হবে। আবার একশোটা অর্থহীন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করে যাবে। বিরক্ত হয়ে 'না' বলে দিচ্ছিল রাজর্ষি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী ভেবে বেয়ারার হাত থেকে মহিলার পাঠানো ভিজিটিং কার্ডটা চেয়ে নিল। আর তার পরে সেটা দেখেই বলে উঠল,—ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

খানিকবাদে যে ঘরে ঢুকল, তার স্বাভাবিক স্মার্টনেস, উজ্জ্বল চোখ ও আকর্ষণীয় চেহারায় মুগ্ধ না হয়ে কোনও উপায় নেই। জিন্সের উপরে লাল হাফ হাতা টপ। লাল লিপস্টিক। কাঁধ অবধি খোলা চুল। চেহারায় সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত সম্ভ্রান্তির ছাপ, যেটা আজকাল চট করে চোখে পড়ে না।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উলটো দিকেই বসার চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বলে উঠল রাজর্ষি,—আপনিই অনিলিখা? আপনার কথা অনেক শুনেছি। এমনকী আপনার আগের বেশ কয়েকটা অভিযানের কথা মিডিয়াতে অত ভালো করে না বেরোলেও খবর পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল আপনি, মানে—

—আরেকটু বয়স্ক হব ভেবেছিলেন, তাই তো?—হেসে বলে উঠল অনিলিখা—আসলে আমার ভাগ্যেই সব ঘটনা ঘটে। আমি এই সিরিয়াল হত্যার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

—হ্যাঁ, কালকে আমাদের বড়সাহেবের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম, যে আপনি আমার সঙ্গে এ-কেসটার ব্যাপারে দেখা করতে চান। সত্যি কথা বলতে কী আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম, কারণ এ ধরনের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে আপনার কি আগ্রহ থাকতে পারে বুঝিনি। এ-বার এ কেসের কথায় আসি। আমি এখনও কোনও আশার আলো দেখিনি। কাউকে সন্দেহ করারও খুঁজে পাইনি। তাই যে-কোনও ধরনের তথ্য আমাকে যদি কোনও পথ দেখায়, তার জন্য মন খোলা রেখেছি। তা আপনি কি এই ভিকটিমদের মধ্যে কাউকে চিনতেন?

—না, এদের কেউই আমার পরিচিত নন।

—তবে? আপনার কাছে কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে?

—হ্যাঁ, একটা জিনিস সন্দেহ করছি। তবে তা বলার আগে যদি এ ব্যাপারে কিছু জানান, আমার আন্দাজ করতে সুবিধে হবে। আপনি কি এখনও অবধি এ ঘটনাগুলোর পিছনে নিজে কোনও ব্যাখ্যা পেয়েছেন? মানে খুনটা ঠিক কীভাবে হচ্ছে? আমার মূল আগ্রহ হল এই খুনের পদ্ধতিতে। এরকম কথা তো কেউ আগে কখনও শোনেনি, যে খুনের পরে শুধুই কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে।

—দেখুন, আমাকে বলা হয়েছে, আপনার সঙ্গে তথ্য শেয়ার করতে কোনও অসুবিধে নেই, তাই বলছি। যে ক'টা খুন বাড়ির মধ্যে হয়েছে, সেখানে খুনের পরেই ছোট কাগজে টাইপ করা একটা লেখা পাওয়া গেছে। তাতে ইংরেজিতে একটা সংক্ষিপ্ত সেনটেন্স—'Your Unknown Past' বা 'তোমার অজানা অতীত' আর তার নীচে লেখা একটা সংখ্যা—666।

আমরা এ ব্যাপারে কাউকে জানাইনি। কোনও কাগজেও প্রকাশ হয়নি। তবে এটাই একটা বড় সূত্র। 666-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা খুনের পরে খুনি নিজের সাক্ষর রেখে গেছে। তবে তার আগের ওই লেখাটার অর্থ ঠিক কী হতে পারে, এক্ষেত্রে তা এখনও বুঝতে পারিনি।

কী যেন এক মুহূর্ত ভাবল অনিলিখা। তার পরে বলে উঠল,—বলে ভালো করলেন। প্রথমে 666-এর প্রসঙ্গে আসি। প্রথমত যে এ ঘটনার পেছনে যুক্ত আছে, সে অঙ্ক ভালো বোঝে। কারণ 666 একটা খুব ইন্টারেস্টিং সংখ্যা। 1 থেকে 36—প্রথম 36টা ন্যাচারাল নাম্বার বা অখণ্ড সংখ্যা যোগ করলে 666 হয়। এ ছাড়া এটা 1, 3, 6, 10, 15-এর মতো একটা ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার।

—সেটা আবার কী?—ইতিমধ্যেই রাজর্ষি বুঝতে পেরেছে যে সামনের এই মহিলা ঠিক এই সংখ্যাটার মতোই ইন্টারেস্টিং।

—যে কয়েকটা ডট দিয়ে একটা ত্রিভুজের গঠন তৈরি করা যায়, সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলি ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার। আপনি একটা ত্রিভুজের গঠন আর ক'টা ডট দিয়ে সে ত্রিভুজ

গঠন করা সম্ভব ভাবলেই এটা খেয়াল করবেন। যেমন 3টে ডট দিয়ে একটা ত্রিভুজের শেপ আনা সম্ভব, 6টা ডট দিয়ে আনা সম্ভব। ঠিক তেমনই 666 এই সংখ্যক বিন্দুর মাধ্যমেও একটা ত্রিভুজ বানানো সম্ভব। তাই এই সংখ্যা হল একটা বিশেষ সংখ্যা। ট্র্যায়াঙ্গুলার নাম্বার। তবে এখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে, অপরাধী যে অঙ্কে ও সংকেতে আগ্রহী এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অপরাধীর প্রোফাইল ভাবার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ ছাড়া এর একটা ধর্মীয় অনুসঙ্গ আছে।

666 হল নিউ টেস্টামেন্টের মতে 'নাম্বার অফ দ্য বিস্ট'। অর্থাৎ 'শয়তানের সংখ্যা'। যে এর পেছনে কাজ করছে, সে ক্রিশ্চান হতে পারে, তবে একইসঙ্গে সে জানাতে চায় যে সে খুব খারাপ কোনও কাজ করতে চলেছে। তবে এসবই অবশ্য অনুমান।

মুগ্ধ হয়ে রাজর্ষি বলে ওঠে,—একটু চা খাবেন? বা রসগোল্লা?

—না, না। শুধু চা।

বেয়ারা ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে রাজর্ষি ফের বলে ওঠে,—আর এর বাইরে যে লেখাটার কথা বললাম সেটা নিয়ে কিছু মনে হয়?

—'তোমার অজানা অতীত'—এই লেখাটা নিয়ে বলছেন তো?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা একটা খুব বড় ক্লু। এর একটাই অর্থ খুনি এদের প্রত্যেককে চেনে। আর ব্ল্যাকমেল করতে চায়। কিন্তু যারা যারা খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। খুনি কীভাবে এদের সবাইকে চেনে তাই বোঝা যাচ্ছে না। সেখানেই হিসেব মিলছে না।

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে যেন কিছু ভাবল অনিলিখা। তার পরে বলে উঠল,—আচ্ছা, যদি এই লেখাটা আপনি নিজে পেতেন কী করতেন?

—মানে? আমি পাব কেন? আমার আবার সেরকম কিছু অজানা অতীত আছে নাকি?—রাজর্ষির গলায় একটু বিরক্তির সুর।

আসলে ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, কিছুদিন আগে একটা গাড়ির পিছনে তাড়া করতে গিয়ে একটা লোককে চাপা দিয়ে প্রায় মারতে বসেছিল। অনেক কষ্টে কেসটাকে চাপা দেওয়া হয়।

রাজর্ষির দিকে খানিকক্ষণ গভীর ভাবে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল অনিলিখা—আমাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু কথা থাকে, যা আমরা অন্য কাউকে জানতে দিতে চাই না।

—কিন্তু হঠাৎ করে একথা?

—এই চিঠিটা পেয়ে সবার আগে চিঠির প্রাপকের যে প্রতিক্রিয়া হবে তা হল, অন্য ঘরে গিয়ে এর সঙ্গের জিনিসটাকে দেখা। তাই না? আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে সবার সামনে

এটা খোলা হোক।

—হুঁ, তা হতে পারে। ইন্টারেস্টিং চিন্তা।

—আর তাই এটা খোলার পরে কী হয়েছে, সেটা কেউ জানতে পারেনি। তা এর সঙ্গে আর কী পাওয়া গেছে জানতে পারি কি?

মেয়েটাকে এতটা বলা ঠিক হচ্ছে কি? একটু দ্বিধা নিয়ে রাজর্ষি ফের বলে ওঠে,—একটা ছোট প্লাস্টিকের বাক্স। দেখাচ্ছি,—বলে একটা ছোট দেশলাই বাক্সের সাইজের প্লাস্টিকের বাক্স নিয়ে এল। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অনিলিখা নেড়েচেড়ে দেখল। বাক্সটার গায়ে একটা ছোট সুইচের মতো আছে। প্রেস করলে ঢাকাটা খোলে। বেশ কয়েকবার খোলা-বন্ধ করে দেখল।—আচ্ছা, এর ঢাকার ভেতর দিকে কিছু লাগানো ছিল কি?

—ঠিকই ধরেছেন। এর ঢাকা যেভাবে স্প্রিং-এর মতো খুলছে, তাতে মনে হয় এর সঙ্গে এমন কিছু লাগিয়ে রাখা যায় যা আঙুলে এসে বিঁধতে পারে। তবে বুঝতেই পারছেন, যেখানে বডি পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে কারণটা ঠিক বলা যাবে না।—একটু থেমে ফের বলতে থাকে রাজর্ষি—আপনিও নিশ্চয়ই বুঝেছেন, সব থেকে বড় রহস্য খুনের পরে এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহ কীভাবে কঙ্কালে পরিণত হল। শরীরের পচন, খোলা বাতাসে তাড়াতাড়ি হলেও এভাবে কঙ্কাল হতে বেশ কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস লেগে যাওয়ার কথা। সেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

পচনজনিত কোনওরকম দুর্গন্ধ, পোকা বা মাছির জড়ো হওয়া—এরকম কিছুও ঘটেনি। বিশেষ করে ধরুন রূপমবাবুর খুন। খুন যদি বোটানিকাল গার্ডেনেই হয়ে থাকে, তাহলে মৃতদেহ সারারাত বাইরে পড়ে থাকার কথা। সেখানে যে ধরনের পোকা-মাছি মৃতদেহকে ঘিরে জড়ো হয়, এক্ষেত্রে তার কিছুই হয়নি। এখনও বুঝতে পারছি না কী করে হচ্ছে এসব।

—তা আপনি সন্দেহজনক কিছু পেয়েছেন ফরেনসিকে?

—হ্যাঁ, তা পেয়েছি। রূপমবাবুর খুন যেখানে হয়, সেখানে একটা বিদেশি কোম্পানির মোজার ফাইবার পেয়েছি। মনে হয় অপরাধী জুতো খুলে শুধু মোজা পরে এগিয়ে গিয়েছিল রূপমবাবুর দিকে। রূপমবাবুর কেসটা না-হয় বাদ দিলাম, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছে বাড়ির মধ্যে, তখন বাইরের কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও কী করে খুনি প্রত্যেকবার তার শিকারের কাছে পৌঁছচ্ছে, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন।

—আচ্ছা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কি কোনও অচেনা লোক গিফট জাতীয় কিছু দিতে এসেছিল?

—প্রত্যেক ক্ষেত্রে পাওয়া এই বাক্সের থেকে ভাবছেন? হ্যাঁ। যারা খুন হয়েছে, তারা একটা গিফট প্যাক পেয়েছিল, যার মধ্যে ওই লেখাটা আর ওই বাক্সটা ছিল। আমার ধারণা কোনও ধরনের ব্ল্যাক মেলিং-এর মূলে।

—এরকম হতে পারে এই গিফট প্যাক পেয়ে এরা তা খুলেছে। প্রথমেই পেয়েছে ওই লেখাটা। লেখাটা পেয়ে আলাদা ঘরে চলে গেছে। সেখানে বাকি অংশ খুলে দেখেছে।

—হতে পারে। কে ওই গিফট প্যাক দিতে এসেছিল, আমরা সেই লোকটার খোঁজ করছি। এটা তো যাকে ইচ্ছে দিয়ে পাঠানো যেতে পারে। মুশকিল হল আমরা এর পরের খুনটাকে আটকাব কী করে? কে এর পিছনে কাজ করছে?

আরও সামান্য কিছু কথার পরে অনিলিখা বেরিয়ে এল। কথা হল, নতুন কিছু জানতে পারলে রাজর্ষি অনিলিখাকে জানাবে।

১০

সন্ধের সময় এই সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে আসতে খুব ভালো লাগে এণাক্ষীর। তাই মাঝে মাঝেই অফিস ফেরত এখানে চলে আসে। চার্চের পরিবেশ খুব ভালো লাগে। সারি দেওয়া কাঠের বেঞ্চিগুলোর যে-কোনও একটাতে বসে থাকে কিছুক্ষণ। উপরের দেওয়ালের নকশা, রঙিন কাচের বিশাল বিশাল জানলাগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে। আজকেও খানিকক্ষণ কাটিয়ে চার্চ থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন বাইরে বিশেষ লোক নেই। খানিকটা হেঁটে রবীন্দ্রসদন মেট্রোয় যেতে হবে। বাড়িতে গিয়ে আবার রান্না করতে হবে মনে হতেই জ্বর এল। কাজের লোক ছুটিতে গেছে। হঠাৎ ও খেয়াল করল এক বিদেশি ভদ্রলোক হাতে একটা ম্যাপ নিয়ে ঘুরছেন। এনাকেই যেন আজকে অফিসে দেখেছিল এণাক্ষী। কী একটা কারণে এসেছিলেন যেন। ঠিক মনে পড়ল না।

এণাক্ষীকে দেখে এগিয়ে এলেন।

ইংরেজিতে বলে উঠলেন,—এটাই কি সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল?

হ্যাঁ, কিন্তু আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক যেন একটু দুঃখ পেলেন।

বলে উঠলেন তাহলে তো আবার কালকে আসতে হবে। এত দূর থেকে এলাম। ঠিক এরকমই একটা ক্যাথেড্রাল আমাদের লন্ডনেও আছে। কেন্সিংটনের কাছে। একই আর্কিটেক্টের হাতে তৈরি।—একটু থেমে একটা কাগজ এণাক্ষীর হাতে দিয়ে ফের বলে উঠলেন,—আচ্ছা, এটা কোথায় জানো? আমাকে এবার এখানে যেতে হবে।

কাগজটা নিয়ে একটু অবাক হল এণাক্ষী। কারণ তাতে কোনও ঠিকানা লেখা নেই। কী একটা কথা লেখা আছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একটু সরে একটা ল্যাম্পের আলোর কাছে এসে দেখল, তাতে শুধু একটা সংখ্যা লেখা আছে। 666।

আর কী একটা লেখা। Your Unknown Past.

ও অবাক হয়ে মুখ তুলে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। দেখল বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে হাসি। মুখের ভাবটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

১১

—অনিলিখা?—কণ্ঠস্বরটা একবার শুনেই অনিলিখার বুঝতে অসুবিধে হল না, উলটো দিকে কে আছেন।

—হ্যাঁ, বলছি। কেমন আছেন জিল?

—হ্যাঁ, ভালো আছি। তা আমি তো বহুদিন বাদে ফোন করলাম। একবার গলা শুনে চিনে গেলে? তোমার মধ্যে ভিনগ্রহী প্রাণীদের অনেক ধর্ম আছে দেখছি।—হেসে উঠল দুজনেই।

জিল ফের বলতে শুরু করলেন—সরাসরি আসল কথায় চলে আসি। এত দিন বাদে আবার সেই গ্রহ থেকে সংকেত পেয়েছি। HD 214 825 OAB থেকে।

—আট বছর বাদে আবার সেই সংকেত?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এর মাঝে আমরা আর কোনও সংকেত পাইনি। আমরা এখনও এবারের সংকেতটা উদ্ধার করতে পারিনি। আমাদের এক্সপার্টরা সংকেত উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। সেই একইরকম বৃত্তের সংকেত। জটিল সংকেত। তবে প্যাটার্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে একই জায়গা থেকে এসেছে। একটা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে তার পাশের বৃত্তগুলোর উপরে চাপ আঁকলে তাদের মধ্যে যে কোণ থাকে, তার উপরেই নির্ভর করে এই সমীকরণ। কিন্তু মূল সমস্যা হল হাজারো বৃত্তের ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করতে হবে তা জানা নেই।

আমরা এখনও জানি না, কীভাবে সেটা তাড়াতাড়ি বার করা যাবে। তবে এটুকু নিশ্চিত যে ঠিক আগের বারের মতো আবার কোনও বড় বিপদ হতে চলেছে। তা-না হলে ওরা এ সঙ্কেত পাঠাত না।

—আচ্ছা, ডক্টর গিলের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই না?

—না, উনি তো নিশ্চিত মারাই গিয়েছিলেন। এই ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির হাত থেকে বেঁচে পালানো তো আর অত সহজ ছিল না। ঠিক যেমন ওর প্রযুক্তিতে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলো মারা গিয়েছিল, ওরও একই দশা হয়েছিল মনে হয়।

—হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে।—চুপ করল অনিলিখা।

উলটো দিক থেকে জিল আবার বলে উঠলেন,—আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। আগের বারে তোমার জন্যই আমরা এত বড় রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলাম। এবারের ঘটনা কোন দিকে এগোচ্ছে, তোমাকে জানাব। তোমার সাহায্য এবারেও লাগতে পারে।

আরও মিনিট পাঁচেক কথা হল। অনেক সময় স্মৃতি যেন পাথরের উপরে খোদাই করে লেখার মতো হয়। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সে ঘটনার ছবি। এখনও মনে পড়ে আমাজনের জঙ্গলে কাটানো সেই রাত। বাতাসে মিশে থাকা সেই তীব্র সালফার ডাই-অক্সাইড-এর গন্ধ। সেই রাতের অন্ধকারে আমাজনের জলে সাঁতরানোর অভিজ্ঞতা। সেই রহস্যময় উপজাতির কথা, যাদের সাহায্যে টটোরা নৌকোয় পালাতে পেরেছিল অনিলিখা। আর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গায়ে সেই রক্তের রং ছড়িয়ে পড়া। আর তার পরে সে রং ছড়িয়ে পড়েছিল আরও দূরে দূরে, সারা আকাশে। এই আগুন লাগা রং আর কখনও দেখেনি অনিলিখা। এখনও যেন চোখে ভেসে ওঠে। যেন সবই কালকের ঘটনা।

আবার ফোন বাজছে। ফোনটা তুলে নিল। উলটো দিকে রাজর্ষি সরকারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

—অনিলিখা, এই পাঁচ মিনিট আগে নবম খুনটার খবর পেলাম। এবারে যিনি মারা গেছেন, তার নাম এণাক্ষী মিত্র। সরকারি চাকুরে। আয়কর দপ্তরে কাজ করতেন। কালকে সন্ধে থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইমাত্র কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালের কাছে। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি কি একবার জায়গাটা নিজে দেখতে চান?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিলিখা। ফের বলে উঠল,—আচ্ছা, যারা যারা খুন হলেন তাদের নামগুলো একবার বলতে পারবেন?

—হ্যাঁ, এ ক'দিন তো রাতে স্বপ্ন দেখলেও ওই এক কেস নিয়েই দেখছি। সব নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল মুখার্জি, লিলি বসু, লিসা থমাস, হিরন্ময় শুর, রূপম বসু, অজয় মণ্ডল, ভেঙ্কট গণেশান, এণাক্ষী মিত্র। দেখেছেন সবক'টা নাম একবারে কীভাবে পরপর বলে দিলাম।

—আচ্ছা, পরপর ঠিকভাবে বলেছেন তো? আগে রূপম বসু না অজয় মণ্ডল। ওখানে হিসেব মিলল না।

—ঠিক ধরেছেন। ওটা ভুল হয়ে গেছে। আগে অজয় মণ্ডল খুন, তার পরে রূপম। কেন বলুন তো?

—সর্বনাশ। জানি না এটা কী করে সম্ভব। তবে একজন পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব। শুধু শুধু এর জন্য এতগুলো খুন।

—কী বলছেন বলুন তো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—যে ক'জন খুন হলেন, তাদের সব ক'জনের নামের প্রথম অক্ষরগুলো পরপর রাখলে হয় ‘Gill Harve’ 'গিল হার্ভে'।

—তা সে কে?

—সংকেত রহস্যের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। ওখানে 'গিল হার্ভে'-র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উনিই ছিলেন সেবারের পুরো কর্মকাণ্ডের পেছনে। 'মনু রিজার্ভ ফরেস্ট'-এ সেবারে উনি ওনার গবেষণার মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন প্রাণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। অনেকটা সফলও হন। উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। তার খুব খারাপ ফলাফল হতে পারত। সেবারে ওনার চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু আমাদের ধারণা হয়তো ভুল ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে উনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু জানি না, এখন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কাকতালীয় ভাবেও যোগাযোগ হতে পারে। তবে 5 শতাংশ চান্সও যদি থাকে, আমাদের সতর্ক হতে হবে। একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাইলে, তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

একটু থেমে রাজর্ষি বলে উঠল,—যাই হোক। আমাকে এবারে ঘটনাস্থলে যেতে হবে। সময় নেই। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি যেতে চান?

—না, আমার যাওয়ার দরকার নেই। তবে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে অবশ্যই জানাবেন।

১২

পুলিশের ফাইলে খুব কম তথ্যই আছে সংকেত রহস্যের ঘটনার উপরে। রাজর্ষি শুনেছিল যে খবরটা যাতে সবার সামনে না আসে, তার জন্য অনেক গোপনীয়তা নেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে ক্লাসিফায়েড টপ সিক্রেট ইনফরমেশন। তা ছাড়া ঘটনাটা ঘটেছিল ভারতের বাইরে। আমেরিকাতে, আয়ারল্যান্ডে, পেরুতে। বেশ কয়েকটা ফোন, ফাইল-পত্র দেখার পরেও তেমন কোনও ইনফরমেশন না পেয়ে ও বাধ্য হল অনিলিখাকে ফোন করতে।

—অনিলিখা, আমি রাজর্ষি বলছি। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু 'সংকেত রহস্য'-এর সম্বন্ধে জানাবেন। ঠিক কী হয়েছিল। আসলে জানেনই তো আসলে কী হয়েছিল সে তথ্য এতটাই গোপনীয়তার সঙ্গে রাখা হয়েছে যে আমার পক্ষে গিল হারভের সম্বন্ধে কিছু জানা শক্ত হয়ে পড়ছে। আপনিই বা কীভাবে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন?

—আসলে এ ব্যাপারে আমার পক্ষেও সব কিছু বুঝিয়ে বলা বেশ শক্ত। বেশ কিছু তথ্য টপ সিক্রেট। তাই গিল হারভে সম্বন্ধেই মূলত বলব, যাতে খুঁজে বার করতে সহজ হয় আপনার পক্ষে।

—কিন্তু তার আগে বলুন তো রহস্যটা শুরু হল কীভাবে?—রাজর্ষি নাছোড়বান্দা।

—আচ্ছা একটু আগে থেকেই বলছি। আয়ারল্যান্ডের শস্যখেতে হঠাৎ এক ছোটবড় বৃত্তের জটিল নকশা দেখা যায়। ক্রপ সারকেলের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, যা কীভাবে রাতারাতি তৈরি হয় তা নিয়ে এখনও অনেক বিতর্ক আছে। এটা না হয় সেরকমই আরেকটা ক্রপ সারকেল বলে ভেবে নেওয়া যেত। কিন্তু এখানে সমস্যা হল অন্য জায়গায়। ওই একই ধরনের জটিল নকশা দেখা গেল আমেরিকার এক সদ্য আবিষ্কৃত গুহার দেওয়ালে। সেটা ওই দেওয়ালে আঁকা হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগে। কী করে দুটো এরকম নকশার মধ্যে এইরকম আশ্চর্য মিল সম্ভব, একটা সদ্যপ্রাপ্ত, অন্যটা পঞ্চাশ হাজারের বছরের থেকেও পুরোনো যা আগে কারুর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। পরে জানতে পারি যে ওই একই সংকেত, একই রকম নকশা এসে পৌঁছেছে সেটি-র কাছে পোরটেরিকোর অ্যারেকিবো টেলিস্কোপে। এর মধ্যে হঠাৎ করে পেরুর কিছু উপজাতির সংখ্যা দ্রুত কমতে শুরু করে। তারা হাজার হাজার বছর ধরে ওখানে থেকেছে। তাদের জীবনধারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। হঠাৎ করে তাদের সংখ্যা এভাবে কমে আসার কারণ খুঁজতে পেরু সরকারের তরফ থেকে দেশ-বিদেশের এক্সপারটদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। আমাকেও সে তদন্ত কমিটিতে রাখা হয়েছিল।

—সেটি মানে 'সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্টিয়াল ইনস্টিটিউট' তাই তো? মানে যারা ভিনগ্রহীদের সন্ধানে হাপিত্যেশ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।—হেসে উঠল অনিলিখা।

—তা সেটির কাছেও একই ধরনের সংকেত। এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তার পরে?

—তা তদন্তে নেমে দেখা যায় এসবের জন্য যে ব্যক্তি দায়ী, তিনি হলেন গিল হারভে। তখনই ওনার বয়স ষাটের মতো ছিল। ইংরেজ। এক অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। পুরো ঘটনা ঘটেছিল পেরুর এক অত্যন্ত প্রত্যন্ত প্রান্তে, মনু রিজার্ভ ফরেস্টে, যেখানে খুব কম লোকই যেতে পারে। ওখানে গিল লোকচক্ষুর আড়ালে গবেষণা করে প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন প্রাণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

—সে কি? তারপর?

—দেখুন এসব ব্যাপারে আমি ননডিসক্লোসার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী বিশেষ কিছু বলতে পারব না, কিন্তু এটুকুই বলব উনি যথেষ্ট সফলও হয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে আমাকেও গিলের দলের লোকের হাতে বন্দি হতে হয়। এক রাতে গিলের দেখা পাই। তাই খুব বেশি খেয়াল নেই। শুধু লোকটার বলার ভঙ্গি বেশ অন্যধরনের এটুকু মনে আছে। মূলত আমার জন্যই

ওনার সব কর্মকাণ্ডের কথা ফাঁস হয়ে যায়। অবশ্য আমি না থাকলেও হয়তো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ওনার সে সব কাজ ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু সে যে কারণই হোক না কেন, বেঁচে থাকলে ওনার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য যে আমি হতাম, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

—তা আপনার হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন যে এতে গিল হারভে যুক্ত আছেন?

—এভাবে ভিক্টিমদের নামের আদ্যক্ষর পরপর সাজালে ওনার নাম যে পাওয়া যায়, এটা কি তাই প্রমাণ করে না! এতোটা মিল কি স্বাভাবিক? তা ছাড়া উনি আর এই ডেভ—দুজনের মধ্যে আরেক বড় মিল দুজনেই আশ্চর্য রকম প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। একই বিষয়ে কাজ করেন। দুজনেই নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করেন। এতটা মিল কাকতালীয় নয় কি? তাছাড়া ডেভের হঠাৎ উত্থান বা পরিচিতি হঠাৎ করে গিলের অন্তর্ধানের পর থেকেই।

—হুম, ঠিকই বলেছেন। মেকস সেন্স। তা ছাড়া খুনি প্রত্যেকক্ষেত্রে নিজের পরিচয় রেখে গেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। এটা বোঝানোর জন্য যে একই লোক এটা করছে, আর খানিকটা যেন আপনাকেই চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। দেখি অনিলিখা কী করতে পারে? এরকম একটা ভাব।

—একদম তাই।

—আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন। আপনি চাইলে আপনার পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

—না, না। তার কোনও প্রয়োজন নেই।

আরও কিছু কথার পরে ফোন রেখে দেয় অনিলিখা। নিজের প্রাণ নিয়ে অনিলিখা চিন্তিত নয়। এমনিতেও গিলের মূল উদ্দেশ্য অনিলিখাকে মারা হলে, এতদিন অনিলিখা বেঁচে থাকত না।

১৩

অনিলিখার জন্য স্পেশাল অভ্যর্থনা। গাড়ি থেকে নেমেই অনিলিখা দেখল, গেটের সামনে গণেশ আর মিস্টার পাই দাঁড়িয়ে আছেন। মিস্টার পাই পরে আছেন সাদা পায়জামা- পাঞ্জাবি। হাতে একটা চুরুট।

মিস্টার পাই-এর কাছে এসে অনিলিখা বলে উঠল,—একী। চুরুট আবার কবে ধরলেন? আপনি ধূমপান করেন জানতাম না তো।

মিস্টার পাই উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসলেন। পাশ থেকে গণেশ একটা ইন্ডিয়ান কিংস সিগারেট-এর এক প্যাকেট শার্টের পকেট থেকে বার করে বলে উঠল,—আর আমি সিগারেট শুরু করেছি।

—কেন হঠাৎ করে?

—স্যার, একটা অ্যান্টি এজিং ট্যাবলেট বার করেছেন। তাতে সিগারেট-চুরুট খেলে যা খারাপ এফেক্ট হয়, তা কেটে যায়। সেটা ঠিক কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা নিয়মিত সিগারেট, চুরুট এসব খাচ্ছি।

—তা কাজ করছে কিনা বুঝছেন?

—আহা, সে কি আর একদিনে বোঝা যায়, অন্তত মাস ছয়েক চেনস্মোকিং করতে হবে। তা এবার বলো কী জন্য আমার দরকার পড়ল?

—হ্যাঁ বলছি। আমাকে বাড়ির ভেতরে যেতে দেবেন তো। আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যাবে না দেখছি।

—কেন?—বলে হেসে উঠলেন মিস্টার পাই।

—আর কেন? এখনকার দিনে আপনার কাছে কোনও সেলফোন নেই। গণেশকে ফোন করলে বেশিরভাগ সময় বলে আপনি কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে জানায় কিনা তা-ও বুঝি না। আপনি কোনওরকম সোশ্যাল নেটওয়ার্কেও থাকেন না। কোনও দিন ব্যবহার করেন না। এর পরে আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখা যায়? এতবার ফোন করার পরে কালকে গণেশ বলল,—আজকে আপনার সঙ্গে সকাল দশটা পনেরোতে এলে দেখা করা যাবে।

আবার হেসে উঠলেন মিস্টার পাই।—দেখো আমি নিজে বিজ্ঞানী হয়ে প্রযুক্তির থেকে খানিকটা দূরত্ব রাখার চেষ্টা করি। আমরা বুঝতেও পারি না, কীভাবে এই সব প্রযুক্তিগুলো আমাদেরকে আস্তে আস্তে পালটে দিচ্ছে। যেমন ধরো, 1995 সাল অবধি যখন আমাদের হাতে সেলফোন ছিল না, বেশিরভাগ বাড়িতেও ফোন ছিল না। তখন আমরা এক সপ্তাহ আগে থেকে বলে রাখতাম এই দিন এই সময় এই জায়গায় দেখা হবে।

এখন তুমি তা ভাবতে পারবে? প্ল্যান করলেও শেষ মুহূর্তে সে প্ল্যান পালটে যাবে, কারণ তুমি জানো শুধু একটা ফোন করে যখন ইচ্ছে এই প্ল্যান পরিবর্তন করা যায়। এর জন্য কি হয়েছে জানো? এর প্রভাব পড়েছে আমাদের স্বভাবে, আমাদের ব্যবহারে, আমাদের সম্পর্কে।

—তা আমিও কি এ পরীক্ষার অংশ?

—একদম তাই। বলতে পারো তোমাকেও যে দেখা করার একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, তার কারণ তুমিও এই পরীক্ষার অংশ। আমরা প্রযুক্তির পরিবর্তনের কথা ভাবি, কিন্তু প্রযুক্তির থেকেও যে আমরা তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছি, তা খেয়াল করি না। আগে আমরা কত কথা বলতাম, এখন দুজন সামনাসামনি হলেও কথা বলার বিষয় খুঁজে পাই না। এখন চোখের

সামনে যে সে অনেক দূরের। আর বহু দূরে হাজার মাইল দূরে যাকে কোনওদিন দেখিনি, চিনি না, তাকে ভাবি সে কত কাছের। তাই না?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা প্রযুক্তি কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার অনেক খবর রাখি। নিজের পরিবর্তনটা বুঝতেও পারি না।

মিস্টার পাই বলে উঠলেন,—চলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা বলব না। ভেতরে যাই।

মিস্টার পাই-এর সঙ্গে ড্রয়িংরুমের সোফায় এসে বসল অনিলিখা। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকটা নতুন বুক কেস। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অনিলিখা বলে উঠল,—আপনি তো প্রচুর বাংলা বই পড়ছেন দেখছি? বিশেষ করে কিশোর সাহিত্য।

—মনের বয়সটাকে বাড়তে দিই না। ওই সব বই পড়ে যেদিন আনন্দ পাব না, সেদিন বুঝব সত্যি বয়স বেড়েছে।

আরেকটা চুরুট ধরিয়ে অনিলিখাকে বলে উঠলেন,—তা বলো কি জন্য তোমার আসা।

অনিলিখা বলে উঠল,—খবরের কাগজ পড়ছেন? খবরটা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, ওই কঙ্কাল কাণ্ড তো?

—ঠিক তাই। কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। এর ব্যাখ্যা একমাত্র বিজ্ঞানের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তা আপনার কী মনে হয়?

—দেখো, অনুমান নির্ভর কিছু বলা উচিত নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানী হয়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, এখানে মানুষ খুন করছে না। করছে অন্য কিছু।

—আমারও তাই ধারণা। আচ্ছা, আপনি অপরাজিত বসুর নাম শুনেছেন কিনা জানি না। ওনার সঙ্গে আমার আগে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বিপদে পড়ে। এখানে আসার পরে খুব রহস্যজনকভাবে মারা যান।

—হ্যাঁ, ওনার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যদিও কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি। খুব বড় মাপের ম্যাথামেটিশিয়ান। কাগজে ওনার মৃত্যুর খবরটা পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কী বিপদে পড়েছিলেন? ও ব্যাপারটা আমার জানা নেই।

—জাল নোট তৈরির ব্যবসার সঙ্গে কোনওভাবে ওনার নাম জড়িয়ে পড়ে। সে ব্যাপারে ওনাকে ইংল্যান্ডে জেলেও যেতে হতে পারত। তাই আগেই উনি পালিয়ে আসেন। যাতে উনি নিজে যে-কোনও অপরাধ করেননি, তা প্রমাণ করতে পারেন। আমিও নিশ্চিত যে ওনার মতো মানুষ, কখনও লোক ঠকাতে পারে না। তা শেষ দিকে উনি কীসের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটা জানার দরকার।

—অঙ্কের দারুণ প্রতিভা। এক কথায় জিনিয়াস। ওনার অনেক বই আমার কাছে আছে। বছর দুয়েক আগে ওনার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। মৌলিক সংখ্যা আর জীবনের মধ্যে সম্পর্ক। কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মৌলিক সংখ্যা ঘুরে ফিরে আমাদের সামনে আসে। খুব নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা।

—এখানে আসার পরে উনি হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিনের জ্বরে মারা যান। ডাক্তার কিছু না বললেও আমার ধারণা ওনাকে বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছিল।

—সে কী? তা কী কারণে ওনাকে মারা হতে পারে? কিছু ধারণা করতে পেরেছ?

মৃত্যুর আগে উনি সংকেতের মাধ্যমে একটা মেসেজ রেখে যান মেয়ের জন্য। আমি সেটা ডিকোড করতে পেরেছিলাম। তাতে উনি লিখে যান যে উনি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু তা এখন খুব খারাপ লোকের হাতে। যে-কোনও সময়ে পৃথিবীতে তার জন্য সাংঘাতিক কোনও বিপদ হতে পারে। ডেভ—বলে কোনও একজনের থেকে সে বিপদ আসতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

—নতুন প্রাণ।—বিড়বিড় করে উঠলেন মিস্টার পাই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। আবার বলে উঠলেন,—নতুন প্রাণ। এ ব্যাপারে প্রথম সাফল্য পান ভেন্টার। খুব কম সংখ্যক জিন দিয়ে নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেন। ডেভ-এর নামও আমি শুনেছি। যার নাম শুনেছি তিনি মাইক্রোবায়োলজির উপরে গবেষণা করে এমন একটা সংস্থার অধিকর্তা। নিজে খুব সম্ভবত ব্যাক্টেরিয়োলজিস্ট। ওই সংস্থা খুব ভালো কিছু কাজ করছিল, এরকম শুনেছি। বছর খানেক আগে ওখানকার কাজ নিয়ে বেশ কিছু লেখাও চোখে পড়েছে। কিন্তু তার পরে গত এক বছর সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। আমি একটু এনার উপরে খোঁজ নিয়ে দেখি।

—তবে সেই ডেভ আর অপরাজিতবাবুর উল্লেখিত ডেভ এক না-ও হতে পারে। আর অপরাজিতবাবু তো ম্যাথেমেটিশিয়ান। উনি ডেভের সঙ্গে একসঙ্গে কি কোনও কাজ করবেন?

—এটাই ভুল ধারণা। বিজ্ঞানের সব শাখা এক জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। আর সেখানে ওদের অপরাজিতবাবুকে দরকার হয়ে থাকতেই পারে।

—আচ্ছা, ধরুন—বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা।

—তুমি যেটা ভাবছ, আমিও সেটাই ভাবছি। এই যে খুনগুলো হচ্ছে তাতে এই ধরনের বিশেষ কোনও মাইক্রোব, মানুষেরই হাতে তৈরি কোনও মাইক্রোব, ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, তাই ভাবছ তো?

—একদম আমার মনের কথাটাই বলেছেন। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? এ ধরনের মাইক্রোব কি তৈরি করা সম্ভব, যারা এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহকে কঙ্কালে পরিণত করবে? আর তা ছাড়া এভাবে এ ধরনের মাইক্রোবকে কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

—অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হতেও পারে। তবে তুমি যাকে নিয়ন্ত্রণ করছ, সে যে কালকে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? আর তাই এ নিয়ে গবেষণার অনেক বাধানিষেধ আছে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এ ধরনের মাইক্রোবের মিউটেশন এমনিতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয়। যদি কোনওভাবে এই মিউটেশনের বা পরিবর্তনের হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এদের মধ্যে এক বছরে যে পরিবর্তন আসতে পারে, তা আমাদের মধ্যে আসতে কয়েক লক্ষ বছর লেগে যায়।

—আপনি কি তাহলে এই খুনগুলোতে এই মাইক্রোবের ভূমিকা নিয়ে কিছু আশঙ্কা করছেন?

মিস্টার পাই আস্তে আস্তে বলে উঠলেন,—এ ধরনের প্রাণ তৈরি করা, তাকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা, আগুন নিয়ে খেলার মতো। সে আগুনে কখন নিজের ঘর পুড়বে সেটাও বলা মুশকিল।

—আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আপনি তো বিখ্যাত বিজ্ঞানী গিল হার্ভের কথা জানেন। সেবারে উনি বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করছিলেন। আমার ধারণা হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মধ্যে উনি মারা যান। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। উনি বেঁচে আছেন। হয়তো কলকাতাতেই আছেন। আর এই যে একের-পর-এক খুন হচ্ছে, তার মূল পাণ্ডাও আমার ধারণা ওই গিল। ওই যে খুনগুলো হয়েছে, যারা মারা গেছে, তাদের প্রথম নামের আদ্যক্ষর পরপর সাজালে তাই ওনার নামই পাওয়া যায়। তবে আর বোধহয় খুন হবে না। উনি শুধু এখন অবধি যা কিছু করেছেন তা শুধু আমাকে বোঝানোর জন্য যে উনি এখনও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। আর একইসঙ্গে প্রমাণ রেখে গেছেন যে উনি চাইলে কি করতে পারেন। খুব সম্ভবত গিল আর ডেভ একই লোক।

—যে শুধু তার ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যই এতকিছু করতে পারে, সে আসলে কী করতে চায় সেটা জানা খুব দরকার। মারাত্মক কিছু একটা হতে চলেছে। লোকটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়। তুমিও খুব সাবধানে থেকো। সত্যি চিন্তার কথা।

মিস্টার পাই আরেকটা চুরুট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

কালকে ভোরবেলা দিল্লি যেতে হবে দুদিনের জন্য। অফিস থেকে ফিরে আসতে রাত হবে। অফিসে যাওয়ার আগেই তাই ব্যাগ গোছাচ্ছিল অনিলিখা।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ফোনটা ধরতেই উলটো দিকে রাজর্ষির উত্তেজিত গলা— খবরের কাগজটা দেখেছেন?

—না, আজকে পড়ার সময় পাইনি এখনও।

—শিগগির গিয়ে দেখুন। লোকটা মারাত্মক কিছু একটা করতে যাচ্ছে। রীতিমতো আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে কালকে কাগজের অফিসে একটা চিঠি দিয়েছে। মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। আগে চট করে একবার দেখে নিন।

আপনার বর্ণনা মতো আমরা সর্বত্র 'গিল হার্ভে'-র খোঁজ করছি। তবে এখনও কোথাও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন হোটেলেও খোঁজ নিয়েছি আমরা। ভাবছিলাম খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি হাতে একদম সময় নেই।

চিঠিতে একটা সংকেতের উল্লেখ আছে। সেটা আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমাদের বেস্ট এক্সপার্টরা কাজ করছেন। দেখা যাক, কিছু বোঝা যায় কিনা তার থেকে।

ফোন ছেড়ে কাগজ নিয়ে খুলে বসল অনিলিখা। প্রথম পাতায় খবর।

Beware Kolkata, You're In Danger.

একটা ছোট চিঠি টাইপ করে কাগজের দপ্তরে পাঠিয়েছে লোকটা। দাবি করেছে যে সে-ই নাকি কঙ্কাল কাণ্ডের সব খুনের মূলে। তাতে একটা সংকেত পাঠিয়েছে। আর তার নীচে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—'পারলে বাঁচাও। সময় কিন্তু খুব কম।'

টিভি খুলল অনিলিখা। কলকাতা একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। সকাল এখন 7টা। তাই এখনও অফিসে যাওয়ার সময় শুরু হয়নি। কিন্তু এখনই এ খবর নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে।

একজন তো খবরে বলেই বসল—যাকে পুলিশ এতগুলো খুনের পরেও ধরতে পারেনি, কী করে নিশ্চিত হব যে কলকাতার পুলিশ তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে।

সত্যি কথা। এত বড় শহর। এত লোকের বাস। কোথায় কী করবে কিছু বলা যায়?

সংকেতটা খুব বড় কিছু নয়। কিছু সংখ্যা আর অক্ষর। পুরো চিঠিটার সঙ্গে কাগজে সংকেতটাও প্রকাশ হয়েছে।

1	X	7	B	5	R	T	H	J	R	C	U	P	9	X	3	S	N	R	4	R	W	M	N	P	S
A	U	W	M	6	5	O	T	N	S	E	I	W	D	Z	5	P	O	5	W	N	5	4	3	O	Q
N	T	S	R	M	6	R	I	N	M	8	A	M	1	P	L	T	X	T	3	5	2	X	Z	Y	2
R	O	O	S	9	5	8	2	M	L	3	N	8	R	O	4	R	Z	M	R	7	5	W	X	7	5
O	4	3	2	8	7	6	X	O	P	4	T	Q	9	P	R	6	X	S	P	S	R	4	2	Q	P
N	6	7	S	4	8	9	5	M	9	9	S	T	4	9	T	5	W	X	R	6	T	U	V	W	4

অফিসের তাড়া আছে। তবু অনিলিখা কাগজটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভাবল। কাগজে হিজিবিজি কাটল। কিছুই মাথায় এল না।

কী জানাতে চেয়েছে গিল? অবশ্য এর পিছনে যদি গিলই থেকে থাকে।

রাজর্ষি কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ডেভ-এর খোঁজ করেছে। ডেভ-এর সংস্থা 'নিউ লাইফ' প্রায় ছ'মাস আগে বন্ধ হয়ে গেছে। আপাতত ডেভ-এর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে অপরাজিতবাবুর ট্যাক্স রিটার্ন থেকে জানা গেছে যে উনি ওই 'নিউ লাইফ' সংস্থার সঙ্গে বেশ কিছু দিন ডাইরেক্টর হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগ 'নিউ লাইফ'-এর কাজকর্ম, কারা কারা যুক্ত ছিলেন সে সব বিশদভাবে জানতে একজন গোয়েন্দাকে ইংল্যান্ডে গত পরশু পাঠিয়েছে।

নাহ, এরকম বিপদের সময় কলকাতা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অনিলিখা ঠিক করল দিল্লি যাওয়া পিছোবে। এই মুহূর্তে যতদিন এই বিপদ না কাটছে, কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না।

আমি তোমার চ্যালেঞ্জ নিলাম গিল, আমি থাকতে কলকাতার কিছু ক্ষতি হতে দেব না।—অনিলিখা নিজের মনে বলে উঠল।

১৫

—অনিলিখা, মিস্টার পাই বলছি।

—হ্যাঁ বলুন। আপনার নাম্বারটা সেলফোনের মনে হচ্ছে? একি স্বপ্ন দেখছি?

—কী আর করা যাবে? বাধ্য হয়ে সেই প্রযুক্তির কাছেই দাসত্ব স্বীকার করতে হল। যদিও এটার থেকে আমি বেশ খানিকটা দূরত্ব রাখব ঠিক করেছি। এটা তাই গণেশের কাছেই রেখেছি।

তা যে জন্য এই ফোনটা করছি। আমি ডেভ সম্বন্ধে খানিকটা খোঁজখবর নিলাম। তোমার সন্দেহটা হয়তো ঠিক। ডেভ ও গিল হারভে একই লোক হতে পারে। প্রায় হঠাৎ করে পাঁচ বছর আগে বিজ্ঞানী মহলে ডেভ-এর নামটা উঠে আসে। তার আগে ওনার নাম কখনও শোনা যায়নি। তার পরে হঠাৎ করে একাধিক রিসার্চ পেপারে ওনার কাজের উল্লেখ দেখি। 'নিউ

লাইফ' সংস্থাটা সম্বন্ধেও একই ব্যাপার। গত বছর ওই সংস্থার দুজন বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেন। হঠাৎ করে এই সংস্থা দেউলিয়া ঘোষিত হয়।

—তা এই ডেভ-এর কোনও ছবি পাওয়া গেছে? বা এই সংস্থার কাজ করার আগে কোথায় যুক্ত ছিলেন সেরকম কোনও পরিচয় পাওয়া গেছে?

—না, সেটাই মজার। কোথাও কোনও ছবি নেই। আগে কী করতেন বা কোথায় পড়াশোনা করেছেন তার সম্বন্ধেও কোথাও কোনও উল্লেখ নেই। এটা নিশ্চিত যে এই ভদ্রলোক শুরু থেকেই তার আসল পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। তা-না হলে আজকের দিনে এত বড় একজন বিজ্ঞানী হয়ে এভাবে পরিচয় লুকোনো যায় না। আর কী জন্য লুকিয়েছেন তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

—গিল হার্ভের কোনও খোঁজ পেয়েছেন?

—না, একই সঙ্গে গিল হার্ভের উল্লেখ কোথাও নেই। সেই তোমাদের পেরুর ঘটনার পর থেকে ম্যাজিকের মতো উধাও। তিনিই যে অন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

—তা মিস্টার পাই, যদি এনার হাতে সত্যিই কোনও শক্তিশালী মাইক্রোব তৈরি হয়ে থাকে, তা দিয়ে কি কোনওরকম মাস মার্ডার সম্ভব? আপনার কী মনে হয়?

—দেখো যেখানে আমরা নতুন প্রাণ তৈরি করছি, সেখানে আমরাই ঈশ্বর। আমরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। এখানে আমরা বলতে পারো শূন্য থেকে শুরু করছি। তাকে কী ক্ষমতা দেবে, তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, সে কীভাবে কাজ করবে, কীভাবে আত্মপ্রকাশ করবে পুরোটাই আমাদের হাতে ডিজাইন করা। জিন থেকে শুরু করে। তাই আমাদের চেনাজানা কোনও মাইক্রোব বা প্রাণীর সঙ্গে তাকে তুলনা করলে আমরা ভুল করব।

তাই এই ধরনের মাইক্রোব যে কী করতে পারবে আর পারবে না, তা বলা সত্যি মুশকিল। এ ধরনের সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার হাতে অনেক দায়িত্ব আসে। সেখানে যদি আমরা সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করি, তবে খুবই বিপদ।

—হ্যাঁ, আর তা ছাড়া মিস্টার পাই, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া লক্ষ লক্ষ বছরের অভিযোজনের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে তাদের স্থান করে নিয়েছে। আর আমরা এখানে কী করছি। সে সব প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে এমন এক প্রাণ নিয়ে এসেছি যে হয়তো নিজেই নিজের নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করবে।

—একদম ঠিক বলেছ অনিলিখা। আর সেখানেই এ ধরনের প্রাণী আমাদের পরিচিত সব প্রাণীর থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

একটু থেমে মিস্টার পাই বলে উঠলেন,—তা গোয়েন্দারা গিল বা ডেভ-এর কোনও খোঁজ পেল? রাজর্ষি কী বলছে?

—না এখনও পায়নি। উলটে শুনছি অহেতুক অনেক বিদেশিদের ধরপাকড়, হেনস্থা করা হচ্ছে। নাম ডেভ-এর কাছাকাছি কিছু হলে তো কথাই নেই। বুঝুন অবস্থা। ভয় হচ্ছে যে শেষ কয়েকদিন যেরকম চুপচাপ, তাতে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ঠিক যেন ঝড়ের আগের নীরবতা। সত্যিই কি কলকাতার বড় বিপদ? কে জানে?

ফোনটা রাখতেই অনিলিখার মনে পড়ল আট বছর আগের সেই ভয়ংকর রাতে গিলের বলে যাওয়া সেই কথা। 'বিজ্ঞানীর কাজ বিজ্ঞানকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমাজকে নয়। বিজ্ঞানী স্বাধীন, তার কোনও দায়িত্ব নেই।'

যে বিজ্ঞানী এরকম কথা বলতে পারেন, তাঁর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। হ্যাঁ, নিজের হাতে তৈরি নতুন মাইক্রোবের ক্ষমতা প্রমাণ করতে তিনি লক্ষ লোককে মারতেও দ্বিধা করবেন না। এর জন্য ওই কি দায়ী? গিল কি অনিলিখার জন্যই কলকাতার ক্ষতি করতে চাইছে? নাকি কলকাতাকে উনি বেছে নিয়েছেন জনসংখ্যার জন্য।

১৬

আরেকটা শনিবার এসে গেল। নাহ, আজ আর শনিবারের আসরে যেতে ইচ্ছে করছে না অনিলিখার। অনেক কাজ। একবার মধ্যমগ্রামে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ওখানে নিজের হাতে আবাসিকদের জন্য কিছু রান্না করে নিয়ে যায়। অনিলিখা ওখানে গেলেই প্রায় উৎসব শুরু হয়ে যায়। আসলে অনেকেই ওখানে আছেন, যাদের ছেলে-মেয়েরা বাইরে বিদেশে বহু বছর থাকেন। অনেকে খোঁজও রাখে না। তাদের কাছে আজ অনিলিখাই সবথেকে বেশি আপনার।

আজকে ঠিক করেছে সবার জন্য পায়েস করে নিয়ে যাবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে বেশ কিছু বই, পত্রিকা। বই পড়লে এনাদের শুধু সময় যে ভালো কাটবে তাই না, এনারা মানসিক দিক দিয়েও অনেক বেশি সুস্থ থাকবেন।

এর মধ্যে আবার ফোন বেজে উঠল। তন্ময়ের।

—আজকে আসছ তো অনিলিখাদি?

—না রে, আজকে আর আসতে পারব না। অনেক কাজ আছে। আজকে অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—সে কী? তুমি নির্ঘাত ওই কঙ্কাল কাণ্ডের জন্য এখনও ছোটাছুটি করছ।

—সে আর এগোল কোথায়।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—আজকে মধ্যমগ্রাম যেতে হবে। তার আগে বেশ কিছু বই-পত্রিকা কিনতে হবে কলেজ স্ট্রিট থেকে। আর তোকে তো গিল-এর কথা বলেছিলাম। সেই মনে হয় এর পিছনে আছে। কিছু জায়গায় আজকে ওনার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে আছে।

—তা কাগজে যে সংকেতটা বেরিয়েছিল, সেটা কিছু উদ্ধার হয়েছে? টিভিতে ওটা নিয়ে তো মাঝেমধ্যেই অনেক আলোচনা হচ্ছে।

—ধুর, গত পাঁচ দিনে গোয়েন্দা দপ্তর কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। আর টিভিতে শুধু তাই নিয়ে খেজুরে আলাপ-আলোচনা চলছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রাজর্ষি বলছে ওই মেসেজটার মূলে আছে কোনও একটা 'কি ওয়ার্ড'। ওই 'কি ওয়ার্ড' যতক্ষণ না উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই সংকেত উদ্ধার সম্ভব নয়।

—তা গিল হঠাৎ কলকাতা বাছল কেন বলো তো?

—এত লোক যে শহরে, সে শহর টেররিস্টদের ভালো টার্গেট হয়। তা ছাড়া মূল কারণটা বোধ হয় আমি। আমার উপরে তো ভারি রাগ। আগেরবার সব কিছু আমার জন্যই ভেস্তে যেতে বসেছিল।

—তুমিও যেমন ওর কথা ভাবছ, ওই গিলও নিশ্চয়ই তোমার কথাই ভাবছে সারাক্ষণ।

—হ্যাঁ, তা হবে হয়তো। কাগজের সেই সংকেতটা—বলে একটু থেমে গেল অনিলিখা—দাঁড়া, একটা কথা তুই দারুণ বলেছিস।—ফোনটা ছাড়ছি। একটু ভাবতে হবে।

বলে চট করে ফোনটা কেটে দিয়ে, অনিলিখা ছুটে গিয়ে সেদিনের কাগজটা বার করল। তার পরে একটা কাগজ পেন নিয়ে বসে গেল। সেই সংকেতটা বার করল। সেদিনের পরে সংকেতটা নিয়ে আর বেশি সময় দেওয়া হয়নি। ভেবেছিল গোয়েন্দা বিভাগের এক্সপার্ট টিম যখন কাজ করছে, তখন ওরাই এর সমাধান খুঁজে বার করতে পারবে।

ইংরেজিতে লেখা বেশ কিছু অক্ষর আর সংখ্যা। পরপর 26টা অক্ষর এক লাইনে। এরকম ছ'টা লাইন আছে। কিন্তু না আছে কোনও অর্থ, না আছে কোনও প্যাটার্ন।

ইংরেজি অ্যালফাবেটে 26টা অক্ষর আছে। এখানেও ছ'টা লাইনের প্রত্যেকটাতে 26টা করে অক্ষর বা সংখ্যা। আচ্ছা, ওই অক্ষরগুলোর ঠিক উপর দিয়ে যদি A, B, C করে Z অবধি লেখা হয়, কী হয়।

তন্ময় একটা খুব দরকারি কথা বলেছে। গিল—কার কথা সবার আগে ভাববে। অনিলিখা। ANILIKHA। এই অনিলিখাই যদি 'কি ওয়ার্ড' হয়।

‘A’ ‘N’ ‘I’ ‘L’ ‘I’ ‘K’ ‘H’ ‘A’ এই অক্ষরগুলোর ঠিক নীচের সংখ্যা বা অক্ষরগুলো খুঁজে নিল অনিলিখা। পরপর 6 লাইন জুড়ে। তাতে যে লেখাটা বেরিয়ে এসেছে তা হল—19 Jun Chandni Metro 10 AM।

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
[1_{1}]	X	7	B	5	R	T	[H_{7}]	[J_{3}]	R	[C_{6}]	[U_{4}]	P	[9_{2}]	X	3	S	N	R	4	R	W	M	N	P	S
[A_{8}]	U	W	M	6	5	O	[T_{15}]	[N_{5}]	S	[E_{14}]	[I_{12}]	W	[D_{10}]	Z	5	P	O	5	W	N	5	4	3	O	Q
[N_{9}]	T	S	R	M	6	R	I	[N_{11}]	M	8	[A_{20}]	M	[1_{18}]	P	L	T	X	T	3	5	2	X	Z	Y	2
[R_{16}]	O	O	S	9	5	8	2	[M_{13}]	L	3	N	8	R	O	4	R	Z	M	R	7	5	W	X	7	5
[O_{17}]	4	3	2	8	7	6	X	[O_{19}]	P	4	T	Q	9	P	R	6	X	S	P	S	R	4	2	Q	P
N	6	7	S	4	8	9	5	[M_{21}]	9	9	S	T	4	9	T	5	W	X	R	6	T	U	V	W	4

তার মানে? আজকেই তো 19 June। ঘড়িতে এখন সকাল ন'টা বেজে দশ। ঠিক পঞ্চাশ মিনিট বাকি।

১৭

রাজর্ষির সঙ্গে চটজলদি কথা বলে নিল অনিলিখা। কীভাবে অনিলিখা ওর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বোঝাতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ওর সঙ্গে কথার মধ্যেই রাজর্ষি রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোরসের সঙ্গে যোগাযোগ করল। প্রত্যেক মেট্রো স্টেশনে কুইক রেসপন্স টিম থাকে। তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল।

অনিলিখার বাড়ি চাঁদনি থেকে বেশি দূরে নয়। পাশেই গিরিশ পার্ক মেট্রো। অনিলিখা জানাল ও পুলিশের সঙ্গে না গিয়ে মেট্রোতে করে এখনই চাঁদনি স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেটাই তাড়াতাড়ি হবে। ওখানে গিয়েই রাজর্ষির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

কোনওরকমে একটা সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এল অনিলিখা। মেট্রো পেতেও দেরি হল না। ট্রেনে অফিসের ভিড়। ধাক্কাধাক্কি। কিন্তু চাঁদনির আগের স্টেশন, সেন্ট্রালে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল।

আনাউন্সমেন্ট হচ্ছে 'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিছুক্ষণের জন্য চাঁদনি স্টেশনে রেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।'

তাড়াতাড়ি মেট্রো থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরল অনিলিখা। চাঁদনি মেট্রোর কাছে যখন পৌঁছোল তখন ঘড়িতে পৌনে দশ। স্টেশনের বাইরে বেশ কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ। স্টেশন খালি করা শুরু হয়ে গেছে। ভেতরে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সকলের মধ্যেই কৌতূহল। কানাঘুষো। কী হচ্ছে?

একজন তো অনিলিখাকেই সাবধান করল—বোমা আছে দিদি। যাবেন না। আল কায়দা অ্যাটাক করেছে।

পুলিশ কিন্তু বেশ ভালো কাজ করছে। বেশি লোক জড়ো হতে দিচ্ছে না। ভেতরে এতক্ষণে রেল পুলিশের 'কুইক রেসপন্স ফোর্স' দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাজর্ষি এসে গেল। পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক। পোশাক দেখে মনে হয় গতকাল রাতে থানাতেই ছিল। চোখে-মুখে ক্লান্তি। খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে তার ছাপ। অনিলিখাকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। নীচে শুধু পুলিশের লোক আর কিছু মেট্রোর অফিসাররা আছেন। সাধারণ যাত্রীদের বার করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যস্ততার মধ্যেও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে অনিলিখার পরিচয় করিয়ে দিল রাজর্ষি।

সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই ধরা হবে। ডেভ-এর ডিটেলস সবার কাছে দেওয়া আছে। পুরোটাই অবশ্য অনিলিখার বর্ণনা থেকে আঁকার ভিত্তিতে।

পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে, কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা। আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল। কিছুই পাওয়া যায়নি। সব স্বাভাবিক। অনিলিখারই একটু অস্বস্তি লাগছে। চারদিকে এত বড় কর্মকাণ্ড, সবই ওর তথ্যের উপরেই নির্ভর করে। তা হলে কি ডেভ শেষ মুহূর্তে প্ল্যান পরিবর্তন করেছে? নাকি ও অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিল?

মহাত্মা গান্ধী স্টেশন থেকে স্ল্যানেড স্টেশন, টানেলের ভেতর সব জায়গায় চিরুনি তল্লাশি হচ্ছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা।

সাড়ে দশটা অবধি কোনও কিছু না পেয়ে আবার মেট্রো চালু করে দেওয়া হল।

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল অনিলিখা। আর যাই হোক, একটা জিনিস বুঝেছে অনিলিখা যে বাইরে থেকে এই সব মেট্রো স্টেশনের নিরাপত্তা যতই নড়বড়ে মনে হোক না কেন, আসলে তা নয়। ভেতরে ভেতরে একটা বড় প্রস্তুতি থাকে, এ ধরনের অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্য। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য পুলিশ সব সময় প্রস্তুত থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রেল পুলিশের কমান্ডোরা যে ভাবে পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল তা সত্যি দেখার মতো।

মেট্রো থেকে বাইরে বেরিয়ে কাছাকাছির কোনও একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। কেউ সঙ্গে থাকলে ভালো হত। একা তো আর খেতে ভালো লাগবে না। তাই শেষে খেতে না গিয়ে কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় ঢুঁ মারবে ঠিক করল অনিলিখা। বাইরে এখনও বিশাল লাইন মেট্রোতে ঢোকার। এরকম অফিস টাইমে হঠাৎ করে মেট্রো বন্ধ হওয়ার খবর শুনে লোকে গালমন্দ করছে। এরা কখনও জানতেও পারবে না আসলে কী হয়েছিল, বা কি সন্দেহ করা হচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল অনিলিখা। হঠাৎ চোখ পড়ল পাশে ট্র্যাফিকে আটকে থাকা উবের ট্যাক্সির দিকে। পেছনের সিটে একজন ছোটখাটো চেহারার লোক বসে আছে। গাঢ় বাদামি রং। গায়ে লাল চাদর জড়ানো। গোল মতো মুখ। ভোঁতা নাক। নীচের ঠোঁটটা সামনের দিকে অস্বাভাবিক রকম ঝোলা, চিবুকে এসে ঠেকেছে।

চোখাচোখি হতেই লোকটা অনিলিখার দিকে বিশেষ অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে উঠল। আর তারপর বন্ধ কাচের উপরে দাগ কাটল। একটা বৃত্ত। তার পরে আরেকটা বৃত্ত।

ট্র্যাফিক লাইট ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে। অনিলিখার অবাক চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে গেল। চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যেতেই অনিলিখা বুঝল যে এ ধরনের লোককে ও আগে কোথায় দেখেছে।

আট বছর আগে সেই অগ্ন্যুৎপাতের রাতে আমাজনের জঙ্গলে যাদের সঙ্গে ও টটোরা বোটে পালিয়েছিল, যাদের সাহায্যে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের হাত থেকে বেঁচেছিল, এ তাদেরই একজন। সেই পেরুর উপজাতি, যারা ভিনগ্রহীদের ভাষা বোঝে। যাদের ভাষা আজও তাই বৃত্তের ভাষা। আর তাই বোঝানোর জন্যই গাড়ির জানলায় বৃত্তের দাগ দিয়ে কিছু যেন লিখছিল লোকটা।

তাহলে কি অনিলিখার অনুমান ঠিক? এখানে কি ডেভ-এর প্ল্যান ওরাই বানচাল করে দিল। কিন্তু ওরা টের পেল কী করে? কেনই-বা এ লোকটা এখানে এল? তাহলে কি এই লোকটা এখানে ভিনগ্রহীদের নির্দেশে তাদের সংকেত পেয়েই এসেছে। ও নিজের চোখে দেখেছে গাড়ির জানলায় আঁকা সেই বৃত্ত। সেই একই ভাষা।

ফোন বাজছে। রাজর্ষির গলা—

—অনিলিখা, আপনার ধারণা একদম ঠিক। এখানে মেট্রোর ট্রেন কন্ট্রোল রুমের ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি যেখানে আছে, তার মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সঙ্গে একটা ছোট ভায়াল।

আমাদের ধারণা এটা ডেভ-এরই। পকেটে ওর ওয়ালেট পাওয়া গেছে। আপনি কি কাছাকাছি আছেন? পারলে একবার এখনই চলে আসুন। কী করে ডেভ এখানে ঢুকল, কেই-বা ওকে মারল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আপাতত। ডেভ নিজেই কীভাবে শিকারে পরিণত হল তা বোঝা যাচ্ছে না।

১৮

ফেয়ারলি প্লেসে ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে মিটিং হচ্ছে। রেলের ও পুলিশের বড় কর্তারা তো আছেনই, রাজর্ষিও আছে। অনিলিখা আর মিস্টার পাইকে ওনারা অনুরোধ

করেছিলেন থাকার জন্য, যাতে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া যায়।

সেদিনকার ওই কঙ্কালটা যে ডেভ-এর ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কঙ্কালের পায়ে যে মোজা ছিল তার ফাইবার আগে পাওয়া মোজার ফাইবারের সঙ্গে মিলে গেছে। প্যান্টের পকেটে যে ওয়ালেট পাওয়া গেছে, তাতে ডেভ-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে। সঙ্গে একটা শূন্য ভায়াল, যাতে ওই মাইক্রোব রাখা ছিল। সেই আসল খুনিকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে তার হাতেই যে তার স্রষ্টার মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এসি ডাকটের বাতাসে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যই কি ওই ভায়াল ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ডেভ? নাকি কোনওভাবে ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম যারা পরিচালনা করে তাদের আক্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন? সেটা হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত ভাবাই যায় না।

ঘটনা ঘটার অনেক আগেই উনি নিজেই ওনার পোষ্যের শিকার হয়েছেন। তাই সেই ভায়ালের মাইক্রোব কেন ডেভকেই একমাত্র আক্রমণ করল, সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন।

মিস্টার পাই মিটিং রুমের এক কোণে বসে টেবিলে রাখা কাজু চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। আর মাঝেমধ্যে বিশাল হাই তুলছিলেন।

এ বিষয়ে ওনার মতামত জিগ্যেস করতে প্রথমে বিষম খেলেন। তার পরে সেটা সামলে বলে উঠলেন,—ডেভ এদের ব্যবহার করেই বারবার খুন করছিল। দেখাতে চাইছিল যে সে চাইলে কী করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে তা হয়নি সেটা পরিষ্কার। ডেভ কিছু করার আগেই অন্য কেউ এসে ডেভ-এর হাত থেকে ওই মাইক্রোবগুলোর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়েছিল আর প্রয়োগ করেছিল ডেভ-এর উপরেই। প্রশ্ন হল কে সেই লোক?—মিস্টার পাই অনিলিখার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—তুমিই বাকিটা বলো অনিলিখা।

অনিলিখা বলে উঠল—অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের যুক্তিতর্কের বাইরে হয়। এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে এমন একটা বিষয়ের উপরে, যা আমরা কেউ মন থেকে সহজে মেনে নিতে পারব না। আপনারা হয়তো জানেন কয়েক বছর আগে আমাকে পেরুতে এক অভিযানে যেতে হয়েছিল। তার মূলে ছিল দূর গ্রহ থেকে অ্যারেকিবো টেলিস্কোপে পাওয়া কিছু সংকেত। সে সংকেত আমরা প্রথমে না বুঝলেও পেরুতে এমন এক উপজাতির সন্ধান পাই, যারা সে সংকেত বোঝে। সে উপজাতি পেরুর ঠিক কোথায় থাকে তা কেউ জানে না। সরকারের রেকর্ডে থাকা উপজাতিদের মধ্যেও ওরা পড়ে না। মজার কথা হল ওরা শুধু যে এই সংকেত বুঝতে পারে তাই না, সেই ভাষাতে কথাও বলে।

তারা ও সেই ভিনগ্রহীরা একই কিনা, সে বিতর্কে যাব না, তবে এত বছর বাদে সেদিনই আমি তাদের একজনকে প্রথম দেখি, ওই চাঁদনি মেট্রোর কাছে। ব্যাপারটা আমাকে তখন অবাক করেছিল। এখন মনে হয় বুঝেছি। ওরাই ছিল ডেভ-এর মৃত্যুর মূলে। ওই মাইক্রোব দিয়ে ডেভকেই আক্রমণ করে এ যাত্রায় বহু লোকের জীবন বাঁচায় ও।

—এসব তো গল্পের মতো মনে হচ্ছে।—হেসে উঠলেন রেলের এক উচ্চপদস্থ অফিসার।

—এর আরেকটা জোরালো ভিত্তি আছে। প্রায় আট বছর বাদে অ্যারেকিবো টেলিস্কোপ ঠিক একইরকম সংকেত পেয়েছে। আগেরবারের মতো এবারেও এই সাংঘাতিক বিপদের কথা ভিনগ্রহীরা আমাদের আগেই টের পেয়েছিল। আর তাই আমাদের সাবধান করার জন্য এই সংকেত পাঠিয়েছিল। আপনাদের এ বিষয়ে আমি ডিটেলস দরকার হলে জানাতে পারি।

—কিন্তু সে মাইক্রোব গেল কোথায়?

—আমরা এখনও এই মাইক্রোব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবে যদ্দুর ধারণা এরা মানুষকে মারতে পারে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত করতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে যতক্ষণ মানুষ বা আক্রান্ত জীবের প্রাণ থাকে, ততক্ষণই এদের প্রাণ থাকে। আর তাই এদের কোনও অস্তিত্ব আমরা এবারেও খুঁজে পাইনি।

—কিন্তু আবার যদি এরকমভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা হয়?

—মনে হয় আর হবে না, কারণ আমরা বুঝতে না পারলেও এরা এখন ওই ভিনগ্রহীদের ভাষা বোঝে। তাদের আদেশ বোঝে। আর তাই এই মাইক্রোবরা আর মানুষের বিরুদ্ধে যাবে না। তবে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আর কে কে এর সঙ্গে যুক্ত আছে। একটা লোকে তো আর সংস্থা চলে না। তবে মাথা যখন গেছেন, তখন বাকিদের ধরতে কষ্ট পেতে হবে না।

মিটিং আরও বেশ খানিকক্ষণ চলল। অনিলিখাকে ও মিস্টার পাইকে পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হল।

মিস্টার পাই বেরিয়ে এসে বললেন,—চলো, সব দুশ্চিন্তা আপাতত শেষ। এবারে এ আনন্দে একটু চিংড়ির কাটলেট খাওয়া যাক।

—তা আপনার গাড়িটা কোথায় আছে?

—সেটা তো গণেশের সঙ্গে।

—তাহলে ফোন করে ডেকে নিন।

—সর্বনাশ। ওটাও তো গণেশের সঙ্গে।

—ঠিক আছে, আমার কাছে নাম্বার আছে। আমিই ফোন করছি।

একটু চিন্তিত ভাবে মিস্টার পাই বলে উঠলেন,—দেখো পাও কিনা। আজকে সকালেই আমি ওকে বলেছি সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির থেকে দূরে থাকতে।

১৯

আবার শনিবারের আসরে আমরা জড়ো হয়েছি। আজ বলা যায় হাউসফুল। যারা নিয়মিত আসে, যারা মাঝেমধ্যে আসে, যারা প্রায় আসেই না—সবাই আজ হাজির। বিশ্বজিৎদাও আছে। তবে মূল আকর্ষণ অবশ্যই অনিলিখা। আমরা সবাই জানতাম আজ অনিলিখা আসবে। সে আকর্ষণেই সবার আসা।

কঙ্কাল কাণ্ড সমাধান হয়ে গেছে। মিডিয়ায় প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী যে সিরিয়াল কিলার এসব খুনের পিছনে ছিল, সে মারা গেছে। কিন্তু কীভাবে মারা গেছে বা পুলিশ কীভাবে তাকে মেরেছে তা পরিষ্কার করে কোথাও বলেনি। তাতে রহস্য আরও বেড়েছে। সেটা নিয়ে বাসে, ট্রামে, চায়ের দোকানে সর্বত্র আলোচনা চলছে।

আমরা শুধু এটুকু জানি যে এ ব্যাপারে একমাত্র যে জানতে পারে সে হল অনিলিখা। কিন্তু সত্যি কথা হল অনিলিখাকে এ-ক'দিন যোগাযোগ করা যায়নি। কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরেও ছিল এর মধ্যে। অবশেষে সে প্রতীক্ষার অবসান।

—ইনএফিসিয়েন্ট। আনপ্রফেশনাল। এত গুলো খুন হল। কীভাবে হল, কেন হল—কোনও উত্তর নেই। খুনি নাকি মারা গেছে! কী প্রমাণ? এরকমও তো হতে পারে যে খুনি কিছুদিনের জন্য জার্মানি বেড়াতে গেছে।—বিশ্বজিৎদার রাগটা কলকাতা পুলিশের উপরে হলেও খোঁচাটা যে অনিলিখার জন্য সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

অনিলিখা মাঝে কয়েকদিনের জন্য জার্মানি গিয়েছিল।

অনিলিখা কোনও কথা না বলে চেয়ারে বসে মন দিয়ে বাড়িতে বানানো মাংসের শিঙাড়া খাচ্ছিল।

শেষে এসব ইন্ডাইরেক্ট ট্যাকটিক্স কোনও কাজ করছে না দেখে আমাকেই আবার বলতে হল—তা তোমার কী মনে হয় অনিলিখাদি? কী হয়েছিল? তুমি তো এ ব্যাপারে নিজে ইনভলভড ছিলে।

—কী আবার? এসবের পিছনে ছিল এক বিশেষ মাইক্রোব, যাকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। একে তৈরি করা হয়েছিল মানুষ খুনের জন্য। খুব তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে কোনও মানুষের মাংস খেয়ে নিতে পারে। নিঁখুত অস্ত্র। মাইক্রোব সাধারণ চোখে দেখা যায় না। যে এর পিছনে থাকে তাকে ধরা আর শক্ত হয়ে যায়।

—কিন্তু পুলিশ তো মিডিয়াকে এরকম কিছু বলেনি? তুমি জানলে কী করে?

—এ ধরনের তথ্য সাধারণ জনতার সামনে এলে আরও অনেক প্রশ্ন উঠত, যার উত্তর দেওয়ার মতো তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না। এটাই আসল কারণ।

—কেন?

—প্রশ্ন উঠত কী এই মাইক্রোব? কে তৈরি করল এই মাইক্রোব? কীভাবেই বা সেই মাইক্রোবের পিছনে থাকা আসল খুনি মারা গেল? সে খুনিরই বা কেন কোনও ছবি প্রকাশ করা হল না? সে খুনির দেহই বা গেল কোথায়?

তন্ময় বলে উঠল,—সেকি? তাহলে সে খুনি মারা যায়নি বলছ? বেঁচে আছে?

—না, না, আমি তা বলিনি। সেও মারা গেছে তার নিজের হাতে তৈরি ওই একই মাইক্রোবের হাতে। আসলে নিজের সৃষ্টি যখন নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন যা হয় আর কি? আর তাই তারও দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে তার কঙ্কাল। একইসঙ্গে ওই মাইক্রোবও ধ্বংস হয়ে গেছে স্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে।

—কে এই স্রষ্টা?

—গিল হারভে। আমার পুরনো বন্ধু, যার কথা তোমরা সংকেত রহস্যে শুনেছ। এখন অবশ্য তিনি সামনে এসেছিলেন ডেভ নাম নিয়ে।

—মানে?—বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।—সেই গিল হারভে যার সঙ্গে তোমার পেরুতে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। আর বলতে পারো আমাকে গিল ওনার উপস্থিতি জানানোর জন্যই একের পর এক এভাবে খুন করছিলেন। যাতে আমি ওনার আসল মেসেজটা পাই যে উনি কলকাতার বুকে একটা বড়সড় আঘাত হানতে চলেছেন। আগের বারের কথা ভুলতে পারেনি গিল। কিন্তু কলকাতার বুকে বড় আঘাত হানার আগেই ওনাকে মরতে হল ওনারই তৈরি মাইক্রোবের হাতে। আর আবার প্রমাণ হল যে আমাদের মধ্যেই ভিনগ্রহীরা আছে। যারা মানুষের ভালো চায়। বিপদের সময় আমদের রক্ষা করে।

—কারা তারা? তুমি পেরুর যে উপজাতির কথা বলেছিলে? তারা?

—ঠিক তাই। তবে এ ঘটনাটা টপ সিক্রেট। 'সেটি' জানে, বিশেষ কিছু লোক জানে। তাই এ ব্যাপারে এর বেশি কিছু কথা বলতে পারব না। আজ আমাদের বিচারে এই উপজাতি উন্নত নয়। তারা কোথায় ঠিক থাকে তা আমিও জানি না। কিন্তু তাদের হাতে এক বিশেষ অস্ত্র আছে। তা হল তাদের ভাষা। সংকেতের ভাষা, যার সাহায্যে তারা এখনও তাদের ভিনগ্রহী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারাই এবার আমাদের রক্ষা করেছে। গিলের মৃত্যু হয়েছে ওদেরই হাতে। গিল মারা না পড়লে কী হত বলা মুশকিল। এ ঘটনা শুধু কলকাতায়

থেমে থাকত না, হয়তো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত। এ ধরনের মাইক্রোব টেররিস্টদের হাতে পৌঁছলে কী হত ভাবা যায়!

এখনও কি বিপদ আছে?

গিল তো আর একা কাজ করেনি। নিশ্চয়ই আরও লোক ছিল এর পিছনে। তাদের খোঁজখবর চলছে। এখনও এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রতীক বলে উঠল,—আচ্ছা, ওই যে ম্যাথামেটিশিয়ান, অপরাজিতবাবু—তাকেও কি গিলই মেরেছেন?

—আমার তো তাই মনে হয়। ওনার পায়ে বিষ ইঞ্জেক্ট করে মারা হয়েছিল। কিন্তু ফরেন্সিকস ছাড়া এখন নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

—কিন্তু ওনাকে মারা হল কেন?

—অপরাজিতবাবুর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল ওই মাইক্রোব তৈরি করতে। পরে অপরাজিতবাবু গিলের ও গিলের টিমের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। হয়তো বাধাও দেন। কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে তখন মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়। সেটা এড়াতেই উনি ইংল্যান্ড ছেড়ে এখানে চলে আসেন। কিন্তু গিল জানতেন অপরাজিতবাবু কোনওভাবে পুলিশকে সবকথা জানিয়ে দিলে ওনার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই ওনাকে মারা হয়।

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—এসব গণ্ডগোলের মূলে অনিলিখা। অনিলিখার জন্যই কলকাতাকে এভাবে আক্রান্ত হতে হল। এর থেকে অনিলিখাকে ধরে নিয়ে গেলেই পারত। কিংবা দু-একটা মাইক্রোব অনিলিখার জন্য—

অনিলিখা হেসে বলে উঠল,—শুধু আমি কেন! এখন তুমিও নিশ্চিন্ত নও! কে বলতে পারে তোমার ওই সিঙ্গাড়ার মধ্যে দু-একটা মাইক্রোব ঘোরাফেরা করছে না। এমনিতেও মাংস ওদের প্রিয় খাবার।

—সর্বনাশ—বিশ্বজিৎদা বিষম খেয়ে হাতের শিঙাড়া ফের প্লেটে রেখে দিল।

২০

ঘটনার পরে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে।

রাত ন'টা। অনিলিখার ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা বেজে উঠল। সামনে পুজো আসছে। চাঁদার জন্য কেউ আসতে পারে। কে এসেছে দেখার জন্য অনিলিখা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজা হাট খোলা। মালতী দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু বাইরে কেউ নেই।

এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে কেউ নেই দেখে মালতী অবাক হয়ে বলে উঠল,—কেউ নেই দিদি। এই তো এখনই বেল বাজল। খুলতে-না-খুলতে চলে গেছে, কী তাড়া। কী সুন্দর

'শাশুড়িমা ভগবান' সিরিয়ালটা দেখছিলাম। বাকিটা আর দেখতে পেলাম না।—একটু থেমে ফের বলে উঠল,—ও মা! কী আবার রেখে গিয়েছে দরজার কাছে লাল প্যাকেটে।

অনিলিখা দরজার কাছে এগিয়ে এল। বাইরে একটা গিফট প্যাক। কে যেন রেখে দিয়েছে। আস্তে করে তুলে নিল অনিলিখা। ঘরে এসে লাল কাগজে মোড়া গিফট প্যাকটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা ছোট কাঠের বাক্স। আর একটা ছোট চিঠি। কয়েকটা লাইন টাইপ করে লেখা শুধু।

অবাক হয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল অনিলিখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়—

আর খানিকক্ষণের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আবার দেখা হবে। অনেক কিছুই ঠিক অনুমান করেছ। কিন্তু যেটা ঠিক অনুমান করোনি, তা হল আমি আর ডেভ একজন নই। অবশ্য ডেভ আমার হয়েই কাজ করত। ডেভ চলে গেলেও আমি আছি। এ যাত্রায় ওই মাইক্রোবগুলোর উপরে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। কিন্তু এখনই যুদ্ধ শেষ হয়নি। আমার কাছে এরকম নতুন মাইক্রোব তৈরি করা শক্ত কিছু নয়।

তোমার জন্য বাক্সে উপহার রেখে গেলাম। তোমার প্রিয় পেরুর বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন। ওর হাতের এগোরোটা আঙুল।

ওদের ডান হাতে ছ'টা আর বাঁ-হাতে পাঁচটা থাকে। হয়তো আগে খেয়াল করোনি। দেখো এখানেও সেই মৌলিক সংখ্যা। পরের বার ওদের চিনতে তোমার সুবিধে হবে। আবার দেখা হবে।

গিল হার্ভে।

666।



সমাপ্ত

পড়ে ভালো লাগলে বই কিনে রাখুন, এই রকম আরো বই পড়তে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন করুন